বাঙলা সাহিত্যের পরিচয়

(প্রাচীন ও মধ্যযুগ)

শ্রীপরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

প্রধান অধ্যাপক, বাঙলা বিভাগ,

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ, নৈহাটী

ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ

২০৬, কর্ণওয়ালিস [illegible]

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

নিবেদন :

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের সামগ্রিক পরিচয়। এম্. এ., বি. এ. (সাম্মানিক) ও বি. এ. (নির্বাচিত) পাঠক্রমের অনুসারী।

অধ্যয়ন-অধ্যাপনা-প্রসঙ্গে যে সকল গ্রন্থ, গ্রন্থকার, অধ্যাপক এবং বন্ধুজনের সহায়তা লাভ করিয়াছি এবং জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যাঁহাদের ভাবনা-কামনার অংশ গ্রহণ করিয়াছি, তাঁহাদের উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

স্বীকৃতি :

* পাণ্ডুলিপি-প্রণয়নে ও মুদ্রণ-পরীক্ষাকার্যে সহায়তা করিয়াছেন :

গৃহিণী ও কন্যারা।

অন্যপ্রকারে সহায়তা করিয়াছেন :

কয়েকজন প্রীতিভাজন সহকর্মী ও কতিপয় স্নেহভাজন প্রাক্তন ছাত্র।

ইহারা সকলেই আমার আশীর্ভাজন ॥

অধ্যাপক-বন্ধু সুধাংশু ভট্টাচার্য্য গ্রন্থ-প্রকাশে এবং বন্ধুবর রূপেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মুদ্রণ-ব্যাপারে অকৃপণ সহায়তা করিয়াছেন।

ঃ সূচক পত্র ঃ

পৃষ্ঠাঙ্ক

পৃষ্ঠাঙ্ক

অধ্যায় : দশ

পৃষ্ঠাঙ্ক

পৃষ্ঠাঙ্ক

অধ্যায় : বারো

মঙ্গলকাব্য সাহিত্য : ২১১—২৯৯

পৃষ্ঠাঙ্ক

পৃষ্ঠাঙ্ক

গোড়ার কথা

আনুমানিক বারো হাজার বছর আগে মধ্যয়ুরোপ অথবা মধ্যএশিয়ার কোন এক স্থানে একভাষা-ভাষী বা সমভাষা-ভাষী ভিন্নজাতির লোক বাস করিত। এতকাল পর্যন্ত ইহাদেরই আর্যজাতি বলিয়া অভিহিত করা হইত। কিন্তু এক্ষণে বলা হয়, আর্য নামে কোন বিশেষ জাতি কোনকালে বর্তমান ছিল না, সম্ভবত বিভিন্ন জাতির লোক পরস্পরের পক্ষে বোধগম্য এক বা একাধিক ভাষায় কথা বলিত—উক্ত ভাষার নাম 'আর্যভাষা' এবং এই ভাষা-ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীর নাম 'আর্যভাষা-ভাষী সম্প্রদায়।'

আদি আর্যভাষা

এই আর্যভাষা বা আদি আর্যভাষাই কালক্রমে স্থানভেদে নানা রূপান্তর লাভ করিয়া য়ুরোপ ও ইরাণ-ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন ভাষায় পরিণত হইয়াছে। এই হেতু এই ভাষার নাম 'ইন্দো-য়ুরোপীয় আদি আর্যভাষা বা পিতৃভাষা' (Indo-European Parent Speech) অথবা 'ইন্দো-জার্মান আর্যভাষা'।

কালক্রমে ইন্দো-য়ুরোপীয় আর্যভাষা দুইটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত হয় —একটি প্রধানত পূর্বদেশীয় বা 'সতম্ গোষ্ঠী', অপরটি প্রধানত পশ্চিমদেশীয় বা 'কেন্তম্ গোষ্ঠী'। সতম্ গোষ্ঠী হইতে রুশীয়, ইরাণীয় ও ভারতীয় আর্য-ভাষা এবং কেন্তম্ গোষ্ঠী হইতে ইংরাজী, ফরাসী, জর্মান, গ্রীক প্রভৃতি য়ুরোপীয় ভাষার উদ্ভব হয়। খ্রীষ্টজন্মের দেড়/দুই হাজার বছর আগেই ভারতীয় আর্যভাষা ইরাণীয় আর্যভাষা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্রতা লাভ করে। ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন ঋগ্‌বেদের ভাষা।

ভারতীয় আর্যভাষা তিনটি যুগে বিভক্ত : ১. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা
২. মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা
৩. নব্য ভারতীয় আর্যভাষা

১. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার নিদর্শন বৈদিক সাহিত্যে বিধৃত। ইহার একটি রূপ বৈদিক সংস্কৃত, অপরটি লৌকিক সংস্কৃত। বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীনতর গ্রন্থগুলি বৈদিক সংস্কৃতে রচিত এবং অর্বাচীন বৈদিক সাহিত্য ও মহাকাব্য-আদি গ্রন্থ লৌকিক সংস্কৃতে রচিত। লৌকিক সংস্কৃত ভাষার ব্যবহারকে অবশ্যই কোন যুগে সীমাবদ্ধ করা সম্ভবপর নয়; কারণ সেই সুপ্রাচীন

প্রাচীন ভারতীয় আযভাষা

কাল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় অপরিবর্তিতরূপেই ইদানীন্তনকাল পর্যন্ত ইহা সমান ভাবে চলিয়া আসিতেছে। যাহা হউক, বুদ্ধদেবের পূর্ববর্তী কাল পর্যন্ত প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার যুগ প্রসারিত।

২. বুদ্ধদেব জনগণের মধ্যে প্রচলিত ভাষায় ধর্মোপদেশদানের আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। বস্তুত, বুদ্ধদেবের কাল হইতেই পালি-প্রাকৃত তথা মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার যুগারম্ভ। মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা বলিতে প্রধানত প্রাকৃত ভাষা বুঝাইলেও প্রাচীন প্রাকৃত, পালি এবং অপভ্রংশ ও অবহট্টও ইহার অন্তর্ভুক্ত। অশোকের শিলালিপিতে প্রাচীন প্রাকৃত, বৌদ্ধধর্ম-গ্রন্থসমূহে ও জাতকগ্রন্থাদিতে পালি, বিভিন্ন নাটকে, কাব্যে ও মহাকাব্যে বিভিন্ন প্রাকৃতের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। অপভ্রংশ ভাষাতেও বহু গ্রন্থাদি রচিত হইয়াছিল। অপভ্রংশ ভাষা ক্রমবিকাশের পথে নব্য ভারতীয় আর্য ভাষায় পরিণত হইবার সুদীর্ঘকাল পর পর্যন্তও অবহট্ট ভাষার ব্যবহার প্রচলিত ছিল।

মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা

৩. প্রাকৃত ভাষা সুপ্রাচীনকালেই অঞ্চলভেদে রূপভেদ লাভ করিয়াছিল। গিরিগাত্রে উৎকীর্ণ অশোকের শিলা-লিপিগুলিতেই তাহার নিদর্শন বর্তমান। আনুমানিক দশম খ্রীষ্টাব্দের দিকেই মধ্যভারতীয় আর্যভাষা সুস্পষ্ট ভাবে আঞ্চলিক ভাষার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য লাভ করে,—এই ভাষাই নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা। বাঙলা, অসমীয়া, উড়িয়া, হিন্দী, মরাঠী, পঞ্জাবী প্রভৃতি উত্তর ভারতীয় ও পাকীস্থানে প্রচলিত ভাষাগুলি এই ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। নব্য ভারতীয় আর্যভাষা এবং অবহট্ট ভাষা সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হইতেছিল বলিয়াই সম্ভবত সর্বপ্রকার আঞ্চলিক ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শনপ্রাপ্তি দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন বাঙলা ভাষায় রচিত চর্যাপদই সম্ভবত নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইয়াছিল, অনুমান করা চলে। অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায় রচিত কোন গ্রন্থই এত প্রাচীন নহে।

নব্য ভারতীয় আর্যভাষা

ক. বাঙলা এবং ইহার সহোদরাস্থানীয় উড়িয়া ও অসমীয়া ভাষা দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙলা ভাষা হইতে বিচ্ছিন্ন হয় নাই বলিয়াই অনুমিত হয়। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পর উড়িয়া এবং ষোড়শ শতাব্দীর দিকে অসমীয়া ভাষা স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছিল। ইহার পর ইহাদের গতিপথ স্ব স্ব ধারায় চিহ্নিত হইয়াছিল।

দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে ভাষা এবং সাহিত্যের রূপান্তর ঘটিলেও জীব-জগতের মতই এখানেও বংশপ্রভাবকে অস্বীকার করা চলে না। পরিবেশ অবশ্যই ভাষা ও সাহিত্যের গঠনে বিরাট প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও সুপ্রাচীন কাল হইতে ভাষা এবং সাহিত্যের যে ধারা অবস্থান্তরের মধ্য দিয়া নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা ও সাহিত্যের জন্মদান করিয়াছে, তাহার প্রভাবও সামান্য নহে। বস্তুত, প্রাচীন এবং মধ্য যুগের ভারতীয় আর্যভাষা এবং সাহিত্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বাঙলা কিংবা অপর কোন নব্য ভারতীয় আর্যভাষা ও সাহিত্যের চর্চা সম্ভবপর নহে। এই কারণেই, বিস্তৃতভাবে সম্ভব না হওয়ায় সংক্ষিপ্ততম আকারে প্রাচীন ও মধ্য যুগের ভারতীয় আর্য ভাষার কিঞ্চিৎ পরিচয় দান করা হইল।

অধ্যায় ঃ
এক

বাঙলা সাহিত্যের যুগবিভাগ

বাঙলা সাহিত্যের বয়স ন্যূনাধিক হাজার বছর। এই হাজার বছরের বাঙলা সাহিত্যে ভাষা, ভঙ্গী, ভাব ও বিষয়ের বৈচিত্র্য যথেষ্টই দেখা গিয়াছে, অতএব ইহাদিগকে সুশৃঙ্খলভাবে গুছাইয়া না লইলে ইহা পরস্পর-বিচ্ছিন্ন কতকগুলি তথ্যের সমষ্টিতে পরিণত হইতে পারে, ক্রমপরম্পরাসূত্রে বিধৃত ইতিহাস হইবে না। অতএব বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনার আরম্ভেই ইহাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা প্রয়োজন। এখন প্রশ্ন, একাধিক শৃঙ্খলাপদ্ধতির কোন্‌টি গ্রহণ-যোগ্য।

শৃঙ্খলা-পদ্ধতি

জীবজগতে কাল-ভেদে যে রূপান্তর দেখা যায়, সম্ভবত তাহাই সর্বাধিক সুপরিস্ফুট। সমগ্রভাবে না হইলেও সাহিত্য জীবজগতের মতই কালে কালে যে রূপান্তর লাভ করিয়া থাকে এবং তাহাতে সমসাময়িক যুগচেতনার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনটি আর কোথাও পাওয়া যায় না। তাই সর্বদেশেই প্রধানত কালকে ভিত্তি করিয়াই সাহিত্য-ইতিহাসের মুখ্য বিভাগ কল্পিত হইয়া থাকে। তাই, সাহিত্যের 'যুগ-বিভাগ' কথাটা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই যেন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যুগ-বিভাগের রীতি অবশ্যই দেশ-কাল-অনুযায়ী নির্ধারিত হয়।

যুগবিভাগের ভিত্তি

বিগত শতাব্দীতে রামগতি ন্যায়রত্ন 'বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে বাঙলাসাহিত্য-আলোচনার গোড়াপত্তন করিলেও অপেক্ষাকৃত বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিতে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস সর্বপ্রথমে রচনা করেন ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন। তাঁহার রচিত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'-ই প্রকৃতপক্ষে বাঙলাসাহিত্যের প্রথম ইতিহাস। দীনেশবাবু তাঁহার গ্রন্থে কালানুক্রমিক পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া বাঙলা-সাহিত্যের ইতিহাসকে নিম্নোক্ত ক্রমে বিভক্ত করিয়াছেন :

যুগবিভাগের প্রাচীন রীতি

১. হিন্দু-বৌদ্ধযুগ : (ক) শূন্যপুরাণ (খ) নাথগীতিকা : গোরক্ষবিজয় (গ) কথাসাহিত্য (ঘ) ডাক ও খনার বচন।
২. গৌড়ীয়যুগ বা শ্রীচৈতন্য-পূর্ব সাহিত্য (ক) অনুবাদ শাখা : কৃত্তিবাস, সঞ্জয়, কবীন্দ্রপরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী, পরাগল খাঁ, মালাধর বসু ;

(খ) লৌকিক সাহিত্য : কানা হরিদত্ত, বিজয়গুপ্ত, নারায়ণদেব, জনার্দন ; (গ) পদাবলীশাখা : চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ; (ঘ) কুলজীসাহিত্য।

৩. শ্রীচৈতন্যসাহিত্য বা নবদ্বীপে প্রথমযুগ : (ক) পদাবলীসাহিত্য : চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরাম দাস, মুসলমান কবিগণ ; (খ) চরিত শাখা ; (গ) অনুবাদ গ্রন্থ।

৪. সংস্কার যুগ : (ক) লৌকিক শাখা : চণ্ডী ; (খ) অনুবাদ শাখা।

৫. কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ বা নবদ্বীপে দ্বিতীয় যুগ : (ক) কাব্যশাখা : বিদ্যা-সুন্দর, আলাওল, কালীকীর্তন ; (খ) গীতিশাখা : কবিওয়ালা প্রভৃতি।

স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে, যুগের নামকরণ যাহাই করিয়া থাকুন না কেন, গ্রন্থকার কালকেই ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তৎপর বিষয়-ভিত্তিক উপবিভাগ কল্পনা করিয়াছেন।

পরবর্তী ঐতিহাসিক এবং সমালোচকগণ নানা কারণে দীনেশবাবু-কৃত এই যুগবিভাগ এবং নামকরণকে সমর্থন করেন নাই। প্রথমত, কোন আভ্যন্তরীণ লক্ষণ বা যুগচেতনার ভিত্তিতে এই বিভাগ কল্পিত না হওয়ায় ইহা বিজ্ঞানসম্মত নহে। দ্বিতীয়ত, যুগবিভাগের মানদণ্ড একান্তভাবে অস্থির, —কোথাও ধর্ম, কোথাও ব্যক্তি, কোথাও বা মনোভাবই যুগের নিরিখ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ধর্মকে ভিত্তি করিয়া বাঙলা সাহিত্যের যুগবিভাগ চলিতে পারে না এই কারণে যে, সুদীর্ঘ হাজার বছরের বাঙলা সাহিত্যে অহিন্দু মনোভাব প্রায় কিছুই নাই বলিলেই চলে। যে ছিটেফোঁটা বৌদ্ধ ও ইস্‌লামী প্রভাব বাঙলা সাহিত্যে বর্তমান, তাহা কখনও যুগ-লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইতে পারে না। শ্রীচৈতন্যদেব অবশ্যই যুগন্ধর পুরুষ,—তাঁহার আবির্ভাবে এবং প্রভাবে বাঙলা সাহিত্যে যে নূতন যুগের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু যে কারণে চৈতন্যদেবকে অবলম্বন করিয়া যুগবিভাগ কল্পিত হয়, সেই একই কারণে কখনও কৃষ্ণচন্দ্রের নামে যুগকে চিহ্নিত করা চলে না। তিনি নিঃসন্দেহে দুইজন সমকালীন শ্রেষ্ঠ কবির পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন, কিন্তু শুদ্ধ এই কারণে তিনি যুগাধিনায়ক হইতে পারেন না। ভিক্টোরিয়া এবং এলিজাবেথ ইংলণ্ডের অধীশ্বরী ছিলেন ; তাঁহাদের রাজত্বকালে ইংরেজী সাহিত্যে যে সমৃদ্ধি দেখা দিয়াছিল, সেই কারণেই ইংরেজী সাহিত্যের যুগ তত্তৎ নামে অভিহিত হইয়া

প্রাচীনরীতির ত্রুটি

থাকে। সেই দিক হইতেও কৃষ্ণচন্দ্রের নামে যুগের নামকরণ করা চলে না, কারণ তিনি কখনই সারা বাঙলার অধিপতি ছিলেন না, অথচ তখনও তাঁহার রাজত্বের বাহিরে বাঙলা সাহিত্যের চর্চা যথেষ্টই ছিল। নবদ্বীপ বা অপর কোন স্থানের নামেও বাঙলা সাহিত্যের কোন যুগের নামকরণ সঙ্গত নহে। কারণ, সমসাময়িককালে কোন কোন দিক হইতে নবদ্বীপের গুরুত্ব স্বীকৃত হইলেও তাহা কখনও সাহিত্যচর্চার কেন্দ্রভূমি হইয়া দাঁড়ায় নাই। বাঙলা সাহিত্যের আধুনিক যুগকে 'কলিকাতা যুগ' বলিয়া অভিহিত করিলে যদিও তাহা হাস্যাস্পদ বলিয়া মনে হইবে, তবু ইহার পশ্চাতে যতখানি যুক্তি আছে, বাঙলা সাহিত্যের কোন যুগকে 'নবদ্বীপ যুগ' বলিয়া অভিহিত করার পশ্চাতে ততখানি যুক্তিও নাই। অতএব, দীনেশবাবু-কৃত যুগবিভাগ অচল। তিনি প্রতিযুগে যে সকল শাখা-বিভাগ কল্পনা করিয়াছেন, তাহাও তথ্যভিত্তিক নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে যে হিন্দু-বৌদ্ধযুগে যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের কোনটিই ঐকালে রচিত হয় নাই, ইহাই সাম্প্রতিক অভিমত। তিনি যেকালে তাঁহার গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তৎকালে বহু উপাদানই দুর্লভ ছিল এবং তখনমাত্র গ্রন্থের রচনাকাল-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনার স্থত্রপাত হইয়াছে; অতএব দীনেশবাবুর রচনায় তথ্যগত প্রমাদও প্রচুর। অধুনা, যখন বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস-সম্পর্কে আলোচনা অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে, তখন দীনেশবাবুর প্রাচীন অনৈতিহাসিক অভিমত বর্জন করাই বিধেয়।

প্রাচীন রীতি অস্বীকৃত

আচার্য স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ স্থকুমার সেন প্রভৃতি মনীষীরা বিভিন্ন লক্ষণ বিচার করিয়া বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসকে তিনটি প্রধান যুগে বিভক্ত করিয়াছেন:

১. প্রাচীন যুগ: আঃ ৯৫০ খ্রীঃ হইতে ১২০০ খ্রীঃ পর্যন্ত, অর্থাৎ তুর্কী-আক্রমণ-পূর্ব যুগ।

১ক. যুগান্তর কাল: আঃ ১২০০-১৩৫০ খ্রীঃ পর্যন্ত, অর্থাৎ তুর্কী শাসনের প্রথম ভাগ।

২. মধ্যযুগ: আঃ ১৩৫০ খ্রীঃ-১৮০০ খ্রীঃ পর্যন্ত অর্থাৎ পাঠান-মুঘল শাসনকাল।

আধুনিক রীতি

(ক) আদি মধ্যযুগ বা চৈতন্য-পূর্ব যুগ:
আঃ ১৩৫০-১৫০০ খ্রীঃ

(খ) অন্ত্যমধ্যযুগ বা চৈতন্যোত্তর যুগ : আ: ১৫০০খ্রী:-১৮০০খ্রী:।

২ক. যুগান্তর কাল : মোটামুটি ১৭৬০খ্রী:-১৮৫৮খ্রী: অর্থাৎ কোম্পানীর শাসনকাল।

৩. আধুনিক যুগ : ১৮০০খ্রী:—

১. প্রাচীন যুগ ঃ প্রাচীন যুগের ব্যাপ্তি দুই শ' বছরের বেশি হইলেও এই কালে বাঙলা ভাষায় রচিত হইয়াছিল তেমন একটি মাত্র গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। গ্রন্থটির নাম 'চর্যাপদ' বা 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়'; অবশ্য গ্রন্থ একটি হইলেও ইহার অন্তর্ভুক্ত পদগুলির তেইশজন রচয়িতার নাম পাওয়া যায়। ইঁহারা একই কালে বর্তমান ছিলেন না,—কেহ বা দশম শতাব্দীর, কেহ বা দ্বাদশ শতাব্দীর। যে সকল সিদ্ধাচার্য চর্যাপদের পদগুলি রচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের জীবৎকাল-সম্বন্ধে যে সকল তথ্য পাওয়া গিয়াছে, তাহারই ভিত্তিতে প্রাচীন যুগের পরিসর নির্দেশ করা হইয়াছে।

চর্যাপদ

এই যুগে রচিত যে একটিমাত্র গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া যুগ-লক্ষণ নির্দেশ করা সহজ নহে। তৎসত্ত্বেও এই যুগের সাহিত্যের গভীরতর অধ্যয়নে যে স্বল্প লক্ষণের সন্ধান পাওয়া যায় তাহাকে নিম্নোক্তক্রমে বিবৃত করা চলে : রচনায় কবি-কল্পনা ও আবেগের স্বল্পতা হইতে মনে হয়, কবিগণ সজ্ঞানে সাহিত্য রচনা করিতে বসেন নাই। ধর্ম তথা সহজ-সাধনপদ্ধতিই ছিল তাহাদের উপপাদ্য বিষয়। রচনায় প্রবাদবাক্য এবং ধাঁধাঁজাতীয় ছড়ার সন্ধান পাওয়া যায়। তবে এই রচনাগুলিতে পরবর্তীকালে বহুল প্রচলিত পদাবলী বা খণ্ড কবিতার পূর্বাভাষ পাওয়া যায়। সংস্কৃত কবিতায় অন্ত্যানুপ্রাস বা মিল ছিল না, চর্যাপদের কবিতাগুলিতে মিল বর্তমান। লেখকের ব্যক্তিগত স্পর্শও এই যুগের রচনার বৈশিষ্ট্য।

চর্যার বৈশিষ্ট্য

১ক. যুগান্তর কাল ঃ তুর্কী আক্রমণকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত বাঙলা দেশে শাসন-সৌকর্যের অব্যবস্থা ছিল। অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, এই কালে, যখন সাধারণ মানুষের মনে শান্তি-স্বস্তির অভাব ছিল, তখন সাহিত্যরচনায় কেহ বিশেষ আগ্রহবোধ করেন নাই। ফলত, এইকালে রচিত হইয়াছে, এইরূপ কোন সাহিত্যনিদর্শন আমরা

পাই নাই। অনুমান করা চলে, পরবর্তীকালে যে মঙ্গলকাব্য-সাহিত্য বিরাট মহারুহের আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহাই হয়তো এই যুগান্তরকালে পাঁচালী-বীজরূপে বর্তমান ছিল। ১৩৪৫ খ্রীঃ শাম্‌স্‌উদ্দিন ইলিয়াস শাহ্ বাঙলা দেশের দীর্ঘ-স্থায়ী বিশৃঙ্খলাকে শৃঙ্খলিত করিয়া দেশে শান্তি স্থাপন করেন। তিনি শিল্প-সংস্কৃতি ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। মনে হয়, এই সময়ই যুগান্তর কালের অবসান ঘটে এবং নূতন যুগের সূচনা দেখা দেয়।

প্রস্তুতির কাল

২. **মধ্যযুগ ঃ** বলিতে গেলে সমগ্র মুসলমান-শাসন যুগটাকেই মধ্যযুগ নামে অভিহিত করা হয়। বহিঃশক্তির প্রচণ্ড আঘাত এবং আক্রমণের আকস্মিকতা বাঙালীকে কূর্মবৃত্তি-অবলম্বনে বাধ্য করিয়াছিল। বাঙালী তখন আশ্রয় খুঁজিয়াছিল ধর্মের নামে দেবতা তথা উপদেবতা ও অপদেবতার কাছে। বস্তুত, এই যুগের সাহিত্য প্রধানত অনার্য দেব-দেবী এবং আচার-সর্বস্ব ধর্মের গুণকীর্তনেই নিয়োজিত ছিল। সাহিত্যিকগণ ছিলেন জীবন-বিমুখ, পরপ্রত্যাশী, বস্তুনিষ্ঠ। ব্যক্তিজীবন তথা সমাজ-জীবন-সম্বন্ধেও তাঁহারা ছিলেন উদাসীন। চিরাচরিত প্রথায় তাঁহারা কাহিনীর পর কাহিনী রচনা করিয়া গিয়াছেন, আপনার অন্তরের দিকে তাকাইবার অবকাশ তাহাদের ছিল না। জীবনযাত্রায় জটিলতা কম ছিল, যুক্তি-বুদ্ধির চর্চাও সাধারণের মধ্যে প্রায় ছিল না বলিলেই হয়,—প্রধানত এই কারণেই তখনও গদ্যসাহিত্যের উদ্ভব সূচিত হয় নাই। কবিতার ছন্দও ছিল গতানুগতিক।

বৈশিষ্ট্য

(ক) আদি-মধ্য যুগ বা চৈতন্য-পূর্ব যুগ ঃ চর্যাপদের পর সুদীর্ঘ কাল বাঙলা সাহিত্যভূমি ছিল বন্ধ্যা। সম্ভবত চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিকে অথবা পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বড়ু চণ্ডীদাস রচনা করেন 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন' বা 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ'। ভাষাতাত্ত্বিক বিচারের জন্য ইহার মূল্য অপরিসীম, কিন্তু সাহিত্যকীর্তি-হিসাবে ইহা এমন কিছু মূল্যবান নয়। কৃত্তিবাস পণ্ডিত-রচিত 'রামায়ণ পাঁচালী' এবং মালাধর বসু-কৃত 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়'ও পঞ্চদশ শতকেই রচিত হইয়াছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন, মনসামঙ্গল কাব্যের কয়েকজন কবিই (বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপ্পলাই, নারায়ণদেব) এই শতকে বর্তমান ছিলেন। কিন্তু এমন কোন আভ্যন্তরীণ কিংবা বহির্লক্ষণ পাওয়া যায় না, যাহার ফলে এই বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা চলে।—আদি মধ্যযুগের ইতিহাস এইখানেই সমাপ্ত।

সৃষ্টির অপ্রাচুর্য

এইকালে রচিত সাহিত্যের মধ্যে নব সৃষ্টির উল্লাস একান্তভাবেই অনুপস্থিত। তবে প্রাচীন যুগের রচনার সঙ্গে প্রধান পার্থক্য এইখানে যে, রচনার বিষয় ধর্মীয় হইলেও কবিরা সজ্ঞানে সাহিত্য রচনা করিয়াছেন,—উৎকর্ষ অবশ্য সর্বত্র একরূপ নহে।

(খ) অন্ত্য-মধ্য যুগ বা চৈতন্যোত্তর যুগ: মহাপ্রভু চৈতন্য সাধারণত ধর্মীয়নেতা বলিয়া পরিচিত হইলেও মধ্যযুগের বাঙলাসাহিত্য ও বাঙালী-সমাজে তাঁহার প্রভাব ছিল অসাধারণ। তাঁহার আবির্ভাবের ফলে বাঙালীর চিন্তাধারায় এবং সমাজ-ব্যবস্থাতেও যথেষ্ট পরিবর্তন সূচিত হইয়াছিল। এতকাল পর্যন্ত সমাজে একটা বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত শ্রেণীই স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল। চৈতন্যদেবই প্রথম উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিলেন—'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরি-ভক্তি-পরায়ণঃ'। অন্ত্যজশ্রেণীর অধিকার স্বীকৃত হইবার পরই সমাজজীবন এবং সাধারণ মানুষের চিন্তাধারায় যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আভাষিত হইয়াছিল, তাহার প্রভাব পরবর্তী কালের সাহিত্যে সুস্পষ্ট। দেবতা এবং ধর্ম তখনও পর্যন্ত সাহিত্যভূমি অধিকার করিয়া থাকিলেও কবিদের মন যে ক্রমশ জীবন-মুখী হইয়া উঠিতেছিল, তাহার পরিচয়ও দুর্লক্ষ্য নহে। চৈতন্যোত্তর যুগে একদিকে যেমন বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছিল, তেমনি অন্যদিকে জীবনীসাহিত্য এবং পদাবলীসাহিত্যও বাঙলাসাহিত্যের একটা বিরাট অংশকে অধিকার করিয়াছিল। বস্তুত বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে স্থান পাইতে পারে—সমগ্র প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলাসাহিত্যের তেমন যে একটি মাত্র শাখাই বর্তমান, সেই পদাবলী-কাব্যসাহিত্য এই যুগেই রচিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন অনুবাদ-সাহিত্যও এই যুগের সাহিত্যসাধনাকে পরিপুষ্ট করিয়াছে। চৈতন্যোত্তর যুগের শেষভাগে যে কাব্যধারা পরিপূর্ণভাবে জীবন-মুখী হইয়া উঠিয়াছিল সেই লৌকিক কাব্যশাখার একদিকে গীতিকা-সাহিত্য, অপরদিকে শাক্তপদাবলী। অশিক্ষিত অথবা অর্ধশিক্ষিত পল্লীকবিদের হাতে রচিত গীতিকাগুলি পরিমার্জিত কিংবা সুসংস্কৃত নহে, কিন্তু বাস্তব-অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ এবং জীবনরসে পুষ্ট। শাক্ত-পদাবলী বৈষ্ণবপদাবলীর অনুকরণে রচিত হইলেও ইহাতে বাস্তবজীবনের সঙ্গে যোগ ঘনিষ্ঠতর। এই লৌকিক সাহিত্যেরই আর একটি ধারা মুসলমানী সাহিত্য বা কিস্‌সা সাহিত্য। এই ধারায় উপকথা-রূপকথা-জাতীয় কাহিনী প্রাধান্য লাভ করিলেও যে এইগুলি জীবনরসে সমৃদ্ধ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

রচনা-প্রাচুর্য

১৭৬০ খ্রীঃ রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের মৃত্যু এবং পলাশীর যুদ্ধ সম-সাময়িক ঘটনা। উক্তযুগের শেষতম প্রতিনিধিস্থানীয় কবি ভারতচন্দ্র। তাঁহার রচনায় যে আধুনিকতার আভাস লক্ষ্য করা যায়, তাহা যুগচেতনার প্রভাববশত। তাঁহার রচনাও পুরাণ-ধর্ম্মী মঙ্গলকাব্য, কিন্তু সুস্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে দেবতা ও ধর্ম এখানে একেবারেই উপলক্ষ্য, কবির দৃষ্টির অন্যত্র নিবদ্ধ।

সমাপ্তি

২. (ক) **যুগান্তর কাল:** পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে সিপাহী-বিদ্রোহ পর্যন্ত শতাব্দীকালকে বাঙলাসাহিত্যের ইতিহাসে আর এক বন্ধ্যাকাল বলিয়া উল্লেখ করা হয়। এই শতবর্ষকাল বাঙলার সমাজ-জীবন এবং জন-জীবন একদিকে যেমন দুঃশাসন ও নৈরাশ্যের ভারে পীড়িত, অন্যদিকে তেমনি উষালগ্নের আবির্ভাব-সম্ভাবনায় ইঙ্গিতময়। ইংরেজ বণিক-কোম্পানীর স্বেচ্ছাচারিতা ও শোষণস্পৃহা একদিকে যেমন বাঙালীর শান্তি-সমৃদ্ধিকে বিনষ্ট করিয়া বাঙ্গালী-মানসকে সাহিত্য-সৃষ্টির প্রতিকূল করিয়া তুলিয়াছিল, তেমনি অপর দিকে ইংরেজী সাহিত্য ও সমাজের সংস্পর্শে আসিবার ফলে বাঙালীর জীবনে নূতন আশার আলোকরেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এই কালেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ এবং হিন্দুকলেজ স্থাপিত হয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হইবার পরই বাঙলায় সর্বপ্রথম গদ্যসাহিত্যের সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছিল আর হিন্দু-কলেজের রিচার্ডসন-ডিরোজিয়োর ছাত্রবৃন্দ পাশ্চাত্যের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হইয়া সর্বপ্রথম আধুনিক সাহিত্য-সৃষ্টিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। বস্তুত, এই যুগেই বাঙলা গদ্যসাহিত্য একেবারে সূতিকাগৃহ হইতে বাল্যাবস্থা পার হইয়াছিল। কাব্যের দিক দিয়া এই যুগ অবশ্যই পূর্ববর্তী কিংবা পরবর্তী কোন যুগেরই তুল্য নহে। কবিগান, তর্জা, টপ্পা, খেউড, আখড়াই, হাফ আখড়াই, যাত্রা প্রভৃতি নিম্নতর রুচির পরিচায়ক কাব্যধারাই সাধারণ মানুষের রসপিপাসাকে নিবৃত্ত করিয়াছিল। অপরেরা সংস্কৃত, ফারসী এবং সদ্য-আগত ইংরেজী সাহিত্য-চর্চাতেই নিযুক্ত ছিলেন।

নব্যযুগের প্রস্তুতি

৩. **আধুনিক যুগ:** ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের স্থাপনা এবং মুদ্রণ-যন্ত্রের প্রতিষ্ঠাকালকেই বাঙলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের আরম্ভ বলিয়া অভিহিত করা হইলেও কাব্যসাহিত্যের সৃষ্টি আরও কিছুটা বিলম্বিত হইয়াছিল। এই যুগের লক্ষণ—বহিরঙ্গ এবং অন্তরঙ্গ—উভয় দিকেই প্রকট। বহিরঙ্গের দিক হইতে সমগ্র গদ্যসাহিত্য ও নাট্যসাহিত্য এবং কাব্যসাহিত্যে গীতিকবিতা,

মহাকাব্য, সনেট ইত্যাদি বহুবিধ রূপের সাক্ষাৎ লাভ করা যায়। আবার গদ্যেও গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ-আদি কত রূপের প্রকাশ। অন্তরঙ্গ বিচারে দেখা যাইবে, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণভাবেই পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। দেবতা ও ধর্ম বিদায় লইয়াছে, মানুষ তৎস্থলে আপনাকেই প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। মানুষ শুধুই জীবনমুখী নহে, অন্তরমুখী হইয়া উঠিয়াছে। বাঙলাসাহিত্যে জীবনচেতনা, সমাজচেতনা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, মন্ময়তা-আদিলক্ষণ সুপ্রকট হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুত, বাঙলাসাহিত্য পাশ্চাত্ত্য ভাবধারায় পুষ্টি লাভ করিয়া যেন নোতুন ভাবেই আত্মপ্রকাশ লাভ করিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সঙ্গে সংযোগসূত্র অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। এই যুগের শ্রেষ্ঠ লেখকদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, মধুসূদন, বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র আদি প্রধান।

বৈশিষ্ট্য

কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে, বাঙলাসাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগের মধ্যে কোন দিক দিয়াই সীমারেখা টানা সম্ভব নয় এবং এতদুভয়ের মধ্যে কোন লক্ষণীয় পার্থক্যও নাই। তাঁহাদের মতে, উভয়যুগকে সম্মিলিত ভাবে 'প্রাচীন যুগ' বলিয়া অভিহিত করাই সঙ্গত। সাধারণ ভাবে আলোচনায় অবশ্য অনেকেই প্রাচীন সাহিত্য বলিতে উভয়যুগের সাহিত্যকেই বুঝাইয়া থাকেন।

ভিন্নমত

অধ্যায় ঃ
দুই

প্রাচীন যুগ

প্রাচীন যুগের বাঙলা সাহিত্যে প্রাচীনতম বাঙলাভাষা ব্যবহৃত হইত। বাঙলাভাষার এই প্রাচীনতম রূপটি লক্ষ্য করা যায় চর্যাপদে। আবার সমসময়েই ভিন্নতর 'অবহট্ট' বা অপভ্রংশ ভাষায়ও যে বাঙলাদেশে সাহিত্য-চর্চা চলিয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় দোহাগুলিতে। প্রাচীনতম বাঙলা এবং অবহট্ট ভাষার সম্পর্কটি বিচার করা প্রয়োজন।

অবহট্ট

সংস্কৃত নাটকগুলিতে বিভিন্ন প্রাকৃতের ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া অনুমান করা চলে যে এক সময়ে শৌরসেনী প্রাকৃতই ছিল সমগ্র উত্তর ভারতের অভিজাত সম্প্রদায়ের ভাষা। পরবর্তীকালে শৌরসেনী প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত শৌরসেনী অপভ্রংশ তথা অবহট্টভাষা উক্ত প্রাকৃতের স্থান অধিকার করে। উত্তর ভারতের (মনে হয়, সমকালীন বাঙলাদেশ সহ) শিষ্টসমাজ অবহট্ট ভাষাকেই সাহিত্যচর্চার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করিলেন,—অবশ্য তখনও পর্যন্ত প্রবল প্রতাপ ছিল সংস্কৃতের। মনে রাখিতে হইবে, উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কথ্যভাষারূপে তখন বিভিন্ন অপভ্রংশ এবং পরবর্তীকালে ভিন্নতর নব্য ভারতীয় আর্যভাষার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। অর্থাৎ যে কালে বাঙলাদেশে শিষ্টসমাজের ভাষা তথা সাধু ভাষা 'অবহট্ট' সাহিত্য-রচনায় ব্যবহৃত হইতেছিল, সেইকালেই গোটা বাঙলাদেশ জুড়িয়া জনসাধারণের কথোপকথন চলিতেছিল প্রাচীন বাঙলার মাধ্যমে।

শিষ্ট সমাজের ভাষা

দীর্ঘকাল পূর্বে, বুদ্ধদেবের কালে, যখন সমগ্র ভারতেই সাহিত্য সৃষ্টি হইত সংস্কৃতভাষা তথা সাধুভাষায়, তখনই বৌদ্ধসমাজ জনগণের কথ্যভাষা পালিকেই গ্রহণ করিয়াছিল সাহিত্য-সাধনার মাধ্যমরূপে। ব্রাহ্মণ্যপ্রথা-শাসিত সমাজ-ব্যবস্থায় বৌদ্ধগণ বরাবরই একটা স্বাতন্ত্র্য এবং সার্বজনীন মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন। অতএব, এই সূত্র ধরিয়া অগ্রসর হইলে আমরা স্বভাবতই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, প্রাচীনযুগে বাঙলাদেশে যখন ব্রাহ্মণ্যপ্রথা-শাসিত সমাজ-ব্যবস্থায়, তথা হিন্দুসমাজে সাধুভাষা অবহট্টই সাহিত্যিক ভাষার মর্যাদা লাভ করিয়াছিল, তৎকালে বৌদ্ধসমাজ জনসাধারণের কথ্য ভাষা প্রাচীন

অবহট্ট বনাম বাঙলা

বাঙলাকেই সাহিত্য-রচনার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করিল। অতএব, একই কালে বাঙলাদেশে পাশাপাশি চলিয়াছিল দুইটি সাহিত্যের ভাষা,—একটি সাধুভাষা অবহট্ট, অপরটি কথ্যভাষা বাঙলা। কথ্যভাষা বাঙলার উপর শৌরসেনী অপভ্রংশের কিছু প্রভাব পড়িয়া থাকিতে পারে, কিন্তু বাঙলা শৌরসেনী অপভ্রংশজাত নহে।

প্রাচীন বাঙলাসাহিত্য ও অন্যান্য উপাদান : পূর্বেই বলা হইয়াছে যে প্রাচীনযুগের বাঙলাসাহিত্যের ইতিহাসে চর্যাপদই একমাত্র গ্রন্থ, যদিও ইহাকে সার্থক সাহিত্য কিংবা সজ্ঞান সাহিত্যসৃষ্টি বলিয়া অভিহিত করা যায় না। এতদ্ব্যতীত, ঐকালে রচিত হইয়াছে তেমন কোন বাঙলাগ্রন্থের সন্ধানও পাওয়া যায় না। চর্যাপদের সঙ্গে যে দোহাগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা সমসাময়িক কালে রচিত হইলেও ইহাদের ভাষা বাঙলা নহে, অপভ্রংশ—এই কারণেই বাঙলা-সাহিত্যের ইতিহাসে ইহাদের কোন স্থান নাই। তবে, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এইরূপ কতকগুলি দোহা বা রচনার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, যাহাদের ভাষা হয় প্রাচীন বাঙলা অথবা ইহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী প্রাক্-বাঙলা (Proto-Bengali)। প্রাচীনযুগের বাঙলাভাষা ও সাহিত্যের উপাদান-বিচারে ইহাদের মূল্য একেবারে অস্বীকার করা চলে না।

চর্যাপদ

মহারাষ্ট্রের চালুক্যবংশীয় কোন এক রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদেই 'মানসোল্লাস' বা 'অভিলাষার্থ চিন্তামণি' নামক একখানি সঙ্কলন-গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ইহাতে বিভিন্ন-ভাষায় রচিত অনেকগুলি লোকসঙ্গীতের নিদর্শন উদ্ধৃত হইয়াছে। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ইহাদের কোন কোনটিকে বাঙলাভাষায় রচিত বলিয়া মনে করেন।—

মানসোল্লাস

'...ছাড়ু ছাড়ু মঁই জাইবো গোবিন্দসহ খেলন' অথবা 'জে ব্রাহ্মণের কুলে উপজিয়া কাতবীর্যা জিনে বাহু ফরসে খণ্ডিআ পরশুরামু দেবু সে মোহার মঙ্গল করউ।'

চতুর্দশ শতাব্দীতে প্রাকৃত ছন্দের লক্ষণ-বিচার-বিষয়ক একটি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল,—ইহার নাম 'প্রাকৃত পৈঙ্গল'। অর্বাচীন অপভ্রংশ ভাষায় গ্রন্থটি রচিত হইলেও ইহার কোন কোন শ্লোক প্রাচীন হিন্দী ও প্রাচীন বাঙলায় কিংবা প্রাক্ বাঙলায় রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়।—

প্রাকৃত-পৈঙ্গল

ওগ্‌গর ভত্তা রম্ভঅ পত্তা গাইক ঘিত্তা দুদ্ধ সজুত্তা।
মোইলি মচ্ছা নালিচগচ্ছা দিজ্জই কন্তা খা পুনবন্তা॥

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই বাঙলাদেশে শ্রীধর দাস 'সদুক্তি-কর্ণামৃত' নামক এক কাব্য-সঙ্কলন রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে জ্ঞাত-অজ্ঞাত প্রায় পাঁচশত জন কবির প্রায় আড়াই হাজার শ্লোক সঙ্কলিত হইয়াছে। এই কবিদের অনেকেই যে বাঙালী ছিলেন এবং শ্লোকগুলির কোন কোনটি যে বাঙলাভাষার লক্ষণাক্রান্ত, তাহাতে বিশেষ সন্দেহ নাই।—

সদুক্তি কর্ণামৃত

পুত্ত পবিত্ত বহুত্ত ধণা ভত্তি কুটুম্বিণি সুদ্ধমনা।
হাক্ক তরাসই ভিচ্চগণা কোকর বব্বর সগ্‌গমণা॥

পদ্মাবতী-চরণ-চারণ-চক্রবর্তী জয়দেব গোস্বামী-রচিত 'গীতগোবিন্দ' অবশ্যই সংস্কৃতভাষায় রচিত বাঙালীর গর্ব করিবার উপযুক্ত একখানি কাব্য। কিন্তু কেহ কেহ সন্দেহ করেন যে গ্রন্থটি আদৌ বাঙলা অথবা অপভ্রংশ ভাষায় রচিত হইয়াছিল, পরে সংস্কৃতভাষায় রূপান্তরিত হয়। এইরূপ সন্দেহের একটি অন্যতম কারণ এই যে, গ্রন্থের কোন কোন স্থলে এরূপ ছন্দ ব্যবহার করা হইয়াছে যাহা সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্র-অনুযায়ী অশুদ্ধ ; প্রাকৃত ছন্দে পঠিত হইলে ছন্দে কোন গোলযোগ থাকে না। গ্রন্থটির ভাষাও স্থানে স্থানে এত সহজ যে সংস্কৃতভাষায় এইরূপ রচনা অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। ইহা ছাড়া পরবর্তী বাঙলাসাহিত্যের উপর, বিশেষভাবে পদাবলী-সাহিত্যের উপর ইহার প্রভাবের কথা মনে করিলে প্রাচীন যুগের বাঙলাসাহিত্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে ইহার কথা উল্লেখ না করিয়া উপায় নাই।

জয়দেব : গীতগোবিন্দ

বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দ অমরকোষের 'টীকাসর্বস্ব' নামে যে টীকা রচনা করেন, তাহাতে তিন শতের অধিক বাঙলাশব্দের সন্ধান পাওয়া যায়। বাঙলা-সাহিত্যের ইতিহাসে অবশ্যই ইহাদের কোন স্থান নাই, কিন্তু প্রাচীনযুগের বাঙলাভাষা ও সাহিত্য এমন অভিন্ন-ভাবে জড়িত যে, একটিকে বাদ দিয়া অপরটি-সম্বন্ধে আলোচনা করা সম্ভব নহে। এইরূপ আর একটি গ্রন্থ হেমচন্দ্র-রচিত 'দেশীনামমালা'। ইহাতেও কতকগুলি বাঙলাশব্দের সন্ধান পাওয়া যায়।

সর্বানন্দ : টীকা-সর্বস্ব

পূর্বে যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, ইহাদের বাইরে আর উল্লেখ করিবার মতো কোন নিদর্শন নাই। সাহিত্যকীর্তি-হিসাবে অবশ্য এইগুলি

উল্লেখযোগ্য কিছু নয়,—কিন্তু যেকালে সাহিত্যের উপাদান একেবারেই দুর্লভ, সেইকালে যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহাই মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। প্রাচীন বাঙলার কতকগুলি তাম্রশাসনে কিছু কিছু স্থান-নাম পাওয়া যায়,—এইগুলিকেও প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের সম্পদ বলিয়া গ্রহণ করা হয়।

তাম্র-শাসন

ড০ দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে প্রাচীন বাঙলায় রচিত বলিয়া নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলির কথা উল্লেখ করিয়াছেন :—

অ. রামাই পণ্ডিত-রচিত 'শূন্যপুরাণ' : দীনেশবাবু মনে করেন খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে আদি ধর্মপূজক রামাই পণ্ডিত গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থের 'শূন্যপুরাণ' নাম সম্পাদক-প্রদত্ত। দীনেশবাবু-ব্যতীত অপর কোন ঐতিহাসিকই গ্রন্থের এই প্রাচীনত্ব স্বীকার করেন না। রামাই পণ্ডিতকে দ্বাদশ শতাব্দীর লোক বলিয়ামানিয়া লইলেও তাহার গ্রন্থকর্তৃত্ব নিঃসংশয়িত নয়। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় মনে করেন যে ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তত পাঁচজন কবির হস্তাবলেপ ইহাতে বর্তমান। ইহার অন্তর্গত 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' অংশটি নিঃসন্দেহে অনেক অর্বাচীনকালের রচনা। রচনার কোন কোন অংশ দুর্বোধ্য। ইহার কোন অংশকে বাঙলাভাষার আদি গদ্য-রচনার নিদর্শনরূপে উল্লেখও করা হইয়া থাকে।—'হথ পাতিয়া লহহ সেবকর অগ্‌ঘ পুপ্‌ফ পাণি।'

শূন্যপুরাণ

আ. মাণিকচন্দ্রের গান ও গোরক্ষবিজয় : স্যার জর্জ গ্রীয়ার্সন রংপুর হইতে নাথ-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত একটি গ্রন্থ আবিষ্কার করিয়া ইহার নাম দেন 'মাণিকচন্দ্রের গান'(The song of Manik Chandra)। মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদও এই জাতীয় একটি কাব্যকাহিনী আবিষ্কার করিয়া 'গোরক্ষ-বিজয়' বা 'মীনচেতন' নামে প্রকাশ করেন। উভয় গ্রন্থেই গোরক্ষনাথ মীননাথ কাহ্নপা হাড়িপা প্রভৃতি নাথপন্থী সাধকদের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহারা সকলেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং খ্রীঃ দশম-একাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। এই কারণেই পূর্বোক্ত গ্রন্থ দুইটিকে প্রাচীনযুগের রচনা বলিয়া পরিচায়িত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই ধরণের আরও অনেক গ্রন্থই আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কোনটিরই কোন প্রাচীন পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয় নাই। গ্রন্থ দুইটির মূল কাঠামো যদিও প্রাচীনকালে রচিত হইয়া থাকে তবু যে আকারে পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে

মাণিকচন্দ্রের গান ও গোরক্ষ বিজয়

ডঃ সুকুমার সেন এইগুলিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী রচনা বলিয়া স্বীকার করেন না।

ই. ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মনে করেন যে 'রূপকথা' এবং 'ডাক ও খনার বচন' গুলিও প্রাচীনযুগের অন্তর্ভুক্ত। অপভ্রংশ ভাষায় লেখা ডাকার্ণব নামক একখানি গ্রন্থ ঐযুগে রচিত হইলেও ডাক ও খনার বচন যে-রূপে প্রচলিত আছে তাহাতে কিছুতেই ঐগুলিকে প্রাচীনযুগের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করা চলে না। সত্য বটে, ডাক ও খনার বচনের বাক্যাংশে কখনও কখনও প্রাচীন রীতির আমেজ পাওয়া যায় এবং কোন কোন শব্দও ইহার প্রাচীনত্বের সাক্ষ্যই দান করে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহাদের প্রাচীনত্ব সমর্থনযোগ্য নয়। আর যদি বাঙলাসাহিত্যের প্রাচীনযুগেই ইহাদের সৃষ্টি হইয়া থাকে, তবু ইহাদের আকারে প্রকারে এত পরিবর্তন ঘটিয়াছে যে ইহাদের প্রাচীন বলিবার কোন সার্থকতা থাকিতে পারে না। রূপকথাগুলি কোন্‌যুগে প্রথম জন্মলাভ করিয়াছিল তাহা অনুমান করাও দুঃসাধ্য। ইহাদের সম্বন্ধে কোন কিছু নিশ্চিতভাবে বলিবার পক্ষে প্রধান বাধা এই যে ইহাদের কোন লিখিত রূপ পাওয়া যায় না। কোন কোন গল্পের ভিতর সমাজ-ব্যবস্থার কাঠামো পর্যালোচনা করিলে মনে হইতে পারে যে এইগুলি প্রাক্-ইসলাম যুগেই রচিত হইয়াছিল। কিন্তু সুদীর্ঘকাল মুখে মুখে প্রচার লাভ করিয়াছে বলিয়া ইহার প্রাচীনত্ব আর কিছুই নাই। বিশেষত ইহাদের কোন লিখিত রূপ পাওয়া না যাওয়ায় ইহাদিগকে সাহিত্যের ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত করাও কঠিন।

রূপকথা
ডাক ও খনার বচন

১. ঃ চর্যাপদ

বাঙলাসাহিত্যের প্রাচীনযুগের ইতিহাসে যে একটি মাত্র গ্রন্থকে নিঃসন্দেহে স্থানদান করা যাইতে পারে, তাহা চর্যাপদ। চর্যাপদের আবিষ্কার-কাহিনী কৌতূহলোদ্দীপক। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল রাজদরবার হইতে কয়েকখানি পুরানো পুঁথি আবিষ্কার করিয়া 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙালাভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' নামে ইহাদের একসঙ্গে প্রকাশ করেন। শাস্ত্রী মহাশয় ধারণা করিয়াছিলেন, ইহাদের সব কয়টিই প্রাচীন বাঙলায় লিখিত। কিন্তু ডঃ সুনীতিকুমার এবং অন্যান্য মনীষীরা স্থির সিদ্ধান্ত

প্রাচীনতম বাঙলা গ্রন্থ

করিয়াছেন যে ইহাদের মধ্যে একমাত্র চর্যাপদের পুঁথিটিই বাঙলাভাষায় রচিত। ইহা ছাড়া ছিল সরহ ও কাহ্নপাদের রচিত দুইটি দোহাকোষ এবং 'ডাকার্ণব' নামে দোহাবলী। দোহাগুলি পশ্চিমা অপভ্রংশে রচিত বলিয়া ইহাদিগকে আলোচনার বাহিরে রাখা হইল।

বৌদ্ধ গানগুলিকে সাধারণ ভাবে চর্যাপদ নামে অভিহিত করা হইলেও শাস্ত্রী মহাশয় ইহার নাম দিয়াছিলেন 'চর্যাচর্য-বিনিশ্চয়'। মুনিদত্তের টীকায় পাওয়া যায় 'আশ্চর্য চর্যাচয়'। ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন যে ইহার নাম হওয়া উচিত 'চর্যাশ্চর্য বিনিশ্চয়'। গ্রন্থের নাম যাহাই হউক, ইহা যখন বাঙলাভাষায় রচিত, তখন নেপাল হইতে ইহার আবিষ্কার বিস্ময়কর। মনে হয়, বাঙলাদেশে তুর্কী-আক্রমণের ফলে একদল উদ্বাস্তু আপনাদের ধর্ম-সংস্কৃতি রক্ষা-মানসে শরণার্থীরূপে হিন্দুরাজ্য নেপালে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। বাঙলাদেশের জলো আবহাওয়া এবং উইপোকার অত্যাচারে গ্রন্থের কোন প্রতিলিপি বাঙলাদেশে পাওয়া যায় নাই,—উদ্বাস্তুদের দ্বারা নীত বইটি কোনক্রমে কালসাগর অতিক্রম করিবার সুযোগ পাইয়াছিল।

নেপালে বাঙলা গ্রন্থ

গ্রন্থটি খণ্ডিত আকারে পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ এবং তেইশজন কবির ভণিতা পাওয়া যায়। একটি তিব্বতী অনুবাদে আরও সাড়ে তিনটি পদ আবিষ্কৃত হয়। অন্য সূত্র হইতে জানা যায় যে ইহাতে অপর একজন কবিরও একটি পদ ছিল। অতএব চর্যাপদ গ্রন্থে সাকুল্যে ৫১টি পদ এবং ২৪ জন কবির ভণিতা ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়।

গ্রন্থের পদ ও কবির সংখ্যা

চর্যাপদের রচয়িতাদের সাধারণত 'সিদ্ধাচার্য' নামে অভিহিত করা হয়। ইহাদের প্রত্যেকেরই নামের পর 'পা < পাদাচার্য' উপাধিটি ব্যবহার করা হয়। যে ২৪ জন সিদ্ধাচার্যের নাম পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে কৃষ্ণ-পাদাচার্য বা কাহ্নুপা-ই প্রধান। ইঁহার রচিত পদের সংখ্যা বারোটি। চিত্রধর্মী কবি ভুসুকুপার রচিত পদের সংখ্যা আট। সরহপার রচিত পদের সংখ্যা চারিটি। ইনি অপভ্রংশ ভাষায় দোহাও রচনা করিয়াছিলেন। কুক্কুরীপাদের ভণিতায় পাওয়া যায় চারিটি পদ। লুইপা-রচিত পদের সংখ্যা মাত্র দুইটি হইলেও প্রাচীনত্বে ইনি প্রথম। কেহ কেহ মনে করেন যে নাথ-গুরু মীননাথ এবং লুইপা (< রোহিত-পাদ) অভিন্ন ব্যক্তি। শান্তিপাদ এবং শবরীপাদ প্রত্যেকেই দুইটি করিয়া

সিদ্ধাচার্য-পরিচয়

২

পদ রচনা করিয়াছেন। অপর সকল সিদ্ধাচার্যই একটি করিয়া পদ রচনা করিয়াছেন। কুকুরীপা, বীণাপা, তন্ত্রীপা, কঙ্কণপা প্রভৃতি ছদ্মনাম ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

ডঃ শহীদুল্লাহ মনে করেন যে আদি সিদ্ধাচার্য লুইপা খ্রীষ্টীয় ৭ম-৮ম শতাব্দীর দিকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহা সত্য হইলে বাঙলাসাহিত্যের ইতিহাস আরও প্রাচীনতর বলিয়া প্রমাণিত হইত। কিন্তু ডঃ সুনীতিকুমার এবং অন্যান্য ভাষাবিজ্ঞানীগণ সিদ্ধাচার্যদের দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর অন্তর্বর্তীকালের বলিয়া মনে করেন। চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত জ্যোতিরীশ্বরের 'বর্ণরত্নাকর' গ্রন্থে যে চৌরাশী সিদ্ধার নাম প্রদত্ত হইয়াছে তাহাদের অনেকেই চর্যাপদের রচয়িতা। ইহা হইতে একটি বিষয় অন্তত নিশ্চিতভাবে বলা চলে যে চর্যাপদের রচনাকাল নিশ্চিত-ভাবে চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী।

চর্যাপদেব রচনাকাল

চর্যাপদের ভাষা প্রাচীনযুগের বাঙলা। এই ভাষার সঙ্গে অবহট্টের সাদৃশ্য অনেকটা প্রকট। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে চর্যাপদের ভাষা প্রায় অবিকৃতরূপেই পাওয়া যাইতেছে বলিয়া আমরা প্রাচীন বাঙলার রূপটি-সম্বন্ধে অবহিত হইবার সুযোগ পাইয়াছি। চর্যার শব্দরূপ, ধাতুরূপ এবং বাগ্‌ধারায় বাঙলাভাষার বিশিষ্ট রূপটিরই সন্ধান পাওয়া যায়। ইহাতে এমন কতকগুলি লক্ষণ প্রকট, যাহার ফলে ইহাকে নিশ্চিতভাবেই বাঙলা বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। গ্রন্থটি আবিষ্কৃত হইবার পরই আমাদের প্রতিবেশীরা ইহাকে আপনাদের ভাষায় রচিত বলিয়া যে দাবি জানাইয়াছিলেন, ভাষাতাত্ত্বিক কারণে তাহাদের সেই দাবি অগ্রাহ্য হইয়াছে।

চর্যাপদের ভাষা

চর্যাপদের ভাষাকে কেহ কেহ 'সন্ধ্যা' ভাষা বা আলো-আঁধারি ভাষা বলিয়া অভিহিত করেন। ইহার কিছুটা বোঝা যায়, কিছুটা বোঝা যায় না,—এই কারণেই ইহাকে সন্ধ্যা ভাষা বলা হয়। অপর কেহ অনুমান করেন যে কথাটি 'সন্ধাভাষা' অর্থাৎ বিশেষরূপে অনুধাবন করিয়াই ইহার অর্থ বাহির করিতে হয়। ভাষার নাম যাহাই হউক, চর্যাপদের অর্থ যে সহজ নহে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। চর্যাপদের একটি পদ ধরা যাউক—

সন্ধ্যাভাষা

আলিএঁ কালিএঁ বাট রুন্ধেলা।
তা দেখি কাহ্ন বিমন ভইলা॥

—আলিতে ও কালিতে পথ রুদ্ধ করিয়াছে দেখিয়া কাহ্নপা বিমনা হইলেন। আলি-কালি বলিতে 'অ'কারাদি স্বরবর্ণ এবং 'ক'কারাদি ব্যঞ্জনবর্ণ বুঝাইতেছে। আর একটু অগ্রসর হইয়া অনুমান করা যায়,—বিভিন্ন বর্ণের সাহায্যে গঠিত বিদ্যায় ভক্তির পথ রোধ করিয়াছে।—কিন্তু অর্থ ইহাতেও সুস্পষ্ট হইল বলিয়া মনে হয় না।

সিদ্ধাচার্যগণ যে সাহিত্যসাধনার উদ্দেশ্য লইয়া চর্যাপদগুলি রচনা করেন নাই, তাহা সহজেই অনুমান করা চলে। সিদ্ধাচার্য বা বৌদ্ধ সহজিয়াপন্থী সাধকগণ আপনাদের সাধন-ভজন পদ্ধতি নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিবার উদ্দেশ্যেই সঙ্কেতবাক্যে ইহাদের প্রচার করিয়াছিলেন। এই কারণেই চর্যার পদগুলির একটা সাধারণ অর্থ সহজেই বাহির করা সম্ভবপর হইলেও ইহার গূঢ় অর্থ হয়তো এখনও পর্যন্ত আমাদের অজ্ঞাত। তাহাদের সাধনতত্ত্বগুলিকে বিভিন্ন রূপকের সাহায্যে প্রকাশ করা হইয়াছে। হইতে পারে, হিন্দুসমাজ-সম্বন্ধে বৌদ্ধ সহজিয়াদের মনোভাব প্রতিকূল থাকায় তাহারা আপনাদের স্বাতন্ত্র্য লইয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে চাহিয়াছিল,—এই কারণেই তাহাদের এই সতর্ক গোপনীয়তা। চর্যার টীকাকার মুনিদত্ত ইহার দার্শনিক তত্ত্ব উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার দর্শনকে 'শূন্যবাদ' বলিয়া অভিহিত করা চলে। শূন্যতাই একমাত্র সত্য—শূন্যতার মধ্যেই সুখদুঃখাদির লোপ ঘটে এবং ইহাতেই মহাসুখের অস্তিত্ব নিহিত। ইহাই অদ্বয় ও সহজ অবস্থা। একমাত্র গুরুর উপদেশেই মহাসুখময় নির্বাণ লাভ করা যাইতে পারে,—ইহার জন্য যোগসাধনাদির প্রয়োজন নাই। —মোটামুটি ইহাই চর্যাপদের দার্শনিক তত্ত্ব।

চর্যার অর্থ ও দার্শনিকতা

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সাধনতত্ত্ব প্রকাশ করিবার জন্যই চর্যাপদ-গুলি রচিত হইয়াছে, সিদ্ধাচার্যগণ সজ্ঞানে সাহিত্য সাধনা করিতে বসেন নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও চর্যাপদ যে নিছক ধর্মগ্রন্থ হইয়া উঠে নাই, তাহাই আমাদের সৌভাগ্য। সহজিয়াপন্থী সাধকদের যে স্বাভাবিক কবিদৃষ্টি ছিল, তাহার ফলেই চর্যাপদে উৎকৃষ্ট শিল্পকৃতিরও পরিচয় পাওয়া যায়। লক্ষ্য করিবার বিষয়, —চর্যার পরবর্তী কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত সাহিত্যে কবিদের যে নিরাসক্ত দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়, চর্যাপদগুলি তাহা হইতে মুক্ত। চর্যাপদে কবিদের ব্যক্তিসম্পর্ক সুনিবিড় এবং এই কারণেই, ইহার পদগুলি শুধু মাত্র কবিতা

বৈশিষ্ট্য ১

নহে, একেবারে গীতিকবিতার পর্যায়ে স্থান লাভ করিয়াছে। বস্তুত ইহাতে বাঙালীর স্বভাবধর্মেরই পরিচয় পাওয়া যায়। চর্যাপদের mystic বা রহস্যময় রূপটির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া সমালোচক বলেন, 'অনুভূতির অনির্বাচ্যতা ব্যঞ্জনাময় প্রকাশরীতিকে আশ্রয় করে অপূর্ব রহস্যমণ্ডিত হ'য়ে উঠেছে।'—'উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী'—কবিতাটি কবিকৃতির একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

বৈশিষ্ট্য ২

চর্যাপদে একটি বিশিষ্ট ধর্মচেতনার প্রকাশ যেমন লক্ষ্য করা যায়, তেমনি ইহা হইতে সমসাময়িক জীবনযাত্রার কিছু কিছু পরিচয়ও আহরণ করা যায়। ডোম্-ডোম্নির স্বাভাবিক প্রেমচর্যা, নৌকা বাওয়া বা সাঁকো তৈরীকরা-আদি রূপকের অভ্যন্তরে যে তত্ত্বই নিহিত থাকুক না কেন, ইহাদের চিত্রধর্মিতাকে যেমন অস্বীকার করা যায় না, তেমনি উপেক্ষা করা যায় না ইহাদের সামাজিক মূল্য। এই প্রসঙ্গে চর্যার কবিদের অলঙ্কার-প্রীতির কথাও বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিতে হয়। রূপক ছাড়াও অন্যান্য অলঙ্কারের সাহায্যে সিদ্ধাচার্যগণ আপনাদের কবিকৃতিকে মণ্ডিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন।

ছন্দ

চর্যাপদাবলী প্রাকৃত-প্রভাবিত ষোড়শমাত্রিক পাদাকুলক ছন্দে রচিত। মাত্রাপ্রধান অক্ষরাভিমুখী এই পাদা কুলক ছন্দই পরবর্তীকালে বাঙলাকাব্যের পয়ার ছন্দে রূপায়িত হইয়াছিল। চর্যাপদেই অবশ্য মাত্রাগত কঠোরতা ক্রমশ শিথিল হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইহার স্বাভাবিক পরিণতিই পয়ার ছন্দ। চর্যাপদে যে অন্ত্যানুপ্রাস ব্যবহৃত হইয়াছিল পরবর্তী বাঙলাসাহিত্যে এই রীতিটিই অনুসৃত হইয়াছিল।

কবিত্ব

চর্যাপদের কবিত্ব ও গীতিময়তা অপেক্ষাকৃত অপরিণত ও অপরিস্ফুট। পরবর্তী বাঙলাসাহিত্যের সঙ্গে অবশ্যই ইহার তুলনা চলে না। কাজেই কাব্যসৃষ্টি-হিসাবে যদিও ইহা বাঙলাসাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিতে না পারে, ভাষা-তাত্ত্বিক প্রয়োজনে চর্যাপদকে অপরিহার্য বলিয়াই মনে করা হয়।

অতি প্রাচীনকালেও যে চর্যাপদের একটা বিশিষ্ট আসন ছিল, সংস্কৃত ও তিব্বতী ভাষায় রচিত ইহার টীকা হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বস্তুত, এই ধরণের টীকা না পাওয়া গেলে চর্যাপদের অর্থনিষ্পত্তি সম্ভবপর হইয়া উঠিত না।

অধ্যায় ঃ
তিন

তুর্কী-আক্রমণ ও যুগান্তর কাল

১২০০ খ্রীঃ কিংবা তৎ-সন্নিহিত কোন কালে বাঙলাদেশে সর্বপ্রথম তুর্কী-আক্রমণ ঘটে। মাত্র সপ্তদশ কিংবা অষ্টাদশ তুর্কী অশ্বারোহী বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করিয়া বাঙলাদেশ অধিকার করিয়াছিল,—এই উপকথা এখন বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়া মানিয়া লইলেও তুর্কী-আক্রমণ যে সমসময়েই সমগ্র বাঙলাদেশে একটা প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার পথ নাই। ভারতের বুকে পারসিক, গ্রীক, শক, হূণ-আদি বিদেশী বিধর্মী শক্তি বার বার আঘাত করিয়াছে। কিন্তু তাহা কখনও প্রত্যক্ষভাবে বাঙলাদেশকে আহত করিতে পারে নাই। ফলে ভারতবর্ষে বার বার বহু শক্তির উত্থানপতন ঘটিলেও এবং রাজশক্তির পরিবর্তন ঘটিলেও সাধারণ বাঙালীর সামাজিক জীবনে তাহার কোন প্রতিফলন ঘটে নহে। তুর্কী-আক্রমণই সর্বপ্রথম বাঙলাদেশকে প্রত্যক্ষভাবে আঘাত করিয়াছিল। এই আঘাত ছিল একান্তভাবেই আকস্মিক, এই আঘাতের জন্য কাহারও কোন মানসিক প্রস্তুতিও ছিল না,—প্রত্যাঘাত করিবার চিন্তাতো অকল্পনীয়। আকস্মিকতা ছাড়াও বিপর্যস্ত হইবার অপর প্রধান কারণ—বাঙলীর সংহতি-শক্তির অভাব।

তুর্কী আক্রমণের আকস্মিকতা

উত্তর ভারতে আর্যভাষী জনগণের আবির্ভাব বহু প্রাচীন ঘটনা হইলেও বাঙলাদেশে তাহাদের আগমন ঘটিয়াছে সম্ভবত গুপ্তযুগে। আর্যদের আগমনের পূর্বে বাঙলাদেশে বাস করিত সম্ভবত বিভিন্ন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত কয়েক প্রকার অনার্য জাতি। ইহাদের মধ্যে কোল-ভীল-সাঁওতাল প্রভৃতি অষ্ট্রীক জাতির নরগোষ্ঠী, দ্রবিড় নরগোষ্ঠী এবং কিছু কিছু মঙ্গোলজাতীয় লোকও বর্তমান ছিল। ইহাদের ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার প্রত্যেকটিই ছিল পরস্পর হইতে ভিন্ন। আবার কালক্রমে বাঙলাদেশে যে আর্যসভ্যতা দৃঢ়মূল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার সঙ্গেও উহাদের ব্যবধান ছিল দুস্তর। বস্তুত সমসাময়িক বাঙলাদেশে আর্য ও অনার্য সভ্যতার দুইটি ধারা চলিয়াছিল

সমকালীন বাঙলার সমাজ জীবন

পাশাপাশি। মনে হয়, ইহাদের মধ্যে রেষারেষির ভাবটিই ছিল প্রবল, উভয়ের উপর পারস্পরিক প্রভাব-সত্ত্বেও উভয়ে মিলিয়া কোন একটি বিশিষ্ট সংহতশক্তিতে রূপায়িত হইয়া উঠে নাই। বরং অনার্যসভ্যতা হইতে আর্যসভ্যতাকে পৃথক্ এবং বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিবার প্রচেষ্টার আর অন্ত ছিল না। বিভিন্ন শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের বেড়াজালে পড়িয়া আর্যসমাজ ক্রমশই সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছিল। যে প্রবল সঙ্ঘশক্তি বহিরাঘাত হইতে দেশকে রক্ষা করিতে পারিত, তাহার সম্যক্ অনুপস্থিতির ফলে বাঙলাদেশে তুর্কী-আক্রমণ অপ্রতিহত হইয়াছিল।

বিদেশী শক্তির প্রথম আঘাতে বাঙালী বিমূঢ় হইয়া পড়িল। যখন সেই আঘাতকে প্রতিহত করিতে পারিল না, তখন একান্ত স্বাভাবিক কারণেই বাঙালী কূর্মবৃত্তি অবলম্বন করিয়া আত্মরক্ষায় প্রয়াসী হইল। তাহার দৃষ্টি হইল অন্তর্মুখী। রাজশক্তি প্রতিকূল, আত্মশক্তিতেও ভরসা নাই,—এই অবস্থায় দৈবের উপর নির্ভর করা ছাড়া আর গতি কি!

আঘাতের প্রথম প্রতিক্রিয়া : অন্তর্মুখিতা

অনার্য জাতি দীর্ঘকাল আর্যদের পাশাপাশি বাস করিতেছিল এবং তৎসত্ত্বেও যেখানে উভয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য-বিধানের স্পৃহা দেখা যায় নাই, বাহিরের এই প্রবল আঘাত তাহাদের নিকট শাপে বর হইয়া দেখা দিল। দীর্ঘকাল প্রতিবেশিত্বের ফলে তাহাদের মিলন না ঘটিলেও একটা সমান অনুভূতির ভাব নিশ্চয়ই গড়িয়া উঠিয়াছিল,—এইবার উভয়ের সম্মুখে একই শত্রু—বিদেশী-বিধর্মী অপরিচিত একটা জাতি,—অতএব আর্য-অনার্য জাতির মিলন ত্বরান্বিত হইয়া উঠিল। কালের প্রভাবে স্বাভাবিক ভাবেই হয়তো কখনো এই মিলন ঘটিত, কিন্তু আত্মরক্ষার তাগিদে তাহাদের অকালেই মোহমুক্তি ঘটিল—আর্য-অনার্য জাতির সংমিশ্রণে বিরাট হিন্দুজাতির অভ্যুদয় ঘটিল। তুর্কী-আক্রমণ বাঙালীর জাড্য নাশ করিয়াছিল, তাহার সুপ্তি ভাঙাইয়া তাহাকে জাগাইয়া তুলিল,—বাঙলা দেশে তুর্কী-আক্রমণের এই পরোক্ষ সুফলটিকে অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই।

মোহমুক্তি : মিলনপ্রচেষ্টা

তুর্কী আক্রমণের প্রথম পর্বেই আক্রমণকারী শক্তি মহোৎসাহে মন্দির ভাঙিয়া মস্‌জিদ নির্মাণ এবং কাফেরকে পবিত্র ইস্‌লামধর্মে দীক্ষিত করিবার প্রচেষ্টায় ব্রতী হইয়াছিল। অতএব বাঙলার অধিবাসীরা অতি সন্তর্পণে

আপনাদের সত্তাকে বাঁচাইয়া রাখিতে সচেষ্ট ছিল। কিন্তু শাসকরাও সুখশয্যার অধিকারী ছিলেন না। প্রথম তুর্কী শাসকদের অনেকেই ঘাতকের হস্তে নিহত হইলেন। ক্রমে একটা সময়ে বাঙলাদেশের শাসন-ব্যবস্থা এমন একটা অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইল যে তাহাকে দুঃশাসন বলিলেও যথেষ্ট বলা হয় না। ন্যূনাধিক দেড়শত বৎসর কাল বাঙলার বুকে দুঃশাসনের বিভীষিকা—সর্বত্র অরাজকতা, সন্ত্রাস, অশান্তি। গণজীবনে তখন ভাঙা-গড়ার খেলা চলিয়াছে। আঘাতে আঘাতে বাঙালী বাঁচিবার শক্তি অর্জন করিতেছিল। বাহিরের আঘাত প্রবলতর হইয়া উঠিলে বাঁচিবার প্রচেষ্টাও প্রবলতর হইল। আবার, এই অবসরে আর্য-অনার্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণে যে নূতন জাতির সৃষ্টি হইল, তাহাও জাগিয়া উঠিয়া অনুকূল ক্ষেত্রের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। মনে হয়, এই কালটা ছিল বাঙালীর মানস-প্রস্তুতির কাল।

প্রাথমিক আঘাত : মানস-প্রস্তুতি

অবশেষে এক সময় দুর্দিনের মেঘ অপসৃত হইল। চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় শামসুউদ্দিন ইলিয়াস শাহ্ দিল্লীর শাসনশৃঙ্খল হইতে বাঙলাকে মুক্ত করিয়া এক স্বাধীন রাজ্য সৃষ্টি করিয়া শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। বাঙলাদেশের মধ্যযুগের ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম দেশবাসীর ভাবনা-কল্পনাকে শাসনকর্তা আপনার বলিয়া গ্রহণ করিলেন। ইলিয়াস্ শাহ্ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক অভিমত এই যে, তিনি 'Represented Bengal's hopes and aspirations and had almost become a national institution.' দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই, যে জাতি জাগরণের উপযুক্ত অবসরের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাহা উচ্চকণ্ঠে আত্মপ্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিল—বাঙলাদেশে আবার নূতন করিয়া সাহিত্য-সাধনা সুরু হইল।

নব জাগরণ

বাঙলাদেশে সুদীর্ঘকাল ইলিয়াস শাহী রাজত্ব চলিয়াছিল। মাঝখানে একজন মাত্র হিন্দু (রাজা গণেশ) এবং তাঁহার মুসলমান বংশধরগণ কিছুদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। বস্তুত এই সুদীর্ঘকাল যে রাজশক্তি অখণ্ড প্রতাপে বাঙলাদেশে আপনার বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন রাখিয়াছিলেন, তাঁহারা বিধর্মী, বিজাতি এবং সম্ভবত ভিন্নভাষীও বটে। কিন্তু সানন্দে লক্ষ্য করা যায় যে, ইহাদের প্রায় সকলেই বাঙলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া গিয়াছেন। সমসাময়িক বাঙালী কবিদের অনেকে সশ্রদ্ধভাবে এই সকল মুসলমান নরপতির নামও উচ্চারণ করিয়াছেন। মনে হয়, যদি দুর্ভাগ্যক্রমে (?)

বাঙলাদেশে আকস্মিকভাবে তুর্কী-আক্রমণ না ঘটিত, তবে হয়তো বাঙলা সাহিত্যের এতখানি প্রসার ঘটিত না, বাঙলা সাহিত্যের নব জাগরণও অনেকটা বিলম্বিত হইত। ব্রাহ্মণ্য-ব্যবস্থাধীন আর্য-সমাজে দেশী ভাষা যে শুধুই অপাংক্তেয় ছিল, তাহা নহে, দেশী ভাষায় সাহিত্য-চর্চাও ছিল নিষিদ্ধ। —'অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ। ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ'। মাতৃভাষায় শাস্ত্র শ্রবণ করিলেও রৌরব নরক-প্রাপ্তি অনিবার্য—ইহাই ছিল শাস্ত্রের নির্দেশ। বিদেশী বিধর্মী রাজশক্তি অবশ্যই এই শাস্ত্রীয় নির্দেশের আওতায় আসে না। অতএব তাঁহারা বাঙলাদেশে বসবাস করিয়া বাঙালী বনিয়া গিয়া বাঙলা ভাষারই যদি পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া থাকেন, তবে কাহারও কিছু বলিবার ছিল না। বস্তুত এইরূপই ঘটিয়াছিল। বাঙলা ভাষা রাজশক্তির আনুকূল্য লাভ করিয়া স্বচ্ছন্দগতিতে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ইলিয়াস-শাহী শাসনারম্ভ কাল হইতেই বাঙলায় নব জাগৃতি ঘটিল এবং যুগান্তর কালের অন্ত ঘটিল।

মাতৃভাষা চর্চায় রাজশক্তির আনুকূল্য

পূর্বে যে আর্য-অনার্য-সংস্কৃতি সমন্বয়ের কথা বলা হইয়াছে, এইবার তাহার ফল ফলিল। অনার্য জাতির যে নিজস্ব ধর্ম-সংস্কৃতি ছিল, আর্য সংস্কৃতির সংঘর্ষে কিংবা সংমিশ্রণে থাকিলেও তাহা একেবারে বিপর্যস্ত হয় নাই। বস্তুত অনার্যরা তাহাদের ধ্যান-ধারণা ও দেবতা-ধর্ম-শুদ্ধই আর্যসমাজে গৃহীত হইয়াছিল। আর্যরাও মহতী বিনষ্টির মুখে পড়িয়া যখন কোন দৈবশক্তির অনুগ্রহ কামনা করিতেছিল, তখনই আর্য-অনার্য মিশ্রণের ফলে আর্যসমাজে নূতন নূতন দেবতার আবির্ভাব ঘটিতেছিল। ঐ সমস্ত দেবতা বা দেবী অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন,—এই ভরসায় নবগঠিত হিন্দুজাতি ইহাদের মধ্যেই আশ্রয় এবং সান্ত্বনা লাভের জন্য সচেষ্ট হইলেন। নবপ্রবিষ্ট দেবতাদের জাতে তুলিবার দায়িত্বও গ্রহণ করিলেন সমাজের উচ্চস্তরে আসীন শিক্ষিত ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্যগণ। সদ্য-উন্নীত দেবতাদের প্রশস্তিবন্দনার উদ্দেশ্যে তাঁহারা রচনা করিলেন 'মঙ্গলকাব্য'। পরবর্তীকালে এই মঙ্গলকাব্য শাখাই মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের একটা বিরাট বিস্তৃত অংশ অধিকার করিয়াছিল।

অনার্য প্রভাব

পূর্বেই বলা হইয়াছে তুর্কী-আক্রমণ হইতে দেড়শ বছর পর্যন্ত বাঙলাদেশে যে অরাজকতা ও অশান্তি চলিয়াছিল, তাহা সাহিত্যসৃষ্টির অনুকূল ছিল না। এই কালে বাঙলাদেশে বাঙলাভাষায় যে কোন সাহিত্য রচিত হইয়াছিল,

এখন পর্যন্ত তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তবে বাঙালীর যে মানস-প্রস্তুতি চলিতেছিল, তাহা অনুমান করা চলে।

সদ্য-কথিত এই মঙ্গলকাব্য শাখার কয়েকজন কবির নাম পরবর্তী কবিগণ সশ্রদ্ধভাবে উচ্চারণ করিয়াছেন। মনসামঙ্গল কাব্য-রচয়িতা কানা হরিদত্ত, চণ্ডীমঙ্গল কাব্য-রচয়িতা মাণিক দত্ত এবং ধর্মমঙ্গল কাব্য-রচয়িতা ময়ূর ভট্টের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের রচনার বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই, যাহাও পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে কবিদের সম্বন্ধে কিছু জানিবার উপায় নাই। নানা কারণেই অনুমান করা হয় যে, পূর্বোক্ত কবিগণই স্ব স্ব কাব্যের আদি রচয়িতা। আরও অনুমান করা হয় যে, এই সকল কবি সম্ভবত এই যুগান্তর কালেই বর্তমান থাকিয়া পাঁচালীর আকারে মঙ্গলকাব্যের কাহিনী রচনা করেন; পরবর্তীকালে এই বীজরূপই প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হইয়াছিল। এই কারণেই যুগান্তর কালকে বাঙালীর মানস-প্রস্তুতির কাল বলিয়া অভিহিত করিলেও অন্যায় হয় না।

মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব (?)

অধ্যায় ঃ
চার

আদি-মধ্যযুগ

বাঙলা সাহিত্যের আদি-মধ্যযুগ স্বল্পায়তন এবং স্বল্পসমৃদ্ধ হইলেও প্রকৃতপক্ষে এই কালেই বাঙলা সাহিত্যের বুনিয়াদ গড়িয়া উঠে। ইহার পূর্ববর্তীকালে রচিত গ্রন্থের সংখ্যা মাত্র একটি এবং এইটির সহিতও পরবর্তী সাহিত্যধারার প্রত্যক্ষ যোগ অনুমান করা কঠিন। এই কারণেই বলিতে হয় যে, আদি-মধ্য-যুগেই প্রকৃতপক্ষে বাঙলা সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল।

ভিত্তিস্থাপন

দিল্লীতে পাঠানবংশীয় সুলতানগণের রাজত্বকালে বাঙলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন ভাগে ভিন্ন ভিন্ন নায়কের আবির্ভাবে ও তিরোভাবে বাঙলার শাসন-ব্যবস্থা প্রায় ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। দীর্ঘকাল এইভাবে চলিবার পর অবশেষে ১৩৫২-৫৩ খ্রীঃ কিংবা কিঞ্চিৎ পূর্বে হাজী ইলিয়াস্ বাঙলাদেশকে দিল্লীর শাসনশৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া শামস্উদ্দিন ইলিয়াস্ শাহ্ নাম গ্রহণ পূর্বক রাজত্ব আরম্ভ করেন। ইলিয়াস্ শাহ্ বাঙলার স্বাধীন সুলতানদের অন্যতম। তাঁহার রাজত্বকালে বাঙলায় শান্তি-সমৃদ্ধি ফিরিয়া আসিল এবং তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য-স্থাপত্যশিল্প এবং অপরাপর সাংস্কৃতিক কার্যকলাপও ধীরে ধীরে যেন নবযুগের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বস্তুত ইলিয়াস্ শাহের রাজ্যকাল হইতেই আমরা আদিমধ্যযুগের আরম্ভ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

যুগারম্ভ

ইলিয়াস্ শাহের মৃত্যুর পর তৎপুত্র সিকন্দর শাহ্ বাঙলার সুলতান হন। তাঁহার রাজত্বকালে বাঙলাদেশকে আবার দিল্লীর অধীনে আনিবার চেষ্টা চলিয়াছিল ; কিন্তু সুদক্ষ শাসক সিকন্দরের চেষ্টায় বাঙলার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রহিল। পিতার মত সিকন্দরও ছিলেন শিল্প-সাহিত্য-আদির পৃষ্ঠপোষক। তাঁহার রাজত্বকালেই পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত আদিনা মস্জিদটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সিকন্দরের নামাঙ্কিত স্বর্ণমুদ্রার সৌন্দর্য উল্লেখযোগ্য। সিকন্দরের পুত্র ঘিয়াসউদ্দিন আজম পিতৃহন্তা হইলেও অতি ন্যায়নিষ্ঠ এবং দক্ষ শাসক ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালেও বাঙলার শান্তি-সমৃদ্ধি ছিল অক্ষুণ্ণ। বিখ্যাত কবি হাফেজের সহিত তাঁহার পত্র-বিনিময় এবং চীন দেশের সহিত দূত বিনিময় চলিত। ১৪১০ খ্রীঃ আজমের মৃত্যুর অব্যবহিত

পরে উত্তরবঙ্গে গণেশ নামক একজন হিন্দু জমিদার ক্রমে অতি ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়া ইলিয়াস্ শাহের বংশধরদের অপসারিত করিয়া স্বাধীন বাঙলার রাজা হইয়া বসেন। এই সময়ই দনুজমর্দনদেব নামক যে প্রবল প্রতাপান্বিত এক স্বাধীন রাজার সন্ধান পাওয়া যায়, অনেকেই মনে করেন যে তিনি এবং রাজা গণেশ অভিন্ন। অনুমান, ইঁহারই পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি কৃত্তিবাস তাঁহার অনুপম 'রামায়ণ পাঁচালী' রচনা করিয়াছিলেন। গণেশের পুত্র যদু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া জালালউদ্দিন নাম ধারণ করেন। তাঁহার পুত্র শামসুউদ্দিন আহম্মদ শা রাজা হইলেন। কিন্তু ইনি অতিশয় অত্যাচারী ছিলেন বলিয়া তাঁহার কর্মচারিগণ তাঁহাকে হত্যা করিয়া পূর্ববর্তী ইলিয়াস্ শাহী বংশের নাসিরউদ্দিন মামুদ শাহ্কে বাঙলার সিংহাসনে স্থাপন করেন। নাসিরউদ্দিন মামুদ শান্তিপ্রিয় এবং শিল্প-সাহিত্যাদি সংস্কৃতির একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে বাঙলাদেশে কয়েকটি উৎকৃষ্ট মস্জিদ স্থাপিত হইয়াছিল। নাসিরউদ্দিন-এর মৃত্যুর পর তৎপুত্র রুকনুউদ্দিন বারবক্ শাহ্ এবং তৎপুত্র য়ুসুফ শাহ্ দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই বাঙলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলিয়া মনে হয়। মালাধর বসু ইহাদেরই কোন একজনের নিকট হইতে 'গুণরাজখান' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

রাজনৈতিক পটভূমিকা

শেষ ইলিয়াস্ শাহী সুলতানদের রাজত্বকালেই হাবসী খোজাদের আধিপত্য বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। অবশেষে ইহাদেরই হস্তে ইলিয়াস্ শাহী বংশের পতন ঘটে এবং কিছুকাল বাঙলাদেশে আবার অরাজকতা চলিতে থাকে। এই অরাজকতার জ্বালায় অস্থির হইয়া দেশের হিন্দু ও মুসলমান আমীরগণ শেষ হাবসী রাজাকে হত্যা করিয়া আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্কে রাজা নির্বাচিত করেন। ইনিই সুলতান হোসেন শাহ্ নামে বাঙলার ইতিহাসে অতিশয় সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। হোসেন শাহী আমল বাঙলাদেশের ইতিহাসে 'সুবর্ণযুগ' নামে আখ্যাত হইবার দাবি রাখে। বস্তুত হোসেন শাহের রাজত্বকালেই মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য এক নূতন পথের সন্ধান লাভ করিয়া অন্য যুগের সৃষ্টি করিল। আদি-মধ্য যুগের সমাপ্তিও এইখানেই।

সাহিত্যের উপর দেশকালের প্রভাব অপরিসীম। দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমি কিভাবে দেশের সাহিত্যকে প্রভাবিত করিয়া থাকে,

পূর্বোক্ত ইতিহাস হইতে তাহার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাইবে। দেশে যখনই কোন অরাজকতা বা অশান্তি দেখা দিয়াছে, তখনই শিল্প-সাহিত্যের গতি হইয়াছে স্তব্ধ। আবার গোলযোগ মিটিয়া গেলেই নূতনভাবে সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা জাগিয়াছে। বিশেষভাবে রাজশক্তির আনুকূল্য যে সাহিত্য-সৃষ্টিতে প্রভূত পরিমাণ সহায়তা করিয়াছে, তাহার ভূয়ো দৃষ্টান্ত বর্তমান।

সাহিত্য-সৃষ্টিতে পরিবেশ

আদি-মধ্যযুগে রচিত সাহিত্যের পরিমাণ কম হইলেও ঐ কালের কবিদের প্রত্যেকেই আপন আপন ক্ষেত্রে এক একজন দিক্‌পাল ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস, 'রামায়ণ-পাঁচালী'র কবি কৃত্তিবাস এবং 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-রচয়িতা মালাধর বসুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বড়ু চণ্ডীদাস তাঁহার গ্রন্থে কোন রাজশক্তির কথা কিংবা অপর কোন কাল-জ্ঞাপক লক্ষণের উল্লেখ না করায় তাঁহার কালসম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধভাবে কোন কিছু বলা সম্ভব হইতেছে না। কৃত্তিবাস তাঁহার কাব্যে যে গৌড়েশ্বরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি রাজা গণেশ বলিয়াই অনুমিত হয়। আর মালাধর বসু যে পৃষ্ঠপোষক রাজার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি সম্ভবত ইলিয়াস-বংশীয় রুকনুউদ্দিন বারবক শাহ্ কিংবা তৎপুত্র য়ুসুফ শাহ্ হইতে পারেন। মহামতি হোসেন শাহ্ সম্বন্ধে অনেকেই সপ্রশংস উক্তি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রাজত্বকালের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা—মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভাব। বলা বাহুল্য, হোসেন শাহ্ যদি পরধর্মসহিষ্ণু, উদার এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক না হইতেন, তবে হয়তো চৈতন্যদেবের পক্ষেও ধর্মমত প্রচার কিংবা ভাব-বিপ্লব ঘটানো সহজসাধ্য হইত না। পটভূমিকা অনুকূল ছিল বলিয়াই চৈতন্যদেব যে নূতন ভাবনার বীজ ছড়াইয়া দিলেন, তাহা অনতিবিলম্বে পত্রে-পুষ্পে-পল্লবে মহীরুহের আকার ধারণ করিয়াছিল।

সুলতানদের সহায়তা

আদি-মধ্যযুগেই মঙ্গলকাব্য শাখার অন্তত একটি অথবা একাধিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, এইরূপ অনুমান একান্ত অসঙ্গত নয়। এই যুগের মঙ্গল-কাব্যের আবির্ভাব একান্ত স্বাভাবিক, এবং প্রত্যুতই যে এইপ্রকার ঘটিয়ছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। যুগান্তর কালে আর্য-অনার্য-সংস্কৃতির সংমিশ্রণের ফলে যে সকল নব দেবতার উদ্ভব হইয়াছিল, এই কালেই তাহাদের প্রশস্তি বন্দনা করিয়া কাব্য রচিত হইবে, কালানুরোধে এই সত্যকে অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই। স্বল্প-পরবর্তীকালে

বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতে স্পষ্টতই উল্লেখ করা হইয়াছে যে—'দম্ভ করি বিষহরী পূজে কোন জনে,' এবং 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে'। অনুমান অসঙ্গত নয় যে, চৈতন্যপূর্ব-কালে তথা আদি-মধ্যযুগেই 'মনসামঙ্গল' কাব্য এবং 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের উদ্ভব ঘটিয়াছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে এই কালে রচিত কোন 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে অন্তত এইরূপ তিনটি মসামঙ্গল কাব্যের নাম উল্লেখ করা চলে, যাহাদের রচয়িতাগণ আদি-মধ্যযুগে বর্তমান ছিলেন, এইরূপ অনুমান করিবার পক্ষে সঙ্গত কারণ বর্তমান। বরিশাল জেলার ফুল্লশ্রী-নিবাসী কবি বিজয় গুপ্ত, ময়মনসিংহ জেলার বোরগ্রামের কবি নারায়ণদেব এবং চব্বিশ পরগণার বাদুড্যা-বটগ্রাম-নিবাসী কবি বিপ্রদাস পিপ্পলাই এই কালে (একই কালে না হইলেও) বর্তমান ছিলেন,—এই উক্তির সমর্থনে যুক্তি একেবারে ভিত্তিহীন নহে।

বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য

পূর্ববর্তী যুগান্তর কালের আলোচনা-প্রসঙ্গে উক্ত কালকে 'মানসপ্রস্তুতি'র কাল বলা হইয়াছে। সেই হিসাবে আলোচ্য আদি-মধ্য-যুগকে 'ভিত্তিভূমি নির্মাণের কাল' বলিয়া অভিহিত করিলে অসঙ্গত বিবেচিত হইবে না।

ভিত্তিভূমি

আর একজন কবির কথা উল্লেখ করা না হইলে আদিমধ্যযুগের আলোচনা অসমাপ্ত থাকিয়া যাইবে,—ইনি অভিনব-জয়দেব কবি বিদ্যাপতি। বিদ্যাপতি বাঙলাদেশের অধিবাসী নহেন, তিনি মিথিলার কবি, মিথিলার রাজকবি। এই কারণেই বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার নাম অন্তর্ভুক্ত হইবার কোন প্রত্যক্ষ কারণ নাই। কিন্তু তাঁহার কাব্যের সঙ্গে বাঙালীর হৃদয়ের যোগ বর্তমান, তাঁহার কাব্যের প্রভাব বাঙলা সাহিত্যের উপর প্রভূত পরিমাণ, এবং বাঙলাদেশে রচিত রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদাবলী সাহিত্যের সহিত তাঁহার কাব্যের যোগ এত ঘনিষ্ঠ যে, বিদ্যাপতিকে বাদ দিলে বাঙলা সাহিত্যের একটা বিশেষ শাখা-সম্বন্ধে আলোচনা একেবারে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। এই কারণে বাঙলা-সাহিত্যের আলোচনায় বিদ্যাপতির উল্লেখ অপরিহার্য। বিদ্যাপতির কালনিরূপণ-বিষয়ে কিছু জটিলতা থাকিলেও তিনি যে আদি-মধ্য তথা চৈতন্য-পূর্বযুগে বর্তমান ছিলেন, তাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

বিদ্যাপতি

আদি-মধ্যযুগে রচিত সাহিত্যের সংখ্যাল্পতার কয়েকটি সম্ভাব্য কারণ নির্ণয় করা চলে। বাঙালীর সদ্য জাগরণ ঘটিয়াছে,—অতএব সম্পূর্ণভাবে

প্রস্তুত হইবার জন্য প্রথম দিকে কিছুটা সময় অপচয়িত হইয়া থাকিতে পারে। ঐকালেও যে প্রবলভাবে সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা বর্তমান ছিল এবং উচ্চ-শিক্ষিত অনেকের মধ্যেই যে দেশী ভাষা-সম্বন্ধে বিরূপ ভাব বর্তমান ছিল তাহারও প্রমাণ বর্তমান। বিদ্যাপতি অবহট্ট ভাষায় রচিত একটি পদে স্বীকার করিয়াছেন যে, 'সক্কঅবাণী বুহঅন ভাবই'—অর্থাৎ বুধজন সংস্কৃত ভাষায় চিন্তা করিয়া থাকেন। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির পক্ষে এই মনোভাব সহায়ক নহে। এমনও হইতে পারে যে, এই কালে হয়তো আরও অনেক সাহিত্যিক কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন,—কিন্তু বাঙলার জলীয় পরিবেশ ও কীটাদির অত্যাচারে গ্রন্থগুলি কালসমুদ্র পার হইয়া আসিতে পারে নাই এবং এই কারণেই সেই সাহিত্যিকগণ স্মৃতিমন্দির হইতে নির্বাসিত হইয়াছেন। অকৃতী কবিদের রচনা অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই বিলুপ্ত হইয়া থাকিতে পারে। যাহা হউক, সংখ্যায় এই যুগ সমৃদ্ধ না হইলেও উৎকর্ষ যে সম্ভাবনাময়, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

সংখ্যাল্পতার কারণ

যুগান্তর কালের আলোচনা-প্রসঙ্গে আদি মঙ্গলকাব্যসমূহের আদি-কবিদের কথা উল্লেখ করিয়াছি। বলা-বাহুল্য, তাহাদের সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, সবই একান্তভাবে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া। অসম্ভব নহে, হরিদত্ত, মাণিকদত্ত এবং ময়ূরভট্ট হয়তো এই আদিমধ্যযুগেই বর্তমান ছিলেন।

আদি মঙ্গল-কাব্যকারগণ

১. বড়ু চণ্ডীদাস ঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

প্রাচীনযুগে চর্যাপদ-রচনার মধ্য দিয়া যে গীতিকাব্যের সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহারই পরবর্তী প্রকাশ চণ্ডীদাসের পদাবলীতে। বিষয়-বস্তুর দিক হইতে চর্যাপদ বৌদ্ধধর্ম ও সহজিয়া সাধনপদ্ধতির অনুগামী আর পদাবলী বৈষ্ণবধর্ম ও অনেকের মতে সহজিয়া সাধনপদ্ধতির অনুগামী। বাঙলা সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণের প্রেম-সম্বলিত কাহিনীর প্রথম দর্শন পাওয়া যায় পদাবলী সাহিত্যে। অবশ্য ইহার পূর্বেই জয়দেবগোস্বামীর 'গীতগোবিন্দ' গ্রন্থে এই কাহিনী পরিপূর্ণ মর্যাদা লাভ করিয়াছে। ভাষার প্রশ্ন বাদ দিলে চণ্ডীদাসের পদাবলী সাহিত্য জয়দেবের গীতগোবিন্দেরই প্রকৃত উত্তরসূরী।

আদি বৈষ্ণব কবিতা

চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতি (বাঙালী না হওয়া সত্ত্বেও) সুদীর্ঘ পঞ্চশতাব্দী-যাবৎ বাঙালীর হৃদয়রাজ্যের অধীশ্বর। বিভিন্ন চৈতন্যজীবনী এবং সমসাময়িক গ্রন্থে চণ্ডীদাসের পদাবলী সাহিত্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। তৎপর যুগে যুগেই চণ্ডীদাসের পদাবলী বাঙালীর মনে অতুলনীয় রস-সৃষ্টি করিয়াছে।

১৩১৬ বঙ্গাব্দে ৺বসন্তরঞ্জন রায় কোন এক গ্রামের এক গোশালা হইতে আদ্যন্ত খণ্ডিত একখানি পুঁথি আবিষ্কার করেন এবং ১৩২৩ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন। গ্রন্থটি প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পাঠক ও সমালোচক-মহলে তুমুল আলোড়ন পড়িয়া গেল। ঐতিহ্য এবং পুরুষানুক্রমে চণ্ডীদাসের যে সমস্ত পদ বাঙালীর রস-পিপাসাকে নিবৃত্ত করিয়াছে, আলোচ্য গ্রন্থে তাহাদের অনুপস্থিতি বিস্ময়কর মনে হইল। অধিকন্তু, আদ্যন্ত খণ্ডিত হওয়া-সত্ত্বেও গ্রন্থে একটি সুগঠিত কাহিনী পাওয়া গেল। অথচ চণ্ডীদাসের পরিচিত পদগুলি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন, তাহাদের সমবায়ে এমন কোন কাহিনী গড়িয়া তোলা সম্ভব নয়। ইহার উপর আবার গ্রন্থের ভণিতায় পাওয়া গেল 'বড়ু চণ্ডীদাস' বা 'অনন্তবড়ু চণ্ডীদাস' নাম। অথচ পরিচিত পদাবলীগুলির প্রায় সর্বত্র 'দীন' বা 'দ্বিজ' উপনাম-সমন্বিত চণ্ডীদাসের নাম পাওয়া যায়। বলাবাহুল্য, এই গ্রন্থটিকে অবলম্বন করিয়া দীর্ঘকাল বাঙলা সাহিত্যে যে বাদানুবাদ চলিয়াছিল, আপাতত তাহা অনেকটা শান্ত বলিয়া মনে হইলেও আসলে সমস্যার সমাধান ঘটে নাই।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন : চণ্ডীদাস

বসন্তবাবুর আবিষ্কৃত গ্রন্থখানি আদ্যন্ত খণ্ডিত বলিয়া ইহাতে গ্রন্থকারের নাম-পরিচয় ও কাল-জ্ঞাপক কোন পুষ্পিকা কিংবা গ্রন্থনাম পাওয়া যায় নাই। সম্পাদক বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ইহার নামকরণ করিলেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। অন্য সূত্র হইতে প্রাপ্ত লক্ষণ-বিচারে মনে হয়, গ্রন্থখানির নাম ছিল 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ'। যাহা হউক, সম্পাদক-প্রদত্ত নামই ইহা শিরোভূষণ করিয়া লইয়াছে। গ্রন্থের ভণিতায় সর্বত্রই চণ্ডীদাসের নাম,—অতএব গ্রন্থকার যে চণ্ডীদাসই তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সন্দেহ জাগাইয়াছে উপনামে। ভণিতার প্রায় সর্বত্র 'বড়ু' এবং ক্বচিৎ 'অনন্তবড়ু' উপনাম। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, কবির নাম ছিল 'চণ্ডীদাস' এবং 'বড়ু' তাঁহার উপাধি অথবা কবির নাম 'অনন্ত', উপাধি ছিল 'বড়ুচণ্ডীদাস'। আশ্চর্যের বিষয়, 'দীন' বা 'দ্বিজ' উপনাম একবারও ব্যবহৃত হয় নাই।

গ্রন্থনাম ও গ্রন্থকার

গ্রন্থে কালজ্ঞাপক কোন পুষ্পিকা পাওয়া না যাওয়ায় এই বিষয়েও সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। বিভিন্ন চৈতন্য-জীবনী গ্রন্থে চণ্ডীদাসের উল্লেখ থাকায় চণ্ডীদাস যে চৈতন্যপূর্ব যুগে বর্তমান ছিলেন, তাহা অনুমান করা চলে। চৈতন্যচরিতকার বলিয়াছেন—

বিদ্যাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত।
আস্বাদয়ে রামানন্দ স্বরূপ সহিত॥

যদি কেহ কূটতর্ক তুলিয়া বলেন যে, চৈতন্যদেব বড়ু চণ্ডীদাসের গ্রাম্য ও অশ্লীল শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-শ্রবণে নিশ্চয়ই পুলকিত হইতেন না, তিনি নিশ্চয়ই দ্বিজ বা দীন চণ্ডীদাসের মধুর রসাশ্রিত পদাবলী শ্রবণ করিতেন, তবে তাহাদের সন্দেহ নিরসন করিবার জন্য সনাতন গোস্বামী-কৃত 'বৈষ্ণবতোষণী' নামক 'টীকার' কথা উল্লেখ করা যাইবে। উক্ত টীকায় 'চণ্ডীদাসাদিদর্শিত দানখণ্ড নৌকাখণ্ডাদি'র উল্লেখ আছে। যত রকম চণ্ডীদাসের পদ পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে একমাত্র বড় চণ্ডীদাস-রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থেই দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। অতএব চৈতন্যদেব যে বড়ু চণ্ডীদাসের পদই আস্বাদন করিতেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই হেতু তিনি যে চৈতন্যপূর্ববর্তী কালেই বর্তমান ছিলেন, তাহাও সন্দেহাতীত ব্যাপার। গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ লক্ষণও এই অভিমতের পরিপোষক।

কালবিচার

যে পুঁথিটি গোশালা হইতে বসন্তবাবু উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহা যদি চণ্ডীদাসের স্বহস্তলিখিত হইত তবে লিপিতাত্ত্বিক প্রমাণের সাহায্যে ইহার কাল-নির্ণয় সম্ভবপর হইত। অথচ গ্রন্থে অন্তত তিনজনের হস্তলিপি বর্তমান এবং লিপির ধাঁচও ঠিক এক নয়। ফলত লিপিতাত্ত্বিকদের অভিমতে ঐক্যের অভাব দেখা যায়। ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন যে, গ্রন্থের লিপি ১৬০০খ্রীঃ-র পূর্ববর্তী নয়, আবার ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে লিপি ১৩৫০ খ্রীঃ-র পূর্ববর্তী।

ভাষাতত্ত্বের বিচারে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় গ্রন্থটিকে আদি মধ্য-যুগের রচনা বলিয়া মনে করেন। ডাঃ সুকুমার সেন বড়ু চণ্ডীদাসকে ষোড়শ শতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত করিলেও ইঁহার ভাষাকে আদি-মধ্যযুগের নিদর্শনরূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব চণ্ডীদাসের জীবৎকাল-সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত তথ্যে উপনীত হইতে না পারিলেও তিনি যে চৈতন্য-পূর্ব যুগে বর্তমান ছিলেন, তাহাতে কোন সংশয় নাই।

চণ্ডীদাস বাসলীপূজক ছিলেন, এই বহুশ্রুত কিম্বদন্তীটি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও সমর্থন লাভ করিয়াছে। চণ্ডীদাস যে বাসলীর সেবক ছিলেন, তাহা বহু ভণিতায়ই উক্ত হইয়াছে। 'বাসলী মাহাত্ম্য' নামক একটি সংস্কৃত পুস্তিকায় পাওয়া যায় যে চণ্ডীদাসের পিতার নাম ছিল নিত্যনিরঞ্জন এবং মাতার নাম বিন্ধ্যবাসিনী। কিন্তু পুস্তিকাটির যাথার্থ্যে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। 'সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়' নামক অপর এক গ্রন্থে তারা নামে চণ্ডীদাসের এক রজকী সাধন-সঙ্গিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। হয়তো ইহা হইতেই কালক্রমে রামতারা ও রামীধোপানী নামক চণ্ডীদাস-সঙ্গিনীর উপকাহিনীর সৃষ্টি হইয়া থাকিতে পারে।

চণ্ডীদাস-পরিচয়

চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত কয়েকটি পদে জানা যায় যে চণ্ডীদাসের বাড়ি ছিল নান্নুর বা নান্নুর গ্রামে—গ্রামটির বর্তমান নাম নান্নুড়, জেলা বীরভূম। এই গ্রামের 'চণ্ডীদাসের ভিটা' নামক স্তূপ খুঁড়িয়া চতুর্ভুজা বাসলী মূর্তিও পাওয়া গিয়াছে। বাঁকুড়া জেলার ছাতনাগ্রামও আবার চণ্ডীদাসের বাসভূমির দাবিদার। এখানেও বহুকাল বাসলীদেবী পূজিত হইয়া আসিতেছেন, কাছেই নুন্নুরহাট নামে একটি স্থানও বর্তমান। এই ছাতনা হইতেই 'বাসলী মাহাত্ম্য' নামক পুস্তিকাটি আবিষ্কৃত হইয়াছে। অতএব বড়ু চণ্ডীদাস নান্নুর বা ছাতনা কোথায় জন্মগ্রহণ করিযাছিলেন, তৎসম্বন্ধে সুনিশ্চিত ভাবে কিছু বলা যাইতেছে না।

কবির বাসস্থান

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত হইয়া একটি অখণ্ড কাহিনীকেই প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছে,—এই বিষয়ে ইহা অন্যান্য বৈষ্ণবপদাবলী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। বৈষ্ণব পদাবলীতে গোষ্ঠ, মান, মাথুর ইত্যাদি কাহিনী বা ভাবকে উপজীব্য করিয়া বিচ্ছিন্ন পদ রচনা করা হইয়াছে, পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাহিনীতে একটা সামগ্রিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, জন্মখণ্ড, তাম্বুল খণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড, যমুনাখণ্ড, বাণখণ্ড, বংশীখণ্ড এবং বিরহখণ্ডে বিভক্ত এই কাহিনীটি স্বরূপেতেও পদাবলী সাহিত্য হইতে পৃথক্। পৃথিবীকে কংসের অত্যাচার হইতে মুক্ত করিবার জন্য ভগবান্ নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইলেন। অন্যদিকে স্বয়ং লক্ষ্মীও পিতা সাগরের ঘরে মাতা পদ্মমার গর্ভে রাধা-রূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। নপুংসক আইহনের সঙ্গে রাধার বিবাহ হইল। আইহন রাধাচরিত্রের বিশুদ্ধতা বজায় রাখিবার জন্য রাধার মায়ের পিসি বড়াই বুড়িকে রাধার রক্ষক

কাব্যের কাহিনী

নিযুক্ত করিলেন। রক্ষকই ভক্ষক হইয়া উঠিল। এই বড়াই বুড়ির দৌত্যেই রাধাকৃষ্ণের মিলন ঘটিতে লাগিল। এই মিলনের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ কখনও 'দানী' সাজিতেছেন, কখনও বা নৌকার 'পারানি' সাজিতেছেন। আবার কখনও বা কৃষ্ণ 'ভারী' সাজিয়া রাধার দধি-সরের পসরা মথুরার হাটে লইয়া যান, কখনও রৌদ্রাতপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য রাধার মাথায় ছত্র ধারণ করেন। কৃষ্ণ কখনও পুষ্পকুঞ্জ নির্মাণ করিয়া রাধার জন্য অপেক্ষা করেন, কখনও বা কালীয়দমন, বস্ত্রহরণাদি লীলায় নির্বিষ্ট হন। লক্ষ্য করিবার বিষয়,—রাধা যে সর্বত্রই একান্তভাবে কৃষ্ণের হাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন, তাহা নহে। কখনও তিনি দূতী বড়াই-কে তাহার অন্যায় প্রস্তাবের জন্য প্রহার করেন, কখনও বা কৃষ্ণের উৎপীড়নে বিরক্ত হইয়া কৃষ্ণ-জননী যশোদার কাছে নালিশ করেন। আবার বাণখণ্ডে দেখিতেছি—মদনশরবিদ্ধা রাধা উন্মাদিনীর মতো কৃষ্ণকে অন্বেষণ করিযা বেড়াইতেছেন। এদিকে কৃষ্ণ বাঁশী বাজাইয়া দূর হইতে রাধাকে উতলা করিয়া তোলেন। আবার সুযোগ পাইলেই রাধা কৃষ্ণের মোহন বাঁশী চুরি করিয়া পলাইয়া যান। বাঁশী প্রত্যর্পণের মধ্য দিয়া তাহাদের মিলনও ঘটে। আবার মিলনতৃপ্তা রাধাকে নিদ্রিতাবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ পলায়ন করিলেন। —খণ্ডিত গ্রন্থখানির এইখানেই সমাপ্তি। পূর্ববর্তী খণ্ডগুলির মধ্যেও আবার কোন কোনটি খণ্ডিত।

আধ্যাত্মিক অথচ মধুর-রসাশ্রিত পদাবলী-সাহিত্যের রস-সুধাপানে তৃপ্ত সাধারণ পাঠক, বিশেষ ভক্ত বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-পাঠে বিব্রত হইয়া পড়েন। কারণ ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের যে ঐশ্বর্যভাবের প্রকাশ ঘটিয়াছে, তাহা তাঁহাদের সংস্কার-বিরুদ্ধ। বিশেষত ইহাতে শুধুই সম্ভোগের কথা —যেন কোন গ্রাম্য বিকৃত-রুচি নর-নারীর একান্ত লৌকিক প্রেমকাহিনীই রাধা-কৃষ্ণের বেনামীতে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার গ্রাম্যতা, অশ্লীলতা এবং সম্ভোগলিপ্সাকে ভক্ত বৈষ্ণবগণ সুনজরে দেখিতে রাজি নহেন। কিন্তু সংস্কার-মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া গ্রন্থটিকে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে,

কাব্য-বিচার

গ্রন্থকারের প্রচেষ্টা কখনও একেবারে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় নাই। ইহাতে একই ধরণের বাদানুবাদ, নীতিবাক্য ও শাস্ত্রের দোহাই, ঘটনার পুনরুক্তি-আদি দোষ থাকা-সত্ত্বেও ইহাতে যে বলিষ্ঠ জীবনবোধের প্রকাশ ঘটিয়াছে, তাহার তুল্য রচনা সমগ্র প্রাচীন ও মধ্য যুগে একান্ত ভাবেই দুর্লভ। সমগ্র কাহিনীতে পাত্র-পাত্রী বলিতে

মাত্র তিনজন,—কৃষ্ণ, রাধা এবং বড়াই বুড়ি। অথচ এই স্বল্পতম চরিত্রের সহায়তায়ই কবি মাঝে মাঝে উৎকৃষ্ট নাটকীয়তা-সৃষ্টিতে সক্ষম হইয়াছেন। বিশেষত রাধা-চরিত্রের চিত্রণে কবি অপূর্ব দক্ষতা ও চাতুর্যের পরিচয় দান করিয়াছেন। সংসারজ্ঞানাভিজ্ঞা, অশিক্ষিতা গ্রাম্য বালিকা কীভাবে স্তরে স্তরে বিবর্তিত হইয়া প্রৌঢ় পারাবতী শ্রীরাধায় পরিণত হইয়াছেন,—তাহা প্রকৃতই উপভোগের বিষয়। ডঃ সুকুমার সেন যথার্থই বলিয়াছেন—'চণ্ডীদাস এই নাম অথবা বড়ু চণ্ডীদাস এই উপাধির অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া যিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামে প্রকাশিত এই নাটগীতি কাব্যটি রচনা করিয়াছিলেন তিনি মহাকবি, এবং অলঙ্কার শাস্ত্রোক্ত মহাকাব্য-লক্ষণের কিছুই ইহাতে না থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মহাকাব্য।'

২. ঃ চণ্ডীদাস-সমস্যা

অনুমান করা চলে, নিবিষ্ট পাঠকের নিকট বহু পূর্বেই 'চণ্ডীদাস' এক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। বিভিন্ন চৈতন্য-জীবনীকার স্বীকার করিয়াছেন যে, মহাপ্রভু চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন করিতেন, অথচ চণ্ডীদাস ভণিতা-যুক্ত পদে চৈতন্যদেবের প্রভাব বর্তমান। চণ্ডীদাস-নামের পূর্বে উপনামের বৈচিত্র্যও পাঠকের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করিতে পারে। তাহা ছাড়া বিভিন্ন উপনাম-যুক্ত চণ্ডীদাসের পদে যে ভাবের ও রচনারীতির বৈষম্য দেখা যায়, বিশেষত, রচনা-বিশেষের উৎকর্ষ-অপকর্ষ দেখা যায়, তাহাও কোন নিষ্ঠাবান পাঠকের দৃষ্টি এড়াইতে পারে না। কিন্তু এই সমস্ত-সত্ত্বেও কেহ উচ্চবাচ্য করেন নাই। কিন্তু পরে ৺বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় বড়ু-চণ্ডীদাস-রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' প্রকাশিত হইলে, চারিদিক হইতে সংশয়-বাণ নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।

সমস্যার উদ্ভব

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থের ভণিতায় কবির নাম, হয় নিরুপাধিক, নয় 'বড়ু' অথবা 'অনন্ত বড়ু' উপনামযুক্ত। অথচ এতাবৎকাল 'দীন, দ্বিজ, দীনক্ষীণ, তরুণীরমণ'-আদি যেসকল উপনাম চণ্ডীদাসের নামের সঙ্গে যুক্ত হইত, তাহাদের সামগ্রিক অনুপস্থিতি কৌতূহলোদ্দীপক। বিষয়, ভাব, রচনাভঙ্গী, ভাষা-আদি সর্ব দিক হইতেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে প্রচলিত পদাবলী সাহিত্যের পার্থক্য সুস্পষ্ট।

উপাধির বৈচিত্র্য

অতএব অতি সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন জাগিল: শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস কে এবং চণ্ডীদাসের সংখ্যাই বা কত।

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন এই বিরাট্ সমস্যা-সত্ত্বেও চণ্ডীদাসের একত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহার ধারণা বালক বয়সের চপলতায় চণ্ডীদাস 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন' নামক গ্রাম্য ও অশ্লীল গ্রন্থটি রচনা করিয়াছিলেন। পরে পরিণত বয়সে উৎকৃষ্ট মধুররসযুক্ত পদাবলীসাহিত্য রচনা করেন। রুচি আর রসের পার্থক্যই যদি একমাত্র প্রশ্ন হইত, তবে সমস্যার এই সমাধান মানিয়া চলা যাইত। কিন্তু সমস্যা আরও অনেক গভীরে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আর পদাবলীর পার্থক্য-সম্বন্ধে ডক্টর শহীদুল্লাহ্ যে প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, তাহার অংশ-বিশেষ হইতে সমস্যার গভীরতা অনুভব করা যাইবে: "(১) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কোনও স্থানে দ্বিজ চণ্ডীদাস বা দীন চণ্ডীদাস ভনিতা নাই। (২) সর্বত্র 'গাএ' বা 'গাইল' আছে, কোথাও 'ভণে' 'কহে' প্রভৃতি ক্রিয়াপদ নাই। (৩) ভণিতা কখনও উপান্ত চরণে হয় না। (৪) বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীমতী রাধিকার পিতা-মাতার নাম সাগর ও পদুমা বলিয়াছেন। [পদাবলী-সাহিত্যে রাধিকার পিতা বৃষভানু এবং মাতা যমুনা।] (৫) বড়ু চণ্ডীদাস রাধার কোনও সখী বা শাশুড়ী-ননদের নাম উল্লেখ করেন নাই। [পদাবলী-সাহিত্যে 'জটিলা-কুটিলার' উল্লেখ লক্ষণীয়।] তিনি বড়াই ভিন্ন কোনও সখীকে সম্বোধন করেন নাই। [পদাবলীর ললিতা-বিশাখা স্মরণীয়] (৬) শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে রাধার নামান্তর চন্দ্রাবলী প্রতিনায়িকা নহেন। (৭) বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণের কোন সখার নাম উল্লেখ করেন নাই। [পদাবলী-সাহিত্যের শ্রীদাম-সুদাম-আদি প্রসিদ্ধ।] (৮) বড়ু চণ্ডীদাস সর্বত্র প্রেম-অর্থে 'নেহ' বা 'নেহা' ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে কেবল চারিস্থলে 'পীরিতি' শব্দের প্রয়োগ আছে, কিন্তু তাহার অর্থ প্রীতি বা সন্তোষ। (৯) বড়ু চণ্ডীদাস কুত্রাপি শ্রীমতী রাধিকার বিশেষণে 'বিনোদিনী' এবং শ্রীকৃষ্ণ-অর্থে 'শ্যাম' ব্যবহার করেন নাই। (১০) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধিকা গোয়ালিনী মাত্র, রাজকন্যা নহেন। (১১) অধিকন্তু বড়ু চণ্ডীদাসের নিকটে ব্রজবুলি অপরিচিত। এইগুলির কষ্টি পরীক্ষায় চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত অনেক পদ যে বড়ু চণ্ডীদাস ভিন্ন অন্য চণ্ডীদাসের, তাহাতে সন্দেহ থাকে না।" ডক্টর শহীদুল্লাহ্ অবশ্য এইখানেই তালিকা সমাপ্ত করিয়াছেন, কিন্তু আসলে ইহা এই স্থানেই শেষ হইবার নহে। প্রচলিত পদাবলী সাহিত্যের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পার্থক্য

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও পদাবলীর পার্থক্য

আরও কতকস্থলে সুস্পষ্ট ভাবেই ধরা পড়ে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ঐশ্বর্যের কাব্য এবং ইহাতে লৌকিক প্রেমের চিত্রই অঙ্কিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে পদাবলী সাহিত্য মধুর রসের কাব্য এবং ইহার প্রেম একান্তভাবেই আধ্যাত্মিক। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধিকা লক্ষীর অবতার কিন্তু পদাবলীর রাধিকা লক্ষীর মতই শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা এবং প্রিয়তমা প্রণয়িনী। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত নায়িকা—'অজ্ঞাতযৌবনমুগ্ধাবস্থা' হইতে প্রগল্‌ভাবস্থায় উপনীত হইয়াছেন। আর পদাবলীর রাধিকা কৃষ্ণসমর্পিতপ্রাণা। সর্বোপরি, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে রাধা-কৃষ্ণের সম্পর্কটি যেভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে গৃহীত হইয়াছিল, পদাবলীতে তাহার উৎকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া গেলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তাহা একান্তভাবে অনুপস্থিত। এই সকল তত্ত্ব এবং তথ্য-আলোচনায় একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব-কল্পনা অপরিহার্য হইয়া দাঁড়ায়।

একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইলে আরও কতকগুলি সমস্যার নিরসন ঘটে। দীর্ঘকাল যাবত একটি অভিমত প্রচলিত আছে যে, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল। চৈতন্য-পূর্ববর্তী বিদ্যাপতি ও চৈতন্যোত্তর চণ্ডীদাসের সাক্ষাৎকারকে এতাবৎকাল বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করা সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাসকে চৈতন্য-পূর্ববর্তী যুগে স্থাপন করিলে এই লোকশ্রুতিটির মর্যাদা সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হইতে পারে। বীরভুম জেলার নান্নুর এবং বাঁকুড়া জেলার ছাতনা উভয় গ্রামই চণ্ডীদাসের জন্মভূমি বলিয়া দাবী করিয়া থাকে। ইহাদের উভয়ের পক্ষেই প্রচুর পরিমাণ যুক্তি বর্তমান থাকায় কোন দাবীকেই নস্যাৎ করিয়া দেওয়া সম্ভবপর নহে। অথচ একই চণ্ডীদাসের পক্ষে দুই স্থানে জন্মগ্রহণ করাও সম্ভবপর নহে। চণ্ডীদাস দুইজন হইলে এই সমস্যার সমাধান হয়। নান্নুর এবং ছাতনা উভয়স্থলেই চণ্ডীদাস-কথিত বাসলী দেবী বর্তমান। কিন্তু বাসলী একস্থানে সরস্বতী-স্বরূপিনী ও অন্যত্র চণ্ডীরূপা। একই চণ্ডীদাস সরস্বতী ও চণ্ডীর পূজক ছিলেন, তাহা মানিতেও কষ্ট হয়। কিন্তু একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইলে আর কোন গোলযোগ থাকে না। উপর্যুক্ত এতগুলি প্রমাণ হাতে থাকিবার পরেও চণ্ডীদাসের একত্বে বিশ্বাসী থাকিলে সত্যেরই অবমাননা করা হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। তাই চণ্ডীদাসের সংখ্যা অন্তত একাধিক ছিল, তাহা মানিতেই হয়।

একাধিক চণ্ডীদাস

সমস্যার জটিলতা হ্রাস

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চণ্ডীদাস এবং পদাবলীর চণ্ডীদাসকে লইয়া যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহাদিগকে পৃথক্ ব্যক্তিরূপে নির্দেশ করিয়া সমস্যার সমাধান করা হইয়াছে বটে, কিন্তু পদাবলীর চণ্ডীদাস-সমস্যার নিরসন এখনও হয় নাই। বিভিন্ন পদাবলীর 'দীন, দ্বিজ, দীনক্ষীণ, আদি, তরুণী-রমণ'—ইত্যাদি উপাধিযুক্ত এবং নিরুপাধিক চণ্ডীদাসেরও প্রচুর পদ বর্তমান। সমস্যা—পদাবলী-সাহিত্যের এই সমস্ত পদই কি কোন একজন চণ্ডীদাসের রচনা?—বলা বাহুল্য, ইহার উত্তরে নানাপ্রকার অভিমতের সৃষ্টি হইয়াছে। ডঃ সুকুমার সেন বড়ু চণ্ডীদাস-ব্যতীত অপর কোন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে সম্মত নহেন। তিনি মনে করেন যে, চণ্ডীদাসের কবি-খ্যাতির সুযোগ লইয়া অনেক অক্ষম কবিও ভণিতায় চণ্ডীদাসের নাম যোগ করিয়াছেন; অনেক সময় কীর্তনীয়ারাও এই অপকর্মে সহায়তা করিয়াছেন। "চণ্ডীদাস'-ফ্যাশন প্রবর্তিত হওয়ায় শুধু যে চণ্ডীদাস-ভণিতায় নূতন পদ রচিত হইতে লাগিল এমন নহে, পুরাতন কবিদিগের উৎকৃষ্ট পদগুলি চণ্ডীদাস ভণিতায় রূপান্তরিত হইতে লাগিল। ইহার জন্য দায়ী অবশ্য কীর্তনীয়ারাই বেশী। এই কারণেই নরহরি সরকার, লোচনদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাস, নিত্যানন্দ দাস, রামগোপাল দাস ইত্যাদি কবির ভাল ভাল পদ পরবর্তী কালে পুঁথিতে ও কীর্তনীয়ার মুখে চণ্ডীদাসের ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে।' ডঃ সেন চণ্ডীদাস-বিষয়ে যে চরম অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা অবশ্য সর্বজনস্বীকৃত নহে।

পদাবলীর চণ্ডীদাস কয়জন?

অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু 'দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী' সঙ্কলন করিতে গিয়া চণ্ডীদাস-সমস্যার উপর অনেকখানি আলোকপাত করিয়াছেন। তিনি চৈতন্যোত্তর যুগে দীন চণ্ডীদাসকেই স্বীকার করিতে চাহেন। তাঁহার সম্পাদিত গ্রন্থটিতে চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত যে সমস্ত পদ বর্তমান, প্রকৃত পক্ষে তাহাদের সবগুলিই চণ্ডীদাস-রচিত নহে। ভিন্ন সূত্রে ইহাদের কোন কোনটির পৃথক রচয়িতার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। অতএব গ্রন্থোক্ত পদগুলির প্রামাণিকতা সন্দেহাতীত নহে। মণীন্দ্রবাবু দ্বিজ-উপাধিধারী পৃথক্ কোন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।

দীন চণ্ডীদাস

ডঃ শহীদুল্লাহ্ কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাস ছাড়াও আরও দুইজন চণ্ডীদাসের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তিনি মনে করেন, 'দীন চণ্ডীদাস একটি ধারাবাহিক

কৃষ্ণযাত্রা রচনা করিয়াছেন, যেমন বড়ু চণ্ডীদাস একটি ধারাবাহিক কৃষ্ণধামালী রচনা করিয়াছেন। কিন্তু দ্বিজ চণ্ডীদাস বিক্ষিপ্ত রচনা ভিন্ন কোন ধারাবাহিক কৃষ্ণলীলার বই রচনা করেন নাই। দীন-দ্বিজ চণ্ডীদাসের মধ্যে এই পার্থক্য তাহাদের রচিত পদগুলি সম্বন্ধে একটি দিগ্‌দর্শনীর কাজ করিবে।' ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'দীন চণ্ডীদাস' ও 'দ্বিজ চণ্ডীদাস' নামাঙ্কিত পদগুলির পার্থক্য-সম্বন্ধে সচেতন থাকিয়াও স্বীকৃতি দিয়াছেন শুধু দীন চণ্ডীদাসকেই। তাঁহার মতে দ্বিজ চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত শ্রেষ্ঠ পদগুলি হয়তো দীন চণ্ডীদাস দ্বারাই রচিত।

চণ্ডীদাসের একত্ব

অধ্যাপক বিমানবিহারী মজুমদার চণ্ডীদাসের বহুত্ব-বিষয়ে নিঃসংশয়। তিনি মনে করেন যে চণ্ডীদাস-উপাধিধারী বহু কবিই ভিন্ন ভিন্ন কালে বর্তমান ছিলেন। তাঁহার মতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস ছিলেন শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক। তাহারও পূর্বে ছিলেন প্রকৃত চণ্ডীদাস—এই চণ্ডীদাসের পদগুলি চিনিবার কতকগুলি লক্ষণও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। এই উপায়ে তিনি স্বয়ং শতাধিক পদও বাছাই করিয়াছেন। বৈষ্ণবপদাবলী-সম্বন্ধে যাহারা আলোচনা করিয়া থাকেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই আবার নূতন নূতন অভিমত পোষণ করিয়া থাকেন। অতএব এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত যে মতান্তর বর্তমান, তাহার সমাধান সহজ নহে বলিয়াই মনে হয়। চণ্ডীদাস-সম্বন্ধে আরও নূতন প্রামাণিক সূত্র আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত চণ্ডীদাস-সমস্যা সমস্যাই থাকিয়া যাইবে,—পাঠককে শুধু চণ্ডীদাসের পদের মধুর রস আস্বাদন করিয়াই তৃপ্ত থাকিতে হইবে। [পদাবলীর চণ্ডীদাস-সমস্যা-সম্বন্ধে 'চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলী-সাহিত্য'-শীর্ষক আলোচনা যথাস্থানে দ্রষ্টব্য।]

চণ্ডীদাসের বহুত্ব

৩. ঃ বিদ্যাপতি

জয়দেব গোস্বামী সংস্কৃত ভাষায় বৈষ্ণবপদাবলী-সাহিত্যের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, মৈথিলী কবি 'অভিনব-জয়দেব' বিদ্যাপতি ব্রজবুলিভাষায় সেই পদাবলী সাহিত্যকে পূর্ণতা দান করিয়াছিলেন। অবশ্য আদৌ রামগতি ন্যায়রত্ন, সারদাচরণ মিত্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি মনীষীদের ধারণা ছিল যে বিদ্যাপতি ছিলেন বাঙালী কবি,—কাব্য রচনা করিয়াছেন ব্রজবুলি

ভাষায়। পরে সর্বপ্রথম জন্ বীম্‌স্ প্রকাশ করিলেন যে, বিদ্যাপতি মিথিলার কবি; রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বীমস্-এর অভিমত সমর্থন করিলেন। স্যার জর্জ গ্রীয়ার্সনই সর্বপ্রথম মিথিলার ভিক্ষুকদের মুখ হইতে শুনিয়া বিদ্যাপতির পদসংগ্রহ প্রকাশ করেন।

বিদ্যাপতি-চর্চা

ক্রমে বিদ্যাপতি-সম্বন্ধে বহু তথ্য প্রকাশ পাইল। দেখা গেল, বাঙলাদেশে ব্রজবুলি ভাষার পদকর্তারূপে বিদ্যাপতি পরিচিত হইলেও স্বদেশ মিথিলায় তিনি বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিতরূপেই অধিকতর পরিচিত। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর কোন এক সময় জন্মগ্রহণ করিয়া বিদ্যাপতি ঠাকুর পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কালে মিথিলার সভাপতি রূপে বর্তমান ছিলেন, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার বিভিন্ন রচনায় তিনি মিথিলার কয়েকজন রাজা ও রাণীর পৃষ্ঠপোষকতার কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছিলেন। ১৪১২ খ্রীঃ রাজা শিবসিংহ বিদ্যাপতিকে বিস্‌পী গ্রাম দান করিয়াছেন,—এইরূপ ঘোষণাসূচক একটি তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছিল, পরে জানা গেল দানপত্রখানি জাল। ইহা ছাড়াও এখন ১৪১২ খ্রীঃ হইতে ১৪৬০ খ্রীঃ পর্যন্ত বিদ্যাপতির জীবৎকালের কতকগুলি লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায়। বিদ্যাপতির পিতা গণপতিঠাকুর রাজা গণেশ্বরের সুহৃদ ছিলেন। তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই বংশ ছিল পণ্ডিতের বংশ।

বিদ্যাপতির পরিচয়

বিদ্যাপতি তাঁহার বিভিন্নগ্রন্থে যে সকল নরপতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে আছেন কীর্তিসিংহ, রাজা দেবসিংহ, রাজা শিবসিংহ, রাজা পদ্মসিংহ, রাণী বিশ্বাসদেবী, রাজা নরসিংহদেব, রাণী ধীরমতী। রাজা শিবসিংহের পত্নী রাণী লছমীদেবীর সঙ্গে বিদ্যাপতির অন্তরঙ্গতা-সম্পর্কে যে সরস কাহিনী প্রচার করা হইয়া থাকে, তাহা ভিত্তিহীন বলিয়াই মনে হয়। অনুমান, বৈষ্ণব সহজিয়া সাধকগণই এই অপ-রটনার জন্য দায়ী।

বিদ্যাপতি তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনে বহু গ্রন্থই রচনা করিয়াছেন। এই রচনাবলী হইতে তাঁহার বহু ভাষাজ্ঞানের এবং অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন বিষয়ে বিদ্যাপতি এত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন যে, তৎকালে ইহা এক বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়াই পরিগণিত হইত। তাঁহার রচিত 'বিভাগসার ও দানবাক্যাবলী' স্মৃতিশাস্ত্র-সম্বন্ধীয় এক বিচারগ্রন্থ; 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী, গঙ্গাবাক্যাবলী ও বর্ষক্রিয়া'য় বিভিন্ন পূজার্চনা-পদ্ধতি-সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে; তাহার রচিত ইতিহাসগ্রন্থের প্রকৃষ্ট

নিদর্শন 'কীর্তিলতা ও কীর্তিপতাকা'; 'ভূপরিক্রমা' নামক গ্রন্থে তীর্থকাহিনী-চ্ছলে বিদ্যাপতি আপনার ভৌগোলিক জ্ঞানেরই পরিচয় দিয়াছেন ; তাঁহার 'পুরুষপরীক্ষা' গ্রন্থে কথাসাহিত্যের গুণাবলী বর্তমান। এইগুলি ছাড়াও তিনি অলঙ্কার-শাস্ত্র-সম্বন্ধীয় 'লিখনাবলী' নামক এক গ্রন্থ রচনা করেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যথার্থই বলিয়াছেন, '······যে গানে তাঁহার খ্যাতি, যে গানে তাঁহার প্রতিপত্তি, যে গানে তিনি জগৎ মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন তিনি যদি তাহার একটি গানও না লিখিতেন, কেবল পণ্ডিতের মত স্মৃতি, পুরাণ, তীর্থ ও গেজেটিয়ার প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহা হইলেও বলিতে হইত, তাঁহার প্রতিভা উজ্জ্বল ও সর্বতোমুখী'। বস্তুত স্বদেশে বিদ্যাপতি আপনার পাণ্ডিত্যের জন্যই প্রখ্যাত।

বিদ্যাপতির গ্রন্থাবলী

বাঙলাদেশে বিদ্যাপতির খ্যাতি ব্রজবুলি ভাষায় রচিত পদাবলীর জন্য। কিন্তু তিনি যে ব্রজবুলি ছাড়াও অন্তত তিনটি ভাষায় পারঙ্গমত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। তাঁহার 'কীর্তিলতা' ও 'কীর্তিপতাকা' অবহট্ট ভাষায় রচিত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। অবহট্ট ভাষায় রচনার কারণ বর্ণনা-প্রসঙ্গে তিনি যে যুক্তিটি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা আধুনিক কালের এই ভাষা-সমস্যার দিনে দিগ্‌দর্শনের কাজ করিতে পারে :

অবহট্টভাষায় বিদ্যাপতি

সক্কয়বানী বুহঅন ভাবই।
পাঁউঅ-রসকো মম্ম না পাবই ॥
দেসিল বঅনা সবসন মিঠ্‌ঠা।
তেঁ তইসন জম্পঞো অবহঠ্‌ঠা ॥

—বুধজন সংস্কৃতবাণীতে ভাবনা করেন, (তাঁহারা) প্রাকৃতরসের মর্ম পান না। দেশী বচন সর্বাপেক্ষা মধুর, তাই ঐরূপ অবহট্ট ভাষায় লিখিতেছি।

বিদ্যাপতি স্মৃতি ও পূজার্চনাদি-সম্বন্ধীয় গ্রন্থে এবং 'পুরুষপরীক্ষা' নামক গ্রন্থে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত হরগৌরী-বিষয়ক কতকগুলি পদ ও সামান্য সংখ্যক রাধাকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় পদও তিনি আপন মাতৃভাষা মৈথিলীতে রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

সংস্কৃত ভাষায় বিদ্যাপতি

বিদ্যাপতির রচনা-সমূহে বহুদেবতাসম্বন্ধীয় প্রশস্তি অতিশয় সুলভ বলিয়াই

তাঁহার ব্যক্তিগত ধর্মমত-সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিয়াছে। বাঙলাদেশের ভক্ত বৈষ্ণবদের নিকট বিদ্যাপতি বৈষ্ণবচূড়ামণি-রূপেই প্রসিদ্ধ। স্বদেশে তিনি শৈবরূপে পরিচিত। তিনি স্বগ্রামে এক শিবমন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়াও জানা যায়। আবার দুর্গা, গঙ্গা, গৌরী প্রভৃতি শক্তি দেবীদের সম্বন্ধেও তিনি একাধিক গ্রন্থ ও বহু পদ রচনা করিয়াছেন। এই সমস্ত কারণে তাঁহার ধর্মমত-সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত উক্তি করা সহজ নহে। মনে হয় এই বিষয়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিমতই সর্বাধিক যুক্তিপূর্ণ। তিনি মনে করেন যে সাধারণ স্মার্তব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মতই তিনিও ছিলেন পঞ্চোপাসক অর্থাৎ গণেশ, সূর্য, শিব, বিষ্ণু ও দুর্গা—সকলকেই সমান ভাবে পূজা করিতেন।

বিদ্যাপতির ধর্মমত

বিদ্যাপতি বহু গ্রন্থপ্রণেতা হইলেও যেহেতু বাঙলাদেশে তাঁহার ব্রজবুলি ভাষায় রচিত পদাবলীই প্রচলিত এবং যেহেতু ব্রজবুলি ভারতের কোন অঞ্চল বিশেষের নিজস্ব ভাষা নহে, এই কারণে বাঙলা-সাহিত্যের ইতিহাসে বিদ্যাপতির পদাবলীগুলিই মাত্র আলোচিত হইবে। মৈথিলী কবি বিদ্যাপতি কিভাবে বাঙলাদেশের হৃদয় অধিকার করিলেন, তৎ-সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের মনে একটি জিজ্ঞাসার সৃষ্টি হইয়া থাকে। অনুমান হয়, বাঙলাদেশে মুসলমান-অধিকার বিস্তৃত হইবার বহুকাল পর পর্যন্ত মিথিলা স্বাধীন হিন্দুরাজ্যরূপেই বর্তমান ছিল। তাই স্বধর্মাশ্রয়ী উচ্চবর্ণের হিন্দুদের অনেকেই ঘনিষ্ঠভাবে মিথিলার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেন। তাহা ছাড়া মিথিলা সমসাময়িক যুগে ন্যায়শাস্ত্র-চর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল বলিয়া বহু বাঙালী মিথিলায় ছাত্রজীবন অতিবাহিত করিতেন। তাহাদের মুখে-মুখেও বিদ্যাপতির পদগুলি বাঙলাদেশে আসিয়া থাকিতে পারে। বিদ্যাপতির অব্যবহিত পরবর্তীকালেই মহাপ্রভু চৈতন্যদেব বিদ্যাপতির মধুর পদ আস্বাদন করিতেন,—বৈষ্ণবসমাজে বিদ্যাপতির প্রচারের ইহাও অন্যতম কারণ। সর্বোপরি দীর্ঘকাল বাঙলাদেশ ও মিথিলা একই সাম্রাজ্যের অধীন ছিল,—অতএব তাহাদের মধ্যে একটা সহজ ঐক্যবোধের সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নহে।

মিথিলার সঙ্গে বাঙলার যোগ

বিদ্যাপতির রচিত পদের ভাষা ব্রজবুলি। তিনি মৈথিলীভাষাতেও কিছু কিছু পদ রচনা করিয়াছিলেন,—এইরূপ কিছু পদ স্যর জর্জ গ্রীয়ার্সন আবিষ্কার ও প্রকাশ করিয়াছেন। এক সময়ে কেহ কেহ ধারণা করিতেন যে, ব্রজবুলি ভাষায় বিদ্যাপতির যে সকল পদ প্রচলিত আছে, তাহা মূলে

মৈথিল ভাষাতেই রচিত হইয়াছিল। এই বিষয়ে নগেন্দ্র গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন, 'বিদ্যাপতি খাঁটি মৈথিলিতেই পদগুলি রচনা করিয়াছিলেন। বাঙলাদেশে ঐগুলি বিকৃতরূপ ধারণ করিয়া বাঙলাভাষার কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। ঐ বিকৃতরূপই ব্রজবুলি নামে পদ-রচনার ভাষারূপে চলিয়াছে।' ডঃ দীনেশ সেনও মোটামুটিভাবে এই অভিমত সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু এই অভিমত গ্রহণ করায় বিপদ আছে; কারণ, বিদ্যাপতির সব পদই যদি মৈথিলীভাষায় রচিত হইত, তবে মিথিলায় অন্তত ঐ সমস্ত পদের মূলরূপ পাওয়া যাইত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে স্যর জর্জ গ্রীয়ার্সন বহু চেষ্টায় যে স্বল্প কয়টি পদ সংগ্রহ করিয়াছেন, গুণের বিচারে এইগুলি ব্রজবুলি পদগুলি অপেক্ষা নিকৃষ্ট। বিকৃত পদগুলিই মূল হইতে উৎকর্ষ লাভ করিবে,—এই মত অশ্রদ্ধেয়। যদি লোকমুখেই কবিতাগুলি বিকৃত হইত, তবে বিভিন্ন কবিতার রূপে কোন সাদৃশ্য ও সঙ্গতি থাকিত না। কিন্তু বাস্তবে অন্যরূপই দেখা যায়। পদাবলীগুলি হইতে যে ব্রজবুলির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার মূলে সুষ্ঠু ব্যাকরণ-সঙ্গত কাঠামো বর্তমান। কোন বিকৃত ভাষারই এইরূপ ঘটনা ঘটিতে পারে না। বাঙলা-দেশের বাহিরে উড়িষ্যা এবং আসামেও ব্রজবুলি ভাষায় যে সকল পদ রচিত হইয়াছিল, তাহাদের কাঠামোও বাঙলাদেশের ব্রজবুলি হইতে অভিন্ন। অতএব, মৈথিলভাষা বিকৃত হইয়া ব্রজবুলি ভাষায় পরিণত হইয়াছে, এইরূপ অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়। এই কারণে ব্রজবুলিকে স্বাধীন ভাবে উৎপন্ন একটি ভাষা বলিয়াই গ্রহণ করিতে হয়। অবশ্য প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ব্রজবুলি কখনও ভারতের কোন অঞ্চলের কথ্য ভাষা ছিল না,—সাহিত্যিক ভাষারূপেই ইহার সৃষ্টি ও পুষ্টি। কেহ কেহ অনুমান করেন যে ব্রজের বুলি বলিয়াই ইহার নাম ব্রজবুলি। কিন্তু ব্রজের বুলি বা 'ব্রজভাষা' ব্রজবুলি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এক ভাষা। বস্তুত 'ব্রজবুলি' কথাটিও খুব প্রাচীন নয়, অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেই ইহার উদ্ভব হয়। সম্ভবত উনিশ শতকের পূর্বে কথাটির প্রচলন ছিল না। ব্রজধামের কাহিনী (রাধা-কৃষ্ণ কাহিনী) এই ভাষায় রচিত হইয়াছিল বলিয়াই ইহার নাম ব্রজবুলি,—এই অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত না হইতে পারে। ডঃ সুকুমার সেন প্রথমে অনুমান করিয়াছিলেন, 'এই আধা-বাঙ্গালা আধা-মৈথিল রাধাকৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক পদাবলীর ভাষা ব্রজবুলি নামে পরিচিত।' কিন্তু মণীন্দ্র বসুই প্রথম প্রমাণ করেন, যে বাঙলাভাষা কিংবা মৈথিলভাষার সঙ্গে জন্মসূত্রে

ব্রজবুলি

ব্রজবুলি-ভাষার কোন সম্পর্ক নাই। তাঁহার মতে কৃত্রিম সাহিত্য ভাষা 'অবহট্ট' হইতেই এই সাহিত্য-ভাষা ব্রজবুলির উদ্ভব। ডঃ সুকুমার সেনও পরে এই অভিমত সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'ব্রজবুলির বীজ হইতেছে 'লৌকিক' বা অর্বাচীন অবহট্‌ঠ। ...ব্রজবুলির বীজ লৌকিকের। ইহার অঙ্কুরোদ্‌গম হয় মিথিলায় এবং প্রতিরোপ হয় বাঙ্গালায়।' বাঙলাদেশে ব্রজবুলিভাষায় রচিত যে পদটিকে প্রাচীনতম বলিয়া অনুমান করা হয়, তাহার ভণিতায় হোসেন শাহের উল্লেখ পাওয়া যায়। অতএব ইহা ১৫০০ খ্রীঃ-র কাছাকাছি সময়ে রচিত হইয়াছিল, অনুমান করা চলে। প্রায় একই সময়ে উড়িষ্যাতেও রায় রামানন্দ 'পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল' নামক চৈতন্য-আস্বাদিত পদটি রচনা করেন। ইহার কিছুকাল পর আসামেও শঙ্করদেব স্বাধীনভাবে ব্রজবুলিতে পদ রচনা করেন। এই ধারা বাঙলাদেশে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সমানবেগে চলিতেছিল। এমন কি আধুনিক যুগেও রবীন্দ্রনাথ ভানুসিংহ-ছদ্মনামে ব্রজবুলি ভাষায় কয়েকটি সার্থক পদ রচনা করিয়াছেন।

বিদ্যাপতি ব্রজবুলি-ভাষার প্রথম কবি বলিয়াই হউক, অথবা তাঁহার অসাধারণ খ্যাতির জন্যই হউক, ব্রজবুলি ভাষায় রচিত পদমাত্রই যেন বিদ্যাপতির,—এইরূপ একটা মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। তাই কাব্য-বিশারদের সংস্করণে বিদ্যাপতির পদের সংখ্যা দুই শতের কম হওয়া সত্ত্বেও নগেন্দ্রনাথের সংস্করণে তাহা প্রায় সহস্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই পদগুলির অধিকাংশই যে কোন-না-কোন বাঙালী কবির রচনা, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। উদাহরণ-স্বরূপ বিদ্যাপতির নামে প্রচারিত কয়েকটি প্রসিদ্ধ পদের কথা উল্লেখ করা চলে। সপ্তদশ শতকের শেষে রচিত 'অষ্টরস ব্যাখ্যা'য় 'এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর' কবিতাটি শেখরের (কবি শেখর) ভণিতায় পাওয়া যায়। অথচ ইহা বিদ্যাপতির নামেই চলিতেছে। 'রসকদম্ব'-প্রণেতা কবিবল্লভ-রচিত 'কী পুছসি অনুভব মোয়' কবিতাটিও বিদ্যাপতির নামেই প্রচারিত হইয়া থাকে। 'ক্ষণে ক্ষণে নয়ন কোন অনুসরই' নামক প্রসিদ্ধ পদটির রচয়িতাও বিদ্যাপতি নহেন, বিদ্যাবল্লভ নামক কোন কবি। এই ভাবে দেখানো যাইতে পারে যে, কবিকণ্ঠহার, নৃপ-বৈদ্যনাথ, চম্পতি, ভূপতি প্রভৃতি বহু বাঙালী কবিরই ব্রজবুলি-ভাষায় রচিত বহু কবিতা বিদ্যাপতির নামে প্রচার লাভ করিয়াছে। সতীশচন্দ্র রায় 'বিদ্যাপতি-বিচার' নামক গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, বিদ্যাপতির নামে প্রচারিত অন্তত ২৬টি পদ আসলে বাঙালী-কবি রায়-শেখর-

বিদ্যাপতির খ্যাতি-বিস্তৃতি

রচিত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে যে বাঙলাদেশেও বিদ্যাপতি-উপাধি-ধারী একজন কবি পরবর্তী কালে ব্রজবুলি-ভাষায় বহু পদ রচনা করিয়া-ছিলেন। ইনি শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জন অথবা ছোটবিদ্যাপতি। ইঁহার রচিত বহু পদও বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত আছে। ফলত, আদি বা মৈথিলকবি বিদ্যাপতির পদগুলি বাছাই করা দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিদ্যাপতি-বাহুল্যের প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ কেহ কেহ বিদ্যাপতি নামক কোন কবির অস্তিত্বও স্বীকার করিতে রাজি নহেন। কিন্তু ইহাও একপ্রকার চরম অভিমত, কারণ, মহাপ্রভু চৈতন্যদেব যে বিদ্যাপতির পদ আস্বাদ করিতেন, কবিরাজ গোস্বামীর এই সাক্ষ্যকে কিছুতেই উপেক্ষা করা চলে না। অতএব সিদ্ধান্ত করা চলে, মৈথিলকবি বিদ্যাপতিই আদি কবি; বাঙলাদেশেও বিদ্যাপতি উপাধিধারী অপর একজন পরবর্তী কালের বিদ্যাপতি ছিলেন; সংগ্রহকর্তা ও কীর্তনীয়াদের দৌলতে বিভিন্ন কবিদের ব্রজবুলি-ভাষায় রচিত পদও বিদ্যাপতির নামে চলিয়াছে; কোন কোন কবি আপনার রচনাকে অমর করিয়া রাখিবার ইচ্ছায় ভণিতায় বিদ্যাপতির নাম ব্যবহার করিয়া থাকিতেও পারেন।

বিদ্যাপতির বহুত্ব

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব বিদ্যাপতির পদ আস্বাদন করিতেন—বিদ্যাপতির কবি-প্রতিভার ইহা এক অখণ্ডনীয় প্রমাণ: সংস্কৃত ভাষায় হইলেও বাঙালী কবি জয়দেবই সর্বপ্রথম পদ রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পদ কান্ত-কোমল হওয়া সত্ত্বেও মনে হয় উত্তরকালে বিদ্যাপতিই অধিকতর অনুকরণ-যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেন। জয়দেব ও বিদ্যাপতি উভয়ের রচনায় কয়েকটি সাধারণ ধর্ম বর্তমান—উভয়েই দেহবিলাস এবং সম্ভোগ-বর্ণনার কবি। সম্ভবত উভয়েই রাজসভার কবি ছিলেন বলিয়াই তাহাদের রচনায় আধ্যাত্মিকতা আরোপ করিতে হয়, আসলে তাহা দেহাসক্তিই বটে। তবে ইহাও সত্য যে, আসলে সৌন্দর্য-প্রীতির জন্যই তাঁহারা দেহ-বর্ণনার উপর এত গুরুত্ব দান করিযাছিলেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাই রূপাসক্তি ভোগাসক্তিকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। বড়ু চণ্ডীদাসের রচনার সহিত তুলনা করিলেই বোঝা যাইবে যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের তুলনায় বিদ্যাপতি-জয়দেবের রচনা কত মার্জিত, অগ্রাম্য ও শ্লীলতাপূর্ণ। বস্তুত, সম্ভোগবর্ণনাও তাঁহাদের রচনায় এক কল্পজগতের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিদ্যাপতি ও জয়দেব এই পর্যন্তই সদৃশ,—ইহার পরই মনে হয় বিদ্যাপতি জয়দেবকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। জয়দেব রাধাকৃষ্ণের লীলার অংশমাত্র, তাহাদের যৌবন-

বিলাসের কয়েকটি দিনের চিত্রমাত্র অঙ্কন করিয়াছেন, আর বিদ্যাপতির রচনায় রাধাকৃষ্ণের লীলাবৈচিত্র্য পরিপূর্ণভাবে রূপলাভ করিয়াছে। প্রেমোন্মেষ হইতে প্রেমের চরম পরিণতি পর্যন্ত স্তরে স্তরে বিভিন্ন অবস্থা-বর্ণনাতেও বিদ্যাপতি অনুপম কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। বিদ্যাপতি-বর্ণিত প্রেম অতি জটিল এবং মনস্তত্ত্ব-সম্মত। তিনি ইহাকে কেবল একটি জৈবিক বৃত্তিমাত্র বলিয়া মনে করেন নাই, তাই তাঁহার অঙ্কিত প্রেমের সহিত জড়াইয়া আছে লজ্জা, ভয়, ঈর্ষ্যা, ছলনা, উদ্বেগ, হর্ষ-আদি বিভিন্ন মানসিক বৃত্তি।

বিদ্যাপতির রচনা-বৈশিষ্ট ও কাব্য-বিচার

"বিদ্যাপতির রাধা অল্পে অল্পে মুকুলিত বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। সৌন্দর্য ঢল ঢল করিতেছে। শ্যামের সহিত দেখা হয় এবং চারিদিকে যৌবনের কম্পন হিল্লোলিত হইয়া উঠে। খানিকটা হাসি, খানিকটা ছলনা, খানিকটা আড়চক্ষে দৃষ্টি। ... আপনাকে আধখানা প্রকাশ এবং আধখানা গোপন, কেবল উদ্দাম বাতাসের একটা আন্দোলনে অমনি খানিকটা উন্মেষিত হইয়া পড়ে।" (রবীন্দ্রনাথ)। বিদ্যাপতি এইভাবে তুলিকায় বিচিত্র বর্ণাধার হইতে এক একবার রঙ্ লইয়া একটু একটু ছোঁয়াইতেছেন, দেখিতেছেন, আবার ছোঁয়াইতেছেন এবং এইভাবেই পূর্ণতা দান করিতেছেন। এইজন্যই "ছন্দ, সঙ্গীত এবং বিচিত্র রঙে বিদ্যাপতির পদ এমন পরিপূর্ণ, এইজন্য তাহাতে সৌন্দর্য-সুখ-সম্ভোগের এমন তরঙ্গলীলা।" (তদেব) বিদ্যাপতি প্রধানত সম্ভোগরসের কবি, তাঁহার কাব্যে প্রেমের যে জীবন্ত রূপ ধরা পড়িয়াছে, তাহা ব্যক্তিসত্তার ঊর্ধ্বে সার্বজনীন অনুভূতি-লোকে উন্নীত হইবার দাবি রাখে বলিয়াই বিদ্যাপতির প্রেম একান্তভাবে বৈষ্ণবোচিত না হওয়াসত্ত্বেও বৈষ্ণব-জনের অন্তরের বস্তু। বিদ্যাপতি রাধিকার বিচিত্র অনুভূতির কথা প্রকাশ করিলেও বিরহ-বেদনা এবং মিলনোল্লাস-বর্ণনাতেই যেন আপনাকেও অতিক্রম করিয়াছেন। গীতিকাব্যের প্রাণরূপে পরিচিত ভাবাবেশ এইখানেই সর্বাধিক গভীর। বিদ্যাপতির কাব্যে এই ভাবসমাবেশের জন্যই মহাপ্রভু অকৃপণ ভাবে তাহা হইতে রস-উপলব্ধির সুযোগ পাইয়াছিলেন। পরিশেষে আর একটি কথা না বলিলে বিদ্যাপতির প্রতি অবিচার করা হইবে। প্রধানত রসসম্ভোগের কবি বলিয়া পরিচিত হইলেও বিদ্যাপতি যে শান্তরসাশ্রিত প্রার্থনাপদাবলী রচনা করিয়াছিলেন, সাহিত্যকীর্তিহিসাবে এবং সাধক-ভাবুক-চিত্তে অপার্থিব রসের উদ্বোধনে ইহাদের স্থানও অতি উচ্চে। বিদ্যাপতির রচনার সর্বত্র ঐশ্বর্যের প্রকাশ ঘটিলেও অন্তত প্রার্থনার কবিতাগুলিতে যে

আত্মদৈন্য, আত্মনিবেদন এবং ঈশ্বরভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা একমাত্র চণ্ডীদাসের পদাবলীর সহিতই তুলনীয়। রূপের আরাধনা করিতে করিতে একসময় বিদ্যাপতি অরূপের সন্ধান লাভ করিলেন,—রূপরসিক কবি সাধকচূড়ামণি-পদে উন্নীত হইলেন।

৪. কৃত্তিবাস ঃ রামায়ণ

জাতির জীবনে যখন জাগরণ ঘটে, তখন জাতি আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ওঠে। বাঙলায় তুর্কী-আক্রমণের ফলে যে যুগান্তরকালে দেখা দিয়াছিল, সুদীর্ঘকাল পর তাহার অবসান ঘটিল,—বাঙলায় নবজাগরণ দেখা দিল। সদ্য-জাগরিত জাতির তখন নূতন উদ্যম, সম্মুখে নূতন আশা। একটা কিছু করিবার প্রেরণা তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। কিন্তু তখনও বাঙলা ভাষা আড়ষ্টতা হইতে মুক্তি লাভ করে নাই। নূতন কিছু করিয়া ওঠার পক্ষে এই ভাষাই প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু ইহাতে নিরাশ হইবারও হেতু নাই। আমাদের পূর্বপুরুষগণ সংস্কৃত সাহিত্যে যে অমূল্য ভাণ্ডার রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে নূতনভাবে আহরণ করিবার মত রত্নের অভাব নাই। অতএব, অতি সঙ্গত কারণেই, যুগান্তরকালের অবসানে সংস্কৃত সাহিত্যকেই অনুবাদ করিবার ঝোঁক প্রবল হইয়া উঠিল। সঞ্চয় সামান্য অথচ আশা অপরিমিত, এই অবস্থায় অনুবাদ-সাহিত্য-রচনায় উভয়কূল রক্ষিত হইল। এইভাবেই বাঙলার প্রথম অনুবাদ-সাহিত্য কবি কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ-পাঁচালী' রচিত হইল।

অনুবাদ সাহিত্য

সংস্কৃত সাহিত্যে কবিগুরু বাল্মীকিকেই 'আদিকবি' বলিয়া অভিহিত করা হয়। বাঙলা-সাহিত্যে প্রকৃতপক্ষে রামায়ণ-অনুবাদক কৃত্তিবাসই 'আদিকবি' অভিধার যোগ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কৃত্তিবাস-সম্বন্ধে নিশ্চিত ভাবে কোন কিছু বলা সম্ভব নহে।

কৃত্তিবাস আদি-মধ্য-যুগের কবি এবং তিনি চৈতন্যদেবের পূর্বেই বর্তমান ছিলেন, এই অভিমতই গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাকে সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিবার পক্ষে একটি প্রবল বাধা এই যে, চৈতন্যজীবনীকারদের মতে চৈতন্যদেব জয়দেব-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস-

আদ্রির কাব্যপাঠে আনন্দ লাভ করিতেন অথচ এই প্রসঙ্গে কৃত্তিবাসের মত কবির অথবা তাঁহার কাব্যের অনুল্লেখ তাৎপর্যময়।

কৃত্তিবাসের আত্মজীবনী

নানাভাবে ইহার ব্যাখ্যাদানের চেষ্টা হওয়া সত্ত্বেও কোন ব্যাখ্যাই যথার্থ সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। তবে চৈতন্য-জীবনীকার জয়ানন্দ তাঁহার 'চৈতন্য-মঙ্গল' কাব্যে কৃত্তিবাস এবং তাহার কাব্যের উল্লেখ করিয়াছেন। বৃন্দাবন দাসও স্বীকার করিয়াছেন যে, তৎকালে রামায়ণের প্রভূত প্রচলন ছিল। যাহা হউক, সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত কৃত্তিবাস-সম্বন্ধে ইহার অধিক কিছু জানিবার উপায় ছিল না। মাত্র বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু এবং দীনেশ বাবু বলেন যে হারাধন দত্ত ভক্তনিধি নামক জনৈক ভদ্রলোক কৃত্তিবাসী রামায়ণের ১৪৩২ শকাব্দের (১৫০০ খ্রীঃ) পাণ্ডুলিপি হইতে কৃত্তিবাসের আত্মজীবনীমূলক কিছুটা রচনা উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু পুঁথিখানির পরবর্তীকালে আর কোন সন্ধান পাওয়া না যাওয়ায় উক্ত আত্মজীবনীমূলক রচনাটির প্রামাণিকতা স্বীকৃত হয় নাই। তারপর, যখন ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী ভিন্নসূত্রে প্রাপ্ত কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে উক্ত অংশটি প্রকাশ করিলেন, তখনই মনীষীদের ঐ দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। অতঃপর কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে আত্মজীবনীর আরও কিছু অংশ পাওয়া গেল। সাধারণভাবে পণ্ডিতমহলে এই আত্মজীবনী প্রামাণিক বলিয়া স্বীকৃত হইলেও ডঃ সুকুমার সেন এখনও সংশয়ান্বিত। তাঁহার ধারণা, ইহাতে কুলজী-বিশারদদেরও কিছুটা হাত থাকিতে পারে। ডঃ মণীন্দ্রমোহন বসুই এই আত্মজীবনী-সম্বন্ধে সর্বাধিক কঠোর মন্তব্য জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাঁহার মতে "এই তথাকথিত আত্মবিবরণী অবিশ্বাস্য এবং জাল। কৃত্তিবাসের বহু পরবর্তীকালে কেহ রচনা করিয়া ইহা কৃত্তিবাসের নামে চালাইয়াছেন।" —যাবৎ অপর কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ হস্তগত না হয়, তাবৎ মণীন্দ্রবাবুর এই চরম অভিমতকেও মানিয়া লওয়া সহজ নহে। অতএব কৃত্তিবাসের জীবনীর নিশ্চিততর উপকরণ লাভ না করা পর্যন্ত আমরা প্রচারিত আত্মজীবনীতেই আস্থা স্থাপন করিব।

কৃত্তিবাস আত্মজীবনীতে বলিয়াছেন যে তাঁহার পূর্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা পূর্ববঙ্গের দনুজ (অথবা বেদানুজ) নামক রাজার পাত্র ছিলেন। অতঃপর পূর্ববঙ্গে বিপর্যয় দেখা দিলে তিনি পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরে ফুলিয়া

গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। এই বংশেরই বনমালী ওঝার পুত্র কবি কৃত্তিবাস। তিনি তাঁহার জন্মদিন সম্বন্ধে বলেন :

আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ (পুণ্য ?) মাঘ মাস।
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস ॥

এগার নিবড়ে যখন বারতে প্রবেশ।
হেনকালে পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ ॥

তথায় করিলাম আমি বিদ্যার উদ্ধার।
যথা যথা যাই তথা বিদ্যার বিচার ॥

বিদ্যাসাঙ্গ করিতে প্রথমে হৈল মন।
গুরুকে দক্ষিণা দিয়া ঘরকে গমন ॥

রাজপণ্ডিত হব মনে আশা করে।
পঞ্চ শ্লোক ভেটিলাম রাজা গৌড়েশ্বরে ॥

সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন সন্তোক।
রামায়ণ রচিতে করিলা অনুরোধ ॥

মাত্র বার বৎসর বয়সে কৃত্তিবাস 'বিদ্যার উদ্ধার' করিবার জন্য বড় গঙ্গা (পদ্মা ?) পার হইয়া উত্তর দেশে গেলেন। তারপর তথায় বিদ্যালাভ করিয়া তিনি রাজা গৌড়েশ্বরের দরবারে উপস্থিত হইয়া সাতটি শ্লোক উচ্চারণ করিয়া তাহার সহিত দেখা করিলেন। গৌড়েশ্বর কবির কবিত্ব-দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে পুষ্পমালা এবং 'পাটের পাছড়া' দিয়া পুরস্কৃত করিলেন। তারপর তাঁহার আজ্ঞায় কবি রামায়ণ রচনা করিলেন।—কবির

আত্মজীবনী পরিচয়

'আত্মপরিচয়' শীর্ষক অংশে আপনার বংশপরিচয়, পরিবেশ-পরিচয় এবং আপনার শিক্ষাদীক্ষা আদি-সম্বন্ধে বিস্তৃত-ভাবেই বহু তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, আপনার

জন্মতারিখ-সম্বন্ধে তিনি মাস-বার-তিথি-আদি উল্লেখ করিলেও শকাব্দটি সম্বন্ধে একেবারে মৌনী। আবার গৌড়েশ্বরের সভা এবং সভাসদ্‌দের নামধাম-পরিচয়-সম্বন্ধেও অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু গৌড়েশ্বরের নামটিই উল্লেখ করেন নাই। প্রাপ্ত তথ্যের উপযুক্ত সদ্ব্যবহার দ্বারা আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় জ্যোতিষিক গণনায় স্থির করিয়াছেন যে ১৩৫৪ শকের (১৪৩২-৩৩ খ্রীঃ) ২৯শে মাঘ রবিবার শ্রীপঞ্চমীর দিন কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু ইহার সমীচীনতা-সম্বন্ধে অনেক আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে।

কৃত্তিবাসের কাল

কৃত্তিবাস যে গৌড়েশ্বরের রাজসভার বর্ণনা দান করিয়াছেন, তাহা কোন হিন্দুরাজার হইবারই সম্ভাবনা। কিন্তু ১৪১৫ খ্রীঃ—১৪১৮ খ্রীঃ রাজা গণেশ গৌড়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। ইহা ছাড়া কয়েক শতাব্দীর ব্যবধানেও গৌড়ের সিংহাসনে অপর কোন হিন্দুরাজার সন্ধান পাওয়া যায় না। আচার্য যোগেশচন্দ্রের গণনার তারিখ মানিতে হইলে এতদুভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধান কষ্টকর হইয়া উঠে। অতঃপর আচার্য রায় 'পূর্ণ' স্থলে 'পুণ্য' পাঠ গ্রহণ করিয়া আবার বিচার করিয়া স্থির করিলেন, ১৩২০ শকাব্দে (১৩৯৮-৯৯ খ্রীঃ) ১৬ মাঘ রবিবার শ্রীপঞ্চমী তিথিতে কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করেন। এই তারিখটিকে গ্রহণ করিলে রাজা গণেশের দরবারে কবি কৃত্তিবাসের উপস্থিতি সম্ভবপর হইতে পারে। ড° দীনেশচন্দ্র সেন, ড° ভট্টশালী প্রভৃতি এই অভিমতের পরিপোষক। কিন্তু যে সকল মনীষী উক্ত গৌড়েশ্বরকে রাজা গণেশ বলিয়া মানিতে রাজি নহেন, তাঁহারা আচার্য রায়ের প্রথমোক্ত অভিমতেরই সমর্থক। তাঁহাদের কেহ মনে করেন, গৌড়েশ্বর বলিতে গণেশ-পুত্র যদু বা জালালুদ্দিনকে বোঝায়, কেহ বা তাহিরপুরের কংস-নারায়ণের কথা উল্লেখ করেন। কৃত্তিবাস তাঁহার পূর্বপুরুষ নরসিংহ ওঝার পৃষ্ঠপোষক যে রাজার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধেও মতভেদ বর্তমান। ইনি পূর্ববঙ্গের সেনবংশীয় দনুজমাধব (১২৮০ খ্রীঃ) হইতে পারেন, চট্টগ্রামের দনুজমর্দন (১৪১৭-১৪১৮ খ্রীঃ) হইতে পারেন। এমন কি দনুজ-মর্দন নাকি রাজা গণেশও হইতে পারেন।—এই সকল অনুমানারণ্যের মধ্য হইতে কৃত্তিবাস এবং তাঁহার পৃষ্ঠপোষক গৌড়েশ্বরকে উদ্ধার করা সহজ নহে। কিন্তু যেহেতু আচার্য রায়ের দ্বিতীয়বারের গণনার সঙ্গে গৌড়ের একমাত্র হিন্দুরাজা গণেশের কাল মিলিয়া যায়, এই হেতু, অপর কোন

প্রবলতর প্রমাণের অভাবে, ১৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দকেই কৃত্তিবাসের জন্মকাল বলিয়া গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের পাণ্ডুলিপির অভাব নাই; কারণ, মনে হয়, বহুকাল পূর্বেই কৃত্তিবাসের রামায়ণ সারা বাঙলায় বহুল প্রচার লাভ করিয়াছিল। কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে কৃত্তিবাসী রামায়ণের কোন প্রাচীন পাণ্ডুলিপির সন্ধান এতাবৎ কাল পাওয়া যায় নাই। বর্তমানকালে যে আকারে কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাজারে প্রচলিত রহিয়াছে, তাহাতে আদি-মধ্যযুগের ভাষার ছিঁটে-ফোটাও অবশিষ্ট আছে কিনা সন্দেহের বিষয়। তাই, অতি সঙ্গত কারণেই মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত দীর্ঘকাল পূর্বে রামায়ণ-সমূহের প্রামাণিকতায় দৃঢ় সংশয় পোষণ করিয়াছিলেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রাচীনতম মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮০৩ খ্রী:। তখনই লোকের মুখে মুখে মূলের ভাষা অনেকখানি বিকৃত হইয়াছিল। তাহা ছাড়া, গ্রন্থটি যখন প্রথম সম্পাদিত হয়, তখনও সম্পাদক ইহার উপর কিছু মাজা-ঘষা করিয়া কাব্যটিকে কিছুটা আধুনিক রূপ দান করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে আরও বিভিন্ন সম্পাদকের হাতে পড়িয়া গ্রন্থটির রূপ আমূল পরিবর্তিত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেহ কেহ আশঙ্কা করেন, বর্তমানে প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে হয়তো কৃত্তিবাসের নাম ছাড়া তাহার আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। প্রথমদিকে পাঁচালী-গায়কগণ যেমন ইচ্ছামত কাব্যের ভিতর নিজেদের রচনা চালাইয়া দিয়াছেন, পরবর্তীকালে সম্পাদক-গণও তেমনি রুচি ও আধুনিকতার দোহাই দিয়া বহু পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন। ফলত, অধুনা-প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণেও কৃত্তিবাসের নাম-মাত্রই সার। মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রচেষ্টায় এক সময় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এর পক্ষ হইতে কৃত্তিবাসের কাব্যের মূল উদ্ধার করিবার আয়োজন হইয়াছিল। তাহার ফলে বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে কৃত্তিবাসী রামায়ণের অযোধ্যা ও উত্তরকাণ্ড প্রকাশিত হয়। উত্তর কাণ্ডটি ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদে অনুলিপি-কৃত বলিয়া অনুমিত পুঁথি-অবলম্বনে রচিত হইলেও পণ্ডিতমণ্ডলী উক্ত কাণ্ড দুইটির প্রামাণিকতা অস্বীকার করেন। উত্তরকালে ড° ভট্টশালী কৃত্তিবাসী রামায়ণের মূল উদ্ধার করিয়া একটি প্রামাণিক সংস্করণ রচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন—ইহার অংশ বিশেষ প্রকাশিতও হইয়াছিল। ড° সুকুমার সেন বলেন, 'ভট্টশালী

কৃত্তিবাসের রচনায় প্রক্ষেপ

মহাশয় যে প্রাচীনতর আদর্শ ঠিক করিয়াছেন, তাহাকে কাব্যের মূল রূপ বলা চলে না, তাহা composite text মাত্র।'—কিন্তু ড° ভট্টশালীর অকাল মৃত্যুর জন্য সেই প্রচেষ্টাও খণ্ডিত রহিল। ফলত, বাজার-প্রচলিত সংস্করণই 'কৃত্তিবাসী সংস্করণ' বলিয়া প্রচারিত হইতেছে।

রামায়ণের আলোচনা-প্রসঙ্গে স্বতই একটি প্রশ্ন মনে উদিত হয়:— রামায়ণ নামে প্রচলিত গ্রন্থটির প্রামাণিকতা যখন সন্দেহাতীত নহে, তখন ইহার আলোচনার সার্থকতা কোথায়? ইহার উত্তরে বলা চলে যে, মূল রামায়ণ-মহাভারতের গ্রন্থকর্তৃত্ব লইয়াও যখন প্রচুর সংশয়ের অবকাশ রহিয়াছে, তখনও ইহার রসাস্বাদনে কোন ব্যাঘাত ঘটে না। তবে আর অনুবাদের ক্ষেত্রে আপত্তি উত্থাপন করিয়া লাভ কি? বিশেষত, প্রাচীন কালের যে সমস্ত কাব্যকে জনসাহিত্য বলিয়া আখ্যাত করা চলে, তাহাদের মধ্যে কালে কালে বহু রচনাই প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। একমাত্র ব্যক্তিবিশেষের রচিত সাহিত্যে, যেখানে ব্যক্তিমানসের ছায়াপাত ঘটিতে পারে, সেই সমস্ত ক্ষেত্রেই রচনা-বিশুদ্ধির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন হয়। কিন্তু রামায়ণ-মহাভারত-আদি মহাকাব্য যদি ব্যক্তিবিশেষের দ্বারাও রচিত হইয়া থাকে, তবু ইহারা প্রকৃতিতে নৈর্ব্যক্তিক। তাই কৃত্তিবাসী রামায়ণে প্রক্ষেপ-বাহুল্য থাকিলেও তাহার আলোচনায় আপত্তি থাকিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

আলোচনার উপযোগিতা

আমরা রামায়ণকে 'মহাকাব্য' রূপে অভিহিত করিলেও কাব্যকার কৃত্তিবাস স্বয়ং ইহাকে 'পাঁচালী' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। মধ্যযুগের বহু কাব্যই 'পাঁচালী' নামে অভিহিত হইলেও বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য-আদি 'লৌকিক পাঁচালী' হইতে রামায়ণ-পাঁচালী অনেকাংশে পৃথক ও স্বতন্ত্র। রামায়ণ-মহাভারত-আদি মহাকাব্য, বিভিন্ন পুরাণের অনুবাদ এবং চৈতন্যজীবনী-আদি গুরুগম্ভীর ভাবযুক্ত সাহিত্যকে 'পৌরাণিক পাঁচালী' নামে আখ্যায়িত করা উচিত। প্রায় সম-শ্রেণীর আর একপ্রকার জনসাহিত্যও ঐ কালে প্রচলিত ছিল,—তাহাদিগকে 'ধামালী' নামে অভিহিত করা হয়। বড়ু চণ্ডীদাস-রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' ঐরূপ ধামালীসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। এই ধামালীর সহিত পাঁচালী কাব্যের পার্থক্যটি একটু বুঝাইয়া বলা প্রয়োজন। ধামালীও জন-সাহিত্য, প্রধানত গ্রাম্য জনগণের ইতর রুচির পরিপোষকতার জন্যই ঐ প্রকার ধামালীর সৃষ্টি

পাঁচালী

হইয়াছে। ধামালীতে কাহিনী আছে, কিন্তু তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভিন্ন পাত্রপাত্রীদের উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়াই পরিবেশিত হয়। ধামালী নৃত্য-গীত-অভিনয়সহ আসরে প্রচারিত হয়। ইহাতে যে রস পরিবেষণ করা হয়, তাহা অতিশয় স্থূল, গ্রাম্য, কুরুচিকর এবং কখনও কখনও অশ্লীল। পক্ষান্তরে পাঁচালী-সাহিত্যে কবিই কাহিনী পরিবেষণ করিয়া থাকেন। ইহার বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্য, মহান আদর্শ, পূতচরিত্র নায়ক-নায়িকার সমাবেশ ইহাকে সমাজের অতি উচ্চস্তরে স্থান দান করিয়াছে। এই দিক দিয়া লৌকিক পাঁচালী হইতেও পৌরাণিক পাঁচালীগুলির স্থান অধিকতর উচ্চে।

বাল্মীকি-প্রণীত রামায়ণ মহাকাব্য-জাতীয় গ্রন্থ; কৃত্তিবাস যদি ইহার হুবহু অনুবাদ করিতেন, তবে হয়তো তাঁহার রামায়ণকেও 'পাঁচালী' না বলিয়া মহাকাব্য নামেই আখ্যায়িত করিতেন। কিন্তু তিনি যাহা রচনা করিয়াছেন, তাহা অনুবাদ হইলেও আক্ষরিক নহে, ভাবানুবাদ তথা বিষয়ানুবাদ মাত্র। রামায়ণের মূল কাহিনীকেই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন; মূল গ্রন্থের বহু অংশই তিনি বর্জন করিয়াছেন, আবার অনেক অংশ নূতন সংযোজনও করিয়াছেন। কৃত্তিবাস গ্রন্থ-রচনা-কালে সম্ভবত যুগ-প্রবৃত্তির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। বাঙলাদেশে তখন নিশীথের অন্ধকার,—শিক্ষা-সংস্কৃতি, বিদ্যা-বৈদগ্ধ্য কোন দিক হইতেই আলোর স্ফুরণ লক্ষ্য করা যাইতেছে না। এই অবস্থায় কৃত্তিবাস সম্ভবত বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন প্রাচীন যুগের মহান্ আদর্শের দিকে। রামায়ণের কাহিনী, রামলক্ষ্মণাদির চরিত্র, পিতৃভক্তি, পত্নীপ্রেম, ভ্রাতৃস্নেহ-আদি বাঙালীর সম্মুখে আদর্শরূপে বিরাজমান থাকিয়া বাঙালীকে আত্মজাগরণে উদ্বুদ্ধ করিবে, সম্ভবত কৃত্তিবাসের এই টুকুই ছিল আশা। তাই তিনি রামায়ণের দার্শনিক তত্ত্ব কিংবা তাত্ত্বিক বাদ-বিতণ্ডা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যবর্ণনা, বিচিত্র অলঙ্কার-সমারোহ ইত্যাদি যতখানি সম্ভব এড়াইয়া চলিয়াছিলেন। 'কৃত্তিবাস পণ্ডিত' যে ইচ্ছা করিলে মূল রামায়ণের সামগ্রিক সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহা অনুবাদ করিতে পারিতেন না, তাহা বিশ্বাস করা যায় না। অতএব অনুমান করিতে হইতেছে, কৃত্তিবাস ইচ্ছা করিয়াই অনুবাদকে মূলানুগ করেন নাই। এমন কি, যখন তিনি রামলক্ষ্মণাদির চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তখনও যুগের প্রভাবে তাহাদের চরিত্রকে নূতন ভাবে রূপায়িত করিয়াছেন। শুধু রামাদি প্রধান চরিত্রগুলিই নহে,

কাব্য-বিচার

রামায়ণের অধিকাংশ চরিত্রই, এমন কি মুনিঋষিরাও যেন সমসাময়িক যুগের প্রতিনিধিরূপে কৃত্তিবাসী রামায়ণে আবির্ভূত হইয়াছেন। বাঙালী-চরিত্রের সাধারণ দোষগুণ, তাহাদের আচার-আচরণ, তাহাদের জীবন-যাত্রার বৈশিষ্ট্য সমস্তই কৃত্তিবাসী রামায়ণে প্রকট। মূল বাল্মীকির রামায়ণে সমসাময়িক ভারতীয় জীবনের ছায়াপাত ঘটিয়াছে, অথবা অঞ্চল-বিশেষের প্রভাব পড়িয়াছে কিনা, জানিনা, তবে কৃত্তিবাস-কৃত রামায়ণ যে বাঙালীর জাতীয়-জীবনের দর্পণ-স্বরূপ, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ফলত, রামায়ণ-অনুবাদে যদি বা কৃত্তিবাসের অক্ষমতা প্রকাশ পাইয়া থাকে, তবে তাহা শতগুণে পোষাইয়া গিয়াছে কৃত্তিবাসের মৌলিকতায়। তাঁহার রামায়ণ অনুবাদ নহে, মৌলিক রচনার স্বাদযুক্ত। কৃত্তিবাসী রামায়ণ অনুকরণ নহে, নূতন সৃষ্টি। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের উক্তিটি স্মরণীয়: 'মূল রামায়ণকে অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালীর হাতে রামায়ণ স্বতন্ত্র মহাকাব্য হইয়া উঠিয়াছে। এই বাংলা মহাকাব্যে বাল্মীকির সময়ের সামাজিক আদর্শ রক্ষিত হয় নাই। ইহার মধ্যে প্রাচীন বাঙ্গালীসমাজই আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছে।'

কৃত্তিবাস তাঁহার কাব্যে যাহা রচনা করিয়া গিয়াছেন, পরবর্তীকালে তাহাতে যে আরও অনেক কাহিনী যুক্ত হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা চলে যে, বাঙলাদেশে চৈতন্যদেবের প্রভাব বহু বিস্তৃত হইবার পরই হয়তো কৃত্তিবাসী রামায়ণে 'তরণীসেনের কাহিনী' যুক্ত হইয়াছিল। এবং সম্ভবত ইহার প্রতিক্রিয়ারূপেই আরও পরবর্তীকালে রামায়ণে 'রামচন্দ্র-কর্তৃক দুর্গাপূজার কাহিনী' সংযুক্ত হইয়াছিল। এইরূপ আরও কোন কোন কাহিনী পরবর্তীকালে যুক্ত হইয়া থাকিতে পারে।

কাব্যের রূপভেদ

লক্ষ্য করিবার বিষয়, পূর্ববঙ্গে প্রাপ্ত পুঁথিগুলিতে এইরূপ সংযোজিত উপকাহিনীর পরিমাণ অনেক কম। এইরূপ বহু পুঁথিতেই তরণীসেনবধ, দুর্গাপূজা এবং রাবণের রামস্তব-আদি কাহিনী অনুপস্থিত দেখা যায়। কবিচন্দ্র নামক জনৈক কবির ভণিতায় প্রাপ্ত কোন কোন পুঁথিতে আবার এই সব কাহিনী বর্তমান। কাজেই অনুমান করা চলে, অপর কোন কোন কবির রচনাও কৃত্তিবাসী রামায়ণের অঙ্গীভূত হইয়াছে। কৃত্তিবাস-ভণিতাযুক্ত কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকারও সন্ধান পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে 'যোগাদ্যার বন্দনা', 'শিবরামের যুদ্ধ', 'রুক্মাঙ্গদরাজার একাদশী'র নাম উল্লেখ করা যায়। অনুমান, অল্পতর খ্যাত কোন কবি হয়তো

আপনার অক্ষম রচনাকে চিরস্থায়ী করিবার অভিপ্রায়ে তাহা কৃত্তিবাসের নামে চালাইয়া দিয়াছেন।

৫. মালাধর বসু ঃ শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়

বাঙলাসাহিত্যের আদিমধ্যযুগে বিভিন্ন সংস্কৃত মহাকাব্য এবং পুরাণ-অনুবাদের যে প্রচেষ্টা দেখা দিয়াছিল, তাহার অন্যতম সার্থক পরিণতি মালাধরবসু-কৃত ভাগবত-পুরাণের অনুবাদ 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' (গোবিন্দবিজয় বা গোবিন্দমঙ্গল) গ্রন্থে। সদ্য-জাগরিত বাঙালীর সম্মুখে একটি আদর্শ কাহিনী ও চরিত্র-পরিবেশনের তাগিদেই হয়তো কবি এই অনুবাদ-প্রচেষ্টায় ব্রতী হইয়াছিলেন। বাঙলাদেশে তখন বিদেশী বিধর্মী এক ভিন্নজাতির শাসনকর্তা বর্তমান,—জাতির জাগরণের জন্য তাই এমন এক মহান্ আদর্শ পুরুষের চিত্র উপস্থাপন করা দরকার, যিনি সর্বতোভাবে জাতির জীবনে প্রেরণা জোগাইতে পারিবেন। এই বিষয়ে যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ পুরুষ, তাহাতে সন্দেহ কি? 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং ন চ পূর্ণঃ নচাংশকঃ'—কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান তিনি পূর্ণাবতারও নহেন, অংশাবতারও নহেন। অতএব কবি অতি সঙ্গত কারণেই কৃষ্ণ-কাহিনী নির্বাচন করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে

ভাগবতের অনুবাদ

কবি দ্বারস্থ হইলেন 'ভাগবতপুরাণের'। অন্যান্য বহু পুরাণেই কৃষ্ণ-কাহিনী স্থান লাভ করিলেও (এমন কি ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে এই কাহিনী ভাগবতপুরাণ অপেক্ষাও বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে), প্রামাণিকতায়, প্রাচীনতায় এবং সশ্রদ্ধরচনার বিচারে ভাগবত-পুরাণই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সমগ্র ভাগবতপুরাণ কৃষ্ণের কথায় পূর্ণ নহে, প্রধানত দশম ও একাদশ স্কন্ধেই কৃষ্ণকাহিনী রূপায়িত হইয়াছে। আমাদের কবির পক্ষেও তাই ভাগবতপুরাণের দশম এবং একাদশ স্কন্ধই গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। বস্তুত মালাধর বসু-কৃত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' সমগ্র ভাগবত পুরাণের অনুবাদ নহে, দশম ও একাদশ স্কন্ধের অনুবাদমাত্র।

কবিরাজগোস্বামী-কৃত 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে মালাধরবসুর সশ্রদ্ধ উল্লেখ

চৈতন্য-চরিতামৃতে মালাধর বসু

পাওয়া যায়। স্বয়ং মহাপ্রভু চৈতন্যদেব মালাধর বসুর পৌত্র রামানন্দ বসুকে সম্বর্ধনা জানাইয়াছিলেন। এমন কি গুণরাজখান মালাধর বসুর জন্মভূমি কুলীনগ্রামের প্রতিও মহাপ্রভুর শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না—

কুলীনগ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া।
প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রায় পট্ট ডুরি লইয়া ॥
গুণরাজখান কৈল শ্রীকৃষ্ণ বিজয়।
তাঁহা এক বাক্য আছে মহাপ্রেমময় ॥

এতদ্ব্যতীত জয়ানন্দ-কৃত 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থেও মালাধর-বসুর উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা হইতে নিশ্চিতভাবে বলা চলে যে 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়'-কর্তা মালাধর বসু চৈতন্যপূর্বকালে অর্থাৎ আদি-মধ্যযুগে বর্তমান ছিলেন।

১৮৮৭ খ্রীঃ শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থ সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয়। ইহাতে একটি শ্লোক সন্নিবিষ্ট আছে:

তেরশ পচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দশ দুই শকে হইল সমাপন ॥

দুর্ভাগ্যক্রমে কোন প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে কাল-জ্ঞাপক এই শ্লোকটি পাওয়া যায়না বলিয়া কেহ কেহ ইহার প্রামাণিকতায় সন্দেহ প্রকাশ করেন। সংশয়ের আরও একটা কারণ বর্তমান। প্রাচীন কোন পুঁথিতেই এইভাবে সরাসরি শকাব্দের উল্লেখ পাওয়া যায় না। (আর যদি তারিখটি প্রামাণিক হইয়া থাকে, তবে ইহাই বাঙলা সাহিত্যে প্রাচীনতম কালজ্ঞাপক উক্তি।) কিন্তু অধিকাংশ ঐতিহাসিক এই কাল-জ্ঞাপক পয়ারটি-অবলম্বনেই মালাধর বসুর কালনির্ণয় করিয়া থাকেন।

কবি ১৩৯৫ শকাব্দে (১৪৭৩ খ্রীঃ) গ্রন্থারম্ভ করেন এবং ১৪০২ শকাব্দে (১৪৮০ খ্রীঃ) গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছিল। কবি অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছেন,—

গুণ নাই, অধম মুই, নাহি কোন জ্ঞান।
গৌড়েশ্বর দিলা নাম, গুণরাজখান ॥

কবির গ্রন্থারম্ভকালে গৌড়ের সিংহাসনে আসীন ছিলেন রুক্‌নুদ্দিন বরবক শাহ্ (১৪৬০-১৪৭৪ খ্রীঃ) এবং সমাপ্তিকালে ছিলেন শামস্‌উদ্দিন য়ুসুফ্ শাহ্ (১৪৭৪ খ্রীঃ—১৪৮১ খ্রীঃ)। উক্ত দুই সুলতানের মধ্যে মালাধর বসুকে কোন্ জন 'গুণরাজখান' উপাধি দান করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, কবির গ্রন্থরচনায় প্রীত হইয়া য়ুসুফ শাহ্-ই তাঁহাকে উক্ত উপাধি দান করেন; আবার কেহ বা অনুমান করেন যে, যেহেতু গ্রন্থের প্রথম দিকের ভণিতায়ও 'গুণরাজখান' উপাধি পাওয়া যায়, তখন নিশ্চিত অনুমান করা চলে যে, গ্রন্থারম্ভের পূর্বেই

রুকনুউদ্দিন বারবাক শাহ্ কবিকে এই উপাধি দান করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে আরও একটি অভিমত এই যে, মালাধর বসু যে গৌড়েশ্বরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা গৌরবে মাত্র, আসলে তিনি কোন হিন্দু জমিদারেরই পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন মাত্র। কোন মুসলমান সুলতান যে হিন্দুর দেবদেবীর কাহিনী শুনিয়া প্রীত হইবেন, তেমন আশা করা যায় না। অতএব, গৌড়েশ্বরের বিষয়ে আলোচনা নিরর্থক। উক্ত অভিমত সন্দেহ মাত্র, কোন যুক্তিসহ প্রমাণ ইহার পশ্চাতে না থাকায় এই অভিমত গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না।

মালাধর বসুর পৃষ্ঠপোষক

মালাধর বসু বর্ধমান জেলার কুলীন গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ভগীরথ বসু এবং মাতা ইন্দুমতী। কুলজী সাহিত্যের মতে আদিশূরের রাজত্বকালে যে পঞ্চকায়স্থ বাঙলা দেশে আসিয়াছিলেন, তাহাদের অন্যতম দশরথ বসুই মালাধর বসুর পূর্বপুরুষ। কবি আত্মপরিচয়-দান-প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন যে ব্যাস-কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া ভাগবত-অবলম্বনে এই 'পাঁচালীকাব্য' রচনা করেন। কবি সর্বত্র কাব্যটিকে 'পাঁচালী' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

কবি-পরিচয়

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে কাব্যখানি সমগ্র ভাগবতের অনুবাদ নহে। মালাধর বসু ভাগবত পুরাণ হইতে দশম ও একাদশ দুইটি স্কন্ধমাত্র গ্রহণ করিয়া অনুবাদ করিয়াছেন। এই অনুবাদও আক্ষরিক অনুবাদ নহে, ভাবানুবাদ, কোথাও বা অনূদিত সারাংশমাত্র। তবে প্রয়োজনমত কবি অন্যান্য স্কন্ধ হইতেও উপাদান আহরণ করিয়া কৃষ্ণ-কাহিনীকে পূর্ণতা দান করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। প্রথম স্কন্ধের বিভিন্ন অধ্যায় হইতে ইহার কতক অংশ গৃহীত হইয়াছে। ভাগবতপুরাণ ব্যতীত অন্যান্য পুরাণ হইতেও কবি কিছু কিছু উপকরণ আপনার গ্রন্থে যোজনা করিয়াছেন। যেমন কৃষ্ণের জন্মের অব্যবহিত পরেই মায়া-কর্তৃক কংসের নিধন-সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণীর কথা ভাগবতপুরাণ, হরিবংশ কিংবা বিষ্ণুপুরাণে নাই। মনে হয় কবি এই অংশ ভবিষ্য-পুরাণ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। ভাগবতপুরাণ বৈষ্ণবদিগের শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থরূপে বিবেচিত হইলেও বিস্ময়ের বিষয়, ইহাতে রাধার কাহিনী নাই, এমন কি তাহার নামও কোথাও উল্লেখ করা হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে

যে রাধার উল্লেখ পাওয়া যায়, সম্ভবত তাহা ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ হইতে গৃহীত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কোন কোন পুঁথিতে কৃষ্ণের দানলীলা, নৌকালীলা-আদি প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। এই সমস্ত কাহিনী যে শুধু ভাগবতেই অনুপস্থিত তাহা নহে, শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কোন কোন পুঁথিতেও তাহাদের উল্লেখ নাই। মনে হয়, ভাগবত-বহির্ভূত যেসমস্ত বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহাদের সমগ্র অংশ অথবা একটা বৃহৎ অংশই প্রক্ষিপ্ত। পরবর্তীকালে ভাগবতপুরাণের যে বহুতর অনুবাদ 'কৃষ্ণমঙ্গল' কাহিনীরূপে রচিত হইয়াছে, সেই সমস্ত গ্রন্থ হইতেও কিছু কিছু অংশ শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে সংযোজিত হইয়া থাকিতে পারে। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কোন কোন গ্রন্থে 'শ্যামাদাস' নামক ব্যক্তির যে ভণিতা পাওয়া যায়, উক্ত কবির রচনাও গ্রন্থমধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিতে পারে। রামায়ণের মতই শ্রীকৃষ্ণবিজয়েরও খুব প্রাচীন কোন পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত না হওয়ায় মালাধর বসুর মূল রচনার পরিচয় পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

গ্রন্থের উপাদান ও উৎস

মালাধর বসু যদি ভাগবতপুরাণের আক্ষরিক অনুবাদ রচনা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার কাব্যের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন মনে হইতে পারিত। কিন্তু 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামে অনুবাদ হইলেও আসলে ইহা মৌলিক রচনাই। এই হেতু গ্রন্থের উৎকর্ষ-অপকর্ষের দায়িত্বও গ্রন্থকারেরই। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, অনেকটা যুগ-প্রয়োজনেই হয়তো কবি গ্রন্থ-রচনায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। অতএব মূল গ্রন্থের যে সমস্ত অংশ কবির উদ্দেশ্য-পরিপূরণে সহায়ক হইবে, কবি সুবিধামত সেই অংশগুলিই গ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্ভবত এই কারণেই তিনি মূলের অলঙ্কার-বাহুল্য বা আড়ম্বরপ্রিয়তাকেও বর্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া, যাহারা মনে করেন যে মালাধর বসু কবিত্ব-প্রকাশে সক্ষম ছিলেন না অথবা সক্ষম থাকিলেও আগ্রহী ছিলেন না, তাহাদের উক্তিকে বিনা প্রতিবাদে মানিয়া লওয়া সম্ভব নহে। প্রয়োজনবোধে কবি আপন কবিস্বভাবেরও পরিচয় দিয়াছেন; তবে কোথাও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠেন নাই—সর্বদাই সংযম রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। কবি কৃষ্ণের ঐশ্বর্য-প্রকাশেই অধিকতর সচেতন ছিলেন, তাই কৃষ্ণলীলার কোমল কবিত্বময় অংশের প্রতি তাঁহার কিছুটা উপেক্ষার ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। অবশ্য এই উক্তি হইতে সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত হইবেনা যে কবি ভক্ত কিংবা ভাবুক ছিলেন না। বস্তুত, রচনার বহুস্থলেই কবির ভক্তি ও ভাবুকতা যথার্থভাবেই

প্রকাশিত হইয়াছে। আত্মনিবেদন ও ভক্তিভাব প্রকাশ করিবার জন্য কবি অনেক সময় মূলের বাহিরেও চলিয়া গিয়াছেন। ভাবুক বাঙালী কবি স্বকল্পিত যশোদা-সম্ভাষণে তাঁহার স্বরূপের যথার্থ পরিচয় দিয়াছেন। মালাধর

কাব্য বিচার

বসু যেকালে গ্রন্থটি রচনা করিয়াছিলেন, অনুমান, সেইকালে ধামালী-সাহিত্যেরও প্রচলন ছিল। অতএব কৃষ্ণলীলা-বর্ণনা-প্রসঙ্গে কবি রসের ও রুচির বিকার ঘটাইলেও সমাজে নিন্দিত হইতেন না। কিন্তু সংযত-স্বভাব কবি এই সুযোগ স্বেচ্ছায় পরিহার করিয়া কাব্যটিকে ইতরতার হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন। 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' বৈষ্ণবদের গ্রন্থ; পরবর্তীকালে রচিত 'চৈতন্যভাগবতে'ও যে পরিমাণ পরধর্ম-বিদ্বেষ প্রকাশ পাইয়াছে, আশ্চর্যের বিষয়, শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে তাহা একান্ত ভাবে অনুপস্থিত। ইহাতে কবির ধর্মসহিষ্ণুতার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে যে শুধু গোপীদের দ্বারা কাত্যায়নীপূজা করানো হইয়াছে তাহা নহে,—স্বয়ং দেবকীও চণ্ডীর পূজা করিতেছেন, দেখা যায়। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব-কর্তৃক বাঙলাদেশে বৈষ্ণবধর্ম-প্রচারের পূর্বে যে কয়জন মনীষী তাহার উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে মালাধর বসু অন্যতম। মালাধর বসুর এই কীর্তিকে চৈতন্যদেব যথার্থভাবেই পুরস্কৃত করিয়াছেন। বাঙালী-হিসাবে আমরা আরও এক কারণে মালাধর বসুর নিকট ঋণী। তিনিও তাঁহার গ্রন্থে কৃত্তিবাসের ন্যায় বাঙালী-জীবনেরই পরিচয় দান করিয়াছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুগাতিশায়ী পুরুষ হইলেও তাঁহার লীলাবর্ণন-প্রসঙ্গে বাঙালীকবি মালাধর বসু তাঁহাকে 'বাঙালী'-রূপেই অঙ্কন করিয়াছেন।

———

অধ্যায় ঃ
পাঁচ

মঙ্গলকাব্য-সাহিত্য

বাঙালাদেশে মঙ্গলকাব্য-সাহিত্যের উদ্ভব কবে, কোথায় এবং কীভাবে ঘটিয়াছিল, তাহা আজ আর নিশ্চিত ভাবে বলা সম্ভব নহে। বস্তুত এই বিষয়ে যে মতারণ্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা মহারণ্যেরই তুল্য। তাহা হইতে প্রকৃত সত্যের উদ্ধার সাধন একরূপ অসম্ভব বলিলেই হয়।

মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব

বাঙলাসাহিত্যের উষালগ্নেই যে মঙ্গলকাব্যসাহিত্যের উদ্ভব ঘটিয়াছিল, তাহা বিশ্বাস করিবার সঙ্গত কারণ রহিয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে এবং ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে মঙ্গলকাব্যের যে সু-পরিণত রূপ দেখা যায়, তাহার পশ্চাতে যে দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা নিহিত ছিল, সাধারণ বুদ্ধিতেই তাহা অনুমান করা চলে। তাহা ছাড়াও প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন কয়েকজন মঙ্গলকাব্যকার সুস্পষ্টভাবেই তাহাদের পূর্বসূরীদের কথা সশ্রদ্ধ ভাবে স্মরণ করিয়াছেন। ইহা হইতেও অনুমান করা চলে যে উক্ত কবিদের দুই এক শতাব্দী পূর্বেই মঙ্গলকাব্য-সমূহের পথ-প্রদর্শক আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই হিসাবে তুর্কী-আক্রমণের অব্যবহিত পরবর্তী যে কালকে আমরা 'যুগান্তর কাল' নামে অভিহিত করিয়াছি, ঐকালেই বাংলাদেশে প্রথম মঙ্গলকাব্য-সাহিত্যের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিতে হয়। সিদ্ধান্তটির পরি-পোষকতায় আর একটি সুদৃঢ় যুক্তি উত্থাপন করা চলে। তুর্কী-আক্রমণের ফলে দেশব্যাপী যে একটা বিপর্যয় দেখা দিয়াছিল, তাহা হইতেও উদ্ধারের কোন উপায় বাঙালীর হাতে ছিল না,—এই কারণেই দেশের স্বাধীনতাও বিনষ্ট হইয়াছিল। অতএব অতি সঙ্গত কারণেই সম-সাময়িক বাঙালী আপনাদের উদ্ধারের জন্য অপর কোন তৃতীয় শক্তির শরণ গ্রহণ করিয়াছিল। এই তৃতীয় শক্তিই দৈবী শক্তি,—বস্তুত, সেই সংস্কারান্ধ মধ্যযুগে দৈবীশক্তির আনুকূল্য কামনা ছাড়া আর কীই বা করা চলিত। আর ঠিক এই সময়েই বহিঃশক্তির আক্রমণের ফলেই, বাঙালী আর্য ও অনার্যজাতির মধ্যে একটা সহজ সংমিশ্রণের প্রক্রিয়া চলিতেছিল। বাঙলার অনার্য অধিবাসীরা পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত ধর্মবিশ্বাস ও

মঙ্গলকাব্যোদ্ভবের পট ভূমিকা

দেবতাদের লইয়াই বৃহত্তর হিন্দুসমাজে উন্নীত হইলে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দৃষ্টিও তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইল। সুচিকিৎসায় ব্যর্থ হইলে যেমন জ্ঞানী বিচক্ষণ ব্যক্তিও কখন কখন ঝাড়-ফুঁকের শরণ লইয়া থাকেন, তেমনি পৌরাণিক দেব-দেবীর সহায়তা লাভে ব্যর্থ হইয়া কিছু কিছু উচ্চবর্ণের হিন্দুও যে নবাগত অনার্য দেব-দেবীর কৃপালাভে আগ্রহ বোধ করিবেন, এই অনুমান মনস্তত্ত্ব-সম্মত। সম্ভবত, নবাগত দেব-দেবীদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিবার অভিপ্রায়েই প্রাগুক্তকালে বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য-রচনার প্রচেষ্টা সুরু হইয়াছিল। খুবই সম্ভব, উদ্ভবকালে কোন মঙ্গলকাব্যই পরবর্তীকালের মত স্ফীত-কলেবরে রচিত হয় নাই। হয়তো তখন ঐগুলি 'পাঁচালী' নামে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আকারে এবং জটিলতা-বর্জিত, সংক্ষিপ্ত ও সরল কাহিনীর মাধ্যমে রচিত হইয়াছিল। অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালেই ঐ পাঁচালীগুলি উপকাহিনী-সমন্বিত হইয়া মঙ্গলকাব্যের রূপ ধারণ করে।

'মঙ্গলকাব্য' বলিতে মধ্যযুগের এক বিরাট সাহিত্য-সংসারকেই বুঝাইয়া থাকে। ইহাতে একদিকে যেমন অনার্যদেব-দেবীদের মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে, তেমনি কোন কোন আর্য দেব-দেবীও মঙ্গলকাব্যের বিষয়ীভূত হইয়াছেন। এমন কি, সমসাময়িক যুগের মহাপুরুষদের অবলম্বন করিয়াও কিছু কিছু মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছে। মনে হয়, পরবর্তীকালে বিশেষ কোন অর্থ ব্যতিরেকেই গ্রন্থের অভিধায় 'মঙ্গল' শব্দ যুক্ত হইত। আধুনিক কালেও তাই 'সারদা মঙ্গল' নামক গ্রন্থ প্রণীত হইযাছে। দীর্ঘকাল প্রচলিত থাকিবার পর বস্তু-বিশেষের একটা good will বা ব্যবহার-মূল্য সৃষ্টি হইয়া থাকে, পরবর্তী 'মঙ্গলকাব্য'-গুলির নামকরণে এই যুক্তি কিছুটা কাজ করিতে পারে। কিন্তু গোড়ায় কী কারণে বিভিন্ন কাব্যের নামকরণে 'মঙ্গল' শব্দ যুক্ত হইয়াছিল, তাহার সূত্র নির্ধারণ করা কষ্টকর। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, 'ব্যক্তিগত কল্যাণ কামনায় দেবতার আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া যে গান রচিত হয় তাহাকেই 'মঙ্গল' বা 'মঙ্গল গান' বলে।' অধ্যাপক চারু বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বিস্তৃতভাবে 'মঙ্গল' শব্দের ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন: 'মঙ্গল কাব্যগুলি গান করিয়া দেবতার মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচার করা হইত। সেই গান একটি বিশেষ রকম সুরে হইত এবং সেই সুরকেও মঙ্গল বলিত। বাঙলা যাত্রা মানে যেমন গান ও গমন উভয়ই, হিন্দিতে তেমনি মঙ্গল মানে

'মঙ্গল' শব্দ ও মঙ্গল কাব্যের অর্থ

মেলা, যাত্রা বা গমন।… যে গান শুনিলে মঙ্গল হয়, যে গানে মঙ্গলকারী দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারিত, যে গান মেলায় গীত এবং যে গান একদিন যাত্রা করিয়া অর্থাৎ আরম্ভ হইয়া আট দিন ব্যাপিয়া চলে তাহাকেই মঙ্গল গান বলে।' সম্ভাব্য অমঙ্গলের হাত হইতে নিস্তার-মানসে দেবতার মাহাত্ম্য-কীর্তন-সম্বলিত গ্রন্থই আদিতে 'মঙ্গল' নামে আখ্যাত হইয়াছিল, —এইরূপ অনুমান বাস্তবের সহিত সঙ্গতিসম্পন্ন বলিয়া মনে হয়। গোড়ায় যাহাই হউক না কেন, পরবর্তী কালে যে পারিভাষিক অর্থেই 'মঙ্গল' শব্দটি ব্যবহৃত হইত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

প্রাচীনকালে যে-প্রয়োজনে বিভিন্ন সংস্কৃত পুরাণের উদ্ভব হইয়াছিল, সেই একই প্রয়োজনের তাগিদেই যে বাঙলাভাষায় মঙ্গলকাব্য-সমূহ রচিত হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা চলে। বৈদিক যুগের অবসানে জনসাধারণের মধ্যেও যখন ধর্মচেতনা তথা দেবচেতনার উদ্ভব হয়, বোধ হয় তখনই লৌকিককাব্য পুরাণগুলির সৃষ্টি হইয়াছিল। বৈদিক দেবতাদের কাল শেষ হইয়া আসিয়াছে, নানাকারণেই নূতন নূতন দেবতার ও কাহিনীর উদ্ভব ঘটিতেছে, এই অবস্থায় নিত্য নব পুরাণের সৃষ্টি অস্বাভাবিক ছিলনা। মধ্যযুগে বাঙলাদেশেও অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, যাহার ফলে নূতন পুরাণ-রচনার আবশ্যকতা দেখা দিয়াছিল। কিন্তু পরিবেশের পরিবর্তন ঘটায় এবং জনমানসের সহিত যোগ ঘনিষ্ঠতর হওয়ায় সংস্কৃতে নবপুরাণ রচনার দিনও ফুরাইয়া আসিয়াছিল। অতএব নূতন যুগের পুরাণ 'মঙ্গলকাব্য'-গুলি রচিত হইল তৎকাল-প্রচলিত বাঙলা ভাষায়। অবশ্য

বাঙলা পুরাণ

অর্বাচীন পুরাণ-সমূহেও মঙ্গলকাব্যের কিছু কিছু দেব-দেবী কিছু কিছু স্থান পাইয়াছেন। মঙ্গলকাব্যগুলি বাঙলাভাষায় রচিত হওয়ার পক্ষে আরও একটা প্রবলতর যুক্তি উত্থাপন করা চলে। পুরাণ-গুলিতে দেবতাদের সঙ্গে সঙ্গে বহুতর মানব-মানবীর কাহিনীও পরিবেশিত হইয়াছে। কিন্তু এই সব মানব-মানবী সমাজের অতি উচ্চস্তরে অবস্থান করিতেন ; সম্ভবত, পুরাণের শ্রোতৃমণ্ডলীও ছিলেন তৎকালের অভিজাতবর্গ ; পক্ষান্তরে মঙ্গলকাব্যের যুগে দেবতারাও যেমন অনার্যদের মধ্য হইতে আগত, তেমনি কাহিনীর নায়ক-নায়িকারাও অনেকেই সমাজের নিম্নতর শ্রেণী হইতে উদ্ভূত। অতএব বাঙলাভাষায় ইহাদের কাহিনী-পরিবেশনেই বাস্তবতার মর্যাদাও রক্ষিত হইয়া থাকে। সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত

—পুরাণের এই পঞ্চলক্ষণ সমগ্রভাবে মঙ্গলকাব্যসমূহে না পাওয়া গেলেও উক্ত কাব্যগুলি যে মূলত পুরাণের অনুসরণেই রচিত হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মঙ্গলকাব্যগুলিতে পুরাণের পরিবেশ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেবদেবীর চরিত্রেও পৌরাণিক আকার দান করা হইয়াছে। এই দিক হইতেও বলা চলে যে মঙ্গলকাব্যগুলি বাঙলা পুরাণের মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে।

মঙ্গলকাব্যগুলি বাঙলার জাতীয় মহাকাব্য কিনা—এইরূপ একটা প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। এই বিষয়ে ড° আশুতোষ ভট্টাচার্যই সম্ভবত সর্বপ্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, 'প্রথমতঃ সাম্প্রদায়িকতার নিম্নস্তর হইতে উদ্ভূত হইলেও কালক্রমে যখন এই সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া মঙ্গল কাব্যগুলি সাহিত্যের উচ্চতর আদর্শের সেবায় নিয়োজিত হইল, তখনই এই শ্রেণীর কয়েকখানি কাব্য জাতীয় মহাকাব্য (National Epic) হিসাবে স্থান পাইবার যোগ্যতা অর্জন করিল।' এই বিষয়ে তিনি 'ধর্মমঙ্গল'-গুলির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে 'পশ্চিম বঙ্গের জাতীয় মহাকাব্য' নামে আখ্যাত করিয়াছেন। তাঁহার মতে, এই কাব্যগুলিতে সমসাময়িক জাতীয় সংস্কৃতি এবং জাতীয় জীবনের শাশ্বত সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে যে সমস্ত চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে, এই গুলিও ড° ভট্টাচার্যের মতে বাঙ্গালীগৃহের নিত্যকালের চিত্র। ইহাদের মাধ্যমেই আমরা প্রাচীন কালের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতে পারি। —এই সমস্ত কারণেই ড° ভট্টাচার্য এইগুলিকে বাঙলার জাতীয় মহাকাব্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু মাত্র এই কয়টি লক্ষণের জন্যই কোন কাব্য কিংবা কাব্যধারাকে 'জাতীয় মহাকাব্য' নামে আখ্যাত করা যায় কিনা, এই বিষয়ে কেহ কেহ সন্দেহ পোষণ করেন। কারণ, তাঁহাদের মতে, জনজীবনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইলেও মঙ্গল কাব্যগুলি শিশুমনের ন্যায় অপরিণত কবিমানসের সাহিত্য বলিয়াই তাহাদিগকে 'জাতীয় সাহিত্য' বলা যায় না। মঙ্গলকাব্যোক্ত চরিত্রগুলিও নিম্নস্তরের। বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি মঙ্গলকাব্যসমূহে প্রকট নহে। ইহা ছাড়াও এইগুলিতে প্রাকৃতিক ও সামাজিক জীবনের পরিচয়, কিংবা ভৌগোলিক বা আঞ্চলিক জীবনেরও কোন সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায় না। এমন কি মঙ্গলকাব্যসমূহে সমসাময়িক যুগের যে পরিচয়

মঙ্গলকাব্য কি জাতীয় মহাকাব্য

পাওয়া যায়, তাহাকেও সমালোচকবৃন্দ জাতীয় জীবনের পরিচায়ক বলিয়া মনে করেন না। তাঁহাদের মতে 'মঙ্গলকাব্যের জগৎ অপরিণত মনের কল্পনা-বিলাস মাত্র।' অতএব, মঙ্গলকাব্যকে বাঙলার জাতীয় ইতিহাস বলিয়া অভিহিত করা চলে না।—আমাদের মনে হয়, উভয় পক্ষই চরম পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। বস্তুত জাতীয় মহাকাব্যে জাতির ভাবনা-কামনা-আদির যেরূপ সুষ্ঠু প্রকাশ ঘটা প্রয়োজন, কোন মঙ্গলকাব্যেই তাহা ঘটে নাই। আবার মঙ্গলকাব্যগুলিকে অপরিণত মনের কল্পনা-বিলাস বলিয়াও উড়াইয়া দেওয়া চলে না। কারণ, মঙ্গলকাব্যসমূহে সমসাময়িক জীবন-যাত্রার যেমন কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি জনজীবনের সহিতও ইহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল বলিয়া জাতীয় জীবন হইতে ইহাদিগকে বিচ্ছিন্নও করা চলে না। জাতীয় মহাকাব্য না হইলেও যে এইগুলি জাতীয় জীবনের সহিত যুক্ত, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

শ্রেণীবিভাগ

মঙ্গলকাব্য-রচনার প্রথম যুগে যদিও দুইটি কি তিনটি মাত্র মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছিল, পরবর্তীকালে বিষয়-বৈচিত্র্যে এবং সংখ্যায় তাহা বহুগুণিত হইয়াছিল। প্রাচীনত্ব, সংখ্যা এবং উৎকর্ষের বিচারে মঙ্গলকাব্যগুলিকে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়: (১) প্রধান মঙ্গলকাব্য: এই শ্রেণীতে পড়ে মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ও শিবমঙ্গল বা শিবায়ন। (২) অপ্রধান মঙ্গলকাব্য: কৃষ্ণ মঙ্গল, শীতলামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, রায়মঙ্গল, সারদামঙ্গল ইত্যাদি বহু কাব্যই এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হয়।

মনসামঙ্গল

মঙ্গলকাব্যসমূহের মধ্যে সম্ভবত 'মনসামঙ্গল' বা 'পদ্মাপুরাণে'র প্রচার এবং জনপ্রিয়তাই সর্বাধিক। ড০ দীনেশ সেন অন্যূন ৬২ জন মনসা-মঙ্গলকাব্য-কারের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তবে তিনিও সন্দেহ করেন যে, ইহার মধ্যে হয়তো অনেকেই 'গায়েন' ছিলেন, কৌশলে ভণিতায় নাম ঢুকাইয়া দিয়াছেন। মনসামঙ্গল-রচয়িতাদের মধ্যে কানা হরিদত্ত, বিজয়গুপ্ত, নারায়ণদেব, বিপ্রদাস পিপ্পলাই, দ্বিজবংশীদাস, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ প্রভৃতি প্রধান। মনসামঙ্গল কাব্যের একাধিক কবি যে চৈতন্য-পূর্বযুগেই বর্তমান ছিলেন, তাহাতে সংশয়ের কোন অবকাশ নাই।

চণ্ডীমঙ্গল

চণ্ডীমঙ্গলও প্রাচীনতর কাব্য-সমূহের একটি। কিন্তু চৈতন্য-পূর্বযুগে রচিত কোন কাব্যের সন্ধান এতাবৎ

কাল পাওয়া যায় নাই। চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের প্রধান কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবির সম্মান লাভ করিয়া থাকেন। অন্যান্য কবিদের মধ্যে দ্বিজমাধব প্রধান। ধর্মমঙ্গলকাব্যের উদ্ভবভূমি এবং প্রসার প্রধানত রাঢ় অঞ্চলে। এই শাখার কবিদের মধ্যে মাণিক গাঙ্গুলি, ঘনরাম চক্রবর্তী, রূপরাম চক্রবর্তী প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রধান মঙ্গলকাব্যশাখার অন্তর্ভুক্ত হইলেও 'শিবায়ন' কাব্য পূর্বোক্ত কাব্যগুলির সহিত তুলিত হইতে পারে না। শিবায়ন-রচয়িতাদের মধ্যে রামেশ্বর ও কবিচন্দ্র বিশেষ ভাবে প্রসিদ্ধ। অপ্রধান কাব্যগুলির মধ্যে 'শীতলামঙ্গল' বহুল প্রচার লাভ করিয়াছিল। শীতলামঙ্গলের কবিদের মধ্যে কৃষ্ণরাম, মাণিক গাঙ্গুলী, শঙ্কর, নিত্যানন্দ চক্রবর্তী প্রধান। 'ষষ্ঠীমঙ্গল'ও অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের কাব্য। কৃষ্ণরাম, রুদ্ররাম ও রামধন চক্রবর্তী এই কাব্যের প্রধান কবি। বাঘের দেবতা দক্ষিণরায়কে অবলম্বন করিয়া 'রায়মঙ্গল' কাব্য রচিত হইয়াছে। 'রায়মঙ্গল কাব্য' চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেরই অনুকরণ। শীতলা-মঙ্গল ও ষষ্ঠীমঙ্গলের কবি কৃষ্ণরামই 'রায়মঙ্গলের'ও কবি। রুদ্রদেবও 'রায়-মঙ্গল' রচনা করিয়াছেন। 'সারদামঙ্গল' কাব্যে সরস্বতীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হইয়াছে। এই কাব্যের কবিদের মধ্যে দয়ারাম, বীরেশ্বর, মুনিরাম প্রভৃতি প্রধান। বিহারীলাল চক্রবর্তী-রচিত 'সারদামঙ্গল' নামে মঙ্গলকাব্য হইলেও তাহা আধুনিক গীতিকাব্য-পর্যায়ভুক্ত। 'কৃষ্ণমঙ্গল' বা 'কৃষ্ণায়ন' কাব্যের রচয়িতাদের মধ্যে রঘুনাথ, মাধবাচার্য, কৃষ্ণদাস, কবিশেখর প্রভৃতি প্রধান। এইগুলি ছাড়াও অপেক্ষাকৃত অপ্রধান আরও বহু কাব্যই রচিত হইয়াছে। তবে ইহাদের কোনটিই খুব প্রাচীন নহে। 'কৃষ্ণমঙ্গল' কাব্য প্রকৃত পক্ষে অনুবাদ শাখার অন্তর্ভুক্ত।

ধর্মমঙ্গল

শিবায়ন

অন্যান্য মঙ্গলকাব্য

বিষয় এবং কাহিনীর বৈচিত্র্য-থাকাসত্ত্বেও মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে কতক-গুলি সাধারণ লক্ষণ পাওয়া যায়। বস্তুত মঙ্গলকাব্যের এই আঙ্গিক লক্ষণ-গুলিকেই মঙ্গলকাব্যের বিশিষ্ট লক্ষণ বলিয়া অভিহিত করা চলে। এই লক্ষণগুলির মধ্যে কতকগুলি পুরাণের লক্ষণও বর্তমান। প্রতিটি মঙ্গলকাব্যের প্রথমেই 'বন্দনা' অংশ। এই অংশে উদ্দিষ্ট দেবতা ছাড়াও অন্যান্য প্রধান প্রধান দেবতা এবং তীর্থদেবতা ও স্থানীয় দেবতাদেরও প্রশস্তি বন্দনা করা হইয়াছে। এই বন্দনাংশে সাম্প্রদায়িকতার বিশেষ কোন স্থান নাই। বন্দনাংশের পরই কাব্যসমূহে 'গ্রন্থোৎপত্তির কারণ' বর্ণনা করা হইয়াছে। এই

কারণ বর্ণনা-প্রসঙ্গেই কবিরা একদিকে যেমন আত্মকাহিনী বিবৃত করিয়াছেন, তেমনি দৈবাদেশের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। মনে হয়, জনসাধারণের সভয় ও সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই মূলে কবিরা 'দৈবাদেশ' বা 'স্বপ্নাদেশে'র কথা উল্লেখ করিতেন। পরবর্তীকালে ইহা প্রচলিত রীতিতেই পর্যবসিত হইয়াছে। কারণ, অনেক গ্রন্থেই দৈবাদেশের পরও আবার পৃষ্ঠপোষক নরপতির আদেশেই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, এইরূপ উক্তি পাওয়া যায়। ইহার পরবর্তী অংশ 'দেবখণ্ড'। এই দেবখণ্ডেও সৃষ্টিপত্তন, দক্ষযজ্ঞ, উমার নবজন্মলাভ এবং হরগৌরীর সংসার-বৃত্তান্ত প্রায় সমস্ত মঙ্গলকাব্যেই একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছে। বস্তুত, এই অংশেরই শেষদিকে কোন শাপভ্রষ্ট দেবতার নরলোকে আবির্ভূত হইবার কাহিনী বর্ণনা করিয়া দেবখণ্ড এবং নরখণ্ডের মধ্যে সেতুবন্ধন করা হইয়াছে। হরগৌরীর জীবনযাত্রা-কাহিনীতে প্রায় সর্বত্রই সমসাময়িক নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালী-জীবনের সুন্দর পরিচয় দান করা হইয়াছে। এই দেবখণ্ড দেখিলে মনে হয়, প্রায় সমস্ত কবিই তাহাদের উদ্দিষ্ট দেবতাকে শিবের সঙ্গে কোন-না-কোন উপায়ে যুক্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। সর্বশেষ 'নরখণ্ডে' মূল কাহিনীটি বিবৃত হইয়াছে। এই খানে দেখা যায়, শাপভ্রষ্ট দেবতা নররূপে গ্রন্থোদ্দিষ্ট দেবতার মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া দেহান্তে আবার স্বর্গলোকে প্রয়াণ করেন। বস্তুত, বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের পার্থক্যটি এই অংশেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তথাপি, লক্ষ্য করিবার বিষয়, কাহিনীগত পার্থক্য থাকাসত্ত্বেও কবিগণ এই অংশে গতানুগতিকতা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিতে পারেন নাই। বারমাস্যা, নারীদের পতিনিন্দা, বিশ্বকর্মার কাঁচুলিনির্মাণ, বাঙলার রন্ধন-প্রণালী ও ভোজ্যতালিকা, বাঙলাদেশের ফল-ফুল-গাছ-পশু-পাখি ইত্যাদির নাম উল্লেখ, চৌতিশাস্তব, লোক-ঠকানো ধাঁধার অবতারণা ও উত্তর-দান প্রভৃতি বিষয় প্রায় প্রতিটি গ্রন্থেই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই সমস্ত লক্ষণযুক্ত কাব্যকেই সাধারণত মঙ্গলকাব্য নামে অভিহিত করা হয়।

সাধারণ লক্ষণ

কাব্যহিসাবে মঙ্গলকাব্যগুলির মূল্য নিরূপিত হইলে কালের দরবারে যে ইহাদের অধিকাংশেরই আসন মিলিবেনা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু তৎসত্ত্বেও বাঙালীর জাতীয় সাহিত্যের ইতিহাস হইতে ইহাদের নাম মুছিয়া ফেলিবার উপায় নাই। ইতিহাস-বিমুখ বাঙালীজাতির কোন ইতিহাস নাই,—কথাটি আংশিক সত্য মাত্র,—বস্তুত, এই মঙ্গলকাব্যগুলিই যে বাঙলা-দেশের মধ্যযুগীয় জীবনের অন্তত আংশিক পরিচয় দান করে,—তাহা অস্বীকার

করিবার উপায় নাই। সমসাময়িক বাঙলাদেশের আচার-ব্যবহার, সামাজিক রীতিনীতি, কিছু কিছু বাস্তব ঘটনা, বাঙলার রন্ধন-প্রণালী ও ভোজ্যতালিকা ইত্যাদির সঠিক বিবরণ পাইতে হইলে মঙ্গলকাব্যগুলির দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া কোন উপায় নাই। ইহা ছাড়া বৈশিষ্ট্য ও যুগ-প্রবণতার পরিচয় পাইতে হইলেও মঙ্গলকাব্যের সহায়তা গ্রহণ অপরিহার্য। বাঙালী যে এককালে নৌবাণিজ্যে প্রাগ্রসর ছিল, তাহার প্রমাণ মঙ্গলকাব্যে যতখানি বিধৃত রহিয়াছে, তেমন আর কোথায় পাওয়া যাইবে? কাজেই সাহিত্যিক উৎকর্ষ যদি কিছু কমও হয়, তবু জাতীয় জীবনের ইতিহাস সঙ্কলনের পক্ষে মঙ্গলকাব্যগুলির দানকে স্বীকার করিতে হইবে।

কাব্যমূল্য

১০. ঃ মনসামঙ্গল কাব্য

বাঙলাদেশে প্রচলিত মঙ্গলকাব্যসমূহের মধ্যে মনসামঙ্গলকাব্যই প্রাচীনতম বলিয়া অনুমিত হয়। 'মনসামঙ্গল' কাব্যের প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় বৃন্দাবনদাস-রচিত 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে ঃ

'দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন ॥'

এবং 'দেবতা জানেন সবে ষষ্ঠী বিষহরী।
তাহার সেবনে সবে মহা দম্ভ করি ॥'

ইহা ছাড়াও, চৈতন্যপূর্ব-যুগেই যে তিন চারি জন মনসামঙ্গল-কাব্যকার জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। প্রাচীনতায় যেমন, ব্যাপকতায়ও মনসামঙ্গল তেমনি অনন্যসাধারণ। সর্ববঙ্গেই ইহার ব্যাপ্তি ছিল বলিলেও যথেষ্ট বলা হয় না,—কারণ বাঙলাদেশের বাইরেও মনসামঙ্গল কাব্যের বহুল প্রচলন ছিল যে, ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহার একটি সম্ভাব্য কারণ এই হইতে পারে যে, প্রধানত নিম্নভূমি বলিয়া এবং বাঙলা-দেশের বহু অঞ্চল অরণ্য-অধ্যুষিত বলিয়া প্রায় সমগ্র বঙ্গেই সর্পের উপদ্রব খুব বেশি,—আর মনসামঙ্গলকাব্যে সর্প-দেবতা মনসারই মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে। অতএব সর্পভয় নিবারণের জন্য বাঙলাদেশে যে অসংখ্য মনসা-মঙ্গল-কাব্য রচিত হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের কোন অবকাশ নাই।

মনসামঙ্গলের প্রচার

প্রধানত লৌকিক দেবতা অর্থাৎ পুরাণে যে সকল দেব-দেবী যথেষ্ট অথবা আদৌ প্রতিষ্ঠালাভের সুযোগ লাভ করেন নাই, তাহারাই দেশভাষায়

রচিত মঙ্গলকাব্যের আসর জাঁকাইয়া বসিয়াছেন। কতকগুলি অর্বাচীন পুরাণে (পদ্মপুরাণ, দেবীভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ) মনসার সাক্ষাৎ পাওয়া গেলেও তিনি যে প্রকৃতই পৌরাণিক দেবী নহেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বস্তুত, বাঙলাদেশে এই লৌকিক দেবতা সর্পমাতা মনসার উদ্ভব-সম্বন্ধে এক বিরাট সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। মনসাপূজা প্রকারান্তরে সর্পপূজা। বাঙলাদেশ এবং পার্শ্ববর্তী উড়িষ্যা এবং আসামেই এই পূজার বহুল প্রচলন। প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ ঋগ্বেদে সর্পের উল্লেখ থাকিলেও তাহা অধুনা-প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। যজুর্বেদে সরীসৃপ অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হইলেও এবং উক্তবেদে বহু প্রকার মন্ত্রতন্ত্রের উল্লেখ থাকিলেও সর্পমন্ত্রের কোন উল্লেখ নাই। গৃহ্যসূত্রে সর্প-পূজার উল্লেখ এবং মহাভারতে নাগজাতির সম্বন্ধে বিস্তৃত আখ্যায়িকা প্রচলিত থাকিলেও বস্তুত বাঙলাদেশে পূজিতা মনসাদেবী এবং মনসামঙ্গল-কাহিনীর সহিত ইহাদের দূরতম সম্পর্কও অনুমান করা কঠিন। শবর-কুমারী-রূপিনী জাঙ্গুলীদেবী নামে বৌদ্ধদের একজন দেবীর সন্ধান পাওয়া যায়। সম্ভবত ইনি মূলে ছিলেন জঙ্গলবাসিনী। ইনি সর্প-বিষমোচয়িত্রী এবং বীণাবাদিনী। বৈদিক সরস্বতীর সহিত জাঙ্গুলীদেবীর এই দিক হইতে সাদৃশ্য বর্তমান—কারণ বৈদিক সরস্বতীও সর্পবিষমোচয়িত্রী এবং শবরকন্যা। গুণসাম্যের দিক হইতেই এইভাবে মনসার উপর বৈদিক ও বৌদ্ধপ্রভাব অনুমান করা চলে। কিন্তু শুধু এই ক্ষীণতম সূত্র হইতে মনসাপূজার বিস্তৃতির কোন ব্যাখ্যা হয়না। ইহার জন্য অন্য কোন প্রাচীন সূত্র সন্ধান করিতে হইবে। প্রাচীনতর পৃথিবীর বহু দেশেই সর্পপূজার প্রচলন ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রজনন-শক্তির প্রতীক-রূপেই এই সর্পপূজার প্রচলন ছিল। প্রাচীন বাঙলায় প্রাপ্ত মনসা-মূর্তিতে যে নরশিশু, ফল বা পূর্ণঘট খোদিত আছে, তাহাও প্রজনন শক্তিরই প্রতীক। প্রাচীন তুরাণীজাতির মধ্যেই সর্বপ্রথম সর্পপূজার সৃষ্টি হইয়াছিল, পণ্ডিতেরা এইরূপ অনুমান করিয়া থাকেন। আর এই তুরাণী জাতি হইতেই নাকি ভারতীয় দ্রাবিড় জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। শেষোক্ত সিদ্ধান্তটি সত্য হউক, মিথ্যা হউক, দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড় জাতির মধ্যে সর্পপূজা যে অতি প্রাচীন এবং বহু-প্রচলিত ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মোহেন-জো-দরোর অধিবাসীদের মধ্যে সর্পপূজার যে প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা হইতেও উপর্যুক্ত উক্তিটির পরিপূর্ণ সমর্থন মিলে। বিশেষত মাতৃ-তান্ত্রিক দ্রাবিড় জাতির মধ্যেই স্ত্রী-দেবতার পূজার প্রচলন স্বাভাবিক—পক্ষান্তরে

মনসার উদ্ভব

বৈদিক আর্য-সমাজে স্ত্রীদেবতার কোন স্থান ছিল না। কার্যক্ষেত্রেও দেখা যায়, সমগ্র ভারতবর্ষে একমাত্র দাক্ষিণাত্য এবং দ্রাবিড়-প্রভাবিত বাঙলা দেশেই স্ত্রীদেবতা মনসার পূজা প্রচলিত। দ্রাবিড়দের মধ্যে 'মুদম্মা' এবং 'মনে মঞ্চাম্মা' নামে দুইজন সর্পদেবীর অস্তিত্ব আছে। 'মনে মঞ্চাম্মা' অবশ্য কোন দেবী নহেন, এক অজ্ঞাত-পরিচয় সর্পের নাম,—কিন্তু, সর্পদেবীরূপেই তিনি পরিচিতা। শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহন সেন অনুমান করেন, 'মাঞ্চীদেবীকে সেখানে 'মঞ্চাম্মা' বা 'মন্‌চা অম্মা' অর্থাৎ মন্‌চা মাতা বলে। ইহারা 'চ'-কে প্রায় 'স'র মত উচ্চারণ করে। কাজেই 'মন্‌সা অম্মা' মন্‌সা মাতায় গিয়া দাঁড়ায়।'—শাস্ত্রী মহাশয়ের এই অনুমান অসঙ্গত নাও হইতে পারে। খ্রীষ্টপূর্বাব্দের কাত্যায়ন-রচিত বার্তিকের 'মনসা দিব্যতে...' হইতে কোন আলোক পাইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব মনে হয়, বৈদিক, বৌদ্ধ ও দ্রাবিড় প্রভাবের ফলেই বাঙলাদেশে মনসার সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছিল।

বাঙলাদেশে মনসাপূজার প্রচলন কবে হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা সুস্থিরভাবে বলা সম্ভব না হইলেও সেনরাজাদের রাজত্বকালেই যে অন্তত মনসামূর্তি নির্মিত হইয়াছিল, তাহা বিজয়সেন-নামাঙ্কিত মনসামূর্তি হইতেই অনুমান করা চলে। অসম্ভব নহে, দাক্ষিণাত্য হইতে আগত সেনবংশীয় রাজাদের সঙ্গেই মনসাপূজাও বাঙলাদেশে প্রবর্তিত হইয়াছিল। বিজয় সেন খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন, এইরূপ অনুমান করা চলে। এই মূর্তিটি ছাড়া আরও বহু মনসামূর্তি বাঙলাদেশ ও সন্নিহিত অঞ্চলসমূহ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রাচীনমূর্তি-সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন যে খ্রীষ্টীয় দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই এই সকল মূর্তি নির্মিত হইয়াছিল। এই সিদ্ধান্ত হইতে অনুমান করা চলে যে, বাঙলা দেশে যখন ব্যাপকভাবে মনসাপূজার প্রচলন হইল, তখনই সমসাময়িক কালে রচিত অথবা সংস্কৃত অর্বাচীন পুরাণগুলিতে মনসাদেবীর কাহিনী যুক্ত হইল। উক্ত পুরাণগুলির কোনটিই খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বে রচিত নহে বলিয়াই পণ্ডিতগণ মনে করেন। সংস্কৃত পুরাণে মনসা-কাহিনী যুক্ত হইবার ফলেই পরবর্তীকালে উচ্চবর্ণের হিন্দুরাও দেশ-ভাষায় মনসাকাহিনী বর্ণনা করিবার সাহস এবং উৎসাহ লাভ করিয়া থাকিতে পারেন।

বাঙলায় মনসাপূজা

মনসার উদ্ভব এবং বাঙলাদেশে ইহার পূজা-সম্বন্ধে এইভাবে একটা সম্ভাব্য ইতিহাস গড়িয়া তোলা সম্ভবপর হইলেও মনসামঙ্গল কাহিনীর উদ্ভব-সম্বন্ধে

আলোকপাত করা এখনও সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে না। সংস্কৃত পুরাণের প্রভাবে মনসামঙ্গলকাব্যের প্রথমাংশ রচিত হইয়া থাকিতে পারে; মহাভারতের আস্তীকমুনির কাহিনী হইতে মনসামঙ্গল-কাব্যের আরও কিছু উপাদান আহৃত হইয়া থাকিতে পারে,—কিন্তু উক্ত কাব্যের মূল কাহিনীটির উৎপত্তির উৎস কোথায়, তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। অনুমান, প্রাচীন কোন লৌকিক কাহিনীর উপর ভিত্তি করিয়াই মনসামঙ্গলকাব্যের মূল গল্পের কাঠামোটি গ্রহণ করা হইয়াছে। কাব্যের প্রধান পাত্রপাত্রীদের নাম—লখাই, বেহুলা, সায়বেনে, প্রভৃতি হইতে কাহিনীটির উপর অনার্য প্রভাবও অনুমান করা চলে। অন্তত পক্ষে, ব্রাহ্মণ্য-প্রধান সমাজ-ব্যবস্থায় যে গল্পটিকে খাপ খাওয়ানো যায় না, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। বাঙলা দেশের এবং সন্নিহিত অঞ্চলের বহুস্থানেই এমন অনেক গ্রাম বা প্রাচীন কীর্তির সন্ধান পাওয়া যায়, যাহাদের সহিত মনসামঙ্গলকাব্য-বর্ণিত চরিত্র অথবা ঘটনার সম্পর্কের কথা উল্লেখ করা হইয়া থাকে। ইহা হইতে অনেকেই অনুমান করেন যে মনসামঙ্গল কাব্যের মূল কাহিনীর কোন প্রাচীন ঐতিহাসিক ভিত্তি থাকাও অসম্ভব নহে।

কাহিনীর উদ্ভব

প্রচলিত মনসামঙ্গলের কাহিনী তিনখণ্ডে বিভক্ত—প্রথম খণ্ডে পৌরাণিক কাহিনী—ইহাতে মনসার উৎপত্তি-আদি ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে মনসার মর্ত্যলোকে পূজা-প্রচার-প্রসঙ্গে চাঁদ সদাগরের সহিত সংঘর্ষের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। তৃতীয় খণ্ডে বেহুলা ও লখীন্দরের কাহিনী পরিবেশন করা হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন যে মূল মনসামঙ্গল কাব্যে শঙ্কর গাড়রী ও নেতা ধোপানীর কাব্য আরও অনেক বেশি প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল—পরবর্তীকালে চাঁদসদাগরের ও বেহুলা-লক্ষীন্দরের কাহিনীই মূল কাহিনীর সবটুকু অধিকার করিয়াছে। কাহিনীতে পাওয়া যায়, শৈব চন্দ্রধর মনসার শাপে চম্পকনগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার স্ত্রী সনকা মনসাপূজার আয়োজন করিয়াছেন বলিয়া শৈব চন্দ্রধর পদাঘাতে মনসার ঘট ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। ইহাতে রুষ্ট মনসা অতিশয় প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া চাঁদের শত্রুতাসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। মনসার রোষ-বহ্নিতে চাঁদের গুয়াবাড়ি বিধ্বস্ত হইল; চাঁদের পরমবন্ধু ধন্বন্তরী ওঝা মনসার কৌশলে নিহত হইলেন। তবুও ছিল চাঁদের মহাজ্ঞান,—মনসা নটীর ছদ্মবেশে চাঁদকে ভুলাইয়া তাহার মহাজ্ঞানও হরণ করিলেন। ইহার পর মনসা কৌশলে

অন্নে বিষ মিশ্রিত করিয়া চাঁদের ছয়পুত্রকে হত্যা করিলেন। চাঁদ সদাগর তবুও অটল,—শিবের প্রতি তার ভক্তি অচলা,—মনসা তাহার নিকট অতিশয় ঘৃণার পাত্র। কিন্তু চাঁদের অজ্ঞাতে সনকা মনসার পূজা করিয়া পুত্রবর লাভ করিলেন। সর্পের দেবতা অনিরুদ্ধ লক্ষীন্দর বা লখাই-রূপে তাহার গর্ভে স্থান লাভ করিলেন, আর অনিরুদ্ধ-পত্নী উষা সায়বেনের ঘরে জন্ম লইলেন। চাঁদ সদাগর চোদ্দ ডিঙ্গা সাজাইয়া বাণিজ্যে বাহির হইয়াছেন। বাণিজ্যে প্রচুর লাভ করিয়া চাঁদ যখন ফিরিয়া আসেন, তখনও পথিমধ্যে মনসা চাঁদের পূজা প্রার্থনা করিয়াছেন,—কিন্তু চাঁদ অবিচল। মনসার রোষ রুদ্ররূপ ধারণ করিল—চাঁদের চোদ্দডিঙ্গা সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইল। চাঁদ সদাগরের মৃত্যুই ঘটিত—কিন্তু চাঁদের মৃত্যু হইলে মর্ত্যলোকে মনসার পূজাপ্রচারের কোন সম্ভাবনা নাই বলিয়া মনসাই চাঁদকে বাঁচাইয়া রাখিলেন। অনাহারক্লিষ্ট চাঁদ দেশে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, পুত্র লক্ষীন্দর পূর্ণ যৌবনে উপনীত হইয়াছে। তিনি সায়বেনের কন্যা বেহুলার সহিত লক্ষীন্দরের পরিণয়কার্য সম্পন্ন করিয়া বরবধুকে লোহার বাসরে আবদ্ধ রাখিলেন। কিন্তু মনসার নির্মমতায় বিবাহরাত্রে লোহার বাসরেই সর্পাঘাতে লক্ষীন্দর প্রাণ হারাইল। বেহুলা স্বামীর প্রাণ ফিরাইয়া আনিবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়া স্বামীর মৃতদেহ কলার ভেলায় ভাসাইয়া চলিল স্বর্গের উদ্দেশ্যে—আত্মীয়-স্বজনদের কোন অনুরোধই বেহুলা গ্রাহ্য করিল না। পথের বহু বাধা বিপত্তি, ভয়-প্রলোভনকে জয় করিয়া বেহুলা পৌঁছিল নেতাধোপানীর ঘাটে। তারপর নেতার সহায়তায় বেহুলা দেবরাজের সভায় উপনীত হইয়া নৃত্যে দেবতাদের তুষ্ট করিয়া স্বামীর প্রাণভিক্ষা লইল। তাহাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হইল, দেশে ফিরিয়া শ্বশুরকে দিয়া বেহুলা মনসার পূজা করাইবে। এইবার বেহুলা পুনর্জ্জীবিত স্বামীকে সঙ্গে লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিল। পুত্রবধূর সাধনায় চাঁদের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটিল, তিনি মনসার পূজা করিলেন।

মনসামঙ্গলের কাহিনী

মনসামঙ্গল-কাহিনীর মূল উদ্দেশ্য, মনসার পূজাপ্রচার। দেবতার মধ্যে যে সকল দিব্যগুণের সমাবেশ ঘটিলে ভক্তের প্রাণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ভক্তিতে দেবতার উদ্দেশ্যে লুটাইয়া পড়ে, বলাবাহুল্য, মনসার মধ্যে তাহাদের একটিও যদি বর্তমান থাকিত, তবে হয়তো কাহিনী-বর্ণনার প্রয়োজনই হইত না। সর্প-দেবতা মনসার চরিত্র সর্পের মতই খল,কুটিল,ক্রুর ও প্রতিহিংসাপরায়ণ। ভক্তিতে নহে, ভয় দেখাইয়া তিনি চাঁদসদাগরের পূজা লাভ করিতে

চাহিলেন। ভয়ের সঙ্গে প্রলোভন, কাকুতি-মিনতি, অনুরোধ-উপরোধ —মনসার পক্ষ হইতে ইহাদের কোনটিরই অভাব ঘটিল না,—কিন্তু আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী মূর্তিমান পুরুষকার এবং স্বীয় অভীষ্টদেবতার প্রতি একান্তভাবে নির্ভরশীল শৈবসাধু চাঁদ সদাগর মনসার প্রতি আকৃষ্ট হইবার কোন সঙ্গত কারণ পাইলেন না। অথচ, বৈশ্যসম্প্রদায়ের কর্ণধার চাঁদ-সদাগরের পূজা লাভ করিতে না পারিলে মর্ত্যলোকে মনসার পূজা প্রচারিত হইবেনা। অতএব মনসার মনে আর কোন দ্বিধা নাই, দ্বন্দ্ব নাই,—বিচার-বুদ্ধি-রহিত হইয়া তিনি প্রবলপরাক্রমে চাঁদসাগরের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলেন। সংগ্রামক্ষেত্র চাঁদসদাগরের হৃদয়,—অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী মনসা অদৃশ্যলোকে থাকিয়া চাঁদসদাগরকে আঘাতের পর আঘাত করিয়া চলিয়াছেন। আঘাতে আঘাতে চাঁদের দেহমন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কিন্তু মাথা তাহার তিলমাত্র নত হয় নাই। মনসাই চাঁদের নিয়তি—চাঁদ সমগ্র পুরুষকার লইয়া নিয়তির প্রতিটি আঘাতকে প্রতিহত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থের সমাপ্তিতে চাঁদ মস্তক নত করিয়াছেন। মনসার প্রবল উন্মত্ততার কাছে এই আত্মসমর্পণ নহে। চাঁদ স্নেহের পারবশ্যই স্বীকার করিয়াছেন। আদর্শবাদী চাঁদ মনসার বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত হইয়াছিলেন,—এই সংগ্রামে তাহার প্রতিপক্ষ নিয়তি—স্নেহ-দয়া-মায়া যে সকল দিব্যগুণ নরত্বকে দেবত্বের মহিমায় উন্নীত করে, চাঁদের মধ্যে সেই সকল গুণের সমাবেশ ঘটিয়াছিল বলিয়াই তিনি নিয়তির অত্যাচারকে উপেক্ষা করিয়াও স্নেহের দাবিতেই নিয়তির নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন। নিয়তির হাতে পুরুসকারের এই চরম লাঞ্ছনার মধ্যেও মনুষ্যত্বের জয় ঘোষিত হইয়াছে। আবার চাঁদসদাগরের সমস্ত কিছু ফিরিয়া পাইবার মধ্যেও ট্র্যাজেডীর মর্মন্তুদ হাহাকার লুক্কায়িত থাকে নাই। বস্তুত, মনসামঙ্গলকাব্যে মনসার যে চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে, সমগ্র মঙ্গলকাব্যে তেমন অপকৃষ্ট দেবচরিত্র যেমন আর একটিও নাই, তেমনি চাঁদসদাগরের মত মহিমোজ্জ্বল, পুরুষকারের জীবন্ত বিগ্রহ অথচ স্নেহ-পরবশ চরিত্রও একটি নাই। সমগ্র মধ্যযুগের বাঙলাসাহিত্যে চাঁদসদাগর-চরিত্র এই প্রদীপ্ত মহিমায় ভাস্বর। কাহিনীর খাতিরে যদি তাহাকে শেষ পর্যন্ত নিয়তির কাছে পরাভব স্বীকার করিতে না হইত, তবে আমরা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতে পারিতাম যে, পাঁচশতাব্দী-পূর্বেই বাঙলাসাহিত্যে মানবিকতার জয় ঘোষিত হইয়াছে।

মনসা পূজা ও সামাজিক পটভূমি

চাঁদসদাগর

কানা হরি দত্ত ঃ

মনসামঙ্গল কাব্যের আদি কাব্যকার সম্ভবত কানা হরি দত্ত। বিজয় গুপ্তের 'মনসামঙ্গল' বা 'পদ্মাপুরাণ' কাব্যে পাওয়া যায়—

মূর্খে রচিত গীত না জানে মাহাত্ম্য।
প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত্ত॥
হরিদত্তের যত গীত লুপ্ত হইল কালে।
যোড়া গাঁথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে॥

বিজয় গুপ্ত ছাড়া পুরুষোত্তম নামক একজন গায়েনের রচনায়ও পাওয়া যায়—

কানা হরিদত্ত হরির কিঙ্কর
মনসা হউক সহায়।
তার অনুবন্ধ লাচাড়ির ছন্দ
শ্রীপুরুষোত্তম গায়॥

বিজয়গুপ্তের জীবৎ-কাল-সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ হস্তগত হইয়াছে তাহাতে তাহাকে চৈতন্য-পূর্ববর্তী কবি বলিয়াই বিশ্বাস করা হয়। অতএব বিজয় গুপ্তের কালেই যদি হরিদত্তের গীত লুপ্ত হইয়া থাকে, তবে তিনি যে বিজয় গুপ্ত অপেক্ষাও অন্তত শতাব্দীকাল পূর্বে বর্তমান ছিলেন, তাহাতে সন্দেহের কোন কারণ থাকিতে পারে না। অসম্ভব নহে, হরিদত্ত হয়তো আদি-মধ্যযুগেরও পূর্ববর্তী যুগান্তর কালে বর্তমান থাকিয়া তাহার 'গীত' রচনা করিয়াছিলেন—কিন্তু ইহাও অনুমান মাত্র। বিজয়গুপ্ত যদিও উল্লেখ করিয়াছেন যে হরিদত্তের গীত সমস্ত লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তাহা সম্ভবত সত্য নহে। কারণ সাম্প্রতিক কালেও 'হরিদত্ত' ভনিতাযুক্ত কিছু কিছু রচনার সন্ধান পাওয়া যায়। হরিদত্তের রচনার অংশবিশেষ মাত্র পাওয়া যায় বলিয়াই তাহার কাব্যের পরিচয় দান সম্ভব নহে। তবে প্রাপ্ত অংশ হইতে অন্তত অনুমান করা চলে যে, কানা হরিদত্ত যেমন মূর্খ ছিলেন না, তেমনি তাহার রচনায় যে যোড়া-গাঁথা কিছুই ছিল না, এই অপবাদও মিথ্যা। ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে 'দাস হরিদত্ত' ভনিতাযুক্ত 'কালিকামঙ্গল' পুঁথির গ্রন্থকার হরিদত্ত এবং মনসামঙ্গল-রচয়িতা হরিদত্ত অভিন্ন। প্রকৃতই যদি এইরূপ হইয়া থাকে, তবে হরিদত্তের পাণ্ডিত্য-সম্বন্ধেও সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। হরিদত্তের ভনিতাযুক্ত সকল রচনাই ময়মনসিংহ জেলায় পাওয়া গিয়াছে বলিয়া, অন্ত

হরিদত্তের কাল ও পরিচয়

কোন প্রবলতর প্রমাণের অভাবে, এই সিদ্ধান্তই করিতে হয় যে, হরিদত্ত ময়মনসিংহ জেলার অধিবাসী ছিলেন।

বিজয়গুপ্ত ঃ সন তারিখযুক্ত মনসামঙ্গলকাব্যের প্রাচীনতম নিদর্শন বিজয়গুপ্ত-রচিত পদ্মাপুরাণ'। বিজয় গুপ্তের রচনায় যে কালবাচক পয়ারটি পাওয়া যায়, তাহার বিচিত্র পাঠান্তর বিজয়গুপ্তের কালনির্ণয়ে প্রবল বাধার সৃষ্টি করিয়াছে। উক্ত পয়ারের প্রথম পংক্তিতে এই বিপত্তি—

(১) ঋতু শূন্য বেদ শশী শক পরিমাণ। (১৪০৬ শক = ১৪৮৪ খ্রীঃ)

(২) ঋতু শশী বেদ শশী শক পরিমাণ। (১৪১৬ শক = ১৪৯৪ খ্রীঃ)

(৩) ছায়াশূন্য বেদ শশী শক পরিমাণ।—এইরূপ আরও অনেক পাঠান্তর পাওয়া যায়, যাহাদের অর্থ নির্ধারণ কষ্টকর।

পয়ারের দ্বিতীয় পংক্তিতে আছে,—

'সুলতান হোসেন শাহ্ নৃপতি তিলক।'

সুলতান হোসেন শাহের সঙ্গে যোগ রাখিতে হইলে দ্বিতীয় পাঠান্তরই গ্রহণ-যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। হোসেন শাহ ১৪৯৩ খ্রীঃ—১৫১৮ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। অতএব বিজয়গুপ্ত ১৪৯৪ খ্রীঃ কাব্য রচনা করেন,—ইহাই মোটামুটি সিদ্ধান্ত। বিজয়গুপ্তের পুঁথির কোন প্রাচীন পাণ্ডুলিপি পাওয়া না যাওয়ায় ড° সেন বিজয়গুপ্তের প্রাচীনত্ব-সম্বন্ধে নিঃসংশয় নহেন। বিজয়গুপ্ত কবি না হইয়া গায়কও হইতে পারেন, ড° সেনের মনে এই সন্দেহও বর্তমান। বিজয় গুপ্তের রচনার কালবাচক অংশের প্রামাণিকতাও তাঁহার মতে অবিসম্বাদিত নহে। বিজয়গুপ্ত তাঁহার কাব্যে আত্মবিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায় যে কবি বরিশাল জেলার গৈলাফুল্লশ্রী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবির পিতা সনাতন, মাতা রুক্মিনী—কবি বৈদ্য-বংশজাত। হরিদত্ত-সম্বন্ধে বিজয়গুপ্তের উক্তিতে অশ্রদ্ধার পরিচয় থাকিলেও কাব্যের অলঙ্কারাদি-সম্বন্ধে যে বিজয়গুপ্ত শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন, তাহা উক্ত উক্তিটি হইতেই অনুমান করা যায়। বস্তুত, পাণ্ডিত্যাভিমানী বিজয়গুপ্ত তাহার কাব্যে অলঙ্কার, মিল ইত্যাদি ব্যাপারে অতি সতর্কতারই পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। বিজয়গুপ্ত ভাবভূয়িষ্ঠ বাগ্‌বিন্যাসেও যথার্থ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার রচনার কোন্ কোন অংশ এখনও পর্যন্ত প্রবাদ-বাক্যরূপে প্রচলিত থাকিয়া উক্তিটির যথার্থতা প্রতিপাদন করিতেছে। সমসাময়িক যুগ ও জীবন হইতে কবি যে অভিজ্ঞতা আহরণ করিয়াছিলেন, কাব্যে তাহার পরিচয় বর্তমান।

বিজয় গুপ্তের আত্মপরিচয়

তাহার অঙ্কিত সামাজিক চিত্রগুলির অংশবিশেষ রুচিবিগর্হিত বলিয়া মনে হইলেও ইহাদের বাস্তবতা নিঃসংশয়িত। এই প্রসঙ্গে তিনি যে রসিকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা স্থূল হইলেও যে সমসাময়িক যুগের পক্ষে বেমানান হয় নাই তাহাও অস্বীকার করা যায় না। বিজয়গুপ্তের দৃষ্টি ছিল বৈচিত্র্যের প্রতি। তাই সমগ্র কাহিনীটি যেন অনেকগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ-প্রায় পালায় বিভক্ত হইয়া আছে। কাহিনী-পরিকল্পনা হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার ইত্যাদি প্রায় সর্বত্রই কবির বৈচিত্র্য-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। ছন্দের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বিজয়গুপ্ত সমসাময়িক অন্যান্য কবিদের অপেক্ষা অনেকটা অগ্রগামী—এই বিষয়ে পরবর্তীকালের ভারতচন্দ্রকে তাহার সার্থক উত্তরসূরী বলিয়া অভিহিত করা চলে।

কাব্যবিচার

বিজয়গুপ্ত মনসার একনিষ্ঠ উপাসক ছিলেন বলিয়া মনে হয়। কারণ রচনায় কবির সহানুভূতি চাঁদ অপেক্ষাও মনসার প্রতিই যে অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিজয়গুপ্ত দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, মনসা জন্মাবধি এমন কতকগুলি প্রতিকূল শক্তি-দ্বারা নির্যাতিত হইয়াছেন যে পরবর্তীকালে তাঁহার নিরুদ্ধ চিত্তবেদনাই তাঁহাকে এমন প্রতিহিংসাপরায়ণ ও নিষ্ঠুর করিয়া তুলিয়াছে। অন্যান্য দেব-চরিত্রাঙ্কনেও বিজয়গুপ্ত অনেকটা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়াছেন। মনে হয় মনসামঙ্গলের প্রধান কবিদের মধ্যে বিজয়গুপ্তই চাঁদ সদাগরের প্রতি সর্বাধিক অবিচার করিয়াছেন। তাহার হাতে চাঁদ সদাগর শেষ পর্যন্ত এমন ভাবে মনসার ভক্ত বনিয়া গিয়াছেন যে, চাঁদের পূর্ববর্তী চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান অসম্ভব হইয়া পড়ে। তবে এই সমস্ত সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হয় যে মনসামঙ্গলকাব্যের কবিদের মধ্যে ব্যাপকতায় ও জনপ্রিয়তায় বিজয়গুপ্তই শ্রেষ্ঠ।

নারায়ণ দেবঃ মনসা মঙ্গল কাব্যের অন্যতম প্রধান কবি নারায়ণদেব। নারায়ণদেবের গ্রন্থে আত্মপরিচয় অংশে কবি নিজের যে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, ময়মনসিংহ জেলার বোরগ্রামে কবির বাসস্থান ছিল। তাহার পূর্বপুরুষগণ রাঢ় দেশ হইতে বোরগ্রামে আসিয়াছিলেন। কবির পিতা নরসিংহদেব, মাতা রুক্মিনী। কবি জাতিতে কায়স্থ। সম্ভবত তাহার উপাধি ছিল সুকবিবল্লভ। কবির গ্রন্থে কোন কালবাচক ভণিতা না থাকায় তাঁহার কালনির্ণয়ে বহিঃপ্রমাণের উপরই একান্ত ভাবে নির্ভর করিতে

পরিচয়

হয়। ডক্টর ভট্টাচার্য কবির বংশধরগণের নিকট হইতে যে বংশতালিকা উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা হইতে অনুমিত হয়, কবি অন্তত সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন। তাঁহার কাব্যে চৈতন্যদেবের উল্লেখ বা প্রভাবের পরিচয় নাই, এমন কি পূর্ববর্তী কোন মঙ্গলকাব্যেরও উল্লেখ নাই। ইহা হইতেই বোঝা যায় যে তিনি চৈতন্য-পূর্ববর্তী কালে বর্তমান ছিলেন। সম্ভবত তিনি যখন কাব্যটি রচনা করেন, তখনও পর্যন্ত হরিদত্তের নাম তাহার কানে পৌঁছায় নাই। এই সমস্ত কারণে কেহ কেহ নারায়ণদেবকে বিজয় গুপ্তেরও পূর্ববর্তী বলিয়া মনে করেন। ড° সেন কোনরূপ কাল-বিচার না করিয়াই নারায়ণদেবকে ষোড়শ শতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। অসমীয়া ভাষায় নারায়ণদেবের গ্রন্থ সুলভ বলিয়া আসামবাসীগণ নারায়ণদেবকে অসমীয়া বলিয়াই উল্লেখ করিয়া থাকেন। অথচ নারায়ণদেবের নিজের রচনাতেই উল্লেখ আছে যে তিনি বঙ্গদেশীয়। অবশ্য এই প্রসঙ্গে বলা চলে

সমস্যা

যে নারায়ণদেব বাঙলাদেশের যে অঞ্চলে বাস করিতেন, তাহা আসামের শ্রীহট্ট জেলার অতি সন্নিহিত; কাজেই তাঁহার রচনায় আসামের প্রভাব পড়া বিচিত্র নহে। তবে তিনি আসামে কোচ-বংশীয় দরঙ্গ সভায় বর্তমান থাকিয়া তাহার মনসা-পাঁচালী বা পদ্মাপুরাণ অসমীয়া ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া যে প্রবাদটি প্রচলিত আছে, তাহা যথার্থ না হওয়াই সম্ভব। কারণ, তাহা হইলে কবিকে সপ্তদশ শতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত করিতে হয়। অথচ তিনি যে তৎপূর্বেই বর্তমান ছিলেন, তাহার প্রমাণ পরবর্তী মনসামঙ্গল কাব্যকারদের রচনাতেই সুলভ। হয়তো, কবির প্রসিদ্ধির জন্যই পরবর্তীকালে কেহ তাহার কাব্যকে অসমীয়া ভাষায় অনুবাদ করিয়া থাকিতে পারেন।—নারায়ণদেব একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছেন যে তিনি সংস্কৃত পুরাণ হইতেই তাহার কাব্যের বিষয় গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু কোন সংস্কৃত পুরাণেই এই কাহিনীর উল্লেখ না থাকায় অনুমিত হয়, যে, মূলে কাহিনীটি সংস্কৃতভাষার কোন উপপুরাণ কিংবা স্থানীয় পুরাণে বিবৃত হইয়াছিল। অন্যান্য বহু পুরাণ-উপপুরাণের মত এইটিও বিলুপ্ত হইয়া গিয়া থাকিতে পারে। নারায়ণদেবের কাহিনী মোটামুটি অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মত হইলেও ইহাতে এমন কতকগুলি অস্পষ্টতা এবং সংক্ষিপ্ততা আছে যে, স্বভাবতই মনে হয়, মঙ্গলকাব্যের ধারা সৃষ্টি হইবার পূর্বেই তিনি কাব্যটি রচনা করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে তাহার কাহিনীর জনপ্রিয়তার জন্য ইহাতে বহু প্রক্ষিপ্ত রচনা প্রবেশাধিকার পাইয়াছে। আগাগোড়া

নারায়ণদেবের ভনিতাযুক্ত কোন পুঁথিই আর এখন সুলভ নয়। কাব্যক্ষেত্রে ইতোপূর্বে কোন সুনির্দিষ্ট আদর্শরূপ বর্তমান না থাকায় কবির কাব্যটি যেন অনেকটা শ্লথবদ্ধ। কাহিনী, অলঙ্কার কিংবা বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের প্রতিও কবির দৃষ্টি যে খুব সচেতন ছিল, তাহাও মনে হয় না। কিন্তু নারায়ণদেবের যে পাণ্ডিত্যের অভাব ছিল, তাহাও নহে। তাহার পাণ্ডিত্য কখনও কাব্যের উপর দুর্ভার হইয়া বসে নাই। নারায়ণদেবের কবিত্ব ছিল সহজ। সহজ কবিত্বের প্রকাশে এবং করুণরস-সৃষ্টিতে নারায়ণদেব সত্যসত্যই অতুলনীয়। নারায়ণদেবের সর্বাধিক কৃতিত্ব চাঁদসদাগরের চরিত্রাঙ্কনে। তাহার কাব্যের নায়ক চাঁদসাগর। একমাত্র নারায়ণদেবের কাব্যেই চাঁদচরিত্র পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। মনসা-বিদ্বেষী চাঁদ স্নেহের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়া শেষ পর্যন্ত মনসার পায়ে অঞ্জলি দান করিয়াছেন, কিন্তু শ্রদ্ধায় মাথা নত হয় নাই। বস্তুত পরাজয় স্বীকার করিলেও এখানে চাঁদসদাগর আপনার মনুষ্যত্বকে কখনও বিকাইয়া দেন নাই। এক মাত্র নারায়ণদেবের গ্রন্থেই চাঁদ-চরিত্রের এই পূর্বাপর সঙ্গতি বজায় আছে।

কাব্য বিচার

বিপ্রদাস ঃ চৈতন্য-পূর্ববর্তী কালের আর একজন মনসামঙ্গল-কাব্যকার কবি বিপ্রদাস পিপিলাই। বিপ্রদাসের গ্রন্থে যে আত্মপরিচয়-জ্ঞাপক পয়ারটি আছে তাহা হইতে জানা যায় যে কবি, হোসেন শাহের রাজত্বকালে ১৪৯৫ খ্রীঃ তাহার গ্রন্থ রচনা করেন ঃ

সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ।
নৃপতি হোসেন শাহা গৌড়ের প্রধান।

কিন্তু গ্রন্থের মধ্যে প্রক্ষেপ-বাহুল্যের জন্য এবং কালজ্ঞাপক পয়ারটির স্বপক্ষে অপর কোন প্রমাণের অস্তিত্ব নাই বলিয়া ডক্টর ভট্টাচার্য অনুমান করেন যে কাব্যটি একান্তই অর্বাচীন। ইহাতে এমন কতকগুলি স্থানের নাম পাওয়া যায়, যেগুলি নিতান্তই আধুনিক। আবার বিপ্রদাসের রচিত কোন প্রাচীন পুঁথিরও সন্ধান পাওয়া যায় না। ইহা হইতে ড° ভট্টাচার্যের অনুমান, বিপ্রদাসের জীবৎকাল উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হওয়াও বিচিত্র নহে। কিন্তু ড° সেন বিপ্রদাসের কালজ্ঞাপক পয়ারটির প্রামাণিকতায় এতই আস্থাবান যে তিনি বিপ্রদাসকেই মনসামঙ্গল কাব্যের 'আদি কবি' বলিয়া মনে করেন। এই বিশ্বাসে তিনি বিপ্রদাসের রচনা বিস্তৃতভাবে উদ্ধার

করিয়াছেন। বিপ্রদাসের আত্মপরিচয় হইতে জানা যায় যে কবির নিবাস ছিল চব্বিশপরগণা জেলার বাদুড়্যা (নাদুড়্যা) বটগ্রামে। কবির পিতার নাম মুকুন্দ পণ্ডিত, জাতিতে ব্রাহ্মণ। স্থানীয় অঞ্চলে এখনো নাগপঞ্চমীর দিন হইতে আরম্ভ করিয়া নয় দিন পর্যন্ত বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গল' গীত হইয়া থাকে। কবির রচনায় যে সর্প-সজ্জার বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা মনোজ্ঞ। কবি চাঁদের বাণিজ্য-যাত্রাপ্রসঙ্গে যে পথের বর্ণনা করিয়াছেন. তাহাতে নূতনত্ব আছে। এই যাত্রাপথে কলিকাতার নামও বর্তমান। সম্ভবত বাঙলাকাব্যে ইহাই কলিকাতার প্রাচীনতম উল্লেখ। বিপ্রদাসের কবিত্ব-শক্তিও অবজ্ঞেয় নহে।

পরিচয় ও কাব্যবিচার

অধ্যায় ঃ

ছয়

গৌড়দরবার ও বাঙলা সাহিত্য

রাষ্ট্র-বিপর্যয়ে যেমন দেশের শিল্প-সাহিত্যের সমূহ ক্ষতি সাধিত হয়, তেমনি দেশে সুশাসন অব্যাহত থাকিলে শিল্প-সাহিত্যেরও সমৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। বস্তুত এই জন্যই দেখা যায় যে, ঘনঘন রাজনৈতিক বিধি-ব্যবস্থার পরিবর্তন কিংবা অরাজকতা দেশের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অনেক সময়ই সর্বনাশের কারণ হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে রাজন্যবর্গের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা শিল্পসাহিত্যের প্রভূত উন্নতি বিধান করিয়া থাকে। বাঙলাদেশের ইতিহাস আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে, রাষ্ট্র-যন্ত্র যতবার হস্তান্তরিত হইয়াছে, ততবারই সাহিত্যের ইতিহাসেও গতিপথের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর আরম্ভে, হিন্দু রাজত্বের অবসানে বাংলা দেশে যে যুগান্তর দেখা দিয়াছিল, দীর্ঘদিনের অরাজকতা ও দুঃশাসনের ফলে সেই যুগে আর কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্য রচিত হইল না। আবার ইলিয়াস-শাহী শাসন প্রবর্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে যেমন দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপিত হইল তেমনি প্রায় সমসময়েই বাঙলা সাহিত্যেও নবজাগরণ দেখা দিল। ইলিয়াস বংশের অবসানের পর কিছু বিরতি-সহ যথাক্রমে রাজা গণেশ ও তাহার বংশধরগণ এবং সুলতান হোসেন শাহ ও তাহার বংশধরগণ গৌড়ের সিংহাসনে আসীন ছিলেন। হোসেন শাহের বংশের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙলাদেশে কার্যত স্বাধীন সুলতানী আমল তথা পাঠান শাসনকালের সমাপ্তি ঘোষিত হইল। এই সুলতানী শাসনকালে বাঙলাদেশে মোটামুটি সুশাসন চলিয়াছিল,—এই কালে রচিত বাঙলা সাহিত্যেও তাহার প্রতিফলন দেখা যায়। রাষ্ট্র-যন্ত্র ইহার পর মুঘল সম্রাটদের হাতে চলিয়া গেল,—বাঙলা সাহিত্যও আবার স্পষ্টত মোড় ঘুরিল। পাঠান-শাসনকাল বাংলা সাহিত্যের 'আদি-মধ্যযুগ' এবং মুঘল শাসনকাল 'অন্ত্য-মধ্যযুগ' নামেই অভিহিত হয়।

যুগপরিবর্তন ও সাহিত্য

হিন্দু রাজত্বকালে শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মোটামুটি পূর্বতন

কাঠামোই বজায় ছিল। কিন্তু সুলতানী আমলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিল। পূর্বে দেশে শিক্ষাসংস্কৃতি ও সাহিত্যের ভাষা ছিল সংস্কৃত। কিন্তু মুসলমান শাসকদের নিকট সংস্কৃত ভাষার তেমন কোন আবেদন ছিল না। অনুমান, দেশের প্রজাসাধারণের নিত্যব্যবহার্য বাঙলা ভাষার প্রতিই তাহারা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। আর এই কারণেই, সমসাময়িক গৌড়াধিপতিদের অনেকেই যে বাঙলাভাষার সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া গিয়াছেন, তাহার বহু লিখিত প্রমাণ বর্তমান।

গৌড়েশ্বরদের মাতৃভাষা-চর্চায় পৃষ্ঠপোষকতা

মুসলমান শাসকগণ বিধর্মী এবং বিজাতি হইলেও বাঙলাদেশ আপনাদের কর্মভূমি ছিল বলিয়া তাঁহারা হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে বহু বাঙালীকেই রাজ সভায় স্থান দান করিয়াছেন, এবং সাহিত্য-রচনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। এমনও দেখা গিয়াছে, রাজার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ না থাকিলেও কোন কোন কবি সশ্রদ্ধভাবেই রাজার নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

ইলিয়াস শাহী বংশের প্রথম দিকের কোন নরপতি সক্রিয়ভাবে বাঙলার কোন কবিকে কাব্য-রচনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না, কিন্তু পরবর্তী নরপতিদের কেহ কেহ যে কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইলিয়াস-শাহী বংশের মাঝখানেই কিছুকালের জন্য হিন্দু রাজা গণেশ এবং তাহার মুসলমান বংশধরগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন। বাঙলার আদি কবি কৃত্তিবাস যে গৌড়েশ্বর-দরবারে উপনীত হইয়া রাজার আদেশ ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়া বাঙলা ভাষায় প্রথম রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা কৃত্তিবাস স্বয়ং শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কৃত্তিবাসের পৃষ্ঠপোষক গৌড়েশ্বর যে কে ছিলেন, তাহা এখন আর সঠিক ভাবে বলা সম্ভব নহে। ড° সেন অনুমান করেন, ঐ সময় গৌড়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন বাঙলার একমাত্র হিন্দু রাজা গণেশ বা কংস। পরে গণেশের পুত্র যদু পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন; তিনি রাজনৈতিক বা অন্য কোন কারণে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া 'জালালুদ্দিন' নামে পরিচিত হইলেন। তিনি কোন কবির পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন কিনা তাহার কোন প্রমাণ নাই। তবে তিনিও যে বিদ্বান্ পণ্ডিতদের রাজসভায় শ্রদ্ধার আসন দান করিতেন, তাহার প্রমাণ আছে। গণেশ রাজদরবারে পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতার যে নজীর স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা দীর্ঘকাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল বলিয়াই জানা যায়।

রাজা গণেশ

রায়মুকুট বৃহস্পতি নামক বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত জালালুদ্দিন (গৌড়াবনী-বাসব) -এর নিকট হইতে যথাক্রমে আচার্য, কবি চক্রবর্তী, পণ্ডিত সার্বভৌম, কবি-পণ্ডিতচূড়ামণি, মহাচার্য, রাজপণ্ডিত এবং সর্বশেষ রায়মুকুটমণি উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

গণেশের বংশধরদের হাত হইতে গৌড়ের শাসনভার আবার ইলিয়াস-শাহী রাজবংশের হাতে চলিয়া গেল। এই বংশের রুকনুউদ্দিন বারবাক্ শাহ্ অথবা তৎপুত্র য়ুসুফশাহ্ 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' গ্রন্থ-রচয়িতা মালাধর বসুকে 'গুণরাজখান' উপাধি দান করেন। মালাধর বসু কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিয়াছেন 'গৌড়েশ্বর দিল নাম গুণরাজখান।'

হোসেনশাহ্ বাঙলার মুসলমান সুলতানদের মধ্যে সর্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে একদিকে যেমন বাঙলাসাহিত্য প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তেমনি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবও তাঁহার রাজত্ব-কালের একটি বিশিষ্ট ঘটনা। পূর্ববর্তী গৌড়েশ্বরদের মত তিনি কোন কবিকে রাজসভায় বিশেষ কোন সম্বর্ধনা করিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না; তবে তাঁহার রাজসভায় যে সমসাময়িক যুগের অনেক কবি ও পণ্ডিতব্যক্তি বিশিষ্ট রাজপদ বা সম্মান লাভ করিতেন, তাহা জানা যায়। হোসেন শাহের দরবারে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন, এমন অনেক সংস্কৃতজ্ঞপণ্ডিতেরও সন্ধান পাওয়া যায়। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই উৎকৃষ্ট সংস্কৃত কাব্য সাহিত্য রচনা করিয়াছেন। গৌড়দরবারের দবীর খাস (Private Secretary) সনাতন গোস্বামী এবং সাকর মল্লিক (Chief Secretary) রূপ গোস্বামী বাঙলার বৈষ্ণব-সমাজে অতি উচ্চ আসন লাভ করিয়া থাকেন। এই দুই ভাই ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম। কনিষ্ঠ রূপ গোস্বামী কয়েকটি উৎকৃষ্ট সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন—ইহাদের মধ্যে উদ্ধবসন্দেশ ও গীতাবলী প্রধান। এই যুগের আরও কয়েকজন সংস্কৃত-ভাষার কবিও গৌড়-দরবার অলঙ্কৃত করিতেন বলিয়া জানা যায়। সুলতান হোসেন শাহের একজন কর্মচারী ছিলেন শ্রীখণ্ড-নিবাসী যশোরাজ খান। যশোরাজ খান একটি ব্রজবুলির পদে শ্রদ্ধার সহিত হোসেন শাহের কথা স্মরণ করিয়াছেন। বাঙলা মনসামঙ্গল কাব্যের প্রধান দুই কবি বিজয়গুপ্ত এবং বিপ্রদাস পিপিলাই। ইঁহারাও নিজেদের রচনার কালবাচক পয়ারে শ্রদ্ধার সহিত হোসেন শাহের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। হোসেন শাহ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইবার স্বল্পকাল মধ্যেই যে সমগ্র গৌড়বঙ্গে তাঁহার

হোসেন শাহ্

কীর্তি ঘোষিত হইয়াছিল, আলোচ্য শ্লোকাংশ দুইটি হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

সুলতান হোসেন শাহের পুত্র নসরৎশাহ্‌ও যে বাঙলার কবিদের পৃষ্ঠ-পোষকতা করিতেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় বাঙলার 'ছোট বিদ্যাপতি' কবিরঞ্জনের একটি রচনায়। কবিরঞ্জন নসরৎ শাহের কর্মচারী ছিলেন। নসরৎ শাহের পুত্র ফিরোজ শাহ্‌ মাত্র অল্প কয় দিন রাজত্ব করিলেও যে কাব্যানুরাগী ছিলেন এবং কবিদের উপযুক্ত সমাদর করিতেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় কবি শ্রীধরের রচনায়। তিনি নসির সাহার পুত্র 'রাজা শ্রীফেরোজ সাহা'র সপ্রশংস উল্লেখ করিয়াছেন।

নসরৎ শাহ,
ফিরোজ শাহ

হোসেন শাহের লস্কর (সেনাপতি) পরাগল খান চট্টগ্রামের শাসক ছিলেন। তাঁহার আদেশ ও পৃষ্ঠপোষকতায় কবীন্দ্র পরমেশ্বর যে মহাভারত রচনা করেন, সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধার সঙ্গে তিনি তাহাকে উল্লেখ করিয়াছেন 'পরাগলী মহাভারত' বলিয়া। পরাগল খাঁর পুত্র ছুটিখানও পিতার মত বাঙলা সাহিত্যের সহায়ক ছিলেন। তাঁহার আদেশে শ্রীকর নন্দী মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের বিস্তৃত অনুবাদ রচনা করিয়াছিলেন। তাহা 'ছুটিখাঁর মহাভারত' নামে প্রসিদ্ধ।

পরগল খান,
ছুটিখান

গৌড়াধিপতিদের প্রেরণা ও পৃষ্ঠপোষকতা যে বাঙলা সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতিবিধান করিয়াছিল, আলোচ্যাংশ হইতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

অধ্যায় ঃ
সাত

অন্ত্য-মধ্যযুগ

বাঙলায় হিন্দু রাজত্বের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন যুগের অবসান ঘটিল, তুর্কী শাসনের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হইল যুগান্তর কাল। দীর্ঘকাল শাসন-ক্ষেত্রে অব্যবস্থা চলিবার পর ইলিয়াস-শাহী রাজবংশের শাসন শুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিল। এই সঙ্গে যুগান্তর কালেরও সমাপ্তি হইল এবং আদি-মধ্য-যুগের সূত্রপাত ঘটিল। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ-শতাব্দীর মাঝামাঝি কালে বাঙলাদেশে সুলতানী আমল বা পাঠান শাসন অন্তর্হিত হইল। সবিস্ময়ে লক্ষ্য করা যায়—বাঙলা সাহিত্যের অন্ত্য-মধ্য-যুগের উদ্ভবও ঐকালেই সম্ভব হইয়াছিল। অবশ্য শুধুমাত্র শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্যই এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল—এই রূপ মনে করিলে ভুল করা হইবে। পাঠান-শাসনের প্রায় শেষ দিকে, বাঙলার শ্রেষ্ঠ সুলতান হোসেন শাহের রাজত্বকালে এক অনুকূল পরিবেশে আবির্ভূত হইলেন প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্য। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব বাঙলাদেশের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙলা সাহিত্যতরী গতি লাভ করিয়াছিল, মহাপ্রভু চৈতন্যের আবির্ভাবে তরীর পালে হাওয়া লাগিল। অবশ্য বাঙলাদেশ মুঘল সম্রাটের অধীনে আসিবার ফলে যে বৃহত্তর সমাজ ও পরিবেশের সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিল এবং তাহা যে বাঙালীর জীবনবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গীতে যথেষ্ট পরিবর্তন আনিয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মুঘলসাম্রাজ্যের রাজনীতিক, আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি বাঙালীর নাগরিক জীবনের সম্মুখে এক নবদিগন্ত উদ্‌ঘাটন করিয়া দিল। সমৃদ্ধির এই বৈচিত্র্য যে বাঙালীর সাহিত্যজীবনেও পরিবর্তন এবং বৈচিত্র্য আনিয়াছিল, তাহাও অনুমান করা চলে। আবার এই মুঘল-প্রভাব যখন জাতির দৃষ্টিকে অনেকটা বহির্মুখী করিয়া তুলিয়াছিল, তখন বাঙলাদেশে চৈতন্য-প্রভাবই তাহাকে সংযত ও সংহত রাখিয়াছে। ফলত আমরা দেখিতেছি, এক দিকে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব, অন্যদিকে মুঘলশাসন,

চৈতন্য-আবির্ভাব ও মুঘল শাসন

—এতদুভয়ের সামগ্রিক প্রভাবেই বাঙলাসাহিত্যের মোড় ঘুরিল, আদি-মধ্য-যুগের অন্তে অন্ত্য-মধ্যযুগ বা চৈতন্যোত্তর যুগের সৃষ্টি হইল। রাজশক্তির আনুকূল্য বাঙলাসাহিত্যের গতি-পথে কিছুটা প্রেরণা অবশ্যই জোগাইয়াছে, কিন্তু ইহাকে একান্ত ভাবে কখনও নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে নাই। বরং বলা চলে, বাঙালীর জাতীয় চেতনার মর্মমূল হইতে উৎসারিত এক প্রেরণাই পরবর্তী সাহিত্য-ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, —আর এই প্রেরণার অপর নামই শ্রীচৈতন্যদেব।

চৈতন্যদেব যদি কোন একটা বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়ের গুরু হইতেন, তবে বাঙলা-সাহিত্যের ইতিহাসে তাহাকে লইয়া বিশেষ মাতামাতি করিবার প্রয়োজন হইতনা। কিন্তু চৈতন্যদেব শুধুমাত্র একজন সাম্প্রদায়িক ধর্মগুরু নহেন,—বাঙালীর জীবন-সমুদ্র-মন্থনে এই চৈতন্যরূপী অমৃত-ভাণ্ডের উৎপত্তি। প্রেমের অবতার চৈতন্যদেব মানবিক সম্পর্কের নব মূল্যায়ন ঘটাইলেন। ফলে, আদি-মধ্যযুগের সাহিত্যে যে মানবিকতার অঙ্কুরোদ্‌গম হইয়াছিল, তাহাই চৈতনোত্তর যুগে বা অন্ত্য-মধ্যযুগের সাহিত্যে পূর্ণ বিকশিত রূপে দেখা দিল। অধ্যাত্মবিলাস-সঞ্জাত দেবনির্ভর সাহিত্য এই বারই প্রথম মানবের পদধ্বনিতে মুখর হইল। চৈতন্য-আবির্ভাবের প্রত্যক্ষ ফল—বাঙলা সাহিত্যে জীবনী-কাব্যরচনা। অবশ্য বাঙালীর স্বভাবে আছে,—'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা'—তাই দেখি চৈতন্যদেবের জীবনী-গ্রন্থেও অলৌকিকত্বের অভাব নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও নরলীলাই যে সর্বোত্তম, বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠগণও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। এই ভাবনারই সার্থক প্রকাশ

চৈতন্য-প্রভাব

ঘটিয়াছে রাধাকৃষ্ণের লীলাবর্ণনায়, তথা বৈষ্ণব-সাহিত্যে। চৈতন্যদেবের প্রভাব যে বিভিন্ন অনুবাদ-সাহিত্যেও বিস্তার লাভ করিয়াছে, তাহার পরিচয় দেখি অনুবাদ গ্রন্থ-গুলিতে নরোত্তম-এর চরিত্রাঙ্কন-প্রয়াসে। অন্ত্য-মধ্যযুগে যে বহু মুসলমান কবিও বৈষ্ণবপদাবলী-রচনায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহার পশ্চাতেও চৈতন্যের প্রভাব ছিল সক্রিয়। মঙ্গলকাব্যগুলিতেও দেখি, দেবতার স্থানে মানুষের একাধিপত্য। বস্তুত, এই মানবিকতাবোধই অন্ত্য-মধ্যযুগের কাব্যগুলির একটা বিশিষ্ট লক্ষণ।

অন্ত্য-মধ্যযুগে নূতন ধরণের সৃষ্টি-প্রয়াস খুব পরিলক্ষিত না হইলেও পরিমাণে যে তাহা প্রভূত ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মোটামুটি ১৫০০ খ্রীঃ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮০০ খ্রীঃ পর্যন্ত বিস্তৃতকালকে যখন

'অন্ত্য-মধ্যযুগ' নামক একটা যুগে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে, তখন আর পরবর্তী সাহিত্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে বিভিন্ন শতাব্দী-অনুযায়ী আলোচনার বিশেষ কোন তাৎপর্য থাকেনা। অতএব এই যুগের সাহিত্য-কৃতিকে আমরা বিষয়ানুযায়ী বিভক্ত করিয়া পরবর্তী আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

বিষয়-বিভাগ

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে অন্ত্য-মধ্যযুগে তথা চৈতন্যোত্তরযুগে বাঙলা সাহিত্য অনেক বেশি প্রসার লাভ করিয়াছিল। বিষয়ে, বৈচিত্র্যে, আঙ্গিকে, সংখ্যায়, সব দিক দিয়াই বাঙলা সাহিত্য শনৈঃ শনৈঃ সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছিল। এই যুগে এমন কিছু সাহিত্যও নূতন ভাবে রচিত হইল, ইতঃ-পূর্বে যাহাদের কোন অস্তিত্বই ছিলনা। ইহার জন্য একদিকে যেমন চৈতন্য-প্রভাব দায়ী অন্যদিকে তেমনি অপর প্রাদেশিক সাহিত্য এবং যুগধর্মও যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে।

এই যুগের সাহিত্যকে বিষয়ানুযায়ী নিম্নোক্তক্রমে বিভক্ত করা যায়ঃ (ক) জীবনী সাহিত্য বা চরিত শাখা, (খ) বৈষ্ণবসাহিত্য—(১) পদাবলী (২) বৈষ্ণবতত্ত্ব, (গ) অনুবাদ সাহিত্য, (ঘ) মঙ্গলকাব্য সাহিত্য, (ঙ) লোকগীতি, (চ) শাক্তপদাবলী, (ছ) বিবিধ।

ক. জীবনী সাহিত্য বা চরিতশাখাঃ—চৈতন্যদেবের জীবনী-অবলম্বনেই এই শাখার উৎপত্তি। পরবর্তীকালে চৈতন্য-পার্ষদদের জীবন-কাহিনী অবলম্বনেও কিছু কিছু চরিত-সাহিত্য রচিত হইয়াছে। রচয়িতাদের কেহ কেহ শ্রীচৈতন্যের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। এই শাখার কবিদের মধ্যে 'চৈতন্য ভাগবত'-কার বৃন্দাবনদাস, 'চৈতন্য চরিতামৃত'-রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, 'চৈতন্যমঙ্গল'-রচয়িতা জয়ানন্দ ও লোচনদাস, প্রভৃতি প্রধান। চৈতন্যদেবের ভৃত্য বলিয়া কথিত গোবিন্দ দাস-রচিত 'কড়চার' প্রামাণিকতা সন্দেহজনক হইলেও উল্লেখযোগ্য। এই গুলি ছাড়া ঈশান নাগর-রচিত 'অদ্বৈত প্রকাশ' এবং লোকনাথ দাসের 'সীতাচরিত্র' প্রধান।

খ. বৈষ্ণব সাহিত্য বলিতে প্রধানত (১) পদাবলী শাখাই বুঝাইয়া থাকে। এই শাখার কবিদের মধ্যে মুরারিগুপ্ত, নরহরি সরকার, বাসুদেব, রামানন্দ-প্রভৃতি অপ্রধান হইলেও চৈতন্য-সমসাময়িক বলিয়া বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই শাখার প্রধান কবি চণ্ডীদাস (দীন ও দ্বিজ), জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস, বলরাম দাস, লোচন দাস প্রভৃতি। (২)

বৈষ্ণবতত্ত্ব শাখায় বিবিধ মোহান্তদের চরিত, বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ এবং কিছু কিছু মৌলিক তাত্ত্বিক রচনাও দৃষ্টিগোচর হয়। এই শাখার কবিদের মধ্যে তেমন উল্লেখযোগ্য কবিত্ব-শক্তি-সম্পন্ন কেহ ছিলেন না।

গ. অনুবাদ শাখার উদ্ভব চৈতন্য-পূর্ব যুগেই ঘটিলেও ইহার শ্রীবৃদ্ধি ঘটে চৈতন্যোত্তর যুগেই। চৈতন্য-পূর্ব যুগে কৃত্তিবাস রামায়ণ অনুবাদ করিয়া যে ধারার প্রবর্তন করেন, শেষ পর্যন্ত তিনি উক্ত ধারায় অনতিক্রমণীয়ই রহিয়া গেলেন; উল্লেখযোগ্য এই যে পরবর্তী কবিদের অনেকেই মূল বাল্মীকির রামায়ণ হইতে সরিয়া গিয়া 'অদ্ভুত রামায়ণ, অধ্যাত্ম-রামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ' ইত্যাদির শরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বিভিন্ন রামায়ণ-রচয়িতাদের মধ্যে অদ্ভুতাচার্য্য, চন্দ্রাবতী, ভবানীদাস প্রভৃতি প্রধান। এই শাখার অন্যতম গ্রন্থ 'মহাভারত'। মহাভারত-রচয়িতাদের মধ্যে কেহ কেহ চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়। কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, সঞ্জয়, কাশীরাম দাস এই শাখার প্রধান কবি; শেষোক্তজন প্রধানতম। মহাভারত-অনুবাদকদের অনেকেই সমগ্র মহাভারতের অনুবাদ করেন নাই। প্রধানত 'ভাগবতপুরাণ' এবং অন্যান্য কৃষ্ণকাহিনী-মূলক কাব্যকে অবলম্বন করিয়া যাহারা অনুবাদ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে 'কৃষ্ণমঙ্গল'-রচয়িতা রঘুনাথ, দ্বিজমাধবাচার্য, 'গোবিন্দ মঙ্গল'-রচয়িতা কবিচন্দ্র, 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়'-রচয়িতা দ্বিজ রমানাথ-আদি প্রধান।

ঘ. মঙ্গলকাব্যশাখাই অন্ত্য-মধ্যযুগের অন্যতম সমৃদ্ধ শাখা। আদি-মধ্যযুগে শুধু 'মনসামঙ্গল' কাব্যই রচিত হইয়াছিল,—এইবার আরও বহু নূতন কাব্য যুক্ত হইল। এই ধারার কবিদের মধ্যে দ্বিজ বংশীদাস, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ প্রভৃতি প্রধান। মঙ্গলকাব্য-শাখার শ্রেষ্ঠ কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম 'চণ্ডীমঙ্গল' রচনা করেন। দ্বিজমাধবও সম্ভবত তাহার সমসাময়িক অথবা পূর্ববর্তী ছিলেন। মাণিকদত্ত আদি চণ্ডীমঙ্গল-রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ কিন্তু তাহার গ্রন্থ অপ্রাপ্য। 'ধর্মমঙ্গলে'র শ্রেষ্ঠ কবি ঘনরাম চক্রবর্তী। কিন্তু খেলারাম, রূপরাম, সহদেব চক্রবর্তীও কাব্য-রচনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। 'শিবায়ন' বা 'শিবমঙ্গল' কাব্য-রচয়িতাদের মধ্যে 'মৃগলুব্ধ'-রচয়িতা রতিদেব, 'শিবায়ন'-রচয়িতা রামেশ্বর এবং কবিচন্দ্র রামকৃষ্ণ প্রধান। এই প্রধান কয়টি মঙ্গলকাব্য ছাড়াও বহুতর অপ্রধান মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছে। একমাত্র 'অন্নদামঙ্গল'-রচয়িতা রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র-ব্যতীত অপর কোন কবিই উল্লেখের দাবি রাখেন না।

ঙ. **লোকগীতিশাখায়** প্রধানত মুসলমান কবিদেরই প্রাধান্য। তাহাদের রচিত বহু গ্রন্থই অনুবাদ মাত্র—অবশ্য কিছু কিছু মৌলিক রচনাও পাওয়া যায়। আলাওল, দৌলতকাজী প্রভৃতি এই শাখার শ্রেষ্ঠ কবি। মৌলিক রচনা এবং বাস্তব জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত 'পল্লীগীতিকা' গুলি এই শাখার অন্তর্ভুক্ত।

চ. **শাক্তপদাবলী**—কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন, কমলাকান্ত প্রভৃতি অনেকেই বৈষ্ণব গীতিকবিতার অনুসরণে শাক্তপদাবলী রচনা করিয়াছেন।

ছ. **বিবিধশাখায়** প্রধানত 'নাথসাহিত্যে'র কথা উল্লেখ করা যায়। এই শাখার অন্তর্ভুক্ত কাব্যগুলির মধ্যে 'গোর্খবিজয়', 'গোপীচন্দ্রের গান' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

১. : চৈতন্য প্রভাব

বাঙলাদেশে আর্য-আগমন ঘটিয়াছিল অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে। পূর্ববর্তী অধিবাসীরা ছিল অনার্য—দ্রাবিড়, অষ্ট্রীক বা নিষাদ ও মঙ্গোল বা কিরাত গোষ্ঠী অথবা আর্য হইলেও ব্রাত্য অবৈদিক আর্য। আর্যদের বর্ণাশ্রম প্রথার কঠোরতা, উচ্চমন্যতাবোধ এবং রীতি-নীতির স্বাতন্ত্র্যহেতু অনার্যদের সহিত তাহাদের সংমিশ্রণ সহজসাধ্য হয় নাই। বরং পরবর্তী-কালের বৌদ্ধধর্মে যে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহাতেই অনার্যগণ তথা বাঙলার আদিম অধিবাসীরা অনেক বেশী আকৃষ্ট হইয়া দলে দলে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। এককালে বাঙলাদেশে যে বৌদ্ধপ্রাধান্য বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তাহা ঐতিহাসিকগণ নির্দ্বিধায় স্বীকার করিয়া থাকেন। আরও পরবর্তী কালে একদিকে শঙ্করাচার্যের অভ্যুদয়ে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থান, অন্যদিকে বৌদ্ধধর্মের বিকৃতির ফলে সমগ্র ভারতেই বৌদ্ধশক্তি ক্রমবিলুপ্তির পথে অগ্রসর হইতেছিল। এমন সময় আসিল নবসৃষ্ট ইসলামধর্ম। ইস্‌লামধর্মেও সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের মর্যাদা লক্ষিত হয়। অতএব যে সকল বৌদ্ধ এবং অনার্য ব্রাহ্মণ্যসমাজের উপেক্ষা অথবা বিদ্বেষ-বশত হিন্দুসমাজের দিকে ঘেঁষিতে পারে নাই, তাহারা সাদরে ইস্‌লাম কবুল করিল। অবশ্য ইস্‌লাম ধর্ম প্রচারের পশ্চাতে প্রবল রাজশক্তিও যে যথেষ্ট আনুকূল্য সাধন করিয়াছে, তাহাও ঐতিহাসিক সত্য। হিন্দুসমাজের

চৈতন্য আবির্ভাবের পটভূমিকা

অন্তর্ভুক্ত অন্ত্যজশ্রেণীও উচ্চতর সমাজের নিকট কোন দিন বিশেষ কোন সুবিধা লাভ করিতে পারে নাই,—তাহারাও কতক পীড়নের ভয়ে, কতক সুবিধার লোভে, কতক বা সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শে ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। এইভাবে মধ্যযুগে যখন হিন্দুসমাজে প্রবল ভাঙ্গন দেখা দিল, তখনই সমাজের ত্রাণকর্তারূপে আবির্ভূত হইলেন প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্য। চৈতন্যজীবনীসমূহে বর্ণনা করা হইয়াছে যে মহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্যের হুঙ্কারেই ভগবান স্বয়ং চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সমাজের প্রয়োজনকেই যদি অদ্বৈতাচার্যের হুঙ্কার বলিয়া বর্ণনা করা যায়, তবে আর চৈতন্য অবতারের পশ্চাতে কোন অলৌকিক কারণ স্বীকার করার প্রয়োজন হয় না। বস্তুত সামাজিক প্রয়োজনই চৈতন্য-আবির্ভাবের কারণ।

জীবন-কাহিনী

১৪৮৬ খ্রীঃ ফাল্গুন পূর্ণিমার দিন নবদ্বীপে শ্রীহট্টাগত এক ব্রাহ্মণ-পরিবারে চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন। চৈতন্যদেবের জ্যেষ্ঠভ্রাতা অল্পবয়সেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া বাল্যে চৈতন্যের (তাঁহার প্রকৃত নাম বিশ্বম্ভর, ডাক নাম,—গোরা, গৌরাঙ্গ ও নিমাই) লেখাপড়ার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই; যাহা হউক নিমাই নিজের চেষ্টাতেই অল্পদিনে সর্বশাস্ত্র অধিগত করিয়া নিমাইপণ্ডিত নামে পরিচিত হইলেন। পিতার মৃত্যুর পরে পিতৃকৃত্যসাধন-উপলক্ষে চৈতন্যদেব গয়াধামে গমন করেন এবং তথায় ঈশ্বরপুরীর সান্নিধ্য লাভ করিয়া সন্ন্যাস-জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। পরে কাটোয়ার কেশবভারতীর নিকট হইতে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা লাভ করিয়া তিনি ২৪ বৎসর বয়সেই চিরকালের জন্য গৃহত্যাগ করিয়া নাম গ্রহণ করিলেন 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'। পরবর্তী ২৪ বৎসর কাল তিনি প্রধানত পরিব্রাজক-রূপেই ভারতময় পরিভ্রমণ করিয়া প্রেমধর্ম প্রচার করেন। জীবনের একটা বিরাট অংশই তিনি পুরীধামে কাটাইয়া মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে লীলা সংবরণ করেন।

শ্রীচৈতন্যদেব বৈষ্ণবধর্মের রূপকার ছিলেন। কিন্তু তৎ-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম স্বরূপে পৃথক্—ইহার অপর নাম 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম'। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে বৈদিকযাগ-যজ্ঞ-সমন্বিত কর্মবাদ এবং শঙ্করাচার্য-প্রবর্তিত জ্ঞানবাদকে প্রাধান্য দান না করিয়া ভক্তিবাদের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে। 'বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর,'—এই সত্যই চৈতন্যদেব উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন। চৈতন্য-প্রবর্তিত এই মতবাদের পশ্চাতে নিহিত আছে এক বিরাট যুগসত্য—যুগের প্রয়োজনে এবং জাতির প্রয়োজনেই এই সত্যদৃষ্টির উদ্ভব হইয়াছিল,

এই সত্যকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বৈদিকযাগযজ্ঞাদি যে কঠোর রীতিনীতির সহিত পালন করিতে হয়, তাহা সমাজের মুষ্টিমেয় লোকেরই সাধ্য। বস্তুত, পরবর্তীকালে একমাত্র ব্রাহ্মণই ছিলেন যজ্ঞাদি কর্মবাদের অধিকারী। শঙ্করাচার্য-প্রবর্তিত জ্ঞানবাদও সমাজের উচ্চস্তরে ছিল সীমাবদ্ধ। শিক্ষা-শাস্ত্র-আদির চর্চায় সমাজের নিম্নস্তরের লোকদের কোনই অধিকার ছিল না—অতএব কর্ম আর জ্ঞানের অংশ হইতে সমাজের বৃহত্তর অংশই ছিল বঞ্চিত। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, চৈতন্যদেব যুগসত্যকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, সমাজের বৃহত্তর অংশে যে ভাঙ্গন দেখা দিয়াছে, তাহাকে রোধ করিতে হইলে এমন এক মতবাদ প্রচার করিতে হইবে, যাহা সর্বজনের পক্ষেই গ্রহণযোগ্য এবং আচরণীয় হইয়া উঠিতে পারে। অতএব নিছক হৃদয়বৃত্তি হইতে উদ্ভূত এই প্রেমধর্মের প্রচারই চৈতন্য-জীবনের লক্ষ্য হইয়া উঠিল। ভক্তিবাদের ভিত্তিতে গঠিত এই প্রেমধর্মে সর্বজীব আশ্রয় লাভ করিতে পারে। সামাজিক বৈষম্য, ধর্মীয় মতবাদের গোড়ামি, মানুষে-মানুষে ভেদজ্ঞান-আদি প্রেমধর্মে স্পষ্টত না হইলেও বাস্তবত অস্বীকৃত হইল। চৈতন্যদেব স্বয়ং যখন 'আচণ্ডালে ধরে দেয় কোল', তখন সমাজের সর্বনাশা ভাঙ্গনের পথ আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া আসিল। যখন 'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ', তখন চিরকালের নিপীড়িত লাঞ্ছিত মানুষ মুক্তির আহ্বান শুনিতে পাইল। বস্তুত, ইহার আগে আর বাঙলাদেশে এমন ভাবে মানব-মুক্তির উদার আহ্বান কখনও ধ্বনিত হয় নাই। এই আহ্বান অনতি-বিলম্বেই সাড়া জাগাইল সমস্ত ভারতে, সমস্ত জাতির মধ্যে—শুধু চণ্ডালই নহে, যবনও পাইল প্রেমধর্মে আপনার অধিকার। ফলে সমগ্র দেশেই দেখা দিল এক অপূর্ব ভাব-বিপ্লব, যাহার মহানায়ক হইলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু।

চৈতন্য-প্রবর্তিত ধর্মমত

বাঙলাসাহিত্যের ইতিহাস-আলোচনা-প্রসঙ্গে চৈতন্যদেবের মাহাত্ম্য-প্রচারে নাসিকা কুঞ্চন করিবার অবকাশ নাই। সত্য বটে, চৈতন্যদেব হয়তো বাঙলা ভাষায় একটি পংক্তিও রচনা করেন নাই, কিন্তু তিনি বাঙলা সাহিত্যকে যাহা দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা স্বর্ণমূল্যে তুলিত হইতে পারে। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বাঙলাদেশে যে নবজাগরণ দেখা দিয়াছিল, তাহাতে বাঙলাসাহিত্যের গতিপথ সুনিশ্চিত ভাবেই একটা পরম পরিণতির দিকে চিহ্নিত হইয়াছিল। চৈতন্য-পূর্বযুগের সহিত চৈতন্যোত্তর যুগের বাঙলাসাহিত্যের বিরাট পার্থক্য

চৈতন্য প্রভাব

হইতেই সদ্য-কথিত উক্তিটির যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে। চৈতন্য-প্রচারিত মতবাদের ফলে মানবজীবনের মূল্য নূতনভাবে নির্ণীত হইয়াছিল—সাহিত্যেও ইহার প্রভাব দুর্নিরীক্ষ্য নহে। এমন কি চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই যে অনুবাদ সাহিত্য, মঙ্গল কাব্য ও কৃষ্ণকাহিনী রচিত হইয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে পরবর্তীকালে রচিত তত্তজ্জাতীয় সাহিত্যের মৌলিক পার্থক্যটুকু অনুসন্ধিৎসু পাঠকের দৃষ্টি কখনও এড়াইতে পারে না। চৈতন্যপূর্বযুগের মঙ্গলকাব্য-সাহিত্যে যে ভেদবুদ্ধির প্রাধান্য দেখা যায়, চৈতন্যোত্তর সাহিত্যে তাহা অসাম্প্রদায়িক হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুত চৈতন্য-প্রভাবই যে ইহার প্রধান কারণ তাহাতে সংশয়ের কোন অবকাশ নাই। ড০ ভট্টাচার্য বলেন '......এই দেশে এই সকল সঙ্কীর্ণতামূলক সাম্প্রদায়িক সাহিত্যের উপর দিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যের কূল-প্লাবনী বন্যা প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। তাহার ফলে এই সমাজের প্রায় সমগ্র সাম্প্রদায়িক সাহিত্যের বৈষম্যের মূল শিথিল হইয়া গিয়াছে।'—লেখক যে এখানে চৈতন্য-প্রবর্তিত ভাববন্যার কথাই উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা অনস্বীকার্য। চৈতন্য-পরবর্তী মঙ্গলকাব্যসমূহে অপর যে সকল পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধে ড০ ভট্টাচার্য আরো বলিয়াছেন: 'চৈতন্যপরবর্তী যুগের মঙ্গলকাব্য মাত্রই নীতির দিক দিয়া উন্নত; ইহার কারণ, চৈতন্যদেবের চরিত্রের মধ্যে যে উচ্চ নৈতিক গুণ ছিল, তাহা সমসাময়িক বৈষ্ণব সাহিত্যের ভিতর দিয়া সমগ্রভাবে বাংলার সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।' পরবর্তী মঙ্গলকাব্য সাহিত্য-রচনায় যে নিম্নশ্রেণীর নায়ক-নায়িকারাও কবিদের সানুকম্প দৃষ্টি-আকর্ষণে সক্ষম হইয়াছিল, তাহাতেও চৈতন্যের প্রভাব অবশ্যস্বীকার্য। মঙ্গল-কাব্যগুলির মত অনুবাদ-সাহিত্যেও চৈতন্যপ্রভাব প্রত্যক্ষগোচর। চৈতন্যদেবের ব্যক্তিজীবনের আদর্শে আকৃষ্ট হইয়াই পরবর্তী অনুবাদকগণ তাঁহাদের কাব্য অনুরূপ মহামানবের চরিত্রাঙ্কনে প্রয়াসী হইয়াছেন। এমন কি তৎকালীন কবিরা বারবার মূল হইতে ভ্রষ্ট হইলেও নায়ক-চরিত্রে চৈতন্যের প্রেমমধুর রূপটির আদল আনিতে দ্বিধা বোধ করেন করেন নাই। বাঙলাসাহিত্যে কৃষ্ণকাহিনীর বাহুল্যও চৈতন্যদেবের কৃষ্ণপ্রেম হইতে জাত। চৈতন্যদেবের পূর্বেই জয়দেব, বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে উপলক্ষ্য করিয়া কাব্য-রচনা করিলেও. মূলত বাঙলা বৈষ্ণবপদাবলী যে চৈতন্যপ্রভাব-সঞ্জাত তাহা সূর্যের মতই সত্য। গৌড়ীয় দর্শনের অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদে পরব্রহ্মের

১.মঙ্গল কাব্যে

২.কৃষ্ণ কাহিনীতে

সচ্চিদানন্দস্বরূপের পরম প্রকাশ ঘটিয়াছে আনন্দে ও মাধুর্যে। ভগবানের মাধুর্যময় রূপের অভিব্যক্তি কৃষ্ণমূর্তিতে,—আর শ্রীরাধিকাই কৃষ্ণের হ্লাদিনী-শক্তি। পরব্রহ্মের এই মানবীয় লীলারসকেই চৈতন্যদেব স্বয়ং আস্বাদ করিয়াছিলেন স্বদেহে যুগপৎ কৃষ্ণ ও রাধার অস্তিত্ব অনুভবের মধ্য দিয়া। বৈষ্ণব কবিতাগুলির মধ্যে চৈতন্য-আস্বাদিত রসেরই পরিবেশন ঘটিয়াছে। চৈতন্যোত্তর কবিগণ চৈতন্যদেবের অন্তরালে দাঁড়াইয়াই রাধাকৃষ্ণ-লীলা-রস আস্বাদন করিয়াছেন। অতএব, চৈতন্যদেবের প্রত্যক্ষ প্রভাবেই যে বাঙলা-

৩. পদাবলী সাহিত্য

দেশে বিরাট পদাবলী সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না। চৈতন্যদেব-প্রবর্তিত প্রেমসাধনার সহিত ঐক্য অনুভব করিয়া ইস্‌লামপন্থী সুফী সাধকরাও রাধাকৃষ্ণের প্রেম-লীলার যে চিত্র রচনা করিয়াছেন, তাহার প্রভূত নিদর্শন রহিয়াছে পদাবলী-সাহিত্যে। বাঙলার লোকসাহিত্যেও চৈতন্যপ্রভাব সুস্পষ্ট। চৈতন্য প্রভাবের প্রত্যক্ষ ও সুপরিণত রূপ,—জীবনীসাহিত্যের কথাই সর্বশেষ উল্লেখ করা

৪. চৈতন্য চরিত

হইতেছে। বাঙলাদেশে চৈতন্যদেবের জীবনকাহিনীকে অবলম্বন করিয়াই সর্বপ্রথম জীবনী সাহিত্য রচিত হইয়াছিল। উক্ত সাহিত্যে চৈতন্যদেবের উপর অলৌকিক দেবমহিমা আরোপ করা হইলেও ঐ সাহিত্যই যে সর্বপ্রথম মানব-জীবনাভিমুখী রূপ লাভ করিয়াছিল, তাহার সাক্ষ্য ইতিহাস। পরবর্তীকালে বৈষ্ণবসাধকগণ আরও কিছুটা অগ্রসর হইয়া চৈতন্যপার্ষদদেরও জীবনী রচনা করিয়া গিয়াছেন।

বস্তুত মধ্যযুগের বাঙলাসাহিত্যে চৈতন্যদেবের প্রভাব যে সর্বতোমুখ রূপ লাভ করিয়া বাঙলাসাহিত্যকে ঐশ্বর্যপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

অধ্যায় :
আট

জীবনী-সাহিত্য

চৈতন্য-জীবনকে অবলম্বন করিয়া যে কাব্য রচিত হইয়াছিল, তাহাই বাঙলাসাহিত্যের ইতিহাসে আদি জীবনী-সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করিয়া থাকে। কেহ কেহ মনে করেন যে, চৈতন্য-পূর্বযুগেই গোর্খনাথ, গোপীচাঁদ বা ময়নামতীকে অবলম্বন করিয়া জীবনীসাহিত্য রচিত হইয়াছিল। আবার কাহারও মতে, ইঁহারা ঐতিহাসিক পুরুষরূপেই এককালে বর্তমান ছিলেন বলিয়া তাহাদের জীবনীই পথপ্রদর্শকের সম্মান লাভের যোগ্য। গোর্খনাথ-গোপীচাঁদ-আদি ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন কিনা এবং তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া যে কাব্য রচিত হইয়াছিল, তাহা চৈতন্য-পূর্ব-যুগবর্তী কিনা,—সেই বিচারে না গিয়াও বলা চলে যে 'গোর্খবিজয়' কিংবা 'গোপীচাঁদের গীত'-আদি কোন গ্রন্থই জীবনী-সাহিত্য নহে। যদি ইহারা প্রাগ্‌বর্তীও হয়, তবু বড় জোর ইহাদিগকে 'মঙ্গলকাব্য শাখায়' কিংবা 'লৌকিক কাব্য শাখা'য় স্থানদান করা চলে—জীবনী-সাহিত্যে কখনও নহে। এতদ্‌ব্যতীত উক্ত ব্যক্তিদের ঐতিহাসিকত্ব এবং তদবলম্বনে রচিত কাব্যসমূহের প্রাগ্‌বর্তিত্বও নিংসংশয় নহে। অতএব চৈতন্যজীবনীগুলিই যে বাঙলাসাহিত্যের আদি জীবনী-সাহিত্য-রচনা-প্রচেষ্টা তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

পূর্বতন জীবন-কাহিনী ?

শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলার মধ্যে 'সর্বোত্তম নরলীলা'—এই নরলীলায়ই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই নরোত্তমকে যাহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, অথবা যাহারা তাঁহার সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে জানিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারা এই মহামানবের জীবনকে সাহিত্যে রূপায়িত করিয়া তুলিবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই। অতএব, একটি দুইটি নহে, কালক্রমে চৈতন্য-জীবনকে অবলম্বন করিয়া অনেকগুলি কাব্যই রচিত হইয়াছিল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য এই যে,—পরবর্তীকালে চৈতন্য-পার্ষদদের কেহ কেহ, এমন কি অদ্বৈতাচার্য-পত্নী সীতাদেবীও জীবনীকাব্যের বিষয়ীভূত হইয়াছেন।

চৈতন্য-জীবনী-সম্বন্ধে একটি সাধারণ অভিযোগ এই যে প্রতিটি কাব্যেই চৈতন্যদেবকে দেবত্বের পদে উন্নীত করা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যের লৌকিক মহিমার উপরে এই অলৌকিকত্বের আবরণ পড়ায়, তাঁহার মানবিকতা

কিছুটা ক্ষুণ্ন হইয়াছে। কথাটা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বস্তুত, মধ্যযুগে যখন ধর্মবিশ্বাসই মূলত মানুষের ভাবনাকামনাকে নিয়ন্ত্রিত করিত, তখনকার দিনে মহামানব-চরিত্রে দেবত্বের আরোপ অনেকটা যুগবশেও করিতে হইত। কিন্তু বাঙালীর স্বভাবেই এই দোষ বা গুণটি নিহিত যে আমরা 'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।' আধুনিককালেও ব্যক্তি-পূজার এই স্বভাবটি দুরীভূত হয় নাই। ভাগবতপুরাণে বর্ণিত কৃষ্ণলীলার কাঠামোয় চৈতন্যলীলা পরিবেশন করিতে গিয়া ভক্তকবি নিছক বাস্তবতার মধ্যে আপনার কল্পনাকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন নাই। ভক্তির প্রবলতা এবং উচ্ছলতায় চৈতন্যদেব আপনি দেবতারূপে পরিণত হইয়াছেন। কিন্তু এই ত্রুটি-সত্ত্বেও বৈষ্ণব কবিদের নিষ্ঠায় সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। চৈতন্যজীবনী কারদের অনেকেই চৈতন্য-সমসাময়িক কিংবা স্বল্প পরবর্তীকালেই বর্তমান ছিলেন, কাজেই চৈতন্যদেব-সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও লক্ষ্য করিবার বিষয়,—তাঁহারা বারবারই বক্তব্যের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিবার জন্য উৎসনির্দেশ করিয়াছেন। যে সূত্রে যে তথ্যের সন্ধান লাভ করিযাছেন, তাহার উল্লেখে কবিদের ঐতিহাসিক মনোবৃত্তি এবং সত্যপ্রচারস্পৃহারই পরিচয় পাওয়া যায়।

দেবভাব ও মানব ভাব

চৈতন্যদেবের জীবনী সর্বপ্রথম রচিত হয় সংস্কৃতভাষায়। এই বিষয়ে প্রথমগ্রন্থ চৈতন্যপার্ষদ মুরারিগুপ্ত-লিখিত 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃত'—ইহা সাধারণত 'মুরারিগুপ্তের কড়চা' নামেই প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ অনুমান করেন, গ্রন্থটি চৈতন্যের জীবৎ-কালেই রচিত হইয়াছিল। যাহা হউক গ্রন্থটি ১৫২০ খ্রীঃ হইতে ১৫৪০ খ্রী-র মধ্যেই যে রচিত হইয়াছিল, এই বিষয়ে পণ্ডিতমণ্ডলী প্রায় অভিন্নমত। ইহার পরই উল্লেখ করিতে হয় কবিকর্ণপুর পরমানন্দ সেন-রচিত তিনখানি গ্রন্থের কথা। প্রথম গ্রন্থ 'চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে' চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্যভ্রমণের পরবর্তী কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় গ্রন্থ 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে' চৈতন্যদেবের বিস্তৃত জীবন-কাহিনী পরিবেশিত হইয়াছে। তৃতীয় গ্রন্থ 'গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা'য় বৈষ্ণবদর্শন-সম্বন্ধে আলোচনাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলিতেও নানাপ্রকার অলৌকিক কাহিনীর অবতারণা করা হইয়াছে। পরবর্তীকালে বাঙলাভাষায় রচিত গ্রন্থগুলিতে মুরারিগুপ্ত এবং কবি কর্ণপূরের প্রভাবের পরিচয় সুস্পষ্ট।

সংস্কৃত ভাষায় চৈতন্য-জীবনী

১০

বৃন্দাবনদাস : চৈতন্যভাগবত

বাঙলাভাষায় রচিত চৈতন্যজীবনী-সমূহের মধ্যে বৃন্দাবনদাস-রচিত' চৈতন্য-ভাগবত' গ্রন্থই সম্ভবত প্রাচীনতম। আদিতে গ্রন্থটির নাম 'চৈতন্যমঙ্গল' ছিল বলিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ-আদি কেহ কেহ উল্লেখ করিয়াছেন। পরে লোচনদাসও 'চৈতন্যমঙ্গল' নামক গ্রন্থ রচনা করায় বৃন্দাবনের মোহান্তরা (কেহ কেহ বলেন, বৃন্দাবনদাসের মাতা নারায়ণী) ইহার নাম পরিবর্তন করেন। এই বিষয়ে 'প্রেমবিলাস' নামক গ্রন্থ বলা হইয়াছে—

'চৈতন্যভাগবতের নাম চৈতন্য মঙ্গল ছিল।
বৃন্দাবনের মোহান্তেরা ভাগবত আখ্যা দিল ॥'

পরবর্তীকালে বৃন্দাবনদাসকে ব্যাসদেবের অবতার বলিয়া বর্ণনা করিবার ফলেও তাহার গ্রন্থের নাম-পরিবর্তনের প্রয়োজন হইয়া থাকিতে পারে। কবিকর্ণপুর 'গৌর গণোদ্দেশদীপিকা'য় বলিয়াছেন,—'বেদব্যাসো য এবাসীদ্দা-বৃন্দাবনোঽধুনা।' কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন, 'চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবনদাস।' ভাগবতপুরাণে কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইয়াছে, অতএব যে গ্রন্থে চৈতন্যলীলা বর্ণিত হইয়াছে, তাহারও নাম 'ভাগবত' হওয়াই সঙ্গত,—গ্রন্থের নামপরিবর্তনে এই যুক্তিটি অহেতুক না-ও হইতে পারে।

ব্যাসাবতার

চৈতন্যজীবনী-প্রণেতাদের অনেকেই বিস্তৃতভাবে আত্মপরিচয় দান করিলেও এই বিষয়ে বৃন্দাবনদাসের কুণ্ঠাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার মাতার নাম নারায়ণী, তিনি ছিলেন শ্রীবাসের ভ্রাতৃকন্যা—ইহার অধিক কোন পরিচয় তাহার গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায় না। কেহ কেহ অনুমান করেন, শ্রীবাসের ভ্রাতা শ্রীরামই ছিলেন নারায়ণীর পিতা। বৃন্দাবনদাস বালবিধবা নারায়ণীর সন্তান—তিনি নিজে দারপরিগ্রহ করেন নাই। পিতৃপরিচয়ে বৃন্দাবনদাসের ঔদাসীন্য থাকিলেও তিনি গুরুর কথায় পঞ্চমুখ। মহাপ্রভু নিত্যানন্দ ছিলেন বৃন্দাবনদাসের গুরু। বৃন্দাবন

পরিচয়

দাস তাহার গ্রন্থের অধিকাংশ উপাদান আহরণ করিয়াছেন নিত্যানন্দের নিকট হইতে :

'অন্তর্যামী নিত্যানন্দ বলিল কৌতুকে।
চৈতন্যচরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে ॥'

অপরাপর চৈতন্য-পার্ষদ এবং ভক্তদের নিকট হইতেও বৃন্দাবনদাস যে কিছু কিছু উপকরণ পাইয়াছেন, তাহাও তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিয়াছেন :

'তাই লিখি যাহা শুনিয়াছি ভক্তস্থানে।'

এই সমস্ত বিষয় দেখিয়া স্বভাবতই মনে হয়, চৈতন্য-জীবন-বিষয়ে বৃন্দাবন দাস যাহা লিখিয়াছেন, তাহার প্রামাণিকতায় অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। কোন বিষয়ে কবি নিজস্ব ব্যাখ্যা দান করিলেও কোথাও যে স্বেচ্ছায় ঘটনার বিকৃতি সাধন করেন নাই, তাহাও বিশ্বাস করা চলে।

রচনার প্রামাণিকতা

বৃন্দাবনদাসের জীবৎকাল কিংবা গ্রন্থরচনাকাল-সম্বন্ধে নানাপ্রকার অভিমত বর্তমান। তবে কবি যে চৈতন্যের জীবিত কালেই বর্তমান ছিলেন, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। তিনি নিজেই বলিয়াছেন,—

'হইল পাপিষ্ঠ জন্ম নহিল তখনে।
হইয়াও বঞ্চিত সে সুখ দরশনে ॥'

মনে হয়, চৈতন্যের জীবৎকালেই জন্ম হইলেও কবি চৈতন্য-দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেন নাই বলিয়াই এই খেদোক্তি করিয়াছেন। আবার বৃন্দাবনদাসের অন্য একটি শ্লোকে পাওয়া যায় যে, চৈতন্যদেব যখন গয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন চারিবৎসরের নারায়ণী তাঁহার প্রসাদ গ্রহণ করিয়া 'হাকৃষ্ণ হাকৃষ্ণ কান্দে নাহিক সম্বিত।' অতএব বৃন্দাবনদাস চৈতন্যজীবনের শেষ দিকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দমহাপ্রভুর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন, এই কথা বারবার স্বীকার করিয়াছেন। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় বৃন্দাবনদাসের উল্লেখ হইতে মনে হয়,—কবি এই তারিখের পূর্বেই গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এই সমস্ত বিচার করিয়া বলা চলে যে বৃন্দাবনদাস সম্ভবত ১৫১০ খ্রীঃ হইতে ১৫২০ খ্রীঃ-র মধ্যবর্তী কোন একসময় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে ডক্টর সুকুমার সেন, এবং 'চৈতন্যচরিতের উপাদান'-রচয়িতা ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার প্রায় একমত হইলেও 'চৈতন্যভাগবতের' রচনাকাল

বৃন্দাবনদাসের জীবৎকাল

সম্বন্ধে তাঁহারা ভিন্নমত পোষণ করেন। ডঃ সেন বলেন, 'সম্ভবত শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পূর্বে গ্রন্থের পত্তন হইয়াছিল এবং নিত্যানন্দপুত্র বীরচন্দ্রের জন্মের পূর্বেই গ্রন্থ পরিসমাপ্ত হইয়াছিল।' ডঃ মজুমদার তারিখটিকে আরও খানিকটা পিছাইয়া ১৫৪৬ খ্রীঃ—১৫৫০ খ্রীঃ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। যাহাহউক, বৃন্দাবনদাস যে মোটামুটি ভাবে চৈতন্য-সমকালেই বর্তমান থাকিয়া 'চৈতন্যভাগবত' রচনা করিয়াছেন, তাহা প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা চলে।

'চৈতন্যভাগবত' তিনটি খণ্ডে বিভক্ত :—পনেরো অধ্যায়ে বিভক্ত আদি-খণ্ড, সাতাশ অধ্যায়ে বিভক্ত মধ্যখণ্ড এবং দশ অধ্যায়ে বিভক্ত অন্তখণ্ড। আদি খণ্ডে চৈতন্যদেবের গয়া হইতে প্রত্যাবর্তন, মধ্যখণ্ডে সন্ন্যাসগ্রহণ এবং অন্তখণ্ডে চৈতন্যদেবের নীলাচলে গুণ্ডিচাযাত্রা পর্যন্ত কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। পরবর্তীকালে দেনুড়ে যে চৈতন্যভাগবতের শেষ তিনটি অধ্যায় আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া কথিত হয়, সেই তিনটি অধ্যায় জাল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। মূল 'চৈতন্যভাগবত' যে খণ্ডিত ও অসমাপ্ত ছিল, তাহা কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তি হইতেও অনুমান করা চলে। তিনি বলেন,—

'নিত্যানন্দ-লীলাবর্ণনে হইল আবেশ।
চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ ॥'

বৃন্দাবনদাস চৈতন্যদেবের প্রথমজীবনের বৃত্তান্তই সমধিক গুরুত্ব-সহকারে বর্ণনা করিয়াছিলেন। চৈতন্যজীবনের শেষ অধ্যায়-সম্বন্ধে তাঁহার নীরব থাকিবার হেতু-সম্বন্ধে সুস্থিরভাবে কিছুই বলা যায় না। কেহ মনে করেন, বৃন্দাবনদাস বৃদ্ধবয়সে কাব্য রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং দুর্ভাগ্যক্রমে কাব্যটির সমাপ্তির পূর্বেই পরলোকগমন করেন।

বৃন্দাবনদাসের কাব্য বিচার-প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা কর্তব্য, বৃন্দাবনদাস কিংবা অপর কোন ভক্ত সহজ কবিত্বের প্রেরণায় অথবা চৈতন্যমহাপ্রভুর জীবনতথ্য-উদ্‌ঘাটন-মানসে জীবনীরচনায় প্রবৃত্ত হন নাই, তাঁহাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল—বৈষ্ণবধর্মের প্রচার। সেই দিক হইতে বিচার করিতে গেলে, জীবনী-সাহিত্যের সাম্প্রদায়িক রূপটি প্রকট। ইহাতে যে শুধু আভাষে-ইঙ্গিতেই অপর সম্প্রদায়ের প্রতি কটাক্ষপাত করা হইয়াছে, তাহা নহে, স্পষ্ট উচ্চারিত ভাষাতেই কবিরা তাহাদের সম্বন্ধে কটূক্তি করিয়াছেন অথবা অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়াছেন। বৃন্দাবনের গ্রন্থের নাম গোড়াতে 'চৈতন্যমঙ্গল' রাখা

হইলেও লেখক গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলকাব্যের রীতিতে বিভিন্ন দেবদেবী-বন্দনার উদারতা প্রদর্শন করেন নাই। অতএব এই সঙ্কীর্ণতা-বোধ হইতে জাত সাহিত্যে সার্বজনীনতার আবেদন যে বিশেষ থাকিবেনা তাহাই স্বাভাবিক। বস্তুত অপর সম্প্রদায়ের উপর আপন সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টায় কবি সর্বদা ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া চৈতন্যভাগবতে কাব্যশ্রীরও অভাব ঘটিয়াছে। প্রধানত উদ্দেশ্যমূলক এবং প্রচারধর্মী বলিয়াই চৈতন্যভাগবত যেমন খাঁটি কাব্য হইতে পারে নাই, তেমনি খাঁটি জীবনীসাহিত্যও হইয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই। গ্রন্থে ঐতিহাসিক উপকরণ অবশ্য যথেষ্টই আছে, কিন্তু চৈতন্য-জীবনের যে সমস্ত কাহিনী কবির দৃষ্টিতে ধর্মপ্রচারের অনুকূল বলিয়া মনে হইয়াছে, কবি সেই সকল কাহিনীই মাত্র গ্রহণ করিয়াছেন। অথচ চৈতন্য-জীবনে নিশ্চিতই এমন বহু ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহা অপর যে কোন জীবনী-সাহিত্যের পক্ষেই অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হইত। এই সমস্ত ঘটনার পরিপূর্ণ বিবরণ পাইলে সমসাময়িকযুগের ইতিহাস পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারিত। ইহা ছাড়াও কবি চৈতন্য-জীবনের ধর্মের দিকটাই শুধু দেখিয়াছেন, তাঁহার কর্মের দিকটাকে প্রধানত উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন। এমন কি চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে যে, সমাজ একটা বিরাট ভাঙ্গনের মুখ হইতে ফিরিয়া আসিল, বৃন্দাবনদাসের কাব্যে তেমন কোন ইঙ্গিতও নাই। চৈতন্যদেবের কর্মপ্রণালী এবং ভাবধারার মধ্যে যে ভারত-ব্যাপী একটা সমন্বয়ের আদর্শ স্থাপনের প্রচেষ্টা সক্রিয়ভাবেই বর্তমান ছিল, তদ্বিষয়ে কবির নীরবতাও বিস্ময়কর। বস্তুত বৃন্দাবন দাস চৈতন্যজীবনের ধর্মের দিকটা লইয়াই আলোচনা করিয়াছেন ; কর্মের দিকটা বাদ দিয়াছেন বলিয়াই তাহা খাঁটি এবং পরিপূর্ণ চরিত-সাহিত্য হইয়া উঠিতে পারে নাই।

কবির সঙ্কীর্ণতা-বোধ

চৈতন্যের কর্মজীবনের প্রতি উপেক্ষা

হিন্দুধর্মের অন্যান্য শাখার বিশেষত শাক্তসম্প্রদায়ের সহিত বিবাদের ফলেই যে এই বৈষ্ণব জীবনী-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। কবি একটু উদার দৃষ্টি লইয়া গ্রন্থখানি রচনা করিলেই চৈতন্য-মাহাত্ম্য অধিকতর পরিস্ফুট হইত। কিন্তু গ্রন্থকারের অসহিষ্ণুতার জন্য চৈতন্য-ভক্তিও শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি-পূজায় পর্যবসিত হইয়াছে। কেহ কেহ স্পষ্টতই বলেন যে চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতের প্রচারের ফলেই বাঙ্গালী-সমাজে ব্যক্তি-পূজার প্রবর্তন হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যকে সাক্ষাৎ

কৃষ্ণরূপে প্রতিষ্ঠার জন্য কবির প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। তিনি ভাগবতের অনুসরণে কৃষ্ণলীলার সাদৃশ্যে চৈতন্যলীলা বর্ণনা করিতে গিয়াছেন বলিয়াই চৈতন্যভাগবত গ্রন্থে প্রচুর পরিমাণ অলৌকিক কাহিনী পরিবেশিত হইয়াছে; শ্রীচৈতন্যের মৃত্তিকাভক্ষণ ও তাঁহার মুখবিবরে বিশ্বরূপের প্রকাশ, তাঁহার বরাহরূপধারণ, চতুর্ভুজ বা ষড়্ভুজ মূর্তির প্রকাশ, সুদর্শনচক্রের ব্যবহার-আদি অলৌকিক কাহিনীর আড়ালে চৈতন্যদেবের ব্যক্তিজীবন অনেকটা চাপা পড়িয়া গিয়াছে।

চৈতন্য কাহিনীতে অলৌকিকত্ব

এই সমস্ত দোষত্রুটি-সত্ত্বেও বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থখানি অমূল্য বলিয়াই বিবেচিত হইয়া থাকে। কবি চৈতন্য-চরিত্র অঙ্কনে সব সময় একটা সসম্ভ্রম ভক্তির ভাব বজায় রাখিতেন। এবং ইহারই ফলে প্রাত্যহিক তুচ্ছতার মধ্যে তাঁহাকে স্থাপন করিতে চাহেন নাই। কিন্তু নিত্যানন্দ-চরিত্র-বর্ণনে তিনি ঔপন্যাসিকোচিত দক্ষতারই পরিচয় দিয়াছেন। নিত্যানন্দের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য-হেতু তিনি তাঁহাকে অধিকতর আপন বলিয়া মনে করিতেন। তাই নিত্যানন্দ-চরিত্রের তুচ্ছতাও ইহাতে উপেক্ষিত হয় নাই। নিত্যানন্দ-চরিত্র অনেকটা বাস্তব, মানবিকতাও ইহাতে অনেকটা সুস্পষ্ট। অবধূত নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈতাচার্যের বাগ্‌যুদ্ধ-বর্ণনা-প্রসঙ্গে কবি অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় দান করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলা-বর্ণনেও কবির বর্ণনা-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীহট্টিয়াদের সঙ্গে ব্যবহারে চৈতন্যদেবের সরস রসিকতার যে চিত্রটি কবি অঙ্কন করিয়াছেন, তাহাও অতিশয় সজীব।

কবির কৃতিত্ব

বৃন্দাবনদাস উচ্চশ্রেণীর কবিপ্রতিভার অধিকারী না হইতে পারেন, তবে তাহার রচনাপ্রবাহ যে সচ্ছন্দগতিতে অগ্রসর হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই বিষয়ে ডঃ সেনের অভিমত উল্লেখযোগ্য: 'কাব্যটির মধ্যে কবিত্ব ফলাইবার কিছুমাত্র চেষ্টা দেখা যায় না, তথাপি চৈতন্য-চরিত্রের অপরিসীম মাধুর্য এবং কবির অন্তর হইতে স্বত-উৎসারিত অজস্র ভক্তিরস চৈতন্যভাগবতকে শ্রেষ্ঠ কাব্যের মর্যাদা দান করিয়াছে। চৈতন্যভাগবতের যে কোন স্থান পড়িলেই ভক্ত কবির আবেগ পাঠকের মনে সঞ্চারিত হইতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় না।' চৈতন্যভাগবতের আর একটি দিক-সম্বন্ধে ডঃ সেন পাঠকদের সাগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি বলেন: 'এইরূপ human interest হিসাবে চৈতন্যভাগবত পুরাতন বাঙ্গালা-সাহিত্যে একক এবং অদ্বিতীয়। শ্রীচৈতন্যের বাল্য এবং

কবি-প্রতিভা

যৌবনলীলা এই রূপ সহজ সরল ভাষায় চিত্তাকর্ষকভাবে বর্ণিত হইয়াছে।' চৈতন্যভাগবতের কোন কোন অংশ অতিশয় হৃদয়গ্রাহী। ভক্ত কবির আবেগ এবং উচ্ছ্বাসও কখন কখন খাঁটি কবিত্বের নির্ঝরিণীর মতো প্রবাহিত হইয়াছে।

সমসাময়িকযুগের চিত্র-রচনায় মধ্যযুগে বৃন্দাবনদাস অতুলনীয়। চৈতন্য-দেবের কালে সমগ্র দেশের রুচি কোন্‌দিকে প্রবাহিত হইতেছিল, ধর্ম-কর্মের অবস্থা কেমন ছিল, চৈতন্য ভাগবত-কাব্যে তাহার একটি নির্ভর-যোগ্য নিদর্শন বর্তমান। সমসাময়িক নবদ্বীপের ঐশ্বর্য, সমৃদ্ধি, শিক্ষা-দীক্ষা-আদি সম্বন্ধেও চৈতন্যভাগবতে বাস্তব অথচ মনোহর চিত্র পরিবেষিত হইয়াছে। তাহার অংশ-বিশেষ উদ্ধারযোগ্য :

যুগচিত্র

নবদ্বীপ সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।
এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে॥
ত্রিবিধ বৈসে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতী প্রসাদে সবেই মহাদক্ষ॥...
সবে মহা অধ্যাপক করি গর্ব ধরে।
বালকেও ভট্টাচার্য সনে কক্ষা করে॥
ধর্মকর্ম লোক সব এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে।
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহুধন॥......
অতি বড় সুকৃতি যে স্নানের সময়।
গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারয়॥...
বাসলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্যমাংস দিয়া কেহ যক্ষপূজা করে॥...
জগৎ প্রমত্ত ধন পুত্র বিদ্যারসে।
দেখিলে বৈষ্ণব মাত্র সবে উপহাসে॥...
তারে বলি সুকৃতি যে দোলা ঘোড়া চড়ে।
দশবিশ জন যার আগে পাছে নড়ে॥

২. লোচন দাস ঃ চৈতন্য মঙ্গল

বৃন্দাবনদাসের অব্যবহিত পরবর্তী চরিতকার সম্ভবত লোচনদাস। লোচন দাস আপনার কাব্যে বিস্তৃত ভাবেই আত্মপরিচয় দান করিয়াছেন। তাঁহার পিতার নাম কমলাকর এবং মাতার নাম সদানন্দী। কবি মাতামহ পুরুষোত্তমের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন; তাহার গুরু ছিলেন নরহরি সরকার ঠাকুর। কবি 'মুরারি গুপ্তের কড়চা' পড়িয়া তাহার অনুসরণেই যে একখানি চৈতন্যজীবনী রচনা-প্রচেষ্টায় ব্রতী হইয়াছিলেন, তাহা গ্রন্থোৎপত্তি-প্রসঙ্গে কবি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। আবার লোচন দাসের কাব্যে যে বৃন্দাবনদাসেরও প্রভূত প্রভাব বর্তমান, তাহার পরিচযও রচনার বহুস্থলেই পাওয়া যায়। তিনি যে বৃন্দাবনদাসের পরবর্তী,—তাহাও তাহার রচনায় পাওয়া যায়,—

কবির পরিচয়

শ্রীবৃন্দাবনদাস বন্দিব এক চিতে।
জগৎ মোহিত যার ভাগবত গীতে ॥

কবির গ্রন্থে 'পাঠমঞ্জরী, কেদার, বড়ারি, মারহাটিযা, ধানশী, শ্রী, ভাটীয়ারী, বিভাস' প্রভৃতি কুড়ি একুশ রকম রাগরাগিনীর উল্লেখ দেখিয়া এবং তাহার নিজস্ব স্বীকৃতি হইতে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, কবি আসরে গান করিবার জন্যই গ্রন্থটি রচনা করিযাছিলেন।

করুণা ভরল সব হেম গোরা গা।
বন্দিয়া গাইব সে শীতল রাঙা পা ॥
সকল ভকত লঞা বৈসহ আসরে।
সে পদ শীতল বা লাগুক কলেবরে ॥

লোচনদাস বৃন্দাবনের পরবর্তী ছিলেন। কিন্তু তাহার জন্ম-মৃত্যু সাল কিংবা গ্রন্থরচনাকাল-সম্বন্ধে সুনিশ্চিত ভাবে কিছু বলিবার উপায় নাই। ড° সেন প্রথম বলিয়াছিলেন যে লোচন দাসের জন্মকাল ১৫২৩খ্রীঃ এবং মৃত্যুকাল ১৫৮৯ খ্রীঃ। কিন্তু পরে আবার ড° সেন এই অভিমত প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন। ড° বিমানবিহারী মজুমদার ১৫৬০ খ্রীঃ—১৫৬৬ খ্রীঃকে এবং ড° দীনেশ সেন ১৫৭৫ খ্রীঃকে লোচনদাসের গ্রন্থ রচনাকাল বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।

কবির কাল

লোচন দাসের কাব্যের নাম 'চৈতন্যমঙ্গল'—বস্তুত, তিনি প্রাচীনতর মঙ্গলকাব্যগুলির সহিত তাঁহার কাব্যের কিছুটা সাধর্ম্যও বজায় রাখিয়াছেন। বৃন্দাবন দাস এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের মত বৈষ্ণবমাহাত্ম্য-প্রচারই তাঁহার কাব্যের উদ্দেশ্য ছিল না বলিয়াই হয়তো তাঁহার কাব্য অপেক্ষাকৃত অসাম্প্রদায়িক। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা চলে যে লোচনদাসের কাব্যের প্রথমেই মঙ্গলকাব্যের অনুসরণে গণেশ, হরগৌরী, সরস্বতী ও দেবতাদের বন্দনা করিয়া পরে গুরুজন, বৈষ্ণব ও গুরুর বন্দনা করিয়াছেন।

কবির অসাম্প্রদায়িকতা

লোচনদাসের কাব্য চারিটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম সূত্রখণ্ডে মঙ্গলকাব্যের মতই বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। এই অংশটি মুরারি গুপ্তের অনুসরণে রচিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, লোচনদাস কখনও কখনও এই সমস্ত কাহিনীর জন্য মহাভারত, জৈমিনি ভারত, ব্রহ্ম-সংহিতা এবং অন্যান্য পুরাণ হইতেও উপাদান গ্রহণ করিয়াছেন। লোচনের কাব্যের দ্বিতীয়খণ্ড বা আদিখণ্ডে মহাপ্রভুর জন্ম হইতে গয়াগমন ও প্রত্যাবর্তন-কাহিনী পর্যন্ত বিবৃত হইয়াছে। পরবর্তী মধ্যখণ্ডে মহাপ্রভুর পুরীযাত্রা ও সার্বভৌম-উদ্ধার পর্যন্ত কাহিনীর বিবরণ পাওয়া যায়। শেষ বা অন্ত্যখণ্ডটি অসম্পূর্ণ।

গ্রন্থ-ভাগ

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, লোচনদাস বৃন্দাবনদাসের মত প্রচারক ছিলেন না, আবার তিনি জয়ানন্দের মত নিছক 'গায়েন' মাত্রও ছিলেন না। মূলত তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান কবি। ফলত, তাঁহার চৈতন্যমঙ্গল কাব্য-হিসাবে 'চৈতন্য-ভাগবত' অপেক্ষাও উপাদেয় বলিয়া বিবেচিত হয়। আবার তিনি ইতিহাস-রচনার ব্যর্থ চেষ্টা না করিয়া কাব্য-রচনার দিকেই মনোযোগ নিবদ্ধ রাখিয়াছিলেন বলিয়া তাহার কাব্য হইতে ঐতিহাসিক-সূত্রের সন্ধান না করাই সঙ্গত। তাহার রচনাকে সার্থক শিল্পসৃষ্টিতে রূপায়িত করিবার আকাঙ্ক্ষায় তিনি প্রয়োজন মত কল্পনাশক্তিরও ব্যবহার করিয়াছেন। এই বিষয়ে ড° সেন মন্তব্য করিয়াছেন, 'চৈতন্যভাগবতের তুলনায় চৈতন্যমঙ্গল বিষয়বস্তুর বর্ণনায় কিছু উন বটে, তবে পল্লবিত কবিত্বাংশে লোচনের কাব্য বৃন্দাবনদাসের কাব্য অপেক্ষা যে শ্রেষ্ঠ তাহা স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে। বৃন্দাবনদাসের রচনা মুখ্যত: বর্ণনাত্মক আর লোচনের রচনা প্রধানত রসাত্মক।' লোচনের কাব্যের ইতিহাস-বিমুখতা এবং পূর্বাপর সামঞ্জস্য-বিহীনতার কথা উল্লেখ করিয়াও

কাব্য বিচার

অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী সহানুভূতির সহিত তাহার কাব্যবিচার করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন : '...কিন্তু খণ্ডবিচ্ছিন্ন এমনি বহু মনোরম চিত্র রচনা করেছেন লোচন;—স্বতন্ত্রভাবে যাদের মধ্যে গল্প ও জীবনরস সুনিবিড় হয়ে আছে। জীবনী-কাব্যকার হিসেবে লোচন ব্যর্থ, কিন্তু মর্মস্পর্শী গল্পরসিক হিসেবে অবশ্য সমুল্লেখ্য।'

লোচনের কাব্য বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের একটি শাখায় বিশেষ সমাদর লাভ করিয়া থাকে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, লোচনদাস ছিলেন চৈতন্য-পার্ষদ্ নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য। নরহরি সরকার বৈষ্ণবসমাজে 'গৌর-পারম্যবাদ' বা 'নদীয়ানগর'-বাদের প্রধান প্রবক্তা। লোচনদাসের কাব্যে শ্রীচৈতন্যের এই 'নদীযা নাগর' ভাবটিই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। 'গৌর-পারম্যবাদ' বা 'নদীয়ানাগর-বাদে'র স্বরূপ এবং লোচনের কাব্যে তাহা কীভাবে পরিস্ফুরিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে জনৈক গ্রন্থকার লিখিযাছেন, 'গৌরপারম্যবাদে

গৌবপাবম্যবাদ

বলা হইয়াছে স্বয়ং কৃষ্ণও উপাস্য নহেন, গৌরাঙ্গই একমাত্র উপাস্য, এই গৌরাঙ্গ আবার সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য নহেন, গৃহী গৌরাঙ্গ। সন্ন্যাসী চৈতন্য পূর্ণ হইতে পারেন, কিন্তু পূর্ণতম হইতেছেন গৃহী ও শৃঙ্গারবেশী গৌরাঙ্গ। গৌরাঙ্গ 'নদীয়ানাগর' এবং ভক্তেরা নদীয়া-নাগরী'। ভক্তের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা হইতেছে ব্রজগোপীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের লীলার অনুরূপ। শ্রীগৌরাঙ্গের রমণীমোহনরূপ, কটাক্ষ, হাস্য, হাবভাব বর্ণনা করিয়া লোচনদাস অপূর্ব কাব্যরচনা করিয়াছেন। লোচনের কাব্যে নদীয়ার কুলবধূগণ গৌরাঙ্গদর্শনে নিজেদের সতীধর্ম পর্যন্ত বিসর্জন দিয়াছেন—"রসালসে আবেশে লোলি পড়ে গোরাপাশে গরগর কামে উনমতা।" লোচনের চৈতন্যমঙ্গল আদ্যন্ত দেবলীলা মাত্র, তাহাতে ঐতিহাসিকতার চিহ্ন নাই—তাহা আগাগোড়া চমৎকার রোম্যান্টিক কাব্য।'

৩. জয়ানন্দ ঃ চৈতন্য মঙ্গল

জয়ানন্দ তাহার 'চৈতন্যমঙ্গল' নামক চৈতন্যচরিতগ্রন্থে যে আত্মজীবনী দান করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, কবির পিতার নাম ছিল সুবুদ্ধিমিশ্র এবং মাতা রোদনীদেবী। কবির জন্মভূমি বর্ধমান জেলার আমাইপুর গ্রাম। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব নীলাচল হইতে গৌড়দেশে যাইবার

কালে আমাইপুর গ্রামে সুবুদ্ধিমিশ্রের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তখনই সুবুদ্ধিমিশ্রের এক বৎসর বয়স পুত্রের নাম রাখেন 'জয়ানন্দ'। অতএব চৈতন্যদেবের জীবৎকালেই জয়ানন্দ জন্মগ্রহণ করেন, এই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। ড° মজুমদার অনুমান করেন, জয়ানন্দ আঃ ১৫৬০ খ্রীঃ 'চৈতন্যমঙ্গল' রচনা করেন। লোচনদাস এবং জয়ানন্দের মধ্যে কে আগে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

পরিচয়

জয়ানন্দও লোচনদাসের মত তাহার 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্যকে মঙ্গলকাব্যের অনুকরণেই গড়িয়া তোলেন। ইহাতেও গ্রন্থের আদিতে বিভিন্ন পৌরাণিক দেবদেবীর বন্দনা করা হইয়াছে এবং বহু পৌরাণিক কাহিনীও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বলা চলে যে, মূল কাহিনী অপেক্ষাও ইহাতে পৌরাণিক কাহিনীর উপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। জয়ানন্দ মূলত 'গায়েন' ছিলেন, তাই পালাগানের আকারেই গ্রন্থটি রচনা করিয়াছেন। লোচনের গ্রন্থের মতই ইহাতেও বিভিন্ন রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে। জযানন্দ পূর্ববর্তী কবিদের সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ উল্লেখ করিয়া পরে বলিয়াছেন,—

কাব্যের পরিচয়

ইবে শব্দ চামর সঙ্গীত বাদ্য রসে।
জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গল গাএ শেষে॥

জয়ানন্দ-রচিত চৈতন্যমঙ্গল নয়টি খণ্ডে বিভক্ত: আদিখণ্ড, নদীয়াখণ্ড, বৈরাগ্যখণ্ড, সন্ন্যাসখণ্ড, উৎকলখণ্ড, প্রকাশখণ্ড, তীর্থখণ্ড, বিজয়খণ্ড এবং উত্তরখণ্ড। বিভিন্ন খণ্ডগুলি অবশ্য সুগ্রথিত নয। ইহাতে চৈতন্যজীবনের যে কাহিনী রচিত হইযাছে, প্রচলিত কাহিনীর সহিত তাহার সর্বাংশে ঐক্য নাই। কোন কোন বিষয়ে জয়ানন্দ যে স্বাধীন-চিত্ততার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার ফলে এক সময় অনেকেই চৈতন্যমঙ্গলের প্রতি সবিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। জয়ানন্দের স্বাতন্ত্র্যের জন্যই তাহাদের ধারণা হইয়াছিল যে জয়ানন্দ পক্ষপাতহীন দৃষ্টিতে সত্য উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্তী গবেষণায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, জয়ানন্দ-প্রদত্ত কাহিনীতে অনেক স্ববিরোধিতা আছে, এবং অনেক কাহিনীই কাল্পনিক। উদাহরণচ্ছলে বলা যায়,—চৈতন্যদেবের পিতৃপুরুষের জন্মভূমি, শচীমাতার দীক্ষাগুরু, চৈতন্যদেবের ভ্রমণপথ, চৈতন্য-মাধবেন্দ্রপুরী সাক্ষাৎকার কিংবা চৈতন্যদেবের বিবাহ-কাল-সম্বন্ধে জয়ানন্দ যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে নূতনত্ব

কাহিনীর স্বাতন্ত্র্য

থাকিলেও সত্যপ্রিয়তার কোন পরিচয় নাই। মনে হয়, গায়েন জয়ানন্দ প্রধানত আসর জমাইবার জন্য এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করিবার জন্যই বহু কাল্পনিক বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে জয়ানন্দ রচিত চৈতন্য-দেবের মহাপ্রয়াণের কাহিনীটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য :

আষাঢ় বঞ্চিত রথ বিজয়া নাচিতে।
ইটল বাজিল বাম পা'এ আচম্বিতে॥
চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে।
সেই লক্ষ্য টোটায় শরণ অবশেষে॥
পণ্ডিত গোসাঞিকে কহিল সর্বকথা।
কালি দশ দণ্ড রাত্রে চলিব সর্বথা॥

চৈতন্যদেবের লোকান্তরের এক অলৌকিক কাহিনী কোন কোন গ্রন্থে বর্ণিত হইলেও এইরূপ বাস্তব এবং সম্ভাব্য কাহিনী অপর কোথাও নাই। জয়ানন্দ কিছু কিছু কাল্পনিক কাহিনী রচনা করিয়াছেন বলিয়াই যে তাহার পরিবেশিত নূতন কাহিনীমাত্রই অপ্রামাণিক হইবে, তেমন কথা বলা যায়না। অতএব অসম্ভব নহে, জয়ানন্দ-রচিত চৈতন্যদেবের এই লোকান্তর-কাহিনীই প্রকৃত সত্য। কিন্তু সত্য হউক, মিথ্যা হউক, জয়ানন্দ চৈতন্যদেবের তিরোধানের এই লৌকিক কাহিনী পরিবেষণ করিয়াছেন বলিয়াই বৈষ্ণবসমাজে তিনি কখনও ক্ষমালাভের যোগ্য বিবেচিত হন নাই। সম্ভবত বৈষ্ণবদের দ্বারা উপেক্ষিত হইবার ফলেই জয়ানন্দের পুঁথি প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছিল। একমাত্র তিনি গদাধর-সম্প্রদায়ভুক্ত অভিরাম গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন বলিয়াই হয়তো জয়ানন্দের কাব্য লোপ পাইতে পাইতেও বাঁচিয়া রহিল।

কবির প্রতি উপেক্ষা

'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থে জয়ানন্দ তাহার পূর্ববর্তী যে সকল কবি এবং চরিত-কারদের নাম ও গ্রন্থের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট। ইহাতে কয়েকটি বিলুপ্ত গ্রন্থের নামও পাওয়া যায়। সমসাময়িক সামাজিকজীবন সম্বন্ধে জয়ানন্দ-প্রদত্ত তথ্য যথেষ্ট মূল্যবান। ইহা হইতে জানা যায় যে, সেকালের উচ্চ-শ্রেণীর মধ্যে মুসলমানী চাল-চলন এবং আদব-কায়দা যথেষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছিল। কলিকালের সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন,—

গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য

ব্রাহ্মণে রাখিব দাড়ি পারস্য পড়িবে।
মোজা পাএ নড়ি হাথে কামান ধরিবে॥

মসনবি আবৃত্তি করিবে দ্বিজবর।
ডাকাচুরি ঘাটি সাধিবেক নিরন্তর॥

বিদগ্ধ-সমাজে জয়ানন্দের গ্রন্থ বিশেষ কোন মর্যাদা লাভে সক্ষম হয় নাই। ড° সেনের মতে, '...লোচনের কাব্য বিদগ্ধের কৃতি, আর জয়ানন্দের কাব্য অবিদগ্ধের লেখনীপ্রসূত। জয়ানন্দের কাব্যে কোনরূপ বাঁধুনি বা পারিপাট্যের প্রয়াস একেবারেই লক্ষিত হয়না, অথচ ইহাতে বৃন্দাবনদাসের কাব্যের মত ভাবাবেগও দেখা যায় না। এই সব কারণে জয়ানন্দের কাব্যের প্রসার ও স্থায়ী আদর হয় নাই।' কোন কোন সমালোচক ইহাকে কাব্য বলিযাই স্বীকার করিতে চাহেন না। একজনের মতে, 'জয়ানন্দের কাব্যে ছিল গায়েনসুলভ চিত্ত-চমৎকার-সৃষ্টির চেষ্টা; কবি-চেতনার স্বতঃস্ফূর্ত অনুমোদনের অভাবে তা অপরিণত পাঁচালীর পর্যায় অতিক্রম করে কাব্য-পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেনি। সার্থক জীবনীর মূল্য ত সে কিছুতেই দাবি করতে পারে না।'

৪. ‖ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী : চৈতন্যচরিতামৃত

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে যে সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয় দান করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে নৈহাটীর নিকটবর্তী ঝামটপুর গ্রাম ছিল কবির জন্মভূমি। কবি স্বপ্নে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর আদেশ লাভ করিয়া বৃন্দাবনধামে গমন করেন এবং তথায় রূপগোস্বামী এবং সনাতন গোস্বামীর অনুগ্রহ লাভ করেন, রঘুনাথ গোস্বামীর শিষ্যত্ব লাভ করেন এবং স্বরূপের আশ্রয় লাভ করেন।

জয় জয় নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ রায়।
যাঁহা হৈতে পাইনু রূপসনাতনাশ্রয়॥
যাঁহা হৈতে পাইনু রঘুনাথমহাশয়।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীস্বরূপ-আশ্রয়॥
সনাতন-কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত।
শ্রীরূপকৃপায় পাইনু ভক্তিরস প্রান্ত॥

'প্রেমবিলাসগ্রন্থ'-মতে জানা যায় যে নিত্যানন্দপ্রভু সশরীরে ঝামটপুর গ্রামে উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণদাসকে নবদ্বীপ যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন।

অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে রচিত 'ভক্তদিগ্‌দর্শনী'-গ্রন্থ-অবলম্বনে জগদ্বন্ধু ভদ্র প্রচার করিয়াছেন যে, কৃষ্ণদাসের পিতার নাম ভগীরথ এবং মাতা সুনন্দা —জাতিতে বৈদ্য। প্রেমবিলাসাদি গ্রন্থে কবিরাজ গোস্বামীর মৃত্যুর কারণ-স্বরূপ বলা হইয়াছে যে, জীবগোস্বামী শ্রীনিবাস আচার্যের সহায়তায় গৌড়দেশে যে সকল বৈষ্ণব গ্রন্থ পাঠাইয়াছিলেন, দস্যুর দল পথে তাহা লুটিয়া লয়। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে কবিরাজ গোস্বামীর 'চৈতন্যচরিতামৃত'ও ছিল। এই দুঃসংবাদ-শ্রবণেই বৃদ্ধ কবিরাজ গোস্বামী প্রাণত্যাগ করেন। এই বিবরণীর সত্যতা-সম্বন্ধে অবশ্য কেহ কেহ সংশয় প্রকাশ করেন।

কবি-কাহিনী

কবিরাজ গোস্বামী যে বৃন্দাবনদাসাদির পরবর্তী ছিলেন এবং রূপ-সনাতনাদির সাহচর্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রত্যুত, তিনি কোন্ কালে বর্তমান ছিলেন এবং কোন্ সালেই বা গ্রন্থ রচনা করিযাছেন, তদ্বিষযে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাইতেছে না। তাহার গ্রন্থের পুষ্পিকায় এই শ্লোকটি পাওয়া যায়ঃ

শাকে সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্যেঽহ্ন্যসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥

এই হিসাবে ১৫৩৭ শকাব্দ (১৬১৫ খ্রীঃ) জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণাপঞ্চমীতে রবিবার দিন বৃন্দাবনধামে গ্রন্থ-রচনা সমাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু তারিখটি গ্রহণযোগ্য নহে বলিয়াই মনে হয়। কারণ প্রৌঢ় কৃষ্ণদাস বৃন্দাবন ধামে আসিয়া সনাতনগোস্বামীর আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন নিশ্চয়ই ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে, কারণ ১৫৫৪ খ্রীঃ সনাতনগোস্বামীর তিরোভাব ঘটে। ইহারও ষাট্ বৎসর পর কৃষ্ণদাসের গ্রন্থ সমাপ্ত হয়—এই উক্তি বিশ্বাসযোগ্য নহে। আবার কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থপ্রণয়নকালে বৃন্দাবন দাসও যে জীবিত ছিলেন, তাহার সাক্ষ্য কবিরাজ গোস্বামী নিজেই দিয়াছেন—'তাঁর আজ্ঞা লয়ে লিখি যাহাতে কল্যাণ।' আর বৃন্দাবন দাসও যে এত দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন না, তদ্বিষয়েও পণ্ডিতমণ্ডলী একমত। অবশ্য কেহ কেহ বলেন যে কৃষ্ণদাস গোস্বামী আপনার বার্ধক্যের কথা বার বার উল্লেখ করিয়াছেন,—

কাল-বিচার

বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির।
হস্ত হালে মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির॥

নানারোগগ্রস্ত চলিতে বসিতে না পারি।
পঞ্চ রোগের পীড়ায় ব্যাকুল রাত্রিদিনে মরি॥

অতএব গ্রন্থরচনা-কালে তিনি যে অতিশয় বৃদ্ধ ছিলেন, তাহা অনুমান করা যায়। কিন্তু গ্রন্থরচনারম্ভকালে কবি বার্ধক্যের কোন দোহাই না দেওয়ায় অনুমিত হয় যে, পরবর্তীকালে 'পঞ্চরোগের পীড়ায়'ই কবি জরাগ্রস্ত হইয়াছিলেন। অতএব তাহার এই বার্ধক্য বয়সের জন্য নহে। কৃষ্ণদাসের পুষ্পিকার অপর একটি পাঠান্তরে 'শাকেঽগ্নি বিন্দুবাণেন্দৌ' উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহাতে ১৫০৩ শকাব্দ বা ১৫৮১ খ্রীঃ পাওয়া যায়। কিন্তু এই বৎসর কৃষ্ণদাস-নির্দেশিত বার-তিথির ঐক্য হয়না—অতএব তারিখটি প্রামাণিক নহে। সবদিক বিবেচনা করিয়া ড° সেন অনুমান করেন যে ১৫৬০ খ্রীঃ-১৫৮০ খ্রীঃ-র মধ্যবর্তী কোন সময়েই গ্রন্থটি বিরচিত হইয়াছিল। কিন্তু ড° দীনেশ সেন, ড° মজুমদার-আদি পণ্ডিতমণ্ডলী মনে করেন যে পুষ্পিকা-ধৃত তারিখেই (১৬১৫ খ্রীঃ) গ্রন্থটি সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

বৃন্দাবনদাস-কৃত 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে চৈতন্য-জীবনের শেষদিকের কাহিনীর বিশদ বিবরণ প্রদত্ত হয় নাই বলিয়া বৃন্দাবন-বাসী বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণদাসকে গ্রন্থরচনা করিতে আদেশ করেন—

মোরে আজ্ঞা করিলা সভে করুণা করিযা।
তা সভার বোলে লিখি নির্লজ্জ হইয়া॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থ আদিলীলা, মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলা তিনখণ্ডে বিভক্ত। প্রতিটি লীলা আবার কতকগুলি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। আদিলীলার সতেরোটি পরিচ্ছেদের প্রথম বারোটি পরিচ্ছেদ প্রকৃত পক্ষে মুখবন্ধ মাত্র,—ইহাতে বৈষ্ণবতত্ত্বের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইয়াছে। পরবর্তী পাঁচটি পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর বাল্যলীলা হইতে আরম্ভ করিয়া নবদ্বীপলীলা পর্যন্ত স্থানলাভ করিয়াছে। মধ্যলীলার পঁচিশটি পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর পরিব্রাজক-জীবনের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। অন্ত্যলীলার কুড়িটি পরিচ্ছেদে চৈতন্য-জীবনের শেষ কয় বৎসরের ভাবোন্মাদ অবস্থার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয়, কবি এত বিস্তৃত গ্রন্থেও চৈতন্যের তিরোধান-কাহিনী বর্ণনা করেন নাই।

গ্রন্থ-ভাগ

ইহার কারণ-স্বরূপ কেহ কেহ অনুমান করেন যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যদেবের লীলাসংবরণের কাহিনীকে একান্ত প্রাকৃত বলিয়াই হয়তো এড়াইয়া গিয়াছেন; আবার কেহ কেহ অনুমান করেন যে, বৃদ্ধ জরাতুর

কবি হয়তো শেষপর্যন্ত লিখিবার বা বলিবার শক্তিই হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন অথবা গ্রন্থ সমাপ্তির পূর্বেই কাল-কবলিত হইয়াছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতে আর একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে,—তিনি চৈতন্যলীলার প্রথমাংশ অতিশয় সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করিয়াছেন। অবশ্য তিনি নিজেই ইহার কারণ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন :

বাল্যলীলাসূত্র এই কৈল অনুক্রম।
ইহা বিস্তারিয়াছেন দাস বৃন্দাবন॥
অতএব এই লীলা সংক্ষেপে সূত্র কৈল।
পুনরুক্তি হয় বিস্তারিযা না কহিল॥

পূর্বসূরী বৃন্দাবনদাসের প্রতি কবির এই ভক্তি ও বিনয়বোধ লক্ষ্য করিবার মত।

চৈতন্য-জীবনের সর্বাধিক প্রামাণিক গ্রন্থ কবিরাজগোস্বামী-কৃত 'শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত'। গ্রন্থটি বৈষ্ণবসমাজে একটি শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থের মর্যাদা লাভ করিয়া থাকে। ড° সুকুমার সেন বলেন, 'চৈতন্যচরিতামৃত চৈতন্যচরিতকাব্য-মাত্র নহে। জীবনীবর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে ইহাতে চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম ও তত্ত্বের স্থূল, সূক্ষ্ম, অতি সূক্ষ্ম বিবরণ, বিচার ও বিশ্লেষণ আছে। তত্ত্ববিচার গ্রন্থটির বাহ্যাংশ নহে; চৈতন্যলীলা, বৈষ্ণবনীতি, দর্শন ও রসতত্ত্ব ইহার মধ্যে অঙ্গাঙ্গিরূপে অচ্ছেদ্যভাবে বিবৃত ও বিচারিত হইয়াছে। বৈষ্ণবদর্শন ও রসতত্ত্ব কৃষ্ণলীলা-কাহিনীর সহিত ওতপ্রোত; সুতরাং ইহাতে কৃষ্ণলীলা যে অনেক পরিমাণে মুখ্যভাবে বিচারিত হইয়াছে তাহাতে অনেকে বিস্ময়বোধ করিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাতে বিস্ময়ের হেতু নাই।'

প্রামাণিক বৈষ্ণবধর্ম গ্রন্থ

চৈতন্যদেবের শেষজীবনের কাহিনী বিস্তৃতভাবে পরিবেষণ করিবার দায়িত্ব লইয়াই কবি গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত হইলেও তিনি যে বৈষ্ণবতত্ত্ব ও দর্শন-প্রচারের দিকেই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বস্তুত এই কারণেই, বৈষ্ণবধর্ম ও দর্শনের এক খনি-রূপেই গ্রন্থটি বৈষ্ণব-সমাজে এত আদৃত হইয়া থাকে। বৈষ্ণবধর্মের তাত্ত্বিক, নৈতিক, দার্শনিক এবং আধ্যাত্মিক সকল বিষয়ই আলোচ্য গ্রন্থে সরলভাষায় পরিবেষিত হইয়াছে। অবশ্য অনেকেই চৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থকে যে দুর্বোধ্য বলিয়া অভিহিত করেন, তাহার কারণ ভাষার কঠোরতা নহে, বিষয়ের কঠোরতা। কবিরাজ গোস্বামী তত্ত্ববিচার

বৈষ্ণব তত্ত্ব ও দর্শন

করিতে গিয়া যথেষ্ট বিচার-শক্তির পরিচয়ও দান করিয়াছেন। যখনই তিনি কোন তত্ত্ব উপস্থাপিত করিয়াছেন, তখনই তাহার সমর্থনে শাস্ত্রীয় বাক্যও উদ্ধার করিয়াছেন। তাহার কাব্যে এই রূপ শ্লোকের সংখ্যা সাড়ে সাত শতেরও অধিক। অবশ্য ইহাদের মধ্যে শত শ্লোক কবির স্বরচিত।

বাঙলাভাষায় বস্তুনিষ্ঠ মননশীল সাহিত্যের অপেক্ষাকৃত স্বল্পতা এই যুগেও বর্তমান। সমগ্র প্রাচীন ও মধ্যযুগে এই ধরণের রচনা প্রায় দুর্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। এই দিক হইতে বিচার করিলে, শুধু প্রাচীন ও মধ্যযুগের নহে, সমগ্র বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসেই কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্য-চরিতামৃতের স্থান অতি উচ্চে। বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শন-সম্বন্ধীয় যাবতীয় আলোচনাই অপেক্ষাকৃত সরলভাষায় ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে—সমসাময়িক যুগে সাহিত্যে গদ্যভাষার প্রয়োগ ছিলনা বলিয়াই হয়তো কবিরাজগোস্বামী পদ্যের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, নতুবা হইত গদ্যই হইত তাঁহার ভাবের বাহন। দৃঢ়বদ্ধ ভাব, ভাবোচ্ছ্বাসের স্বল্পতা এবং সরল প্রকাশ-ভঙ্গী তাহার রচনাকে গদ্যধর্মী করিয়াই তুলিয়াছে। গ্রন্থে পল্লবিত কবিত্বের অবকাশ কম, কবিত্বের বিকাশও কম। কবি যুক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে গদ্যাত্মক রচনায় আপনার প্রয়োজন সাধন করিয়াছেন।

বস্তুনিষ্ঠ গদ্য-ধর্মী রচনা

ড° সুশীলকুমার দে তাহার Vaisnava faith and movement in Bengal গ্রন্থে বলিয়াছেন, 'The literary merit of the work, with its epic length, prolixity and prosiness is much inferior to its prototype. The style is terse, but not very elegant or attractive and the versification poor and faulty.'

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের আরও কিছু ত্রুটি আছে, প্রসঙ্গক্রমে তাহাদের উল্লেখ প্রয়োজন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ মূলত কাব্যকীর্তি স্থাপন করিবার জন্য গ্রন্থরচনায় আত্মনিয়োগ করেন নাই,—তাহার প্রধান লক্ষ্য ছিল বৈষ্ণবধর্মের প্রচার। তাই তাঁহার সাধের কাব্য প্রচারধর্মী হইয়া উঠিয়াছে,—কাব্যগুণ প্রায় নাই বলিলেও চলে। দৃশ্যত তাহার কাব্যে অসাধারণ বিনয় প্রকাশ পাইলেও তিনি প্রতিপক্ষ-সম্বন্ধে সহিষ্ণুতার পরিচয় দান করেন নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজের যে পদটি রসসাহিত্যের উৎকৃষ্ট-নিদর্শন হিসাবে গৃহীত হইয়া থাকে, সেই 'বংশীগানামৃতধাম লাবণ্যামৃতজন্মস্থান' পদটিতেই অ-বৈষ্ণবের রসনাকে 'ভেকজিহ্বা', নাসাকে 'ভস্ত্রা', এবং দেহকে 'লৌহসম' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

কবিরাজগোস্বামী তত্ত্ববিচারে অতিশয় যুক্তি এবং নিষ্ঠার পরিচয় দানকরিলেও

বৈষ্ণবধর্ম প্রচার

চৈতন্য-মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে গিয়া তিনিও বৃন্দাবনদাসের মতই অলৌকিকতার সহায়তা গ্রহণ করিয়াছেন। ফলে তাহার গ্রন্থে যে ঐতিহাসিকতার সম্ভাবনা বর্তমান ছিল, কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাহার সুযোগ পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এই কারণেই বলা চলে, কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচনা তত্ত্ব, ধর্ম এবং দর্শনের বিচারে অসাধারণ বলিয়া বিবেচিত হইলেও জীবনীসাহিত্য কিংবা ঐতিহাসিকতার বিচারে একান্তই সাধারণ।

৫. গোবিন্দদাসের কড়্চা

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' উল্লেখ করা হইয়াছে—

মুকুন্দদত্ত বৈদ্য গোবিন্দ কর্মকার।
মোর সঙ্গে আইসহ কাটোআ গঙ্গাপার॥

ইহা ছাড়া সমগ্র চৈতন্য-সাহিত্যের কোথাও গোবিন্দ কর্মকার নামক কোন ব্যক্তির উল্লেখ পাওয়া যায় না। চৈতন্যজীবনী-রচয়িতাদের প্রত্যেকেই পূর্বসূরীদের সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন,—কিন্তু কেহই চৈতন্য-সমসাময়িক গোবিন্দদাস কর্মকারের কাব্যের কথা উল্লেখ করেন নাই। অতএব ১৮৯৫ খ্রীঃ শান্তিপুরের জয়গোপালগোস্বামী 'গোবিন্দদাসের কড়চা' নামে যে গ্রন্থ প্রকাশ

সমস্যা

করেন, এবং ১৯২৬ খ্রীঃ ড° দীনেশচন্দ্র সেন উক্ত গ্রন্থের যে নব সংস্করণ প্রকাশ করেন, তাহা ভক্ত বৈষ্ণব এবং ঐতিহাসিকদের মনে এক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিল। মূল গ্রন্থটি যেমন একটি সমস্যাস্থল হইয়া দাঁড়াইল, তদপেক্ষা অধিক সমস্যার সৃষ্টি করিল গ্রন্থ-বর্ণিত বিষয়-সমূহ। এই গ্রন্থটিকে অবলম্বন করিয়া পণ্ডিতসমাজে যে পরিমাণ বাদ-বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছে, তেমনটি আর বড় হয় নাই।

গোবিন্দদাস গ্রন্থে যে আত্মপরিচয় দান করিয়াছেন তাহাতে বলিয়াছেন যে তিনি জাতিতে কামার—'অস্ত্রহাতা বেড়ি'-গড়া তাঁহার পেশা। তাঁহার পিতা বর্ধমান জেলার কাঞ্চনপুর-বাসী শ্যামাদাস এবং মাতা মাধবী। কবি 'নির্গুণে মুরখ' বলিয়া পত্নী শশিমুখীর দ্বারা অপমানিত হন এবং 'চৌদ্দশ ত্রিশ শকে' একদিন গৃহত্যাগ করেন। তিনি কাটোয়ায় পৌঁছিয়া প্রেমের ঠাকুর চৈতন্যদেবের নাম শুনিতে পাইলেন এবং নবদ্বীপে গিয়া তাঁহার ভৃত্যের পদ

গ্রহণ করিলেন। অতঃপর মহাপ্রভুর সঙ্গে গোবিন্দ দাস নীলাচল আসেন।

কবির পরিচয়

মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের সময় গোবিন্দদাস বরাবর তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবর্তনের পর মহাপ্রভু তাঁহাকে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। গ্রন্থটি এইখানেই খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে।

গ্রন্থকার যেভাবে গ্রন্থটি সাজাইয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের একটা দলিল বা record রাখাই ছিল কবির অভিপ্রায়। 'করচা করিয়া রাখি শক্তি অনুসারে'। তাই তিনি এই 'কড়্চা' বা note বা diary রাখিয়াছিলেন। গ্রন্থটিতে কিন্তু দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকাহিনী ব্যতীত অপর কোন বিষয়ে কবির প্রতিশ্রুতি-মত, নিখুঁত 'কড়চা' রাখিবার প্রমাণ পাওয়া যায় না। যাহা হউক, গ্রন্থটি যদি মহাপ্রভু-সঙ্গী গোবিন্দদাস কর্মকারেরই রচিত হইত, তবে ইহাই হইত চৈতন্য-বিষয়ে প্রাচীনতম এবং প্রামাণিকতম পুস্তক। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, গ্রন্থটিই গোবিন্দদাসের শত্রুতা সাধন

প্রামাণিক ?

করিয়াছে। ইহার ভাব, ভাষা এবং এমন কিছু আভ্যন্তরীণ প্রমাণ বর্তমান, যাহাতে ইহাকে চৈতন্যের সমকালীন কিংবা গোবিন্দদাসকর্মকার-রচিত বলিয়া বিশ্বাস করিয়া ওঠা যায় না। গ্রন্থের প্রামাণিকতা-সম্বন্ধে যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

গ্রন্থটির ভাষা প্রায় আগাগোড়াই আধুনিক,—মাঝে মাঝে যেন জবরদস্তি করিয়া কিছু কিছু প্রাচীন শব্দ প্রবেশ করানো হইযাছে। এই বিষয়ে অবশ্য গ্রন্থটির অন্যতম সমর্থক ড০ দীনেশচন্দ্র সেন মনে করেন যে, গ্রন্থের স্থান-বিশেষের পাঠোদ্ধার কষ্টকর হওয়ায় এবং স্থানে স্থানে পুঁথি কীটদষ্ট হওয়াতেই সম্পাদক গোস্বামী মহাশয় নিজে কিছু কিছু শব্দ যোজনা করিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু দীনেশবাবু যে শাক দিয়া মাছ ঢাকিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা স্পষ্টতই বোঝা যায়, যখন দেখি, গ্রন্থের মধ্যেই আবার কীটদষ্ট বলিয়া কোন কোন অংশ ছাড় দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থের মধ্যে 'জানলা, রসালখণ্ড, পূর্ণ নগরের' উল্লেখও গ্রন্থটির আধুনিকতার নিঃসংশয় প্রমাণ। পর্তুগীজ শব্দ হইতে আগত 'জান্লা' বাঙ্‌লা ভাষায় অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে; 'রসালখণ্ড' স্থানটি ১৮৩৬ খ্রী-র পর রাসেল সাহেবের নাম-অনুসারে নামাঙ্কিত হয়; ব্রিটিশ-অভ্যুদয়ের পূর্বে পুনা তথা 'পূর্ণনগর' ছিল অজ্ঞাত অখ্যাত স্থান।—গ্রন্থকার এত বার বার

স্নন-তারিখের কথা এবং কড়চা করিবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন যে, মনে হয়, পরবর্তীকালে গ্রন্থখানি লইয়া বিভ্রাটে পড়িতে হইতে পারে, এই আশঙ্কায়ই কবি আট-ঘাট বাঁধিয়া অগ্রসর হইয়াছেন।

জালগ্রন্থ : কড়চা

এতটা সচেতন ইতিহাস-বোধ তৎকালের পক্ষে অস্বাভাবিক। গ্রন্থকার নিজেকে 'নিগুর্ণে মুরখ' বলিয়া পরিচয় দিয়াও যে-ভাবে কাব্যটি রচনা করিয়াছেন, তাহাতে তাহাকে 'সহজাত কবিত্ব প্রতিভার অধিকারী' বলিলেও মনে প্রশ্ন থাকিয়া যায়,—গোবিন্দদাস 'প্রমেয়, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, অবয়বী' ইত্যাদি বেদান্তাদির তত্ত্বকথা কোথা হইতে জানিলেন? ইহা ছাড়াও গ্রন্থে নানাপ্রকার ভ্রান্তি এবং অসঙ্গতির পরিচয় সুস্পষ্ট। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া ডঃ সুকুমার সেন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, '(১) ভাষা ধরিয়া বিচার করিলে গোবিন্দদাসের কড়চার রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর উর্ধ্বে যাইতে পারেনা। (২) বস্তু ধরিয়া বিচার করিলে দেখিতে পাই যে, গ্রন্থটি শ্রীচৈতন্যের কোন অনুচরের রচনা হইতে পারেনা।'—বস্তুত, ডঃ সেনের অনেক পূর্বেই মৃণাল-কান্তি ঘোষ 'গোবিন্দদাসের কড়চা-রহস্য' গ্রন্থে এবং বিপিন বিহারী দাশগুপ্ত 'Govinda Das's Kadcha—a Black Forgery'-নামক গ্রন্থে প্রমাণ করিয়াছেন যে কড়চাখানি আগাগোড়া জাল। ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার মধ্য পথ অবলম্বন করিয়া বলিয়াছেন, 'গোস্বামী মহাশয় হয়ত কোন কীটদষ্ট প্রাচীন পুঁথি সংক্ষিপ্তভাবে যাহা পাইযাছিলেন, তাহাই পল্লবিত করিযা নিজের ভাষায় লিখিয়া গোবিন্দদাসের কড়চা নাম দিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।'—এই সমস্ত আপত্তি ছাড়াও গ্রন্থমধ্যে চৈতন্যদেব-সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য পরিবেশন করা হইয়াছে, তাহাও ভক্ত বৈষ্ণবদের নিকট গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় নাই।

গ্রন্থটি যখন এবং যাহার দ্বারাই রচিত হইয়া থাকুক, গ্রন্থটিতে দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের যে খুঁটিনাটি বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী। গ্রন্থটির স্থানে স্থানে উত্তম কবিত্বশক্তিরও নিদর্শন পাওয়া যায়।

৬. অন্যান্য চৈতন্য-জীবনী

চৈতন্যদেবের জীবনকাহিনী-অবলম্বনে লিখিত আর একখানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। গ্রন্থটি চূড়ামণিদাস-রচিত। পূর্বে ইহাকে 'ভুবনমঙ্গল' নামে পরিচায়িত করা হইলেও প্রকাশ কালে ডঃ সেন ইহার নাম দান করেন

'গৌরাঙ্গ-বিজয়'। ডঃ সেন মনে করেন গ্রন্থটি ১৫৪২ খ্রীঃ হইতে ১৫৫০ খ্রী-র মধ্যবর্তী কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল। চূড়ামণিদাস ছিলেন নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর অনুচর ধনঞ্জয় পণ্ডিতের শিষ্য। তাহার গ্রন্থে পরিচ্ছেদ বিভাগ নাই। আলোচ্য গ্রন্থটিতে কবি চূড়ামণিদাস চৈতন্যদেব এবং তাঁহার পার্ষদদের সম্বন্ধে কিছু কিছু নূতন তথ্য পরিবেষণ করিয়াছেন। কবি চৈতন্যদেবকে ভগবানের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন; কিন্তু তত্ত্বকথার প্রচার করিয়া কিংবা অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ বর্ণনা করিয়া তিনি এই অবতারত্ব প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করেন নাই। গ্রন্থের কোন কোন চরিত্র-চিত্রণে এবং বর্ণনায় কবি বেশ বাস্তবতাবোধের পরিচয় দিয়াছেন।

চূড়ামণিদাস : ভুবনমঙ্গল

অপ্রধান জীবনী-কাব্য : চৈতন্যদেবের জীবন-কাহিনী-অবলম্বনে যে চরিতশাখার একটি ধারার সৃষ্টি হইয়াছিল, চৈতন্যচরিত্র-চিত্রণেই তাহা সমাপ্ত হয় নাই, পরবর্তীকালে চৈতন্য-পার্ষদদের অনেকের জীবনকাহিনী-অবলম্বনেই আরও কিছু কিছু চরিত-সাহিত্য রচিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ঈশান নাগর-রচিত 'অদ্বৈতপ্রকাশ', হরিচরণের 'অদ্বৈতমঙ্গল', নরহরিদাসের 'অদ্বৈতবিলাস', লোকনাথদাসের 'সীতাচরিত্র' ও বিষ্ণুদাস আচার্যের 'সীতাগুণকদম্ব' প্রভৃতি প্রধান। এইগুলি ছাড়াও 'ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তমবিলাস, গৌরচরিত-চিন্তামণি, প্রেমবিলাস' ইত্যাদি আরও গ্রন্থ কালে কালে রচিত হইয়াছে,—ইহাদের মধ্যে চৈতন্য-পরিকরদের জীবনী বর্ণনা করা হইয়াছে। আশ্চর্যের বিষয়, চৈতন্য-পর্ষদ্ এবং পরিকরদের অনেকেরই জীবনী-অবলম্বনে অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, কিন্তু বলরামের অবতার-রূপে পরিচিত নিত্যানন্দপ্রভুর জীবন কাহিনী-অবলম্বনে কোন গ্রন্থ রচিত হয় নাই। ইহার একটি সম্ভাব্য উত্তর এই হইতে পারে যে অধিকাংশ চৈতন্য-জীবনীতেই চৈতন্য-চরিতের সঙ্গে নিত্যানন্দচরিতও প্রায় সমভাবেই বর্ণিত হইয়াছে, অতএব পৃথক্‌ভাবে নিত্যানন্দ-জীবনী রচনার বিশেষ কোন প্রয়োজনীয়তা হয়তো কেহ বোধ করেন নাই।

৭. : অদ্বৈতজ

ক ॥ শান্তিপুরের বৃদ্ধ আচার্য অদ্বৈতমহাপ্রভুকে মহাদেবের অবতার-রূপে বিশ্বাস করা হয়। বৈষ্ণবগণ বিশ্বাস করেন যে অদ্বৈতাচার্যের হুঙ্কারেই

ভগবান্ চৈতন্যরূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অদ্বৈতাচার্য চৈতন্য-জননী শচীদেবীর দীক্ষাগুরু ছিলেন বলিয়াও বৈষ্ণবসমাজে তাহার স্থান অতি উচ্চে। অদ্বৈতাচার্যের একাধিক জীবনকাহিনী রচিত হইয়াছিল, ইহাদের মধ্যে ঈশাননাগর-রচিত 'অদ্বৈতপ্রকাশ' অন্যতম। গ্রন্থে কবি আত্মজীবনীপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে তিনি পাঁচবৎসর বয়সে অদ্বৈতাচার্যের গৃহে আশ্রয় লাভ করেন এবং প্রায় সত্তর বৎসর বয়সে অদ্বৈতাচার্যের অভিপ্রায়ে এবং অদ্বৈত-পত্নী সীতাদেবীর আদেশে আচার্যদেবের জন্মভূমি শ্রীহট্টের লাউড় গ্রামে চলিয়া আসেন। এখানেই—

ঈশান নাগর : অদ্বৈতপ্রকাশ

চৌদ্দশত নবতি শকাব্দ পরিমাণে।
লীলাগ্রন্থ সাঙ্গ কৈনু শ্রীলাউড় ধামে ॥

কবি ঈশাননাগর প্রত্যক্ষভাবে গৌরাঙ্গমহাপ্রভুর সান্নিধ্য-লাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন। ইহা ছাড়াও চৈতন্য পার্ষদ্‌দের প্রত্যেকের সহিতই তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল বলিয়া বিশ্বাস করা চলে। এই গ্রন্থে চৈতন্য জীবন-সম্বন্ধেও এমন সমস্ত তথ্য পাওয়া যায়, যে সকল অন্য কোন গ্রন্থেই দুর্লভ অথচ ইহাদের প্রামাণিকতায়ও কোন সন্দেহ নাই। ডঃ সেন বলেন, '... গ্রন্থ বৃহৎ না হইলেও প্রামাণিকতায় ইহা চৈতন্যজীবনী কাব্যগুলির অপেক্ষা কোন অংশে খাটতো নহেই, পরন্তু লোচন-জয়ানন্দাদির গ্রন্থ হইতে উৎকৃষ্ট। তাবৎ চৈতন্য ও চৈতন্যপরিষদ-জীবনীগ্রন্থের মধ্যে অদ্বৈতপ্রকাশের একাধিক অনন্য-সাধারণ বিশেষত্ব আছে, তাহাতে এই গ্রন্থের মূল্য বাড়িয়া গিয়াছে।...অদ্বৈতপ্রকাশকে চৈতন্যজীবনীগুলির অন্যতম বলা যায়।' ঈশাননাগরের দৃষ্টি খুব সজাগ ছিল। যখনই যে বিষয়ে কিছু রচনা করিয়াছেন, তখনই তাহার উৎস-নির্দেশ করিয়াছেন। স্বয়ং চৈতন্য মহাপ্রভু স্বমুখে তাঁহাকে যে উপদেশ দান করিয়াছিলেন, তাহা কৌতূহলোদ্দীপক বিবেচনায় নীচে উদ্ধৃত হইল :

কাব্য বিচার

সহাস্যে মধুরভাষে গৌরাঙ্গ কহিলা।
শুনহ ঈশান শাস্ত্র যাহা প্রকাশিলা ॥
সাধুস্থানে করিবে সদ্ধর্মের শিক্ষণ।
সর্ব ধর্ম শ্রেষ্ঠ হরিনাম সঙ্কীর্তন ॥

তপজপ হৈতে নামের মহিমা প্রচুর।
নাম লৈলে সর্ব অপরাধ যায় দূর ॥
প্রকৃতি সম্ভাষ উদাসীনের ধর্মনাশ।
নানা দেব-দেবীর কৃষ্ণে না হয় বিশ্বাস ॥

'অদ্বৈতপ্রকাশের মধ্যে পাণ্ডিত্যপ্রয়াস অথবা কবিত্বপ্রচেষ্টা বা কবিসুলভ আড়ম্বর কিছুই নাই। ভাষাও অলঙ্কার-বর্জিত, সরল। ঈশান ক্ষমতাশালী লেখক ছিলেন; কি তত্ত্বকথায় কি সাধারণবর্ণনায় সর্বত্রই লিখন-ভঙ্গীর বিশিষ্টতা ও মাধুর্য বর্তমান।' (ড° সেন)

খ ॥ অদ্বৈতাচার্যের জীবনকাহিনী-অবলম্বনে রচিত অপর একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হরিচরণ দাস-রচিত 'অদ্বৈতমঙ্গল'। হরিচরণ দাস অদ্বৈতপ্রভু অথবা তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অচ্যুতানন্দের এক শিষ্য ছিলেন। তিনি অদ্বৈতাচার্যের শেষ-জীবনের লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন আর প্রথমজীবনের লীলাকাহিনী শুনিয়াছেন প্রভুর মাতুল-তুল্য বিজয়পুরীর মুখে। কবির কাব্য পাঁচ 'অবস্থায়' এবং তেইশ সংখ্যায় বিভক্ত। ইহাতে চৈতন্যলীলা-সম্বন্ধে নূতন কিছু কিছু তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। চৈতন্যদেব যে শান্তিপুরেও অদ্বৈতাচার্য এবং নিত্যানন্দের সঙ্গে দানলীলার অভিনয় করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ আর অন্যত্র পাওয়া যায় না। আবার অদ্বৈতাচার্যের জ্যেষ্ঠ চারি ভ্রাতাই যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও এই গ্রন্থ হইতেই জানা যাইতেছে।—গ্রন্থকার নিজের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু পরিচয় দান করেন নাই।

হরিচবণদাস:
অদ্বৈতমঙ্গল

গ ॥ নরহরিদাস 'অদ্বৈতবিলাস' নামক অপর একটি অদ্বৈত-জীবনী রচনা করিয়াছিলেন। গ্রন্থটি সম্ভবত সম্পূর্ণ আকারে এখনও উদ্ধার করা যায় নাই। সাহিত্যপরিষদে রক্ষিত পুঁথিটি খণ্ডিত,—ইহাতে শুধু বাল্যলীলার কাহিনী বর্তমান। ড° সেন অনুমান করেন যে গ্রন্থটি অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে রচিত হইয়াছিল।

নরহরিদাস:
অদ্বৈতবিলাস

৮. : সীতাজীবনী

সীতাদেবী মহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্যের পত্নী। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবও বিবাহিত ছিলেন; কিন্তু চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গৃহসম্পর্ক বিচ্ছিন্ন

করিয়াছিলেন বলিয়াই, মনে হয়, চৈতন্য-পরিবারের সঙ্গে চৈতন্য-পার্ষদ্দের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া উঠিবার বিশেষ অবকাশ ঘটে নাই। পক্ষান্তরে অদ্বৈতাচার্য ছিলেন গৃহী সন্ন্যাসী,—চৈতন্যদেব এবং পার্ষদ্দের অনেকেই অদ্বৈত-গৃহে গমনাগমন করিতেন। ফলত, অদ্বৈত-পরিবারের সঙ্গেই চৈতন্য-ভক্তদের সম্পর্ক সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ ছিল বলিয়া অনুমান করা চলে। সম্ভবত এই কারণেই শ্রেষ্ঠ নারীচরিত্রের আদর্শ-রূপে তৎকালীন বৈষ্ণবসমাজে সীতাদেবীকেই গ্রহণ করা হইয়াছিল। অবশ্য প্রসঙ্গ-ক্রমে বলা চলে যে, চৈতন্যদেবের মত সীতাদেবীর চরিত্রেও অনেক অসাধারণত্ব, অনেক অলৌকিকত্ব আরোপ করা হইয়াছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহার মানবিক রূপটি কখনও চাপা পড়ে নাই। সীতাদেবীর প্রসঙ্গে হরিচরণ দাস বলিয়াছেন:

সীতাদেবীর প্রভাব

শিষ্য প্রসাদ পাত্র গুরুসঙ্গে বসি।
কেশ খসিল প্রভুর অন্ন পরিবেশি॥
দুইহস্তে পরিবেশি আনি হাতে ধরি।
আর দুই হস্তে চুল বান্ধিল প্রসারি॥

সীতাচরিত্র-সম্বন্ধে দুইখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, একখানি লোকনাথদাস-রচিত 'সীতাচরিত্র', অপরখানি বিষ্ণুদাস আচার্য-রচিত 'সীতাগুণ কদম্ব'। গ্রন্থ দুইখানি-সম্বন্ধে ড° সেন বলেন, 'দুইখানি বইয়েরই প্রাচীনত্ব কৃত্রিম।' ইহাদের মধ্যে লোকনাথদাস-রচিত 'সীতাচরিত্র' প্রধান। এই লোকনাথ দাসই অদ্বৈত-শিষ্য লোকনাথ চক্রবর্তী বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। তাহা না হইলেও ইনি যে অদ্বৈত-শিষ্যসম্প্রদায়ভুক্ত কেহ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থে বৃন্দাবনদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ-আদির উল্লেখ বর্তমান। গ্রন্থটি ত্রয়োদশ অধ্যায়ে সমাপ্ত বলিয়া গ্রন্থকার উল্লেখ করিলেও ইহাতে কোন অধ্যায়ের উল্লেখ নাই, পরন্তু গ্রন্থটিকে খণ্ডিত বলিয়াই মনে হয়। গ্রন্থে উল্লেখযোগ্য কোন তথ্য নাই। গ্রন্থকার প্রধানত সীতাদেবীর দুই শিষ্য নন্দিনী ও জঙ্গলীদেবীর মাহাত্ম্য এবং ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। ইঁহারা উভয়েই পুরুষ ছিলেন,—সাধনার জোরে নারীত্ব লাভ করিয়াছিলেন অথবা নারীবেশেই ইঁহারা সাধনা করিতেন।

লোকনাথদাস:
সীতাচরিত্র

মাধবেন্দ্র আচার্যের পুত্র বিষ্ণুদাস আচার্য 'সীতাগুণকদম্ব' নামে অপর

গ্রন্থ খানি রচনা করেন। বিষ্ণুদাস সীতাদেবীর শিষ্য ছিলেন। ইহাতে নন্দিনী এবং জঙ্গলীদেবীর মাহাত্ম্য থাকিলেও অদ্বৈত আচার্য এবং সীতাদেবী-

বিষ্ণুদাস আচার্য : সীতাগুণকদম্ব

সম্বন্ধেও নূতন কিছু কিছু তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে। ১৪৪৩ শকাব্দে গ্রন্থটির রচনারম্ভ হইয়াছিল, উল্লেখ করা হইলেও ইহাতে সন্দেহের অবকাশ বর্তমান।

৯. : বৈষ্ণবমোহান্ত-চরিত

সপ্তদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তীকাল পর্যন্ত বিভিন্ন বৈষ্ণব মহাজনদের জীবন-কাহিনী অবলম্বনে প্রচুর চরিত-সাহিত্য রচিত হইয়াছে। অবশ্য ইহাদের মধ্যে চৈতন্য-জীবন-বিষয়েও কিছু কিছু গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব মহাজনদের মধ্যে প্রধান ছিলেন শ্রীনিবাস, নরোত্তমদাস, শ্যামানন্দ প্রভৃতি। নরোত্তমদাসের ব্রাহ্মণ শিষ্য নরহরিচক্রবর্তী বৈষ্ণবমহান্তদের সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থই রচনা করিয়া গিয়াছেন,—ইহাদের মধ্যে শ্রীনিবাস আচার্যের জীবনী-কাহিনী-অবলম্বনে রচিত 'শ্রীনিবাসচরিত', নরোত্তমদাসের জীবনী 'নরোত্তমবিলাস' এবং বিভিন্ন বৈষ্ণবমোহান্তদের কাহিনী-অবলম্বনে লিখিত 'ভক্তিরত্নাকর' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'ভক্তি-রত্নাকর' গ্রন্থে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের কাহিনী, বীর হাম্বীর-কর্তৃক 'চৈতন্য-চরিতামৃত'গ্রন্থাদি-লুণ্ঠন কাহিনী, খেতুরীর মহোৎসবাদির বর্ণনা স্থান লাভ করিয়াছে। শ্রীখণ্ডের নিত্যানন্দদাস-রচিত 'প্রেমবিলাস'ও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। নিত্যানন্দদাস ছিলেন নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর কনিষ্ঠাপত্নী জাহ্নবীদেবীর মন্ত্রশিষ্য। গ্রন্থটি ১৫২২ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬০০ খ্রীঃ রচিত হইয়াছিল বলিয়া পুষ্পিকায় উক্ত হইয়াছে। শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তমঠাকুর, শ্যামানন্দ, জাহ্নবী ঠাকুরাণী এবং বীরচন্দ্র গোস্বামী—এই পাঁচজনের চেষ্টায় চৈতন্যোত্তর বঙ্গদেশে যে বৈষ্ণবধর্ম প্রবর্তিত হইল তাহার ইতিহাস এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। ড০ সেনের মতে "'প্রেম বিলাস' এক হিসাবে বাঙ্গালাসাহিত্যের প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ। সেই হেতু গ্রন্থটির মূল্য এবং মর্যাদা যথেষ্ট আছে।' যদুনন্দনদাস-রচিত 'কর্ণানন্দ' প্রেমবিলাসের উপসংহার-রূপেই গৃহীত হইয়া থাকে। ইহাতে বৈষ্ণবমোহান্তদের প্রধান প্রধান শাখার এবং উপশাখার বর্ণনা করা হইয়াছে। 'প্রেমবিলাসে' বর্ণিত কাহিনী এই গ্রন্থে অতি সংক্ষিপ্ত আকারে পরিবেষিত হইয়াছে। রাজবল্লভ-রচিত 'বংশীবিলাস' বা 'মুরলী-

বিলাস' গ্রন্থে চৈতন্যানুচর এবং শ্রীকৃষ্ণের বংশীর অবতার-রূপে কথিত বংশীবদন চট্টের জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থটি ষোড়শ-সপ্তদশ-শতাব্দীর বৈষ্ণব ইতিহাসে একটি অতিশয় মূল্যবান সংযোজন। ইহাতে অলৌকিক ঘটনার আধিক্য থাকিলেও কোন কোন তত্ত্বের উপর নূতন আলোকপাত করা হইয়াছে। গোপীজনবল্লভদাস শ্যামানন্দ-শিষ্য রসিকানন্দ বা রসিক-মুরারির জীবনী-অবলম্বনে 'রসিকমঙ্গল' রচনা করেন। ইহাতেও অলৌকিক কাহিনীর প্রাচুর্য থাকাসত্ত্বেও সমসাময়িককালে বাঙলাদেশে বৈষ্ণব ধর্ম-প্রচারের বিষয়ে অতিশয় মূল্যবান উপকরণ পাওয়া যায়।—বৈষ্ণবমোহান্তদের বিষয়ে অনুরূপ আরও বহু গ্রন্থই রচিত হইয়াছিল। সাহিত্য-কীর্তি-হিসাবে ইহাদের বিশেষ কোন মূল্য নাই, অধিকাংশক্ষেত্রেই পূর্বানুবৃত্তিমাত্র।

অধ্যায় ঃ
নয়

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য

সমগ্র প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলাসাহিত্যে যদি এমন কোন শাখার নাম উল্লেখ করিতে হয়, যাহা বিশ্বসাহিত্যে স্থান লাভের যোগ্য, তবে নিশ্চিতই বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যের কথাই বলিতে হইবে। ধর্মের সহিত ইহার কিছু সম্বন্ধ বর্তমান থাকিলেও এই সাহিত্য যে রসের বিচারে দেশ-কালের সীমাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কোন্ গুণে বৈষ্ণব-সাহিত্য কালকে জয় করিবার শক্তি অর্জন করিয়াছিল, তৎ-সম্পর্কে বলিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবকবিতার প্রেমের দিকটাই বিশেষভাবে দেখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "...এই প্রেমের শক্তিতে বলীয়সী হইয়া আনন্দ ও ভাবের এক অপূর্ব স্বাধীনতা প্রবলবেগে বাঙলাসাহিত্যকে এমন এক জায়গায় উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে যাহা পূর্বাপরের তুলনা করিয়া দেখিলে হঠাৎ খাপছাড়া বলিয়া বোধ হয়। তাহার ভাষা, ছন্দ, ভাব, তুলনা, উপমা ও আবেগের প্রবলতা সমস্তই বিচিত্র ও নূতন। তাহার পূর্ববর্তী বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের সমস্ত দীনতা কেমন করিয়া এক মুহূর্তে দূর হইল, অলঙ্কারশাস্ত্রের পাষাণবন্ধন-সকল কেমন করিয়া এক মুহূর্তে বিদীর্ণ হইল, ভাষা এত শক্তি পাইল কোথায়, ছন্দ এত সঙ্গীত কোথা হইতে আহরণ করিল? বিদেশী সাহিত্যের অনুকরণে নহে, প্রাচীন সমালোচকের অনুশাসনে নহে, দেশ আপনার বীণায় আপনি সুর বাঁধিয়া আপনার গান ধরিল। প্রকাশ করিবার আনন্দ এত, আবেগ এত যে, তখনকার উন্নত মার্জিত কালোয়াতি সঙ্গীত থই পাইল না। দেখিতে দেখিতে দশে মিলিয়া এক অপূর্ব সঙ্গীতপ্রণালী তৈরি করিল, আর কোন সঙ্গীতের সহিত তাহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য পাওয়া শক্ত।" মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য ও অনুবাদ সাহিত্যের যুগে এইভাবে বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্য আপনার পথ করিয়া লইয়াছিল।

কালজয়ী বৈষ্ণব সাহিত্য

আমাদের দেশে একটা বহু-প্রচলিত অভিমত এই যে, মহাপ্রভু চৈতন্য-দেবের আবির্ভাবের ফলে যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল, তাহারই সহিত সংশ্লিষ্ট অবস্থায় বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যের সৃষ্টি ও পুষ্টি। সৃষ্টি-সম্বন্ধে কিছুটা সংশয় থাকিলেও বৈষ্ণবপদাবলীর পুষ্টি-ব্যাপারে গৌড়ীয়

বৈষ্ণবধর্মই প্রধান সহায়কের ভূমিকা লইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। চৈতন্যপূর্ব যুগেই বড়ু চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি রাধাকৃষ্ণ-বিষয়-অবলম্বনে পদ রচনা করিয়াছিলেন। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' অনেকটা কাহিনী-কাব্য-জাতীয় হইলেও ইহার শেষদিকে কয়েকটি আস্বাদন-যোগ্য পদের সন্ধান পাওয়া যায়। কেহ কেহ অনুমান করেন, চৈতন্য-দেবের পূর্বেই অপর একজন পদকর্তা চণ্ডীদাসও আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাহাছাড়া পদ-জাতীয় রচনা জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' গ্রন্থে এবং 'চর্যাপদে'ও পাওয়া যায়। বিশেষত, চৈতন্যদেব নিজেও বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের বর্ণিত রাধাপ্রেমের প্রভাবে পড়িয়া রাধা-ভাবের সাধনায় আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন—কেহ কেহ এইরূপ উক্তিও করিয়া থাকেন। অতএব পদাবলীসাহিত্যের সৃষ্টি যে চৈতন্য-প্রভাবজাত নহে, তাহা প্রায় বিনাদ্বিধায়ই স্বীকার করা চলে। কিন্তু চৈতন্য-লীলা যে পদাবলী সাহিত্যের পুষ্টিতে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহাও নিঃসন্দেহে বলা চলে।

বৈষ্ণব সাহিত্যে চৈতন্য প্রভাব

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনে একমাত্র 'ভক্তিমার্গ'কেই ঈশ্বর-আরাধনার শ্রেষ্ঠ উপায়-রূপে স্বীকৃতি দান করা হইয়াছে। চৈতন্যচরিতামৃতে এই প্রসঙ্গে 'শুদ্ধাভক্তি-'র কথা বলা হইয়াছে।—'আনুকূল্যে সর্বে-ন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন' শুদ্ধা ভক্তি, এবং এই 'শুদ্ধ ভক্তি ইঁহা হৈতে প্রেম হয়'। অতএব জ্ঞানেন্দ্রিয়-কর্মেন্দ্রিয়াদি সর্ব-প্রকার ইন্দ্রিয়কে কৃষ্ণাভিমুখী রাখিয়া যে ভক্তি-সাধনার পথে অগ্রসর হওয়া যায়, তাহার সিদ্ধিই 'প্রেম'। আবার

বৈষ্ণব ধর্মে ভক্তিবাদের প্রাধান্য

প্রেম পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী॥

বস্তুত, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনে রাধাভাবের সাধনাকেই শ্রেষ্ঠ সাধনা বলিয়া অভিহিত করা হয়। উক্ত দর্শনের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের গৌরাঙ্গ-রূপে অবতীর্ণ হইবার কারণ সম্বন্ধে কলিয়াছেন,—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কিদৃশং বেতি লোভাৎ,
তদ্ভাবাঢ্য সমজনি শচী-গর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ।'

অন্যত্র আছে,

রাধাভাব অঙ্গীকরি ধরি তার বর্ণ।
তিনসুখ আস্বাদিতে হয় অবতীর্ণ ॥

রাধাপ্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করিবার জন্যই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্যলোকে নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্য প্রধানত রাধাপ্রেমের স্বরূপ-চিত্রণেই নিযুক্ত।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই বাঙলাদেশে রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে উপজীব্য করিয়া পদাবলী সাহিত্যের রচনা আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। [এই প্রসঙ্গে একটি কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়ের কথা উল্লেখ করিতে হয়। 'ভাগবতপুরাণে' কৃষ্ণ-কাহিনী বিস্তৃতভাবেই লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, এই কারণে পুরাণখানি ভক্তবৈষ্ণবের নিকট শ্রেষ্ঠ-ধর্মগ্রন্থের মর্যাদা লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় ইহাতে রাধার নামটি পর্যন্ত কোথাও উল্লেখ করা হয় নাই। সম্ভবত পরবর্তী পুরাণ-সমূহে, বিশেষত 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে' রাধাকৃষ্ণের প্রেম-কাহিনী বিস্তৃতভাবে পরিবেষিত হইয়াছে। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে'ই সম্ভবত সর্ব্বপ্রথম এই বিষয়ে রচিত গীতধর্মী পদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।]

কৃষ্ণলীলা-কাহিনীর উদ্ভব

কিন্তু ঐ সমস্ত পদসাহিত্যের প্রেম-রচনার মধ্যে কবিদের ব্যক্তিগত অনুভূতির উচ্ছ্বাসই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। এখানেও রাধাভাবের সাধনা—কবি স্বয়ং যেন রাধারূপে কৃষ্ণপ্রেমের স্বাদ উপলব্ধিতে তৎপর। কিন্তু চৈতন্যোত্তর কবিগণ চৈতন্যদেবের অন্তরালে দাঁড়াইয়া যেন রাধাকৃষ্ণের লীলারস আস্বাদন করিয়াছেন। এই বিষয়ে ড° শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেন, 'বাঙলার বৈষ্ণব কবিগণ সকলেই একটু দূর হইতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা আস্বাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—রাধার ভাব কেহই অবলম্বন করিতে চাহেন নাই।...সখী বা মঞ্জরীর অনুগভাবে সাধন করিয়া নিত্য যুগল-লীলা আস্বাদন করাই ছিল বাঙলার বৈষ্ণব কবিগণের সাধ্যসার।' চৈতন্য-পূর্ব বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রেমকে অনেকটা প্রাকৃত বা পার্থিব প্রেম বলিয়াই বর্ণনা করা চলে। কিন্তু পরবর্তী বৈষ্ণব কবিগণ ভক্তির দ্বারা সেই পার্থিব প্রেমকে কিছুটা মাজিয়া ঘষিয়া মালিন্যমুক্ত করিয়া তবে প্রকাশ করিয়াছেন। ড° দাশগুপ্তের মতে, 'পরবর্তী-কালে গৌড়ীয় গোস্বামিগণ-কর্তৃক যখন রাধাতত্ত্ব দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইল তখনও

সাহিত্যের ভিতরে রাধা তাহার ছায়াসহচরী মানবী নারীকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই।'

বাঙলাসাহিত্যের জনৈক ঐতিহাসিক বৈষ্ণবপদাবলীতে বর্ণিত প্রেমের পার্থিবতা প্রমাণ করিবার জন্য একটু উগ্র অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন। 'সহজিয়া-কবি-জীবনে পরকীয়া-প্রেমের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল বলিয়াই তাঁহাদের রচিত বৈষ্ণবপদাবলীতে তাহা স্বাভাবিক, সজীব ও রসোচ্ছল হইয়া প্রকাশিত হইতে পারিয়াছিল এবং সেই জন্য জনপ্রিয়তা ও প্রতিষ্ঠালাভে সমর্থ হইয়াছিল। ইহাই বৈষ্ণব পদাবলীর প্রকৃত ইতিহাস।' ইনি তাঁহার বক্তব্যের সমর্থনে রবীন্দ্রনাথের 'বৈষ্ণবকবিতা'র অংশবিশেষ উদ্ধার করিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, যে, কবির মনেও অনুরূপ ধারণারই সৃষ্টি হইয়াছিল।—

বৈষ্ণব কবিদের পরকীয়া প্রীতি?

'সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি?......'

কিন্তু তৎসত্ত্বেও উক্ত সমালোচক বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যকে রিয়ালিষ্টিক কবিতা বলিয়া অভিহিত করেন নাই। তাঁহার মতে, 'বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেমের মূল বাস্তব জীবনের মৃত্তিকায় বটে, কিন্তু তাহার ফুল ফুটিয়াছে কবি-কল্পনার উন্মুক্ত আকাশে। এইখানেই পদাবলীর কবিদিগের কবি-প্রতিভা।' এই বিষয়ে অপর একজন মধ্য-পথাবলম্বী ঐতিহাসিকের অভিমত উদ্ধার করিতেছি। ইনি পার্থিবপ্রেম ও ভক্তির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করিয়া বৈষ্ণবপদাবলীর একটা যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন। '...বৈষ্ণবপদাবলীকে পুরাপুরি মর্ত্যপ্রেমের নিরিখে বুঝা যাইবেনা, আবার শান্তরসাস্পদ ভক্তির নিরাকাঙ্ক্ষ আত্ম-নিবেদনও ইহার একমাত্র পরিচয় নহে—উভয়ের সংমিশ্রণে, প্রেমের বিষা-মৃতের তীব্রতায় ইহা অনন্যসাধারণ।'

বৈষ্ণবসাহিত্যে পার্থিবপ্রেম ও অধ্যাত্মপ্রেম

বৈষ্ণবপদাবলী রোম্যান্টিক গীতিকবিতার লক্ষণযুক্ত। মর্ত্যচেতনাকে প্রধান 'আলম্বন' রূপে গ্রহণ করিয়া কবি তাহার দৃষ্টিকে প্রসারিত করিয়াছেন অনেক ঊর্ধ্বে,—যেখানে কামনা আর প্রাপ্তির মধ্যে আছে দুস্তর ব্যবধান; এই প্রাপ্তি-কামনার ব্যাকুলতাই কবিকে রোম্যান্টিক করিয়া তুলিয়াছে। ভাগবতচেতনা এবং ধর্মানুভূতিও এই বিষয়ে কবিকে সহায়তা করিয়াছে। এই বিষয়ে প্রাচীন সংস্কৃত এবং প্রাকৃত কবিদের মর্ত্যজীবনাশ্রয়ী রোম্যান্টিক কবিতার এবং

বৈষ্ণবপদাবলীতে রোম্যান্টিকতা

জয়দেব-বিদ্যাপতির সৌন্দর্য্য-পিপাসু রোম্যান্টিক মনের প্রভাবের কথাও স্বীকার করিতে হয়। রাধাকৃষ্ণের প্রেমানুভূতি এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কবিচিত্তে যে রোম্যান্টিকতার জন্ম দান করিয়াছে, তাহা কবির কাব্য-ব্যঞ্জনা ও সৌন্দর্য-সৃষ্টিতেই অবসানপ্রাপ্ত হয় নাই, কাব্যদেহ-নির্মাণেও স্বধর্মের পরিচয় দান করিয়াছে। অর্থাৎ কাব্যের ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কারাদি-বিচারেও ইহার রোম্যান্টিকতা সুস্পষ্ট।

পদাবলীর বিভাগ

রাধাপ্রেম বৈষ্ণবপদাবলীর প্রধান উপজীব্য হইলেও চৈতন্য-জীবনীও ভক্তবৈষ্ণবের নিকট সমানভাবে আদরণীয় ছিল। তাই চৈতন্যোত্তর-সাহিত্যে 'গৌরাঙ্গ-বিষয়ক' পদাবলীর সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। ড° সুকুমার সেন, এই জাতীয় পদগুলিকেও বৈষ্ণবমহাজন-পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া বৈষ্ণবপদাবলীর স্থূল চারিটি বিভাগ করিয়াছেন : ১. গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদাবলী, ২. ভজনপদাবলী, ৩. রাগাত্মিকপদাবলী, ৪. রাধাকৃষ্ণ পদাবলী।

১. গৌবাঙ্গ-বিষয়ক পদাবলী

রাধাভাব অঙ্গীকার করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ নরলোকে গৌরাঙ্গরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এই স্থিরবিশ্বাসেই বৈষ্ণবপদকর্তাগণ রাধাকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহের প্রমূর্ত প্রকাশ-রূপে গৌরাঙ্গদেবের ভজনা করিয়াছেন। বৃন্দাবনের ষড়্‌গোস্বামীগণও রাধাকৃষ্ণতত্ত্বে চৈতন্যদেবের অন্তর্জীবনেরই পরিচয় পাইয়াছেন। অন্যান্য বৈষ্ণব ভক্তগণও গৌরাঙ্গদেবের মধ্যে রাধাভাবের উদ্দীপনা লক্ষ্য করিয়াছেন। এইস্থলে কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা এই,—চৈতন্যদেবের পরবর্তী জীবন-সাধনা অপেক্ষাও তাঁহার পূর্বজীবনের তথা গৌরাঙ্গ-জীবনের যৌবন-সাধনাই কবিদের অধিকতর আকর্ষণ করিয়াছিল। তাই গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদগুলি প্রধানত নবদ্বীপ-লীলাকে কেন্দ্র করিয়াই রচিত হইয়াছে। বৈষ্ণবসাহিত্যে গৌরাঙ্গ-বিষয়ক এই পদগুলিকে সাধারণভাবে 'গৌরচন্দ্রিকা' নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। পদাবলীকীর্তনের প্রারম্ভে গৌরচন্দ্রিকা-কীর্তনকে বৈষ্ণবগণ অবশ্য করণীয় বলিয়া মনে করেন। রাধাকৃষ্ণের লীলাকীর্তনে যে ধরণের রস বা কাহিনী পরিবেষণ করা হইবে, গৌরচন্দ্রিকা হইতেও তদনুরূপ পদ বাছিয়াই পালাকীর্তন সুরু হয়। রাধাকৃষ্ণের যুগল লীলায় যতপ্রকার ভাববৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়, রাধাভাবে ভাবিত গৌরাঙ্গের জীবনেও ততপ্রকার ভাববৈচিত্র্য লক্ষ্য করিয়া পদাকর্তাগণ পদ রচনা করিয়াছেন। বস্তুত রাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনীর ছকে ফেলিয়াই গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদগুলি রচিত হইয়াছে

বলিয়াই 'গৌরচন্দ্রিকা'তেও পূর্বরাগ, বিরহ, অভিসার-আদি পদের সন্ধান পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে চৈতন্যদেবের জীবনের বহু ঘটনাকে অবলম্বন করিয়াও বহু কবি পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তবে উৎকর্ষে এইগুলি পূর্ববর্তী পদগুলির সহিত তুলনীয় নহে। বাসুদেব ঘোষ ও তদ্‌ভ্রাতা গোবিন্দ ঘোষ, বংশীবদন, শিবানন্দ, নরহরি সরকার, লোচনদাস, রাধামোহন, মুরারি গুপ্ত, রামানন্দ বসু-আদি অনেকেই গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ রচনা করিয়াছেন। বৃন্দাবন দাসের উক্তি হইতে জানা যায় যে, মহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্যই সর্বপ্রথম গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ রচনা করিয়া গৌরাঙ্গ-কীর্তনের সূচনা করেন :

কৃষ্ণলীলার অনুসরণ

'আপনে অদ্বৈত চৈতন্যের গীত করি।
বলিয়া নাচেন প্রভু জগত নিস্তারি॥'

চৈতন্যদেবের প্রাচীনতম জীবন-কাহিনী, সংস্কৃতভাষায় রচিত 'মুরারি গুপ্তের কড়চা'র লেখক মুরারি গুপ্ত চৈতন্যদেব অপেক্ষা বড় হইলেও তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। মুরারি গুপ্ত-রচিত একখানি গৌরচন্দ্রিকার পদ বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য—'সখি হে, ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।' বিখ্যাত পদকর্তা গোবিন্দ দাসের 'নীরদনয়নে নীরঘন-সিঞ্চনে' পদটিও গৌরচন্দ্রিকার মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ পদ বলিয়া পরিচিত। পূর্বকথিত বাসুদেব ঘোষ যতগুলি পদ রচনা করিয়াছেন, তাহাদের সবগুলিই গৌরাঙ্গ-বিষয়ক।

ভজন পদাবলীতে ঈশ্বর-বন্দনা, চৈতন্যেতর ভক্ত বৈষ্ণবদের বন্দনা কিংবা গুরুবন্দনার পদগুলিই স্থানলাভ করিয়াছে। বিদ্যাপতির প্রার্থনা-বিষয়ক পদগুলি অপূর্ব। তাঁহার রচিত 'মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়,' 'তাতল সৈকত বারিবিন্দু সম সুতমিত রমণী-সমাজে' পদ দুইটি ব্যঞ্জনায় এবং কবি-কৃতি হিসাবে অনবদ্য। নরোত্তমদাস, চন্দ্রশেখর দাস, গোবিন্দ দাস, বলরাম দাস প্রভৃতি অল্পকয়েক জন কবিও কিছু কিছু ভজন পদাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন।

২. ভজনপদাবলী

রাগাত্মিক পদাবলীতে 'সহজিয়া সাধনপদ্ধতি'রই আভাস পাওয়া যায়। এই হিসাবে এইগুলিকে খাঁটি বৈষ্ণবপদাবলী বলিয়া অভিহিত না করাই সঙ্গত। এই ধরণের রাগাত্মিকপদ বাঙালাসাহিত্যে পূর্বেও বর্তমান ছিল, পরেও রচিত হইয়াছে। সিদ্ধাচার্যদের দ্বারা রচিত চর্যাপদ হইতে আরম্ভ করিয়া বাউলগান পর্যন্ত বহু রচনাতেই এইরূপ রাগাত্মিকপদের সন্ধান পাওয়া যায়।

৩. রাগাত্মিক পদাবলী

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, লোচনদাস, নরোত্তম, নরহরি দাস প্রভৃতি অনেকেই রাগাত্মিক পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক পদগুলিই প্রকৃত বৈষ্ণবপদাবলী, এবং সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে এইরূপ পদেরই প্রাচুর্য দেখা যায়। পূর্বেই বলা হইয়াছে, বৈষ্ণবপদাবলীর মূল উপজীব্য বিষয় প্রেম। শ্রীকৃষ্ণ রাধাপ্রেমের স্বাদ গ্রহণ করিবার জন্যই গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রেমের বিচিত্র গতি, বিচিত্র ভাব,—বৈষ্ণবপদাবলীতে প্রেমের বৈচিত্র্যই দেখানো হইয়াছে। রসশাস্ত্রের অনুসরণে বৈষ্ণবপদকর্তারা প্রেম-ব্যতীত অপর সকল প্রকার রসের পদই রচনা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে বাৎসল্য, সখ্য, মধুর, শান্ত এবং দাস্যই প্রধান। অবশ্য এই প্রসঙ্গে স্বীকার করা প্রয়োজন যে আদিরসের বা প্রেম-বিষয়ক পদগুলির তুলনায় অপরাপর রসাশ্রিত পদ অনেকটা কৃত্রিম এবং অপরিণত বলিয়া মনে হয়।

৪ রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদাবলী

চৈতন্যদেবের তিরোধানের অব্যবহিত পরবর্তীকালেই সম্ভবত নরোত্তম দাসঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। ষড়্-বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষ্যে তিনি এক মহোৎসবের আয়োজন করেন,—ইহা 'খেতরীর মহোৎসব' নামে বিখ্যাত। এই খেতরীর মহোৎসবেই রসকীর্তনের উদ্ভব হয়। আর এই রসকীর্তনকে অবলম্বন করিয়াই অসংখ্য পদের বিশেষত পালাকীর্তনের সৃষ্টি হয়। এই পালাকীর্তনই বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যের প্রাণ। বৈষ্ণব মহাজন-পদগুলি যতখানি কবিতা, তাহার অধিক গান। রাধাকৃষ্ণ-লীলাকাহিনী তথা রাধাকৃষ্ণের প্রেম-বৈচিত্র্য পালাকীর্তনের মধ্য দিয়াই যথার্থরূপে প্রকটিত হইয়াছিল। অতএব কীর্তনে রাধাকৃষ্ণের লীলা-কাহিনী যে ভাবে পরিবেষিত হয়, তাহার বিশ্লেষণেই বিভিন্ন রসাশ্রিত পদের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

খেতরী মহোৎসব ও কীর্তন

কীর্তনের পূর্বেই, যে রসের কীর্তন হইবে, সেই রসাশ্রিত গৌরচন্দ্রিকা গাহিয়া পালাগানের উদ্বোধন করা হয়। এই রীতিটি সম্ভবত নরোত্তমদাস-প্রবর্তিত। কীর্তনগায়ক বা সঙ্কলয়িতাগণ নানাকবির একই রসাশ্রিত পদ একত্র সঙ্কলন করিয়া এক একটি পালারূপে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। রাধা-কৃষ্ণের নিত্যলীলার এই প্রকার রূপভেদ অসংখ্য। বস্তুত বিভিন্ন পালাগানের মধ্য দিয়া কৃষ্ণজন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার মথুরাগমন-কাহিনী পর্যন্ত পাওয়া যাইবে—জন্মলীলা,

গৌরচন্দ্রিকা

নন্দোৎসব, বাল্যলীলা, গোষ্ঠলীলা, দানলীলা, রাসলীলা, হোলি, ঝুলন, পূর্বরাগ, অভিসার, মান-ইত্যাদি বহুবিধ লীলাই পালাগানের অন্তর্ভুক্ত।

আবার রাধিকার মনোভাব ও আচরণকে অবলম্বন করিয়া পদগুলিকে আটটি বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই আট পর্যায়ে নায়িকা নিম্নোক্তরূপে প্রকাশিতা হইয়া থাকেন :

১. অভিসারিকা : প্রিয়মিলনের উদ্দেশ্যে নায়িকা সঙ্কেত-কুঞ্জাভিমুখে যাত্রা করেন।

২. বাসকসজ্জা : প্রিয়মিলনের উদ্দেশ্যে নায়িকা স্বদেহ এবং কুঞ্জসজ্জায় নিযুক্তা থাকেন।

৩. উৎকণ্ঠিতা : নায়কের জন্য নায়িকা উৎসুকভাবে সঙ্কেতকুঞ্জে প্রতীক্ষা করেন।

৪. বিপ্রলব্ধা : নায়িকা নায়কদ্বারা বঞ্চিতা অথবা প্রতারিতা হন।

পদাবলীর বিভিন্ন পর্যায়

৫. খণ্ডিতা : নায়ককে প্রতিনায়িকার নিকট হইতে প্রত্যাবৃত্ত দেখিয়া নায়িকা রুষ্ট হন।

৬. কলহান্তরিতা : নায়কের সহিত মান করিয়া নায়িকা পরে অনুতাপ করেন।

৭. প্রোষিতভর্তৃকা : নায়কের মথুরাগমনে নায়িকা বিরহজীবন যাপন করেন।

৮. স্বাধীনভর্তৃকা : ইহাতে নায়কের সহিত নায়িকার খণ্ডমিলনের ব্যঞ্জনা আছে।

রূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি' বৈষ্ণবরসশাস্ত্র-বিষয়ে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। পদাবলী সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য প্রেমভাবের উজ্জীবন ঘটিয়াছে যে শৃঙ্গার রসে, আলোচ্য গ্রন্থে তাহার বিস্তৃত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।

রসশাস্ত্রানুযায়ী পদাবলী-বিভাগ

রূপগোস্বামীর মতে শৃঙ্গাররসের দুইটি ভেদ : বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ। বিপ্রলম্ভ আবার চারিশ্রেণীতে বিভক্ত : পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস।

'মিলনের পূর্বে পরস্পরের দর্শনাদির দ্বারা নায়ক-নায়িকার চিত্তে উদ্বুদ্ধ রতি যখন বিভাবাদির সংযোগে আস্বাদনীয় অবস্থা লাভ করে, তখন তাহার নাম হয় **পূর্বরাগ**। ...'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি,' 'যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি' যথাক্রমে রাধার ও কৃষ্ণের রূপদর্শন-জাত পূর্বরাগ ; 'কেবা শুনাইল শ্যামনাম' রাধার কৃষ্ণনামশ্রবণ-জাত পূর্বরাগ।

'প্রতিনায়িকাকে নায়ক যদি উৎকর্ষ দেন, তাহা হইলে নায়িকার মনে যে

ঈর্ষ্যাজনিত রোষের উদ্ভব হয়, তাহারই আস্বাদযোগ্য অবস্থার নাম **মান**। আমাদের 'ধনি ভেলি মানিনী' প্রভৃতি পদ এই সূত্রে পঠনীয়।

'প্রেমের গভীরতার ফলে প্রিয়সন্নিকটে থাকিয়াও বিরহবোধজনিত যে বেদনা, তাহারই আস্বাদ-যোগ্য অবস্থার নাম **প্রেমবৈচিত্ত্য**।...'নাগর সঙ্গে রঙ্গে সব বিলসই' ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

'দেশান্তরগমনাদি কারণে বিচ্ছিন্ন নায়ক-নায়িকাহৃদয়ে যে বিরহ বেদনার সৃষ্টি করেন, সেই বেদনার আস্বাদ্য অবস্থা **প্রবাস**।...মাথুর অংশের পদ ইহার উদাহরণ।

'ইহাদের প্রত্যেকটি বিপ্রলম্ভ নামক শৃঙ্গার-রস। ইহারা মাত্র ভালো-বাসা, রোষ, বেদনা-বোধ নহে; পরন্তু উপযুক্ত বিভাব-অনুভাব-সঞ্চারী ভাবের সংযোগে তাহাদের আনন্দময় সংবিদ্-রূপ। আমাদের বর্তমান লক্ষ্য পদাবলীকাব্য, বস্তুজগতের সাধারণ ঘটনা নহে।

'**সম্ভোগ** নায়ক-নায়িকার মিলনজাত উল্লাসময় ভাব। ইহাও বাস্তব নহে, কাব্যগত। বৈষ্ণবশাস্ত্রে বহুপ্রকার সম্ভোগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 'সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ।' ইহার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ এই যে, নায়িকা এখানে সম্পূর্ণ স্বাধীন। রাধা পরকীয়া বলিয়া পূর্ণ স্বতন্ত্রতা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। এই কারণে বৃন্দাবনলীলায় সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ কল্পনা করা কঠিন।' (শ্যামাপদ চক্রবর্তী)

বাঙলা সাহিত্যে বৈষ্ণবপদাবলীগুলির স্থান অনন্য। সমগ্র প্রাচীন ও মধ্যযুগে তো ইহাদের তুলনাই মিলেনা, এমন কি আধুনিকযুগেও রবীন্দ্রনাথের কবিতা-ব্যতীত অল্প কবিতাই ইহার সমকক্ষতা দাবি করিতে পারে। ভাবে, ভাষায়, ছন্দে, অলঙ্কারে এবং ব্যঞ্জনায় বৈষ্ণবপদগুলি অপূর্ব সার্থকতা অর্জন করিয়াছে। বৈষ্ণবকবিতা একেবারে খাঁটি বাঙলার কবিতা, বাঙালীর হৃদয়ের কথা। '...ইহারা সম্পূর্ণ বঙ্গীয়—বাংলাদেশের, বঙ্গপ্রকৃতির ও বাঙালী চরিত্রের সঙ্গে সুসমঞ্জস। বাঙালীহৃদয়ের ভাবুকতা, সৌন্দর্যবোধ ও সুকোমল মাধুর্য নিঃশেষে প্রকাশিত হইয়াছে বৈষ্ণবপদাবলীতে। আরও

পদাবলীর মূল্যবিচার

কয়েকটি গুণে বৈষ্ণব কবিতা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত বঙ্গীয় কবিতা হইতে স্বতন্ত্র; সেগুলি হইতেছে কবিচিত্তের বিশাল বিস্তৃতি, উন্মুক্ততা ও গভীরতা। বৈষ্ণবপদাবলী অধ্যাত্ম সাধনার উপযোগী অথচ পূর্ণভাবে মানবীয়, সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীসাহিত্য অথচ অদ্ভুত-ভাবে সর্বজনীন, জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলেরই আস্বাদ্য। অতিরিক্ত ধর্মীয়

সংকীর্ণতা বা যুগচেতনা ইহাকে দেশে ও কালে আবদ্ধ করে নাই। ইহারা চির স্বাধীন ও চির নবীন। ইহারা বাঙ্গালীর কবিকৃতির চূড়ান্ত নিদর্শন।'

বাঙলাদেশে পদাবলীসাহিত্য যে কী পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল,তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে নিম্নোক্ত তথ্য হইতে। ড০ দীনেশ সেন ১৪৫ জন মহাজনপদকর্তার নাম উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাদের মধ্যে তিনজন মহিলাকবি এবং এগারোজন মুসলমান কবি আছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমেই 'ক্ষণদাচিন্তামণি' গ্রন্থে ৪৫জন কবির তিনশত পদ সঙ্কলিত হইয়াছে। 'পদামৃত সমুদ্র' গ্রন্থে ৭৪৬টি পদ সংগৃহীত হইয়াছে। 'পদকল্পতরু' গ্রন্থে ১৩০ জন কবির তিন হাজারের অধিকপদ সঙ্কলিত হইয়াছে। ড০ সুকুমার সেন বলেন, 'আজ অবধি প্রকাশিত বৈষ্ণবগীতিকবিতার সংখ্যা সাত-আট হাজারের কাছাকাছি হইবে, ভবিষ্যতে আরও দুই-চারি হাজার কবিতা আবিষ্কৃত হইতে পারে।'

পদাবলীর বিস্তৃতি

১. ঃ চৈতন্য-পূর্বযুগ

চৈতন্যের যুগেই বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্য বিশেষ সমৃদ্ধিলাভ করিলেও ইহার উদ্ভব হইয়াছিল চৈতন্য-পূর্ব যুগেই। এই যুগের কবিদের মধ্যে প্রথমেই নাম উল্লেখ করিতে হয় 'বড়ু চণ্ডীদাসে'র। বড়ু চণ্ডীদাস 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে যে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহা রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক হইলেও কাব্যটি পদাবলী-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত নহে। তবে ইহাতে, বিশেষত ইহার শেষদিকে রাধাবিরহের কোন কোন অংশে পদাবলীসাহিত্যের লক্ষণযুক্ত কিছু কিছু রচনার সন্ধান পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যদেব যে চণ্ডীদাসের রচনার স্বাদ গ্রহণ করিতেন, তিনি যদি এই বড়ু চণ্ডীদাস হইয়া থাকেন, তবে সম্ভবত চৈতন্যদেব এই রাধা-বিরহ অংশই পছন্দ করিতেন। কারণ, সমগ্র কাব্যের মধ্যে এই অংশেই রাধার অন্তরের ভক্তি ও আত্মনিবেদনের পরিচয় পাওয়া যায়। পদাবলী সাহিত্যের কিছুটা সমধর্মিতা এই অংশেই বর্তমান। তবে চৈতন্যোত্তরযুগের রাধা এবং চৈতন্য-পূর্বযুগের রাধাভাবের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। বড়ু

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

চণ্ডীদাসের রাধিকা একান্তভাবে মানবী—তাঁহার আর্তি ও বেদনার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার কোন স্পর্শ নাই।

চৈতন্যপূর্বযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বিদ্যাপতি। তাঁহার সম্বন্ধে পূর্বেই বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। বিদ্যাপতির রাধার সঙ্গেও চৈতন্যোত্তর যুগের রাধিকার পার্থক্য সুস্পষ্ট। বিদ্যাপতি মানবী রাধার বহিরঙ্গের দিকেই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তবে বিদ্যাপতির প্রার্থনার পদগুলি চৈতন্যোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ রচনারই সমকক্ষতা দাবি করিতে পারে।

বিদ্যাপতি

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-রচয়িতা মালাধর বসু কোন পৃথক্ পদ রচনা করিয়াছেন বলিয়া জানা না গেলেও তাঁহার মধ্যে যে গীতিপ্রবণতার ভাব বর্তমান ছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ-বিজযের স্থানে স্থানে এইরূপ পদাবলীর সমধর্মী রচনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। লক্ষ্য করিবার বিষয়, রচনার এই সমস্ত অংশে রাধাচিত্তের বেদনা এবং আর্তিই প্রকাশিত হইযাছে।

মালাধর বসুর
শ্রীকৃষ্ণবিজয়

বড়ু চণ্ডীদাস কিংবা মালাধর বসু কেহই বিচ্ছিন্ন কোন পদ রচনা করেন নাই। এইরূপ বিচ্ছিন্ন প্রাচীনতম পদের সন্ধান পাওয়া যায় হোসেনসাহের রাজত্বকালে। পদটি ব্রজবুলি ভাষায় রচিত। ভণিতায় কবি 'যশোরাজখান' আত্মপরিচয়দান-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,

শ্রীযুত হুসন জগতভূষণ
সোই ইহ রস জান।
পঞ্চগৌড়েশ্বর ভোগ পুরন্দর-
ভনে যশোরাজ খান ॥

অনুমান করা হয়, যশোরাজখান সুলতান হোসেন শাহের কর্মচারী ছিলেন এবং তাঁহার রাজত্বকালের মধ্যেই (১৪৯৩ খ্রী°—১৫১৯ খ্রী°) পদটি রচনা করিয়াছিলেন। ড়° সুকুমার সেন অনুমান করেন যে, এই যশোরাজখান একখানি 'কৃষ্ণচরিত'ও রচনা করিয়াছিলেন।

যশোরাজখান

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা চলে যে, সমসাময়িক যুগে প্রায় সমগ্র পূর্বভারতেই ব্রজবুলি ভাষায় বৈষ্ণবপদ-রচনা প্রয়াস চলিতেছিল। চৈতন্যদেবের প্রায় সমসাময়িক শঙ্করদেব আসামে যেমন একজন প্রধান ধর্মগুরুর আসন অধিকার করেন, তেমনি অসমীয়া সাহিত্যের উৎকর্ষ-সাধনেও একজন

খাঁ-এর সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি আসামে ব্রজবুলি ভাষায় পদরচনা করিয়াছিলেন। উড়িষ্যায় রায় রামানন্দ ব্রজবুলিতে পদ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল' পদটি চৈতন্যদেব আস্বাদ করিয়াছিলেন—চৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ উল্লেখ আছে। মিথিলার বিদ্যাপতি-ব্যতীত অন্তত আরও একজন কবি যে হোসেন শাহের রাজত্ব কালেই ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কবির নাম যশোধর। ইনি এবং পূর্ববর্ণিত যশোরাজখান একই ব্যক্তি কিনা বলা কঠিন। ত্রিপুরার রাজা ধনমাণিক্যের একজন রাজপণ্ডিত ব্রজবুলি ভাষায় যে অন্তত একটি পদ রচনা করিয়াছিলেন তাহার সন্ধানও পাওয়া গিয়াছে।

চৈতন্য-সমসময়ে পূর্বভারতে ব্রজবুলি

ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার এবং অপর কেহ কেহ অনুমান করেন যে, চৈতন্য-পূর্ব যুগেই পদাবলীরচয়িতা একজন চণ্ডীদাস জন্মগ্রহণ করেন। ডঃ মজুমদার অবশ্য বড়ু চণ্ডীদাসকে চৈতন্যোত্তরযুগে স্থাপন করিতে চাহেন, কিন্তু তাঁহার এই অভিমত প্রায় কেহই স্বীকার করেন না। যাহা হউক তাঁহাদের বক্তব্য এই যে, পদাবলী-রচয়িতা এই চণ্ডীদাস এবং পালাকীর্তন-রচয়িতা (দীন) চণ্ডীদাস পৃথক ব্যক্তি। চণ্ডীদাস বা দ্বিজ চণ্ডীদাস পূর্বরাগ, আক্ষেপানুরাগ এবং ভাবসম্মেলনের পদরচনায় অপূর্ব সার্থকতার পরিচয় দান করিয়াছেন এবং শ্রীচৈতন্যদেব ইঁহারই রচনার স্বাদ গ্রহণ করিয়া পুলকিত হইতেন।—যাহা হউক, এই সম্বন্ধে এখনও মতবিরোধ বর্তমান বলিয়াই আমরা চৈতন্যোত্তরযুগের পরিচয়-দান প্রসঙ্গে পদাবলীর চণ্ডীদাস-সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিব।

চৈতন্য-পূর্ব চণ্ডীদাস

২. ঃ চৈতন্য-সমসাময়িক যুগ

চৈতন্যদেবের সমসময়ে চৈতন্য-ভক্ত এবং পার্ষদ্‌দের মধ্যে অনেকেই পদরচনায় যথেষ্ট পরদর্শিতার পরিচয় দান করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের অনেকেই চৈতন্যদেবকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কেহ কেহ চৈতন্যদেবকে অবলম্বন করিয়াও পদরচনা করিয়া গিয়াছেন।

চৈতন্য-পরিকর

চৈতন্যের বয়োজ্যেষ্ঠ, অথচ সহপাঠী এবং ভক্ত মুরারিগুপ্ত সংস্কৃত ভাষায়

যে চৈতন্য-জীবনী রচনা করিয়াছেন, তাহাই আদি চৈতন্যজীবনী। কিন্তু এই মুরারি গুপ্ত যে বৈষ্ণবপদও রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অনেকেরই অজ্ঞাত। 'মুরারি'-ভণিতাযুক্ত অসংখ্য পদ হইতে অল্পকয়টি পদমাত্র মুরারি গুপ্তের রচনা বলিয়া নির্বাচিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে 'সখিহে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও' এবং 'কি ছার পীরিতি কৈলা' পদ দুইটি অর্থ-গৌরবে উৎকৃষ্ট। চৈতন্য-দেবের বাল্যলীলার প্রত্যক্ষ-দর্শী মুরারিগুপ্তের চৈতন্য-বিষয়ক পদগুলিতে আন্তরিকতা এবং বাৎসল্য ভাব প্রকট। বাঙলা ছাড়া ব্রজবুলি ভাষাতেও মুরারি গুপ্ত কয়েকটি পদ রচনা করিয়াছিলেন। 'তপত কিরণ যদি অঙ্গ না দগধল'—এইরূপ একটি পদ।

১. মুরারি গুপ্ত

নরহরি সরকার চৈতন্য-সমসাময়িক এবং একজন প্রধান চৈতন্যভক্ত হওয়াসত্ত্বেও চৈতন্য-জীবনী কাব্যে তাঁহার সম্বন্ধে বড় একটা উল্লেখ পাওয়া যায়না,—ইহা বিস্ময়ের বিষয়। দাস-ঠাকুর-উপাধিধারী নরহরি সরকার বর্ধমানজেলার শ্রীখণ্ডের অধিবাসী ছিলেন। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে শ্রীখণ্ডদল সুপরিচিত এবং স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী। যে বৈদ্যবংশে নরহরি জন্মগ্রহণ করেন, সেই বংশে আরও কয়েকজন কৃতী বৈষ্ণবকবিও জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নরহরিদাস 'গৌরাঙ্গাষ্টমালিকা' এবং 'শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত' নামে দুইখানি সংস্কৃত গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। অনুমিত হয় যে, এই নরহরিদাসঠাকুরই বাঙলাদেশে সর্বপ্রথম গৌরাঙ্গ-পূজার প্রবর্তন করেন। তিনিই প্রথম গৌরলীলা-বিষয়ে পদ রচনায় উদ্যোগী হইয়াছিলেন। এইরূপ মনে করিবারও সঙ্গত কারণ আছে। 'পাপিয়াশেখরের' ভণিতাযুক্ত একটি পদে নরহরিদাস-সম্বন্ধে পাওয়া যায় যে,

২. নরহরি সরকার

'গৌরাঙ্গের জন্মের আগে বিবিধ রাগিণীরাগে
ব্রজরস করিলেন গান।'

লোকশ্রুতি-অনুসারে নরহরিদাস চৈতন্য অপেক্ষা মাত্র চারি পাঁচ বৎসরের বড় ছিলেন, অতএব এই পদটি বিভ্রান্তিজনক বলিয়া বোধ হয়। হইতে পারে, গৌরলীলাবিষয়ক পদ রচনার পূর্বে তিনি কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদ রচনা করিয়াছিলেন। কয়েকটি রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদে তাঁহার ভণিতাও পাওয়া যায়; নরহরিদাসের সমস্তপদ বাঙলাভাষায় রচিত হইলেও একটি পদের ভাষা ব্রজবুলি। নরহরিদাস 'গৌর-নাগরী'-ভাবের প্রবর্তক। কৃষ্ণাবতার গৌরচন্দ্রই একমাত্র পুরুষ এবং গৌরাঙ্গ-ভক্তগণ গোপীভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া

গৌরলীলা আস্বাদন করিতেন—ইহাই 'গৌরনাগরীভাব'। নরোত্তম দাস এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

'প্রেমের নাগরী ভেল দাস নরহরি।
গৌরাঙ্গের হাটে ফেরে লইয়া গাগরী।'

শ্রীখণ্ডদলে কেহ কেহ গৌরাঙ্গকে নাগর ভাবে এবং নিজেদের নাগরী-ভাবে কল্পনা করিয়া অতিশয় হাল্কা আদিরসের পদও রচনা করিয়া গিয়াছেন। হয়তো, এই কারণে অন্যান্য বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের উপর কিছুটা বিরক্ত হইয়া থাকিতে পারেন এবং চৈতন্য-জীবনী হইতে নরহরিদাসের নির্বাসনের ইহাও একটি অন্যতম কারণ হইয়া থাকিতে পারে। এই গৌরনাগরীভাবের প্রবর্তনা যে প্রকৃতই আপত্তিজনক ছিল এবং এই পথেই যে বৈষ্ণবধর্মে ধ্বস নামিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে ড০ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন :

গৌরনাগরীভাব

'...পরবর্তীকালে বৈষ্ণব সহজিয়াগণ বৈষ্ণবসমাজে প্রাধান্য লাভ করিলে চৈতন্যের নীতিমার্গীয় প্রেমধর্ম রহস্যবাদী আদিরসাত্মক 'কাল্ট'-এর কবলগ্রস্ত হইয়া পড়িল, এবং ধীরে ধীরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম অবক্ষয়ের পথ ধরিল। নরহরি প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও এই ব্যাপারের জন্য গৌণত দায়ী, কারণ তিনিই এই জাতীয় নাগরভাবের আদর্শ প্রচার ও পদরচনার সূত্রপাত করিয়াছিলেন।' ঘনশ্যামদাস-উপাধিধারী নরহরি চক্রবর্তী নামক অপর এক বহু পরবর্তী কবির সহিত মিশ্রিত হইয়া যাওয়ায় নরহরি দাসের কবিতাগুলিকে পৃথক করিয়া লওয়া কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। তবে যে সকল গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদে গৌরনাগরভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, অন্তত সেইগুলি যে নরহরিদাস-রচিত তাহাতে নিশ্চিত হওয়া চলে। সাধারণভাবে নরহরিদাসের কবিতায় উৎকৃষ্ট কবিকর্মের বিশেষ পরিচয় পাওয়া না গেলেও তাঁহার রচিত কয়েকটি পদ যে উত্তম কাব্য-স্বাদযুক্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। 'কিনা হৈল সই মোর কানুর পীরিতি।' 'সই কত না সহিব ইহা/আমার বন্ধুয়া আন বাড়ি যায়/আমারি আঙ্গিনা দিয়া।' 'গৌরাঙ্গ নহিত কিমেনে হইত/কেমনে ধরিত দে।'—প্রভৃতি পদ-গুলির মধ্যে যে প্রকৃত ভক্তহৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

মুর্শিদাবাদের অধিবাসী তিনভ্রাতা—গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, বাসুদেব

ঘোষ শ্রীগৌরাঙ্গের নাম শুনিয়া নবদ্বীপে চলিয়া আসিলেন এবং চৈতন্য-গোষ্ঠীতে যোগদান করিলেন। চৈতন্যদেবের সঙ্গে ইঁহারা সকলেই নীলাচল গমন করিয়াছিলেন। পরে চৈতন্যদেবের নির্দেশে গোবিন্দঘোষ তথায় থাকিয়া গেলেন, অপর দুই ভ্রাতা বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করিবার জন্য গৌড়ে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই তিন ভ্রাতাই কীর্তনে পারদর্শী ছিলেন, তন্মধ্যে মধ্যম ছিলেন শ্রেষ্ঠ। আবার তিন ভ্রাতাই কিছু কিছু পদও রচনা করিয়া গিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ গোবিন্দ ঘোষ যে কয়টি পদ রচনা করিয়াছেন, সব কয়টি গৌরাঙ্গ-বিষয়ক। তাঁহার 'হেদে রে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও। বাহু পসারিয়া গোরাচাঁদেরে ফিরাও॥' পদটিতে ভক্তের আকূতি বাণীমূর্তি ধারণ করিয়াছে। চৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শী বলিয়া তাঁহার রচনায় স্বাভাবিকতা এবং আন্তরিকতা বর্তমান।

ঘোষভ্রাতৃত্রয়

৩. গোবিন্দ ঘোষ

মাধব ঘোষ বাঙলা এবং ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই পদ রচনা করিয়াছেন,—তবে পদের সংখ্যা খুব বেশি। তাঁহার রচিত বাঙলা পদগুলি চৈতন্য-বিষয়ক এবং ব্রজবুলি পদগুলি কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক। তাঁহার নিমাই-সন্ন্যাসের পদগুলির বাস্তবতা ও আন্তরিকতা প্রশংসনীয়। মাধব ঘোষ কীর্তনীয়ারূপেই অধিকতর খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন, পদ-রচনার দিক হইতে তাঁহার স্থান তত উচ্চে নহে।

৪. মাধব ঘোষ

ঘোষ ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে পদ-রচনায় সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন কনিষ্ঠ বাসুদেব ঘোষ। তিনি কৃষ্ণলীলার অনুসরণে গৌরাঙ্গলীলা-বিষয়েবহু পদ রচনা করিয়াছেন,—তবে অনুকরণজাত বলিয়া এইগুলি অনেকটা কৃত্রিম বলিয়া মনে হয়। চৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শী বাসুদেব ঘোষের রচনায় চৈতন্য দেবের ব্যক্তি ও মানসজীবনের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা, অনেকের মতে চৈতন্যজীবনী-অপেক্ষা অধিকতর প্রামাণিক। কবিরাজগোস্বামী বাসুদেব ঘোষের রচনা-সম্বন্ধে বলিয়াছেন।

৫. বাসুদেব ঘোষ

'বাসুদেব গীতে করে প্রভুর বর্ণনে।
কাষ্ঠপাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে॥'

চৈতন্যের বাল্যলীলার পদ-রচনায় বাসুদেব যে বাৎসল্য রসের পরিচয় দান করিয়াছেন, তাহা উল্লেখযোগ্য। 'শচীর আঙ্গিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়'-পদটি বাৎসল্যরসের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বাসুদেবের পরবর্তী পদগুলিতে গৌরনাগরভাবের পরিচয় অস্পষ্ট নহে।

'রুনু ঝুনু ঝুনু ঝুনু নূপুর পায়।
পেখলুঁ গৌরাঙ্গ বর নটরায়॥' কিংবা
'সবসুখ তেয়াগলুঁ কুলে তিলাঞ্জলি দিলুঁ
গোরা বিনা আন নাহি ভায়।'

—ইত্যাদি পদে স্পষ্টতই কবি রাধাভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া গৌরাঙ্গকে ভজনা করিয়াছেন। তবে পরবর্তী কবিদের গৌরনাগর-ভাবের রচনায় আদিরসের যে বাড়াবাড়ি দেখা যায়, বাসুদেবের রচনা তাহা হইতে মুক্ত। বরং ইঁহার রচনায় বিরহিণী রাধার বেদনাই সংযতভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 'পদকল্পতরু'র সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায় বাসুদেব ঘোষকে 'নদীয়া-নাগরী'-ভাবের একজন উদ্ভাবক বলিয়া মনে করিলেও তাঁহাকে রুচিহীনতার দায় হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন। '...বর্তমান সময়ে একশ্রেণীর গৌরভক্তদের মধ্যে নাগরীভাবের উপাসনার উপলক্ষ্যে যে নানা উচ্ছৃঙ্খলতার কথা শুনা যায়, উহার জন্য লোচন-নবঘন-শ্যাম-নরহরির উদ্দাম পরিকল্পনা আংশিক-ভাবে দায়ী কিনা তাহা আধুনিক বৈষ্ণব ইতিহাস লেখকের চিন্তনীয় হইয়াছে।...আনন্দের বিষয় যে, নরহরি সরকার ও বাসুদেব ঘোষের সম্বন্ধে এরূপ কোনও অভিযোগ করা চলে না।'

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-রচয়িতা কুলীনগ্রামবাসী মালাধর বসুর পুত্র অথবা পৌত্র রামানন্দ বসু চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। তিনি প্রতি বৎসর স্বগ্রামবাসীদের সঙ্গে লইয়া নীলাচলে বর্ষার চারিমাস কাল চৈতন্যদেবের সান্নিধ্যে কাটাইতেন। 'রামানন্দ' ভণিতাযুক্ত ১১টি এবং 'রামানন্দ বসু' ভণিতাযুক্ত ৭টি পদ পাওয়া গিয়াছে। পরবর্তী ৭টি পদই আলোচ্য

৬. রামানন্দ বসু

রামানন্দের রচিত। ইহাদের মধ্যে একটি নিত্যানন্দ-সম্বন্ধীয়, দুইটি চৈতন্য-বিষয়ক এবং অপর চারিটি কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক। কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদগুলির একটি ব্রজবুলিভাষায় রচিত। রামানন্দ বসুর কোন কোন পদ সার্থকসৃষ্টি বলিয়াই কীর্তিত হইয়া থাকে।

কাঁচড়াপাড়ার (কুলীন গ্রামের?) শিবানন্দ সেন মহাপ্রভুর একজন পরম ভক্ত ছিলেন। তাঁহার একটি পদে পাওয়া যায় যে, তিনি প্রতিবৎসর আত্মীয়বন্ধু বা গ্রামবাসীদের সঙ্গে লইয়া নীলাচলে মহাপ্রভুর দর্শনে যাইতেন।

'গৌড়ীয় যাত্রিক সনে বৎসরান্তে দরশনে
কহিলা যাইতে নীলাচলে।'

'শিবানন্দ'-ভণিতা ব্যতীতও শিবাই, শিবাই দাস, শিবানন্দ চক্রবর্তী এবং শিবরাম-ভণিতাযুক্ত অনেকগুলি পদের সন্ধান পাওয়া যায়। এই সব পদই যে শিবানন্দ সেন-রচিত নহে, তাহা অনুমান করা চলে। কবিত্বের দিক হইতে শিবানন্দের কাব্য খুব উৎকৃষ্ট না হইলেও ইহাতে প্রত্যক্ষদর্শীর আন্তরিকতা বর্তমান। শিবানন্দ সেনের পুত্রই 'কবিকর্ণপূর' উপাধিধারী বিখ্যাত পরমানন্দ দাস।

৭. শিবানন্দ সেন

মহাপ্রভুর প্রতিবেশী বংশীবদন চট্ট চৈতন্য-পরিবারের অভিভাবক-স্বরূপ ছিলেন। ইনি একজন উৎকৃষ্ট পদকর্তাও ছিলেন। বংশীবদন-ভণিতাযুক্ত ২৫টি এবং বংশী-ভণিতাযুক্ত ৯টি পদ পাওয়া গিয়াছে। এইগুলি বংশীবদন চট্টর রচিত। বংশীদাস নামক অপর এক কবির রচনার সহিত তাঁহার কিছু কিছু রচনা মিশিয়া গিয়া থাকিতে পারে। বংশীবদনের বাঙলাপদগুলির ভাষা অতিশয় প্রাঞ্জল। তাঁহার কবিতাগুলির মধ্যে প্রত্যক্ষদর্শীর অন্তরঙ্গতার পরিচয় বর্তমান। 'আর না হেরিব প্রসর কপাল/অলকা তিলকা কাচ', 'রাই জাগ রাই জাগ শারীশুক বলে' প্রভৃতি পদগুলি তাঁহারই রচিত। বংশীবদনের 'হেদে লো বিনোদিনী/এ পথে কেমতে যাবে তুমি' পদটি সম্বন্ধে ড০ বন্দোপাধ্যায় বলেন, '...অতি চমৎকার; চিত্রধর্মে ও প্রতীকনির্বাচনে এই পদটির pastoral (রাখালী) সুর অতি প্রশংসনীয়।'

৮. বংশীবদন

চৈতন্য-সমসাময়িককালে আরও অনেক কবি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনেকেরই একই নাম থাকিবার ফলে অনেক সময় ইহাদের রচনা-বিভ্রাট ঘটিয়া থাকে। তবে চৈতন্যের সমকালে উৎকৃষ্ট কবি-প্রতিভা-সম্পন্ন পদকর্তার সন্ধান বিশেষ পাওয়া যায় না। যে সকল পদকর্তার পদাবলী প্রকৃত সাহিত্য-বাচ্য হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহাদের প্রায় সকলেই চৈতন্যের পরবর্তী-কালে জন্মগ্রহণ করেন।

৩. চৈতন্যোত্তর যুগ : চণ্ডীদাস

বাঙলাদেশের সর্বকালের বৈষ্ণবকবিদের মধ্যে চণ্ডীদাস শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এই শ্রেষ্ঠ কবি চণ্ডীদাসের পরিচয় লইয়া বিরাট সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। বস্তুত বাঙলাদেশে যে কয়জন চণ্ডীদাস ছিলেন, তাহাই এখনও পর্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাসকে এই চণ্ডীদাস

চক্র হইতে বাহিরে আনা হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও চণ্ডীদাসের পরিচয় লইয়া মতান্তরের সীমা নাই। দীন চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, সহজিয়া চণ্ডীদাস, তরণীরমণ চণ্ডীদাস ইত্যাদি নানা-অভিধাযুক্ত চণ্ডীদাসদেরই আবির্ভাব ঘটিতেছে। ইহাছাড়া নিরুপাধিক চণ্ডীদাসতো আছেনই।

পদাবলীকার চণ্ডীদাস-সমস্যা

গোড়ায় পূর্বরাগ, আক্ষেপানুরাগ, ভাবোল্লাস-আদি বিচিত্র-রসযুক্ত বিচ্ছিন্ন পদের রচয়িতা বলিয়াই চণ্ডীদাস পরিচিত ছিলেন; পরে, বর্তমান শতাব্দীর প্রথম পাদেই আবিষ্কৃত হইল বড়ু চণ্ডীদাস-কৃত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এবং চণ্ডীদাস-রচিত অনেকগুলি পালাগান। ইতঃপূর্বে কিন্তু চণ্ডীদাসের কোন পালাগান পাওয়া যায় নাই। যখন পাওয়া গেল, তখন পর পর অনেকগুলি পালাই পাওয়া গেল—রাসলীলা, চণ্ডীদাসের চতুর্দশ পদাবলী, জন্মলীলা, রাধার কলঙ্কভঞ্জন প্রভৃতি। চণ্ডীদাসের বিচ্ছিন্ন পদাবলীর সহিত এই পালাগানগুলির সর্বাঙ্গীন পার্থক্য সুস্পষ্ট। এমন কি, বিভিন্ন পালাগানের রচযিতাও যে একই ব্যক্তি হইতে পারেন না, সে বিষয়েও অনেকেই সুস্পষ্ট অভিমত পোষণ করিয়া থাকেন। শ্রদ্ধাস্পদ ব্যোমকেশ মুস্তফী চণ্ডীদাসের 'জন্মলীলা' নামক পালা-গানটি প্রকাশ করিয়াছিলেন। অথচ তিনিই মন্তব্য করিযাছেন, 'চণ্ডীদাসের সুবিখ্যাত পদাবলী-ব্যতীত চণ্ডীদাসের নামে ইতিপূর্বে আরও দুইখানি কাব্যের কথা সাধারণ্যে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে।... যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য প্রমাণ না পাওয়া যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত পদাবলীর চণ্ডীদাস, কলঙ্ক-ভঞ্জনের চণ্ডীদাস ও জন্মলীলার চণ্ডীদাসকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়াই ধরিয়া রাখা উচিত। বাংলা সাহিত্যে একদিন চণ্ডীদাস নামের কবির জোড়া ছিল না, এই কয় বৎসরের মধ্যে একেবারে দেড় জোড়া অর্থাৎ তিনজন অথবা দুইজোড়া অর্থাৎ চারিজন চণ্ডীদাস পাওয়া গেল।' ইহার উপর আবার বড়ু চণ্ডীদাসকে যোগ করিলে চণ্ডীদাসের সংখ্যা পাঁচজনে আসিয়া দাঁড়াইবে।

চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত গ্রন্থাবলী

ড০ দীনেশচন্দ্র সেন, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতি মনীষী অনুমান করেন যে, রচনার বহু বৈচিত্র্য-সত্ত্বেও চণ্ডীদাস এক জনই ছিলেন। মণীন্দ্রমোহন বসু বড়ু চণ্ডীদাস-ব্যতীত শুধু দীন চণ্ডীদাসকে স্বীকার করিয়াছেন। ইনিই নাকি দুই হাজারের অধিক পদের সাহায্যে এক বিরাট্ পালাগান রচনা করিয়া-ছিলেন। ইহার বিচ্ছিন্ন পদই পদাবলী-রূপে বিভিন্ন সঙ্কলন গ্রন্থে উদ্ধৃত

হইয়াছে ; আবার ইহা হইতেই খণ্ড খণ্ড পালাগানও এখানে সেখানে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। বিমান বিহারী মজুমদার পদাবলীর উৎকৃষ্ট পদগুলির রচয়িতা চণ্ডীদাসকে চৈতন্যদেবের পূর্বে স্থাপন করিয়াছেন।

চণ্ডীদাসের সংখ্যা বিষয়ে মতভেদ

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পদাবলীরই দুইজন চণ্ডীদাসের কথা বলিয়াছেন; একজন চৈতন্য-পূর্ব পদাবলীর চণ্ডীদাস, অপর জন চৈতন্যোত্তর পালাগানের চণ্ডীদাস। ইহার উপর চণ্ডীদাস-চক্রকে আরও জটিল করিয়া তুলিযাছে রাগাত্মিক পদের রচযিতা সহজিয়া চণ্ডীদাস। পীরিতি তন্ত্রের সাধক, রামীর সহিত সম্পর্কযুক্ত চণ্ডীদাসের পদে সহজিয়াভাবের প্রকাশ ঘটিয়াছে। যে কয়জন সুধীব্যক্তি চণ্ডীদাস-সম্পর্কে আলোচনায় অবতীর্ণ হইযাছেন, দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহারা একমত হইতে না পারায় সমস্যার জটিলতাই বৃদ্ধি পাইয়াছে। নিম্নে এই বিষয়ে কিছু আলোকপাত করা হইল।

বাঙলাসাহিত্যের প্রথম সার্থক ইতিহাস-রচয়িতা ডঃ দীনেশ সেন তো স্পষ্টই বলিয়াছেন, 'আমার নিকট চণ্ডীদাস এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই।' তিনি

চণ্ডীদাসেব একত্ব

চণ্ডীদাসের সুরটা চিনিবার দাবি লইয়াই কথা বলিয়াছেন, কোন যুক্তির পথ অবলম্বন করেন নাই। ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালীর প্রখর ইতিহাস-বোধ থাকা-সত্ত্বেও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, 'চণ্ডীদাস একাধিক ছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই, কেহ এ পর্যন্ত এমন কোন প্রমাণ দিতে পারেন নাই।' তবে অবশ্য তিনি স্বীকার করিযাছেন যে, চণ্ডীদাসের রচনায় কিছু ভেজাল চলিয়া থাকিতে পারে। বসন্তরঞ্জন 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' পুঁথি আবিষ্কার করাসত্ত্বেও বড়ু চণ্ডীদাসের পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে পদাবলীর চণ্ডীদাসই প্রথম বয়সে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রচনা করিয়াছেন। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় দুইজন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাঁহার মতে পদাবলীসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পদগুলির রচয়িতা এক চণ্ডীদাস চৈতন্য-পূর্ব যুগে বর্তমান ছিলেন; আবার তিনিই 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'ও রচনা করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, যে অসংখ্য পদ চণ্ডীদাস-চিহ্ন বহন করিতেছে, সেই সকল পদের রচয়িতা চণ্ডীদাস 'দীন'-উপাধিধারী

চণ্ডীদাসের দ্বি-ত্ব

এবং তিনি ছিলেন নরোত্তমদাসেব শিষ্য। হরেকৃষ্ণ বাবুর সর্বশেষ অভিমত এই যে, এই দীনচণ্ডীদাসই সহজিয়া-মতাবলম্বী রাগাত্মিক পদগুলি রচনা করিয়াছেন। রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্রও দুইজন চণ্ডীদাসে বিশ্বাসী। তিনি চৈতন্য-পূর্ববর্তী একজন চণ্ডী-

দাসকে স্বীকার করিয়াছেন, যিনি পদাবলীর শ্রেষ্ঠ পদগুলি রচনা করিয়াছেন। নিকৃষ্টতর কবিত্ব-প্রতিভার অধিকারী দীন চণ্ডীদাস ছিলেন চৈতন্যোত্তর কালে। রায় বাহাদুর মিত্র বড়ু চণ্ডীদাসের প্রামাণিকতায় বিশ্বাস করেন না। সতীশচন্দ্র রায় তিনজন চণ্ডীদাসের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তাঁহার মতে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়ু চণ্ডীদাস ছাড়াও দুইজন চণ্ডীদাস ছিলেন। 'আমাদের বিবেচনায় কৃষ্ণকীর্তনের 'প্রবল শক্তিশালী' কিন্তু উন্নত আধ্যাত্মিকতার লেশ শূন্য কবি চণ্ডীদাস বরং কোন অচিন্তনীয় সাধনার বলে পদাবলীর শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক কবি চণ্ডীদাসে পরিণত হইলেও হইতে পারেন, কিন্তু দীন চণ্ডীদাসের পক্ষে উহা সম্পূর্ণ অসম্ভব বটে।' পদাবলীর উৎকৃষ্ট পদগুলির রচয়িতা চণ্ডীদাস যে চৈতন্য-পূর্বযুগেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এবং তিনিই যে আধ্যাত্মিক ভাবে পরিপূর্ণ রাগাত্মিক পদগুলি রচনা করিয়াছিলেন, এই বিষয়ে তিনি প্রায় নিশ্চিত। ড০ বিমানবিহারী মজুমদার চণ্ডীদাসের সংখ্যা আরও বাড়াইয়া দিয়াছেন। তিনি মনে করেন যে একজন চণ্ডীদাস চৈতন্য-পূর্বযুগেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার পদগুলিই কাব্যাংশে এবং ভাবের দিক হইতে উৎকৃষ্ট এবং চৈতন্যদেব ইঁহারই পদ আস্বাদন করিয়াছিলেন। বড়ু চণ্ডীদাস ছিলেন চৈতন্যদেবের সমসাময়িক এবং তিনি কতকাংশে চৈতন্যদেবের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। বিমানবাবু চৈতন্য-পরবর্তী আরও দুইজন চণ্ডীদাসের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন; ইহাদের একজন 'দ্বিজ' ও অপরজন 'দীন' চণ্ডীদাস। তিনি সহজিয়াপদগুলির রচয়িতা কোন চণ্ডীদাসকে স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে 'চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত সহজিয়া পদগুলি কোন একজন কবির লেখা নহে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি এই পদগুলি রচনা করিয়াছেন।'

চণ্ডীদাসের ত্রি-ত্ব

চণ্ডীদাসের বহুত্ব

উপরে বিভিন্ন পণ্ডিতজনের যে সকল অভিমত উদ্ধৃত হইল, সেই মতারণ্য হইতে প্রকৃত সত্যের উদ্ধার আপাতত অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে। তবে বড়ুচণ্ডীদাস সম্বন্ধে প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা চলে যে তিনি পদাবলীর চণ্ডীদাস হইতে পৃথক্। [এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য 'বড়ু চণ্ডীদাস: শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-শীর্ষক আলোচনা দ্রষ্টব্য।] অপর চণ্ডীদাসদের সংখ্যা কত, সেই বিচারে না গিয়া বরং চণ্ডীদাসের পদ ধরিয়া আলোচনাই অধিকতর সার্থক হইবে বলিয়া মনে হয়।

চণ্ডীদাসের পদ-বিভাগ

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে বাদ দিলে চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত অপর সকল পদগুলিকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে : ১. বৈষ্ণবমহাজনপদ ২. পালাকীর্তন ৩. রাগাত্মিক পদ।

১. বৈষ্ণবমহাজনপদ : প্রধানত চণ্ডীদাস-সমস্যাসৃষ্টির পূর্বে চণ্ডীদাসের যে পদাবলী-সাহিত্য চিরকালের বাঙালীর মন কাড়িয়া লইয়াছিল, সেই পরম-স্বাদু পদগুলিকেই 'বৈষ্ণবমহাজনপদ' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই পদগুলি কে বা কাহারা রচনা করিয়াছিলেন, সেই আলোচনা আজ বৃথা। কারণ পদের ভণিতায় যেমন 'দ্বিজ' উপাধি পাওয়া যায়, তেমনি 'দীন' উপাধিরও অভাব নাই, আবার নিরুপাধিক চণ্ডীদাসের পদের সংখ্যাও কম নহে। অনুমান হয়, গায়েনরাও অনেক সময় হয়তো ভণিতার নাম-উপাধির উপর হস্তক্ষেপ করিয়া থাকিতে পারেন। যাহা হউক, এই বিচ্ছিন্ন পদগুলিই চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত শ্রেষ্ঠ রচনার নিদর্শন।

চৈতন্য-পূর্ব যুগে রাধাকৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ে যাঁহারা পদ রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা নিজেরাই যেন সেই লীলারস-আস্বাদনের জন্য রাধার সঙ্গে একাত্ম হইয়া পড়িয়াছিলেন। চৈতন্যোত্তর কালে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটিল ; পদকর্তারা তখন চৈতন্যের অন্তরালে দাঁড়াইয়া সেই লীলার স্বাদ গ্রহণ করিযাছেন। এই দিক হইতে বিচার করিলে মনে হয়, চণ্ডীদাস-রচিত বৈষ্ণব মহাজনপদগুলির অধিকাংশই চৈতন্য-পূর্বকালে রচিত। চণ্ডীদাসের এইভাবতন্ময়তাই যে তাঁহার কাব্যের শ্রেষ্ঠ গুণ, এবং বহিরঙ্গে অসম্পূর্ণতাসত্ত্বেও যে কেন চণ্ডীদাস বাঙালীর এত প্রিয়জন বলিয়া গণ্য হইতেন, চণ্ডীদাসপদাবলীর সম্পাদক নীলরতন মুখোপাধ্যায়ের উক্তি হইতে তাহা বোঝা যাইবে। তিনি লিখিয়াছেন, "চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণের প্রেমে একেবারে মজিয়া গিয়াছিলেন। যোগীর ন্যায় মানসক্ষেত্রে রাধাকৃষ্ণের লীলা প্রত্যক্ষ করিতেন। যাহা দেখিতেন, তাহাই গাইতেন। কল্পনার কথা নয় যে, সাজাইয়া গুছাইয়া তোমার মনে চমক লাগাইতে হইবে। চণ্ডীদাস কৃত্রিমতা জানিতেন না। খাঁটি জিনিষ যেমন পাইলেন, আনিলেন, লোকে লউক আর না লউক, সেদিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তাই তাঁহার কবিতা সরল ও অলঙ্কারবিহীন। বর্ণনীয় বিষয় হইতে মনকে দূরে না আনিলে ত আর উপায় খোঁজা হয় না। সুতরাং বিষয়ে তন্ময়তা জন্মিলে উপমা প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য থাকেনা।" বস্তুত ইহাই শ্রেষ্ঠ কাব্যের লক্ষণ। কাব্যের অলঙ্কৃত সৌন্দর্য সরাসরি পাঠকমনকে স্পর্শ

মহাজনপদাবলীর শ্রেষ্ঠত্ব

করিবে এবং কবিতে ও পাঠকে একটা সাহিত্য-বোধের সৃষ্টি করিবে। তাই রাধাভাবে তন্ময় চণ্ডীদাস যখন আকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠেন, 'সই, কেবা শুনাইল শ্যামনাম' তখন সঙ্গে সঙ্গে পাঠকমনও সাড়া দিয়া উঠে। এই শ্যামনাম বিরহ-ব্যাকুল পাঠকেরও 'কানের ভিতর দিয়া মরমে' প্রবেশ করে।

কৃষ্ণের সহিত তখনও রাধার সাক্ষাৎকার হয় নাই, শুধু তিনি'শ্যাম' নামটি মাত্র শুনিয়াছেন,—ইহাতেই তাহার চিত্তে পূর্বরাগের সৃষ্টি হইয়াছে। এই পূর্বরাগে রাধার আপন স্বাতন্ত্র্যবোধের পরিচয় নাই। তিনি শুধু নাম জপিতে জপিতেই অবশ হইয়া পড়িয়াছেন,—এই কৃষ্ণতন্ময়তাই রাধা-জীবন। তাই, মনে হয়, বৃথাই তিনি ভাবিতেছেন,

'নামপরতাপে যার ঐছন করল গো
অঙ্গের পরশ কিবা হয়।'

এই দেহ-সচেতনতা রাধিকার একান্তই সাময়িক, কারণ তাহার প্রেম দেহের অনেক ঊর্ধ্বেই অবস্থান করিত। যাহা হউক, শ্যাম-নাম শ্রবণের পর রাধা চিত্রপটে শ্যামমূর্তি দর্শন করিলেন এবং তাহারও পরে—'যমুনাকূলে' রাধা 'ত্রিভঙ্গ দাঁড়ায়ে তরুমূলে' মুরলী-ধারী শ্যামসুন্দরের সাক্ষাৎ পাইলেন। এইবার রাধার অন্তরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি আর কিছুতেই আপনাকে সামলাইয়া রাখিতে পারিতেছেন না। 'ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার' তিনি আসা-যাওয়া করিতেছেন, যদি আবার শ্যামের দর্শন পাওয়া যায়। এই দর্শনের জন্য এমন কিছু নাই যাহা তিনি করিতে পারেন না,—'গুরু দুরুজন ভয় নাহি মন'—রাতের অন্ধকারে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলে গুরুজন বা দুর্জনের হাতে নিপীড়িত হইতে পারেন, কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমে সেই ভয়ও তাহার অন্তর্হিত। অন্তর-ধনে ধনী রাধিকা কৃষ্ণসমর্পিতপ্রাণা, তিনি তো সমস্তই কৃষ্ণে উৎসর্গ করিয়া বসিয়া আছেন, অতএব দেহসৌন্দর্যে কৃষ্ণকে মুগ্ধ করিবার কথা তিনি ভাবিতেও পারেন না। তাই আপনার সর্বস্ব উৎসর্গ করিয়া তিনি যোগিনী সাজিয়াছেন, শুধুই যে 'বিরতি আহারে রাঙাবাস পরে', তাহা নহে, 'রাধা সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে',—শ্যাম-সদৃশ মেঘের মধ্যেই তিনি শ্যামের সন্ধান করেন। তাহার অন্তর-ব্যথা প্রকাশ করিবার ভাষা নাই।—বস্তুত রাধার 'পূর্বরাগ'-বর্ণনায় চণ্ডীদাস এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়াছেন। বিদ্যাপতি-আদি কবিগণ পূর্বরাগের কবিতায় রাধার লীলাচপল রূপটিই প্রকাশ করিয়াছেন,—কিন্তু চণ্ডীদাস রাধাময় হইয়া বিরহিণী নারীর মতই বিবশা হইয়া পড়িয়াছেন।

পূর্ববাগ

পূর্বরাগের চিত্র-অঙ্কনে চণ্ডীদাস যে পারদর্শিতার পরিচয় দান করিয়াছেন, তৎপ্রসঙ্গে ডঃ দীনেশ সেন বলিয়াছেন, 'চণ্ডীদাসের বাণী সহজ, সরল ও সুন্দর।...পূর্বরাগের অবস্থা চিত্রিত করিয়া চণ্ডীদাস যে ধ্যানপরায়ণা রাধিকার মূর্তিটি দেখাইয়াছেন, তাহার সাশ্রুনেত্র আমাদিগকে স্বর্গীয় প্রেমের স্বপ্ন দেখাইয়া অনুসরণ করে এবং চৈতন্যপ্রভুর দুটি সজলচক্ষুর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সেই মূর্তি ভাষার পুষ্পপল্লবের বহু উর্ধ্বে নির্মল অধ্যাত্মরাজ্য স্পর্শ করিয়া অমর হইয়া রহিয়াছে। সেইস্থানে সাহিত্যিক সৌন্দর্যের আড়ম্বর নাই।'

চণ্ডীদাস পূর্বরাগ অপেক্ষাও অধিকতর কৃতিত্বের পরিচয় দান করিয়াছেন, আক্ষেপানুরাগের পদ রচনায়। এখানে কবির তথা রাধার ভাবতন্ময়তা আরও গাঢ়, আরও স্পষ্ট। আক্ষেপানুরাগের আরও কয়েকজন বড় বড় কবি আছেন, কিন্তু তাঁহাদের রাধিকা অহংকে ত্যাগ করিতে পারেন নাই, তাই আক্ষেপের সঙ্গে অনুযোগও বর্তমান। কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধিকার মনে কোন অনুযোগ নাই, অভিযোগ নাই, তিনি যে আপনার সর্বস্ব বিলুপ্ত করিয়া দিযাছেন। তিনি 'রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি'—আর কীই বা করিবেন। কিন্তু ইহার পরও যখন রাধা দেখিতে পান, 'আমার বঁধুয়া আন বাড়ি যায় আমার আঙ্গিনা দিয়া'—তখন তিনি জ্ঞানদাসের রাধিকার মত 'কেশ ছিঁড়ি ফেলি বেশ দূর করি' আপন মাথা ভাঙ্গিবার কথা ভাবেননা,—শুধু নীরবে অভিশাপ দেন, 'আমার পরাণ যেমতি করিছে, তেমতি হউক সে।'

আক্ষেপানুরাগ

চণ্ডীদাসের 'ভাব-সম্মিলনের' পদগুলিতে যেন আরও আন্তরিকতা, আরও সুস্পষ্টতার পরিচয় পাওয়া যায়। জীবন-ভোর রাধিকা কৃষ্ণ-সন্ধানেই কাটাইয়াছেন, কৃষ্ণতো তাহার জীবনের জ্বালাই শুধু বাড়াইয়াছেন, তৎসত্ত্বেও যখন রাধিকা বলেন 'জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণনাথ হৈও তুমি', তখন আর বিস্মিত না হইয়া উপায় নাই। রাধাপ্রেম কামনাবাসনাশ্রিত মর্ত্যলোক হইতে বহু উর্ধ্বে এক অধ্যাত্মলোকে বিচরণ করে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 'শতেক বরষ পরে বঁধুয়া মিলাল ঘরে', এই শতবর্ষের ব্যবধানও যাহার চিত্তে একটুখানি মালিন্য স্পর্শ করাইতে পারে নাই, সেই রাধাচিত্ত যে যুগ যুগ ধরিয়া বিরহিণী-প্রাণে অমৃতবারি সিঞ্চন করিবে তাহাতেই বা বিস্ময়ের কী আছে। বস্তুত, এই কারণেই বৈষ্ণবপদাবলী-সাহিত্যে চণ্ডীদাস-কৃত রাধার আত্মসমর্পণের পদগুলি অমূল্য সম্পদ বলিয়াই বিবেচিত হইয়া থাকে।

ভাবসম্মিলন

ব্যাকুলতা ও বেদনা যত সহজে মানুষের মনে সাড়া জাগাইতে পারে অপর কোন অনুভূতিই তাহা পারে না। সম্ভবত এই কারণেই চণ্ডীদাসের পদগুলি পাঠকমনকে এত সহজেই আকর্ষণ করে। তাঁহার পদে চমক নাই, ঠমক নাই, অলঙ্কার নাই,—অতি সহজ সরল ভাষায় প্রাণের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু পাঠক তাহাতেই মুগ্ধ। অতএব রচনার বহিরঙ্গ নহে, ইহার ভাব এবং রসই অধিকতর আস্বাদনযোগ্য। চণ্ডীদাসের এই বেদনা-বোধই প্রকৃত-পক্ষে তাঁহার কাব্যের শ্রেষ্ঠ গুণ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন, চণ্ডীদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন। চণ্ডীদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন। বিদ্যাপতি ভোগ করিবার কবি। চণ্ডীদাস সহ্য করিবার কবি। চণ্ডীদাস সুখের মধ্যে দুঃখ এবং দুঃখের মধ্যে সুখ দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার সুখের মধ্যেও ভয়—দুঃখের প্রতি অনুরাগ।'

চণ্ডীদাসের উৎকর্ষ

চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত বহু কবিতাই অপর কোন কবি-কর্তৃক রচিত বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। ইহাদের মধ্যে বিশেষভাবে, 'ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার', 'আমার বঁধুয়া আন বাড়ি যায়', 'সজনি ও ধনি কে কহ বটে', 'কাহারে কহিব মনের বেদনা' প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তবে এইগুলি এখনও মতান্তর বলিয়াই গৃহীত হইয়া থাকে, স্থির সিদ্ধান্ত নহে।

২. **পালাকীর্তন** : বৈষ্ণব মহাজন পদগুলির বাহিরেও চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত অসংখ্য পদ পাওয়া যায়, ইহাদের সংখ্যা অন্যূন দুই হাজার। পদগুলি বিচ্ছিন্ন নহে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পালাকীর্তনের আকারে সজ্জিত। যদি এই পদগুলি একই ব্যক্তির রচনা হইয়া থাকে, তবে তাহা কৃষ্ণ-বিষয়ক কোন পুরাণের অনুসরণে রচিত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায়। মণীন্দ্রনাথ বসুর মতে, দীনচণ্ডীদাসই এই পালাকীর্তনের রচয়িতা। দীনচণ্ডীদাস চৈতন্যোত্তর কালে বর্তমান ছিলেন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, মণীন্দ্রবাবু দীন চণ্ডীদাসের যে পালাকীর্তন প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে গৌরচন্দ্রিকার অভাব, অথচ চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কবিদের প্রায় সকলেই গৌর-বিষয়ক পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। আরও লক্ষণীয় বিষয়, দীন চণ্ডীদাসের রচনায় বাশুলীরও কোন উল্লেখ নাই।

রচয়িতা
দীন চণ্ডীদাস (?)

দীন চণ্ডীদাস তথা পালাকীর্তন-রচয়িতা চণ্ডীদাসের ভূরি-রচনার ক্ষমতা

ছিল, কিন্তু উৎকর্ষ তাঁহার গণনাতেই, গুণে নহে। কাহিনী-রচনায় তিনি চাতুর্যের পরিচয় দান করিলেও পদাবলীর সহিত তাঁহার রচনা কোনক্রমেই তুলনীয় নহে। ভাবের ঐশ্বর্যে কিংবা গভীরতায় পালাকীর্তনের পদগুলি একান্তই সাধারণ। যে-চণ্ডীদাসের পদ শ্যাম-নামের মতই কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করে, আলোচ্য পালার একটি পদও প্রায় তত্তুল্য নহে। দুই হাজার পদের মধ্যে শতকরা একটি পদও পদাবলীর সমকক্ষতা দাবি করিতে পারে কি না সন্দেহ। বরং এইদিক হইতে বড়ু চণ্ডীদাসের রচনাও উৎকৃষ্টতর বলিয়া বোধ হয়। বড়ু চণ্ডীদাসের রচনায় গ্রাম্যতা আছে, ভাব-বিহ্বলতারও অভাব আছে; কিন্তু তাহার চাতুর্য শুধু কাহিনীবয়নে নহে, ছন্দ-অলঙ্কারাদির ব্যবহারেও বড়ু চণ্ডীদাস পটুত্বের পরিচয় দিয়াছেন। কবিত্বশক্তি, কল্পনাশক্তি এবং রচনাচাতুর্যে তিনি পদাবলীর চণ্ডীদাসের সমকক্ষতা দাবি করিতে না পারিলেও অন্তত পালাকীর্তন-রচয়িতার অপেক্ষা যে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে আবেগ ও কল্পনাকুশলতা কবিকে কাব্যরচনায় প্রেরণা দান করে, দীন চণ্ডীদাসের রচনায় তাহারই একান্ত অভাব দেখা যায়—'তাঁহার পালাগানের পদাবলী অতিশয় নীরস—শুষ্ক ঘটনাবিবৃতি মাত্র। দীন চণ্ডীদাস উপাদান-কঙ্কালে লাবণ্য সঞ্চার করিতে পারেন নাই। যাহাকে ইংরাজীতে 'uninspired' লেখা বলে, দীন চণ্ডীদাসের অধিকাংশ পদই সেই প্রকার uninspired, আবেগ উত্তাপহীন, প্রথাপালনের পদাবলী হইয়াছে।' (ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়)

অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্টতা

৩. রাগাত্মিক পদ: বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়ের রচিত 'চর্যাপদ'-গুলিতে যেমন কতকগুলি সঙ্কেতের সাহায্যে তাহাদের আচরিত ধর্মরহস্য প্রকাশিত হইয়াছে, চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত কতকগুলি বৈষ্ণব পদেও এইরূপ সাঙ্কেতিকতার আভাস পাওয়া যায়। এই ধরণের পদগুলিকে 'রাগাত্মিক পদ' বলিয়া অভিহিত করা হয়। সহজিয়া সাধন-পদ্ধতিতে কিছুটা তান্ত্রিকতার প্রভাব পড়িয়াছে। এই পদগুলিতেই চণ্ডীদাস-রামীর কাহিনী প্রশ্রয় লাভ করিয়াছে। বৈষ্ণবমহাজনপদ এবং দীন চণ্ডীদাসের পালাকীর্তনে রামীর নাম কোথাও পাওয়া যায় না; পক্ষান্তরে চণ্ডীদাস ও রামীকে অবলম্বন করিয়া পরবর্তীকালে যে সকল মুখরোচক-কাহিনী জন্মলাভ করিয়াছিল, আলোচ্য রাগাত্মিক পদগুলিতে এই কাহিনীই পরিপোষকতা লাভ করিয়াছে। অসম্ভব নহে, হয়তো নূতনতর কোন

সহজিয়া পদ্ধতি

চণ্ডীদাস এই কাহিনীর নায়ক হইয়া থাকিতে পারেন। অথবা এমনও হইতে পারে, সহজিয়াপন্থী কোন এক বা একাধিক কবি পদরচনা করিয়া তাহা চণ্ডীদাসের নামে চালাইয়া দিয়া থাকিবেন। যাহা হউক, রাগাত্মিকপদগুলির রচয়িতা যিনিই হউন, মনে হয়, তিনি পালাকীর্তন-রচয়িতা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কবি-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। যদিও কবির রাগাত্মিকপদগুলির সঙ্গে কিছু কিছু প্রহেলিকারও মিশ্রণ ঘটিয়াছে, তৎসত্ত্বেও কবিতাগুলির শিল্পকৃতি প্রশংসনীয়। রাগাত্মিকপদগুলিতে গূঢ় ধর্মপ্রণালী ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে বলিয়া কবি অনেক রূপক ও প্রতীকের ব্যবহার করিয়াছেন। প্রতীকের বহিরাবরণ ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিলে যে রসের সন্ধান পাওয়া যাইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ সহজিয়া চণ্ডীদাস যত বড় সাধক ছিলেন, তাহার অপেক্ষাও বেশি ছিলেন কবি।

পালাকীর্ত্তন অপেক্ষা উৎকর্ষ

৪. ॥ জ্ঞানদাস

বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে জ্ঞানদাস শ্রেষ্ঠ না হইলেও প্রধানদের মধ্যে একজন। একদিকের বিচারে অবশ্য জ্ঞানদাসকে শ্রেষ্ঠত্বও দান করা চলে: কারণ বৈষ্ণবকবিদের মধ্যে একমাত্র তাঁহার রচনাতেই যেন আধুনিক মনের প্রতিফলন দেখা যায়। জ্ঞানদাস, মধ্যযুগের কবি হইয়াও কীভাবে যুগাতিশায়ী ভাবধারার অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই দিক হইতে তিনি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম এবং রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রেরই সমধর্মী।

আধুনিকতার লক্ষণ

জ্ঞানদাসের চৈতন্য-দর্শন না ঘটিলেও যে তিনি চৈতন্যের জীবৎ-কালেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা মোটামুটি স্বীকৃত হইয়া থাকে। অন্তত তিনি যে চৈতন্যপরিমণ্ডলেই লালিত-পালিত হইয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। জ্ঞানদাসের ব্যক্তিগত পরিচয় জানিবার সুযোগ বিশেষ নাই। তাঁহার সর্বজনস্বীকৃত পরিচয় সামান্যই—সম্ভবত বর্ধমান জেলার কাঁদড়া গ্রামে তিনি ১৫৩০ খ্রীঃ ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অবশ্য এই সব তারিখ একেবারেই আনুমানিক। তবে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে নরোত্তমদাসের আহ্বানে যে মহোৎসব অনুষ্ঠিত

পরিচয়

হইয়াছিল জ্ঞানদাস তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন,—এই বিষয়ে লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবীদেবীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং নিত্যানন্দশাখার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন,—এই বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। নিত্যানন্দ-বিষয়ে রচিত জ্ঞানদাসের পদে প্রত্যক্ষদর্শীর পরিচয় পাওয়া যায় অনুমান করিয়া ড° বিমান বিহারী মজুমদার মনে করেন যে জ্ঞানদাস হয়তো নিত্যানন্দ প্রভুর মহাপ্রয়াণের বেশ কিছু পূর্বেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, 'জ্ঞানদাসের নিত্যানন্দের ভাববর্ণনার পদগুলি দেখিয়া মনে হয়, কবি যেন নিজ চোখে দেখিয়া এগুলি লিখিতেছেন।'

চণ্ডীদাসকে অবলম্বন যে বিরাট চণ্ডীদাস-সমস্যার স্থষ্টি হইয়াছে, জ্ঞানদাসকে অবলম্বন করিয়া তেমন কোন জটিল সমস্যার উদ্ভব না ঘটিলেও যে যথাকালে ঐরূপ সমস্যা দাঁড়াইয়া যাইতে পারে, তেমন আশঙ্কার কারণ রহিয়াছে। কারণ প্রাচীন সঙ্কলনে ('পদকল্পতরু') জ্ঞানদাসের নামাঙ্কিত পদের সংখ্যা ছিল ১৮৬টি, ইহার মধ্যে ১০৫টিই ব্রজবুলিতে রচিত। আধুনিক সঙ্কলনে এই সংখ্যা অনেক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে; ইতোমধ্যে আবার জ্ঞানদাস-রচিত একটি পালাগানেরও ('যশোদার বাৎসল্যরস') সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় অনুমান করিতেছেন যে জ্ঞানদাস রচিত পদের সংখ্যা সাকুল্যে চারিশতের কম হইবে না। অথচ জ্ঞানদাস-রচিত প্রাচীন ও প্রামাণিক পদগুলির বিচারে, পরবর্তীকালে

সমস্যা

আবিষ্কৃত অনেকগুলি পদের কর্তৃত্বই জ্ঞানদাসে আরোপ করিতে শঙ্কা ও সঙ্কোচ বোধ হয়। পালাগানে যে ধরণের ভণিতা ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই ভণিতার ধরণই আলাদা। জ্ঞানদাসের প্রামাণিক পদগুলির ভণিতায় কবি যেমন বর্ণিত লীলার সঙ্গে একীভূত হইয়া তাহাতে অংশ গ্রহণ করেন, ('জ্ঞানদাস কহে সখি স্থির হৈয়া থাক দেখি') পালাগানের ভণিতায় তাহার একান্ত অভাব। 'জ্ঞানদাস কন'—এইরূপ ভণিতায়, সম্মানবাচক ক্রিয়া-পদের ব্যবহারে স্বভাবতই মনে সংশয়ের স্থষ্টি হয়। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় এই পালাগানের পদগুলিকে স্ব-সম্পাদিত গ্রন্থে গ্রহণ করিলেও তাঁহার সংশয় অপ্রকাশ থাকে নাই। 'এই পালাপুঁথিটি পদাবলী সাহিত্যের জ্ঞানদাসের রচিত কিনা, তাহা আভ্যন্তরীণ প্রমাণের সাহায্যে নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না।' জ্ঞানদাসের নামে প্রচলিত রচনাগুলির প্রামাণিকতায় সন্দেহ প্রকাশ করিয়া ড° স্থকুমার সেন মন্তব্য করিয়াছেন, 'জ্ঞানদাস নাম তখন এবং পরেও অনেকের নিশ্চয়ই ছিল।

এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ না কেহ পদ রচনা করিয়া থাকিবেন। কিন্তু এ নামে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিকে ধরা যাইতেছে না এবং পদগুলির মধ্যে দ্বিতীয় লেখনীর নিশ্চিত পরিচয়ও পাওয়া যাইতেছে না। সুতরাং আপাতত জ্ঞানদাস-নামিত সমস্ত পদই একজনের উপর চাপাইতে হয়।'

জ্ঞানদাস বাঙলা, ব্রজবুলি এবং বাঙলা-মিশ্রিত ব্রজবুলি ভাষায় পদ-রচনা করিয়াছেন। সমসাময়িক যুগে কীর্তনগানের বহুল প্রচারের জন্যই হয়তো জ্ঞানদাস ব্রজবুলি ভাষায় এত পদ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার

ব্রজবুলি পদ

ব্রজবুলি ভাষায় রচিত পদের সংখ্যা বাঙলাপদ হইতে অনেক বেশি হইলেও উৎকর্ষে বাঙলাপদগুলিই শ্রেষ্ঠ। অবশ্য ড° সেন জ্ঞানদাসের ব্রজবুলিভাষায় রচিত পদগুলির উৎকর্ষ-সম্বন্ধে প্রশংসোক্তিই করিয়াছেন। তিনি বলেন, '...Jnana Das was the most careful writer of Brajabuli ; though there are a few poems where Brajabuli is greatly mixed up with Bengali.' কিন্তু গোবিন্দ-দাসের ব্রজবুলিপদের সহিত অথবা জ্ঞানদাসের স্বরচিত বাঙলাপদের সহিত তুলনামূলক আলোচনায় একথা নিঃসন্দেহেই প্রতিপন্ন হইবে যে জ্ঞানদাসের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটিয়াছে বাঙলা ভাষাতেই। কাব্যধর্মের দিক হইতেও যেমন জ্ঞানদাসের ব্রজবুলিপদগুলি হীনপ্রভ, তেমনি ছন্দ ও অলঙ্কারের ব্যবহারেও তিনি গোবিন্দদাসের সমকক্ষ হইয়া উঠিতে পারেন

বাঙলা ভাষার পদ

নাই। কোন কোন পদে কবির অন্তর স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে প্রকাশিত হইলেও অধিকাংশ পদেই যেন কৃত্রিমতা-জনিত কিছুটা আড়ষ্টতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বিদ্যাপতির অনুকরণই করিয়াছেন, তাহার অতিরিক্ত কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে জ্ঞানদাসের বাঙলাপদগুলি শুধুই যে চণ্ডীদাসের অনুকরণ, তাহা নহে, কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি চণ্ডীদাসকেও ছাড়াইয়া গিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা চলে যে, 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধিলুঁ' নামে যে অপূর্ব-সুন্দর পদটি সাধারণত চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া উল্লেখ করা হয়, এই পদটির প্রকৃত রচয়িতা জ্ঞানদাস। জ্ঞানদাস সম্ভবত সর্বাধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন 'আক্ষেপানুরাগে'র পদগুলিতেই। সদ্য-কথিত 'সুখের লাগিয়া' পদটি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইহা ছাড়া 'তোমার গরবে গরবিনী হাম, রূপসী তোমার রূপে' পদটিও জ্ঞানদাসের একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। ভাবসম্মেলনের পদগুলিতে ভক্ত কবিগণ যে কল্পনার স্বর্গ রচনা করিয়া মিলন

সুখ অনুভব করিয়া থাকেন, জ্ঞানদাস হয়তো তাহাতে সান্ত্বনা পাইতেন না বলিয়াই এই ধরণের পদ রচনায় খুব আগ্রহ বোধ করেন নাই। কিন্তু পূর্বরাগ ও রূপানুরাগের কয়েকটি পদে জ্ঞানদাস যেন আপনাকে আপনি অতিক্রম করিয়াছেন। কৃষ্ণের দর্শন লাভ করিবার পর রাধিকা আর নিজেকে সামলাইতে পারিতেছেন না। তাই সখেদে বলেন,—

পদাবলীবিশ্লেষণ ও কৃতিত্ব-বিচার

'আলো মুঞি জানোনা—
জানিলে যাইতাম না কদম্বের তলে।
চিত মোর হরিয়া নিলে ছলিযা নাগর ছলে।'

ইহার পরই রাধিকা কারণ বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলিলেন,

'রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥'

'যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল'-জাতীয় পদ রচনা করিতে পারিলে কোন অত্যাধুনিক কবিও পুলকিত হইয়া উঠিতে পারিতেন। জ্ঞানদাসের এইরূপ আর একটি উল্লেখযোগ্য পদ—

'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নহি বান্ধে॥'

শুধু বৈষ্ণবকবিতার উচ্চ ভাবকল্পনার প্রকাশ বলিয়াই নহে, জ্ঞানদাস-রচিত এই ধরণের পদগুলিতে ভাষা-রীতিও লক্ষ্য করিবার মত। বিদ্যাপতি বা গোবিন্দদাসের মত জ্ঞানদাস ভাষাশিল্প-সম্বন্ধে এত সচেতনতার পরিচয় না দিলেও আলোচ্য পদটিতে ভাষা ও ভাবের হর-পার্বতী-মিলন সাধিত হইয়াছে। নিম্নোক্ত পদটিতেও অনুরূপ শিল্পকৃতির পরিচয় পাওযা যায়:—

ভাষারীতি

'দেখ্যা আইলাম তারে সই দেখ্যা আইলাম তারে।
এক অঙ্গে এত রূপ নয়ানে না ধরে॥'

পূর্বোদ্ধৃত জ্ঞানদাসের পদগুলিতে যে রোম্যান্টিক কবিমানসের পরিচয় পাওয়া যায়, বৈষ্ণব গীতি-কাব্য-সাহিত্যেও তাহার তুলনা মেলা ভার।

এই দিক হইতে বিচার করিলে সম্ভবত জ্ঞানদাসের পদগুলিকেই খাঁটি লিরিক কবিতার মর্যাদা দান করা চলে। রোম্যান্টিক মনোভাব সাধারণত একটু বিষণ্ণতার ধার ঘেঁষিয়া চলে বলিয়াই জ্ঞানদাসের বিরহের পদগুলিও খাঁটি মানবিক আকুতিতে সমৃদ্ধ।

রোম্যান্টিকতা

'রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমিঝিমি শবদে বরিষে'—

পদটি পড়িবার পর মুগ্ধচিত্ত রবীন্দ্রনাথের চোখের সামনে একটা বিরাট্ পট-ভূমিকায় একটি উজ্জ্বল চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছিল। 'বংশীধ্বনি'-বিষয়ক পদ-রচনায় জ্ঞানদাস প্রায় দ্বিতীয়-রহিত। 'চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের মুরলী যেন সদাই সজীব। ইহার প্রতি রন্ধ্রের স্বর যেন বিশ্বপ্রকৃতির মর্মের এক একটি ধর্মের ধ্বনিরূপ। ইহার প্রতাপ ও ক্ষমতা অপরিসীম।' দানখণ্ড এবং নৌকাবিলাসের কোন কোন পদেও জ্ঞানদাস অনুরূপ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। আলোচ্য কবিতায় কবি জ্ঞানদাস অত্যুৎকৃষ্ট চিত্র-প্রতীকের সার্থকতম ব্যবহার দেখাইয়াছেন।

জ্ঞানদাসকে সাধারণভাবে চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই প্রসঙ্গে চণ্ডীদাসের সহিত জ্ঞানদাসের রচনার সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য-সম্বন্ধে আলোচনা করিলেই পূর্বোক্ত অভিমতটির যাথার্থ্য বিচারিত হইবে। চণ্ডীদাস প্রধানত ভাবের কবি, জ্ঞানদাসও তাহাই। অবশ্য বৈষ্ণব কবিদের সকলেই অল্পবিস্তর ভাবরসেরই কবি, কিন্তু তাহাদের মধ্যেও গভীরতায় চণ্ডীদাস শ্রেষ্ঠ এবং তাহারই পরে জ্ঞানদাসের স্থান। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা-আস্বাদনে চণ্ডীদাস এবং জ্ঞানদাস-উভয়েই সমপর্যায়ভুক্ত, কিন্তু চণ্ডীদাস সেই লীলার সহিত যেমন একাত্মতাবোধ করিয়াছেন, জ্ঞানদাসের সেই তন্ময়তাবোধ নাই। মনে হয়, তিনি যেন একটু দূর হইতে লীলারস আস্বাদন করিয়াই পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন, চণ্ডীদাসের মতো ভিতরে ঢুকিয়া এক হইয়া যাইতে পারেন নাই। চণ্ডীদাস যেমন যথাসর্বস্ব সমর্পণ করিয়া আপনহারা হইয়া বসিয়াছেন, জ্ঞানদাস তেমন ভাবে আত্মবিসর্জন দিতে পারেন নাই। বরং বলা চলে, জ্ঞানদাস আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াই রাধাকৃষ্ণের লীলাকে আপন অন্তরে অনুভব করিয়াছিলেন, আর চণ্ডীদাস আপন সত্তা বিসর্জন দিয়া রাধাকৃষ্ণের লীলার মধ্যে মিশিয়া গিয়াছেন। লীলা-আস্বাদনে চণ্ডীদাস চেতনা হারাইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার রচনায় বহিরঙ্গের প্রতি পরিপূর্ণ ঔদাসীন্য

চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস

প্রকাশ পাইয়াছে ; পক্ষান্তরে জ্ঞানদাসের রচনায় মণ্ডননৈপুণ্য উপেক্ষণীয় নহে। তিনি কারুকৃতি-সম্বন্ধে সজাগ থাকিয়া তুলিতে রঙ লাগাইয়া চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। এই চিত্র বিদ্যাপতি বা গোবিন্দ দাসের মত বর্ণাঢ্য না হইলেও চণ্ডীদাসের মত এত নিরাভরণও নহে। জ্ঞানদাস সচেতনভাবে শিল্প-সৃষ্টির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন বলিয়াই বহিরঙ্গের বিচারে তিনি চণ্ডীদাসকে অতিক্রম করিয়াই গিয়াছেন। 'চণ্ডীদাসের রসহিল্লোল জ্ঞানদাসে নাই, গোবিন্দদাসের হীরক-কাঠিন্যও তাহাতে পরিদৃষ্ট হয় না, কিন্তু লাবণ্যকে অনায়াস-বন্ধনে বাঁধিয়া অতি চমৎকার মণিহার রচনার গৌরব তাঁহার প্রাপ্য।' একটু বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিলেই বোঝা যাইবে যে রাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনী প্রতিটি বৈষ্ণব কবির হৃদয়েই প্রাণবেদনার সৃষ্টি করিয়াছে, কিন্তু তাহা প্রকাশের ভাষা এক একজন এক একভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। ভাবের দিক হইতে চণ্ডীদাসের সঙ্গে জ্ঞানদাসের সাধর্ম্য থাকিলেও রূপের দিক হইতে জ্ঞানদাস বরং গোবিন্দদাস-বিদ্যাপতির সগোত্র। 'চণ্ডীদাস গভীরতম প্রাণবেদনার গীতকার আর বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস ঐ একই প্রাণবেদনার সার্থক চিত্রকর।' ভাবের দিক হইতে চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের মধ্যে ঐক্যবোধ বর্তমান বলিয়াই জ্ঞানদাসের রচিত কোন কোন পদ চণ্ডীদাসের নামে প্রচার লাভ করিয়াছে। জ্ঞানদাস যে চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য, ইহাই তাহার অখণ্ডনীয় প্রমাণ।

৫. গোবিন্দদাস কবিরাজ

প্রাচীন বাঙলাসাহিত্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে যে একটি প্রশ্নে পাঠক-সমালোচককে বারবারই বিব্রত বোধ করিতে হয়, তাহা, কবিদের নাম-সাদৃশ্য। চণ্ডীদাসের ক্ষেত্রে সমস্যা বিপুল আকার ধারণ করিয়াছে ; বিদ্যাপতি এবং জ্ঞানদাস নামের আড়ালেও একাধিক কবির অস্তিত্ব অনুমিত হইয়া থাকে ; গোবিন্দদাসকে লইয়াও একই সমস্যা। এক ষোড়শ শতাব্দীতেই অন্তত পক্ষে চারিজন গোবিন্দের সন্ধান পাওয়া যায়। গোবিন্দঘোষ এবং গোবিন্দ আচার্য ছিলেন শ্রীচৈতন্যের পারিষদ্‌গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ইঁহারা দুই জনই পদকর্তা ছিলেন। গোবিন্দদাস চক্রবর্তী নামক কবি বহু পদই রচনা করিয়াছিলেন। চতুর্থ কিন্তু শ্রেষ্ঠ ছিলেন গোবিন্দদাস কবিরাজ। প্রস্তুত পরিচ্ছেদে আমরা এই গোবিন্দদাস

গোবিন্দ চতুষ্টয়

কবিরাজের প্রসঙ্গ লইয়াই আলোচনা করিব। কিন্তু আশঙ্কা হইতেছে, গোবিন্দদাস-নামাঙ্কিত পদগুলিতে মিশ্রণ ঘটিয়া থাকিতে পারে। 'গোবিন্দ দাস'-ভণিতাযুক্ত পদ ব্রজবুলি এবং বাঙলা উভয় ভাষাতেই রচিত হইয়াছে। সাধারণ বিশ্বাস এই যে, ব্রজবুলি ভাষায় রচিত পদগুলিই ,গোবিন্দদাস কবিরাজের। গোবিন্দদাস কবিরাজ বাঙলাভাষায়ও পদ রচনা করিয়াছিলেন কিনা নিশ্চিতভাবে বলা যাইতেছেনা।

কবি-পরিচয়

গোবিন্দদাস কবিরাজ সম্ভবত ১৫৩৭ খ্রীঃ মাতুলালয়ে (বর্ধমানে শ্রীখণ্ড গ্রাম) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা চিরঞ্জীব, মাতা সুনন্দা এবং মাতামহ প্রসিদ্ধ 'সঙ্গীতদামোদর' গ্রন্থ-প্রণেতা দামোদর। কবির জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামচন্দ্র কবিরাজও একজন ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। গোবিন্দদাস প্রথম জীবনে মাতামহের প্রভাবে শাক্তমতাবলম্বী ছিলেন বলিয়াই জানা যায়। শেষযৌবনে দেবীর স্বপ্নাদেশে তিনি শ্রীনিবাস আচার্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইহার পূর্ব হইতেই তিনি পদ রচনা করিতেন। এইরূপ একটি পদে গোবিন্দদাস হরপার্বতীর অর্ধনারীশ্বর রূপ চিত্রণ করিয়া ভণিতায় বলিয়াছেন :

'গৌরীশঙ্কর চরণকিঙ্কর
কহই গোবিন্দদাস ॥'

খেতরীর মহোৎসবে জ্ঞানদাসের সঙ্গে গোবিন্দ দাসও উপস্থিত ছিলেন বলিয়া জানা যায়। বৃন্দাবনের শ্রীজীব গোস্বামী গোবিন্দদাসের কবিত্বশক্তিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে 'কবিরাজ' বা 'কবীন্দ্র' উপাধি দিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। অনুমান ১৬১৩ খ্রীঃ কবি দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

জ্ঞানদাসকে যেমন চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য বলিয়া প্রচার করা যায়, তেমনি গোবিন্দদাসকেও বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য বলিয়া পরিচায়িত করিবার প্রথা বহুকাল প্রচলিত আছে। দীর্ঘকাল পূর্বেই কবি বল্লভদাস এই বিষয়ে মন্তব্য করিয়াছেন :

'ব্রজের মধুর লীলা যা শুনি দরবে শিলা
গাইলেন কবি বিদ্যাপতি।
তাহা হৈতে নহে ন্যূন গোবিন্দের কবিত্বগুণ
গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি ॥'

কবি বিদ্যাপতি-পদের সহিত গোবিন্দদাসের পদের ভাবসাদৃশ্য এবং রূপ-সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াই গোবিন্দদাসকে 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' আখ্যায় ভূষিত

করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে বাঙলাদেশে আর একজন 'বিদ্যাপতি' উপাধিধারী কবিও বর্তমান ছিলেন, তিনি শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি, কখনও কখনও ইঁহাকে 'ছোট বিদ্যাপতি' বলিয়াও অভিহিত করা হয়। যাহা হউক গোবিন্দদাসকে দ্বিতীয় বিদ্যাপতি বলিয়া অভিহিত করিবার আরও কিছু সঙ্গত কারণ বর্তমান। গোবিন্দদাস যে সজ্ঞানেই বিদ্যাপতির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহার কয়েকটি সুস্পষ্ট প্রমাণও পাওয়া যায়। গোবিন্দদাস-রচিত অন্তত নয়টি পদের ভণিতায় বিদ্যাপতির নাম পাওয়া যাইতেছে। 'পদামৃত সমুদ্রে'র (খ্রীঃ ১৭২১) সঙ্কলয়িতা রাধামোহন ঠাকুর অনুমান করিয়াছিলেন যে, গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির অসম্পূর্ণ পদগুলিকে সম্পূর্ণ করিয়া তাহাতে যুগ্ম-ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু ড০ সুকুমার সেন এই অনুমানের যুক্তি-যুক্ততায় সন্তুষ্ট না হইয়া বরং অনুমান করেন যে, 'গোবিন্দদাস কতকগুলি পদ বিদ্যাপতির পদের প্রত্যুত্তর-স্বরূপ রচনা করিয়াছিলেন এবং সেইগুলিতে তিনি বিদ্যাপতির নাম করিয়া গিয়াছেন।' অপর কেহ কেহ অনুমান করেন যে গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির ত্রি-চরণপদের চতুর্থ পদ পূরণ করিয়াছেন—

দ্বিতীয় বিদ্যাপতি

'বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব,
গোবিন্দদাস রসপূর।'

গোবিন্দদাসের ভণিতাযুক্ত বহু ব্রজবুলি এবং বাঙলাপদের সন্ধান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ব্রজবুলি ভাষায় রচিত পদগুলিকেই গোবিন্দদাস কবিরাজের রচনা বলিয়া গ্রহণ করা হয়। বাঙলাভাষায় রচিত পদগুলি গোবিন্দদাস চক্রবর্তীর রচনা। এইরূপ অনুমান বিজ্ঞানভিত্তিক না হইলেও ইহা ছাড়া গত্যন্তর নাই। এই অনুমানের ভিত্তিতেই গোবিন্দদাসের পদগুলি বিচার করিয়া সাহিত্য-সমালোচকগণ গোবিন্দদাস কবিরাজকে চৈতন্যোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদা দান করিয়া থাকেন। গোবিন্দদাস ব্রজবুলি ভাষায় যে সকল পদ রচনা করিয়াছেন, তাহাদের ভাষা অবিমিশ্র ব্রজবুলি; অন্য অনেকের মত তিনি ইহাতে বাঙলা ভাষার মিশ্রণ ঘটান নাই। তদ্ভব শব্দও তিনি কম ব্যবহার করিয়াছেন, অধিকাংশ শব্দই তৎসম অথবা অর্ধতৎসম। কবিতার আঙ্গিক তথা বহিরঙ্গের দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যাইবে, সমালোচক-গণ কবিকে বৃথাই শ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদা দান করেন নাই। ভাষায়, ছন্দে, অলঙ্কারে গোবিন্দদাস অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ভাষার স্থাপত্যশিল্পে গোবিন্দদাসের দক্ষতা অনুপম। পদের লালিত্য, ছন্দের ঝঙ্কার ও অলঙ্কারের সুষ্ঠুপ্রয়োগে

বিদ্যাপতি-শিষ্য গোবিন্দদাস স্বীয় গুরুরই সার্থক উত্তরসূরী। তাঁহার রচনার প্রধানগুণ যে ইহার শ্রুতিমাধুর্য, তাহা কবি নিজেও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন :

'রসনারোচন শ্রবণবিলাস।
রচই রুচির পদ গোবিন্দ দাস॥'

গোবিন্দদাসের পদ বিচার করিয়া ডঃ সেন মন্তব্য করিয়াছেন, 'ইঁহার লেখায় ছন্দের বৈচিত্র্য যথেষ্ট আছে। অনুপ্রাসের ও উপমা-রূপকাদি অর্থালঙ্কারের প্রয়োগ কবিরাজের মত আর কোন পদকর্তাই করিতে পারেন নাই। শব্দের ঝঙ্কারে এবং পদের লালিত্যে গোবিন্দদাস কবিরাজের গীতি কবিতাগুলি বাঙালা সাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।' গোবিন্দদাস ছিলেন সৌন্দর্য-রসিক রূপদক্ষ কবি। যে ধরণের পদ বিলাস-বিভ্রম-সৃষ্টির অনুকূল, কবি সাধারণত ঐ ধরণের পদরচনায়ই বিশেষ আগ্রহ এবং অধিকার-বোধের পরিচয় দিয়াছেন। এই বিষয়ে একজন বিশিষ্ট সমালোচকের অভিমত উদ্ধার করিতেছি : 'সংযমবুদ্ধির ফলে গোবিন্দদাসের কাব্যে যে বিশেষ বস্তুটির আবির্ভাব ঘটেছে, তাকে কাব্যের স্থাপত্যবিদ্যা বলা চলে। তাঁর অধিকাংশ পদ যেন কুঁদে তৈরী—'কুন্দে যেন নিরমাণ'। প্রতিভার আলোড়ন-ক্ষণে অর্ধবাহ্যদশায় আত্ম-সংবিতের বিলয় মুহূর্তে প্রেরণার হাত ধরে কবি তাঁর কাব্য সৃষ্টি করেন নি। তাঁর কবিভাবনা কাব্যের সব কটি প্রয়োজনীয় বস্তুর সমাবেশ করে অপরিসীম রসবোধ ও তীক্ষ্ণ শিল্পদৃষ্টির সহায়ে একটির পর একটি পদ রচনা করে গিয়েছে। ফলে...কাব্যের রূপ-সম্পূর্ণতা যাকে বলে, সেই finish-এর অসৌকর্য কোথাও ঘটেনি।' (শঙ্করী প্রসাদ বসু)

রূপদক্ষ গোবিন্দদাস

গোবিন্দদাস নানাধরণের পদই রচনা করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে গৌর-চন্দ্রিকা, রূপানুরাগ ও অভিসারের পদগুলিতেই তাঁহার উৎকর্ষ সমধিক। মান-বিরহের পদও তিমি রচনা করিয়াছেন, তবে তাহাতে গোবিন্দদাসের প্রতিভার সেই ঔজ্জ্বল্যের স্পর্শ নাই।

গোবিন্দদাস মহাপ্রভুর দর্শনলাভ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছিলেন বলিয়া ক্ষুব্ধ-কণ্ঠে বলিয়াছেন, 'গোবিন্দদাস রহুঁ দূর।' সম্ভবত এই ক্ষোভ দূর করিবার জন্যই তিনি সমগ্র অন্তর দিয়া গৌরাঙ্গ-স্বরূপকে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলশ্রুতি তাঁহার গৌর-চন্দ্রিকার পদগুলি। গৌরচন্দ্রিকা-পদ-রচনায় গোবিন্দ

গৌরচন্দ্রিকা

দাসের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিততনু' মহাপ্রভুর এমন জীবন্ত বিগ্রহ অপর কোন পদকর্তার রচনাতেই চোখে পড়ে না।

'অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চরু
সুরধুনী-তীরে উজোর ॥'

মহাপ্রভুর মহাপ্রয়াণের পর বাঙলাদেশে যে চৈতন্য-চেতনা বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছিল, বৃন্দাবনের ষড়্‌গোস্বামীর প্রেরণায় শ্রীনিবাস আচার্যই তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিযাছিলেন, আচার্যদেবের সুযোগ্য শিষ্য গোবিন্দদাস কবিরাজ ভক্তচিত্তে চৈতন্যদেবের মূর্তিকে অধিষ্ঠিত করিয়া দিলেন।

রূপানুরাগ

গোবিন্দদাসের রূপানুরাগের পদগুলিতে যে শিল্পচাতুর্য এবং কবির আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাও অতুলনীয়। কবি তাঁহার উপাস্য দেবতাকে অন্তরে ঠাঁই দিয়াছেন, তাঁহাতে আত্মলীন হইয়াছেন, কিন্তু কখনও আত্মহারা হন নাই,—এই খানেই তাঁহার বৈশিষ্ট্য। গোবিন্দদাস ধীর এবং প্রশান্ত। চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের মতো আবেগোচ্ছল হইয়া তিনি আত্মবিস্মৃতি লাভ করেন নাই; তিনি সচেতন শিল্পী। এই দিক হইতে বিচার করিয়াই ড০ সেন মন্তব্য করিয়াছেন, 'তবে বলরামদাস এবং জ্ঞানদাসের পদে যেরূপ আন্তরিকতা আছে, কবিরাজের অধিকাংশ পদের মধ্যে সেরূপ আন্তরিকতার অভাব পরিলক্ষিত হয়।' শিল্পীর সচেতনতার জন্যই কবিতাগুলি অতি বেশি অলঙ্কৃত হইয়া পড়িয়াছে।—

'ভালে বনি আওয়ে মদন মোহনিয়া।
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ তরঙ্গিম
রঙ্গিম ভঙ্গিম নয়ন নাচনিয়া ॥'

অভিসার

গোবিন্দদাস সর্বাধিক কৃতিত্বের পরিচয় দান করিয়াছেন অভিসারের পদগুলিতে। এখানে তিনি শুধু শ্রেষ্ঠই নহেন,—নগাধিরাজের উন্নত মহিমায় বিরাজ করিতেছেন, অপর সকলে তাঁহা হইতে শত যোজন দূরে।—অলঙ্কার শাস্ত্রে যে অষ্টপ্রকার অভিসারের কথা উল্লেখ করা হয়, কবি স্বকৃত রচনায় তাহার প্রতিটির পরিচয় দান করিয়াছেন। এই পদগুলি ভিতরে বাহিরে সর্বদিকের বিচারেই শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় আসীন।

'কণ্টকগাড়ি কমলসম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করি পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥'

কবিতাটিতে রাধিকার কৃচ্ছ্রসাধনা-প্রচেষ্টার মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা যেন অক্ষরে অক্ষরে ক্ষরিত হইতেছে।

'মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট॥'

পদটিতে রাধিকার অভিসারের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা হইতেই সাযুজ্যলাভে আগ্রহী ভক্তহৃদয়ের আকূতি রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে।

গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য ছিলেন, তাহা প্রায় সকল সমালোচকই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। একেত তিনি 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' নামে পরিচিত ছিলেন, তাহার উপর আবার বিদ্যাপতির সহিত যুগ্মভণিতায়ও তাঁহার নাম বহুবার উচ্চারিত হইয়াছে। অতএব বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য-রূপে পরিচিত হইবার দাবি এইখানেই প্রতিষ্ঠিত। এইগুলি অবশ্যই বাহিরের কারণ; কিন্তু যাহারা বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের কাব্যের সহিত নিবিড়ভাবে পরিচিত ছিলেন, তাহারাও উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছেন। গোবিন্দদাস যখন প্রথম পদ-রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তিনি বৈষ্ণব ছিলেন না। সম্ভবত পঞ্চোপাসক বিদ্যাপতির ব্রজবুলিপদের আকর্ষণেই গোবিন্দদাস প্রথম পদ-রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। তিনি যে সজ্ঞানে বিদ্যাপতির অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহাতেও সন্দেহ নাই। বিদ্যা-পতির মতই তিনিও কাব্যের বহিরঙ্গের দিকটার উপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। অবিমিশ্র ব্রজবুলি ভাষা, ছন্দের বৈচিত্র্য, অলঙ্কারের বহুল ব্যবহার ইত্যাদিতে বিদ্যাপতির অনুসরণপ্রিয়তাই লক্ষ্য করা যায়। এমন কি তিনিও বিদ্যাপতির মতই কৃষ্ণলীলা-কাহিনীর বিলাস-কলা-কুতূহলের দিকেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। মান-মাথুর-বিরহের পদে গোবিন্দদাস বিশেষ কোন কৃতিত্বের পরিচয় দান করিতে পারেন নাই। বিদ্যাপতি আপন অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির পরিপ্রেক্ষিতেই লীলামাধুর্যের স্বাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু গোবিন্দদাস ছিলেন এই বিষয়ে অধিকতর সৌভাগ্যবান। কারণ তিনি যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তখন মহাপ্রভু আপন জীবনের ভিতর দিয়া রাধাকৃষ্ণের লীলা-কাহিনীকে প্রকাশ করিয়া

গিয়াছেন। অতএব বলা চলে, গোবিন্দ দাস লীলামাধুর্যের প্রত্যক্ষ স্বাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কাজেই কৃষ্ণ-লীলাকে একান্তভাবে বাহির হইতে দেখেন নাই। তিনিও সমসাময়িক যুগমানসের অংশভাগী ছিলেন, কাজেই যুগের ভাবুকতায়ও তিনি আপন উপলব্ধিকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবার অবকাশ পাইয়াছিলেন। এই কারণেই কেহ কেহ অনুরূপক্ষেত্রে গোবিন্দদাসকে বিদ্যাপতি অপেক্ষাও সার্থকতর কবি বলিয়া মানেন। '...গোবিন্দদাস সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা, গোষ্ঠিগত ঐতিহ্য-সমৃদ্ধি, ব্যক্তিগত প্রতিভা-চমৎকৃতি ও অনুভূতি-নিবিড়তার প্রভাবে তিনি বৈষ্ণবপদ-সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে গুরুর সিদ্ধিকেও হয়ত অতিক্রম করে যেতে পেরেছিলেন।' (ভূ-চৌধুরী)। আরও একটি ক্ষেত্রে বিদ্যাপতি অপেক্ষাও গোবিন্দদাসের কৃতিত্বকে উচ্চস্থান দিতে হয়। গোবিন্দদাসের কাব্যে যে একটি অপূর্ব গীতি-মূর্ছনা লক্ষ্য করা যায়, তেমনটি বিদ্যাপতির ছন্দ-সুষমাযুক্ত পদেও পাওয়া যায় না। অবএব গোবিন্দদাসের এই সুরচেতনা বিদ্যাপতি হইতে লব্ধ নহে। 'বিদ্যাপতির নিকট গোবিন্দ-দাসের ঋণ ছন্দের জন্য, সুরের জন্য নয়। বিদ্যাপতির অনেক পদ বাহ্যরূপে অপেক্ষাকৃত ছন্দ-পরুষ—অথচ তাহাদের ভাবগৌরবের তুলনা নাই। সেখানে গোবিন্দদাস অনেক পিছনে। তথাপি গোবিন্দদাসের চূড়ান্ত প্রতিভা—অর্থাৎ সুর-প্রতিভার প্রশ্নে বিদ্যাপতির স্থান নিম্নেই।'

বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস

৬. অপরাপর কবিগণ

চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি-জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাস বৈষ্ণব মহাজনদের মধ্যমণি। ইঁহাদের বাহিরে যাঁহারা বৈষ্ণবপদাবলী রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা অগণিত। ইঁহাদের মধ্যে অল্প কয়েকজনের রচনায়ই কিছু কিছু উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়, অপর সকলের রচনা একান্তভাবেই গতানুগতিক। যে স্বল্প কয়েকজন কবির রচনায় বৈশিষ্ট্য বা উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়, পরবর্তী আলোচনা তাঁহাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হইবে।

বলরাম দাস: যে কোন প্রধান বৈষ্ণবপদকর্তার আলোচনা-প্রসঙ্গেই ইতোপূর্বে আমরা একটি সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছি, তাহা পদকর্তার পরিচয়-সমস্যা। তাঁহাদের প্রত্যেকের নামেই একাধিক পদকর্তার

সন্ধান পাওয়া গিয়াছে; আমাদের দুর্ভাগ্য যে প্রধান-চতুষ্টয়ের বাহিরেও আমরা এই সমস্যার হাত হইতে মুক্তি পাই নাই। প্রসঙ্গক্রমে বলরামদাসের কথাই উল্লেখ করা চলে। ডঃ সুকুমার সেনের ভাষায় 'বাঙ্গালা বৈষ্ণব গীতিকবিদের মধ্যে বলরাম দাস অতি উচ্চস্থান অধিকার করেন।'—কিন্তু ইনি যে কোন্ বলরাম, কে তাহার সন্ধান দিবে? 'গৌরপদ-তরঙ্গিণী'র সম্পাদক মন্তব্য করিয়াছেন, 'বলরামদাস লইয়া সাহিত্যজগতে বিষম গোল। আমরা ১৯ জন বলরামের সন্ধান পাইয়াছি।' ডঃ সেন উনিশ জনকে কমাইয়া পাঁচজনে দাঁড় করাইয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও সমস্যা-সমাধানের কোন সূত্র পাওয়া যায় না। ইঁহাদের মধ্যে কেহ বাঙলায়, কেহ ব্রজবুলিতে, কেহ আবার বাঙলা এবং ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তবে অনুমান হয়, ইঁহাদের মধ্যে দোগাছিয়া গ্রামবাসী ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব বলরাম দাসই সর্বপ্রাচীন এবং প্রধান। ইনি মহাপ্রভু নিত্যানন্দের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। অতএব, চৈতন্যলীলা-দর্শনে বঞ্চিত ছিলেন বলিয়া আক্ষেপ করিলেও, মনে হয়, ইনি চৈতন্যের জীবৎ-কালেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বাঙলা ও ব্রজবুলিভাষায় রচিত 'বলরামদাস'-ভণিতাযুক্ত অধিকাংশ পদ ইনিই রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা হয়। গোবিন্দদাস কবিরাজের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য এক বলরাম দাস ব্রজবুলি ভাষায় উৎকৃষ্ট পদ রচনা করেন। ইনি ছিলেন বুধরী গ্রামের অধিবাসী। বলরামদাস ভণিতাযুক্ত যে সকল ব্রজবুলি পদে ছন্দোবৈচিত্র্য ও অলঙ্কার-বাহুল্য লক্ষ্য করা যায়, হয়তো ইনিই ঐ পদগুলির রচয়িতা। নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবীদেবীর শিষ্য 'প্রেম-বিলাস' গ্রন্থের রচয়িতা বলরাম দাস অবশ্য 'নিত্যানন্দদাস' ভণিতায় পদ রচনা করিয়াছেন। বসু বলরাম এবং দীন বলরাম ভণিতাযুক্ত পদগুলি পৃথক্ ব্যক্তিদের দ্বারা রচিত হইবার সম্ভাবনাই অধিক।

পরিচয়-সমস্যা

বলরামদাস-ভণিতাযুক্ত ব্রজবুলির পদগুলি ছন্দের ঝঙ্কারে এবং অলঙ্কার-বাহুল্যে শ্রুতিসুখকর বলিয়া মনে হইলেও কাব্যাংশে বাঙলাপদগুলিই উৎকৃষ্ট। ইহাদের ভাষা সরল, ভাবও আন্তরিক। এই গুণে বলরামদাসের বাৎসল্যরসের পদগুলিকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করা চলে। অপর কবিগণ প্রধানত মধুর রসের উপাসক, প্রসঙ্গক্রমেই হয়তো বাৎসল্যরসের কয়েকটি পদ রচনা করিয়া থাকিবেন। কিন্তু বালগোপালের উপাসক বলরামদাস বাৎসল্য-রসকেই আপন প্রতিভা-প্রকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

'শ্রীদাম সুদাম দাম শুন ওরে বলরাম
মিনতি করিয়ে তো সভারে।'

পদটি কিংবা 'বলরাম, তুমি মোর গোপাল লৈয়া যাইছ'

পদটিতে কৃষ্ণজননীর উদ্বেগ পরবর্তী কালের শাক্তকবিদের পদে বর্ণিত উমা-জননীর উদ্বেগের সহিতই মাত্র তুলিত হইতে পারে। বলরাম-দাসের বর্ণনা একান্ত স্বাভাবিক এবং মানবিক। বলরামদাসের এই মানবিক আবেদন এবং সহজ জীবন-রস-প্রীতির জন্য পাঠকসাধারণ তাঁহার রচনার সহিত আপন হৃদয়টিকে সম্পর্কযুক্ত করিতে পারে।

বলরাম দাসের রূপানুরাগ এবং রসোদ্গারের পদগুলিতে মৌলিকতা না থাকিলেও ইহাদের অকৃত্রিম সরলতা এবং শুচিশুভ্র পরিবেশের জন্যই ইহারা বৈশিষ্ট্য দাবি করিতে পারে।

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে বলরামদাসের স্থান-সম্বন্ধে নানামুনির নানা মত। কেহ কেহ তাঁহাকে প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহেন, কেহ বা তাঁহার স্থান দান করেন দ্বিতীয় শ্রেণীতে। কেহ বা এতদুভয়ের মধ্যবর্তী অংশেই বলরামদাসের স্থান নির্দেশ করিয়াছেন। ড° বন্দ্যোপাধ্যায় বলরামের কাব্যের দোষগুণ বিচর করিয়া বলিয়াছেন, 'ছন্দ-অলঙ্কার, ভাষাভঙ্গিমা, কল্পনার অভিনবত্ব, চিত্রকল্পের সুবিহিত প্রয়োগ প্রভৃতি আলোচনা করিলে তাঁহার এই পদগুলিতে বিশেষ কোন কবিত্ব ও নিপুণতা খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। তাহার কারণ তাঁহার পদে চমকপ্রদ শিল্পগুণের একান্ত অভাব আছে। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার পদে প্রত্যক্ষ শিল্পায়ন অপেক্ষা ব্যঞ্জনার ইঙ্গিত একটু বেশি। এই জন্য যাঁহারা বৈষ্ণবপদে ছন্দ ও অলঙ্কারের কারুকর্ম দেখিতে অভ্যস্ত, তাঁহারা বলরামের এই সমস্ত জলবৎ তরল পদ-গুলিতে উগ্র স্বাদ পাইবেন না।'

লোচন দাস: 'চৈতন্যমঙ্গল'-নামক চৈতন্যজীবনী গ্রন্থের রচয়িতা লোচনদাস কিছু কিছু পদও রচনা করিয়া গিয়াছেন। লোচনদাস নরহরি দাসের শিষ্য। নরহরিদাস গৌরনাগরী ভাবের প্রবর্তক ছিলেন। শিষ্যও গুরুর অনুসরণ করিয়াছেন। 'চৈতন্যমঙ্গল'-আলোচনা-প্রসঙ্গে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। লোচনদাসের পদাবলীতেও এই গৌর-নাগরীভাবের পরিচয় বর্তমান। তিনি এই বিশেষ ভাবকে প্রকাশ করিবার জন্য পদাবলীরচনার ক্ষেত্রে একটা বিশেষ রীতিরও অনুসরণ করিয়াছিলেন —এই রীতিটিকে 'ধামালী' সংগীত বলা হয়। ইহার ছন্দে যে বৈশিষ্ট্য আছে,

তাহাই পরবর্তীকালের বাঙলা কবিতায় ছড়ার ছন্দেও বিশিষ্টতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহা হউক, এই ধামালী ছন্দে লোচনদাসের গৌরনাগরী-ভাবের প্রকাশ সুস্পষ্টই হইয়াছে :

'আমার প্রাণ ছম্ ছম্ করে সখি মন ছম্ ছম্ করে।
আধ কপাইলা মাথার বিষে রইতে নারি ঘরে ॥
লোচন বলে কান্‌চিস্ কেনে ঢোক আপনার ঘর।
হিয়ার মাঝে প্রাণ ডুবাইয়া গোরাচান্দে ধর ॥'

অবশ্য লোচনদাসের সবগুলি পদই যে এইরূপ ধামালী ছন্দে রচিত, তাহা নহে ; তিনি গতানুগতিক পয়ার-ত্রিপদী ছন্দেও আপনার মনোভাব-প্রকাশে সার্থকতা লাভ করিয়াছেন।

'অমিয়া মথিয়া কেবা নবনী তুলিল গো,
তাহাতে গঢ়িল গোরাদেহ।
জগৎ ছানিয়া কেবা রস নিঙ্গাঢ়িল গো
এক কৈল সুধার সুলেহ ।।'

এই গৌরচন্দ্রিকার পদটিতে লোচনের কবিত্বশক্তির সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। লোচনদাস যে উৎকৃষ্ট কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন, তাহার একটি বিশেষ প্রমাণ এই যে তাঁহার রচিত কয়েকটি পদ চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে নিম্নোক্ত পদটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—

'চলে নীল সাড়ি নিঙারি নিঙারি পরাণ সহিতে মোর।
সেই হৈতে মোর হিয়া নহে থির মনমথ জ্বরে ভোর ।।'

অনন্ত দাস : অনন্ত নামে দুইজন কবির সন্ধান পাওয়া যায় ; ইঁহারা দুইজনই ছিলেন অদ্বৈতাচার্যের শিষ্য—একজন অনন্তদাস, অপরজন অনন্ত আচার্য। অনন্তদাস-রচিত অন্তত একুশটি ব্রজবুলি পদের সন্ধান পাওয়া যায়। মনে হয়, ইনি শুধু ব্রজবুলিতেই পদ রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহার রচিত রূপানুরাগ এবং অভিসারের পদগুলি উৎকৃষ্ট।

'বিকচ সরোজ ভান মুখমণ্ডল,
দিঠি ভঙ্গিম নট-খঞ্জন জোর।
কিয়ে মৃদু মাধুরি হাস উগারই
পীপী আনন্দে আঁখি পড়লহি ভোর ॥'

এই পদটি এবং

ধনি ধনি বনি অভিসারে।
সঙ্গিনী রঙ্গিনী প্রেম-তরঙ্গিনী
সাজলি শ্যাম-বিহারে ॥'

—পদটি অনন্তদাসের

উল্লেখযোগ্য রচনা।

নরোত্তমদাস ঠাকুর : বাঙলাদেশে যে কয়জন ভক্ত বৈষ্ণব সাধক ও কবির প্রচেষ্টায় বৈষ্ণব ধর্মের তথা ভক্তিভাবের প্রবাহ দেখা দিয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে নরোত্তমদাস অন্যতম। নরোত্তমদাস রাজশাহী জেলার খেতুরীর রাজবংশের সন্তান। ১৫৪০ খ্রীঃ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক সম্পত্তি জ্ঞাতিভ্রাতার হস্তে সমর্পণ করিয়া ইনি বৃন্দাবনধামে গমন করিয়া শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া শ্রীনিবাস আচার্য ও শ্যামানন্দ সেনের সহযোগিতায় বাঙলাদেশে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন। ইনি খেতুরীতে ষড়্‌বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে যে মহোৎসবের ব্যবস্থা করেন তাহা হইতেই বাঙলাদেশে প্রথম কীর্তনের সূত্রপাত। আর এই কীর্তন-প্রসঙ্গেই পদাবলী-সাহিত্যের সমৃদ্ধি ও প্রসার। নরোত্তমদাস ঠাকুর একদিকে যেমন পদকর্তা ছিলেন, অন্যদিকে তেমনি বৈষ্ণব ধর্ম ও সাধনভজন-সম্বন্ধীয় তত্ত্বেরও ব্যাখ্যাতা ছিলেন। তাঁহার রচিত 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'য় বৈষ্ণব সাধন-পদ্ধতি-সম্বন্ধে কতকগুলি মূল তত্ত্বকথা অতি সহজ সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। রচনায় কবির দুর্লভ কবিত্বশক্তির প্রকাশ ঘটিয়াছে। এই গ্রন্থটিতে একশত উনিশটি ত্রিপদী শ্লোক স্থান পাইয়াছে। নরোত্তমদাসের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে প্রার্থনাসূচক পদগুলিতে। এই প্রার্থনার পদগুলি কেবল যে বৈষ্ণব সাধকদেরই অন্তর স্পর্শ করিয়া থাকে তাহা নহে, এইগুলির এমন একটি সার্বজনীন আবেদন আছে, যাহার ফলে সাধারণ পাঠকও বিমুগ্ধ চিত্তে পদগুলি আবৃত্তি করিয়া থাকে। —

'গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর।
হরি হরি বলিতে নয়নে বহে নীর ॥
আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে ॥'

নরোত্তমদাসের এই ধরণের পদগুলিতে ভক্ত হৃদয়ের আর্তি এবং আন্তরিকতা সুস্পষ্টরূপেই ধরা পড়ে।

গোবিন্দদাস চক্রবর্তী ঃ গোবিন্দদাস কবিরাজের মত গোবিন্দদাস চক্রবর্তীও ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। ইনি বোরাকুলি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গোবিন্দদাস চক্রবর্তী বাঙলা পদ-রচনাতেই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তবে মনে হয়, তিনি কিছু কিছু ব্রজবুলি পদও রচনা করিয়া থাকিতে পারেন। ডঃ সেন অনুমান করেন যে, "গোবিন্দদাস' এবং 'গোবিন্দদাসিয়া' ভণিতাযুক্ত বাঙ্গালা পদগুলি প্রায় সবই চক্রবর্তীর লেখা বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। তবে এরূপ কতকগুলি পদ গোবিন্দ আচার্যের রচনা হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নয়।'—

'শুন সুন্দর শ্যাম ব্রজবিহারী।
যদি মন্দিরে রাখি তোমারে হেরি॥'

এই পদটিতে কবির যে দীন আর্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে ইহাকে একটি উৎকৃষ্ট বৈষ্ণব কবিতা বলিয়া অভিহিত করিতে হয়।

রায়শেখর ঃ ষোড়শ শতকের শেষভাগে যে সকল পদকর্তা বর্তমান ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রায়শেখর অন্যতম। ইনি অসংখ্য পদ ছাড়াও 'গোপাল বিজয়' নামক বাঙলা কাব্য এবং একাধিক সংস্কৃত কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। গোপাল-বিজয়ে আত্মপরিচয়-দান-প্রসঙ্গে কবি জানাইয়াছেন যে তাঁহার পৈতৃক নাম দৈবকীনন্দন সিংহ, পিতার নাম চতুর্ভুজ।—

'সিংহবংশে জন্ম নাম দৈবকীনন্দন।
শ্রীকবিশেখর নাম বলে সর্বজন॥

কবি কিন্তু পদের ভণিতায় 'রায়শেখর, কবিশেখর, শেখর, শেখর রায়' ইত্যাদি বহু উপাধি অথবা উপনাম ব্যবহার করিয়াছেন। রায়শেখর-রচিত পদের সংখ্যা অনেক,—ইহাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট এবং সাধারণ, সব রকম পদই পাওয়া যায়। ব্রজবুলি পদ-রচনায় রায়শেখর যে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। ডঃ সুকুমার সেন বলেন,'ব্রজবুলি কবিতা-রচনার দক্ষতায় গোবিন্দদাসের পরেই কবিরঞ্জন এবং রায় শেখরের নাম করিতে হয়।'—

'এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভর বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর॥'

পদটি বিদ্যাপতির রচনা বলিয়া বহুল প্রচার লাভ করিলেও প্রাচীনতর ও প্রামাণিক পুঁথিতে ইহাতে শেখরের ভণিতাই পাওয়া যায়। শুধু এইটিই

নহে, রায়শেখরের এইরূপ আরও অনেক পদই বিদ্যাপতির নামে চলিয়া গিয়াছে। ইহা হইতেই কবির কবিত্ব-শক্তির উৎকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

কবিরঞ্জন : শ্রীখণ্ডের অধিবাসী কবিরঞ্জন বাঙলা এবং ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। কবিরঞ্জন 'বিদ্যাপতি' উপাধিধারী ছিলেন এবং 'বিদ্যাপতি' ভণিতায় পদ রচনা করিয়াছেন। ফলত, তাঁহার অনেক রচনাই বিদ্যাপতির রচনার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। যে সকল বাঙলাপদে 'বিদ্যাপতি' ভণিতা পাওয়া যায়, তাহা নিঃসংশয়ে কবিরঞ্জনের রচনা। কবিরঞ্জন 'ছোট বিদ্যাপতি' নামেও প্রসিদ্ধ। কথিত হয় যে, তাঁহার সহিত চণ্ডীদাসের মিলন ঘটিয়াছিল। ব্রজবুলি পদ-রচনায় বাঙলা সাহিত্যে গোবিন্দদাসের পরই ইহার স্থান। কবিরঞ্জনের একটি পদে হোসেনশাহের পুত্র নসরৎ শাহের উল্লেখ পাওয়া যায়।—

বিদ্যাপতি ভানি
অশেষ অনুমানি
সুলতান শাহ নসির মধুপ ভুলে কমলা বাণী ॥

৭. ঃ পরবর্তী কবি ও কাব্যসঙ্কলন

পরবর্তীকালে অর্থাৎ সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে বহু কবিই কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইঁহাদের কেহই উৎকৃষ্ট কবি-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না। অতএব ইঁহাদের মধ্যে যাহারা অন্তত যুগের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারেন, তেমন দুই একজনের কথা-মাত্র উল্লেখ করা হইল। অপর, এইকালে কয়েকটি পদসঙ্কলন গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, এইগুলিই বরং আমাদের কালে অতিশয় উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। আলাচ্য অধ্যায়ে ইহাদেরও কিছুটা পরিচয় দান করা হইবে।

জগদানন্দ : শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দনের বংশধর জগদানন্দ সপ্তদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ পদকর্তা। জগদানন্দ বাঙলা এবং ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বাঙলা ভাষায় রচিত পদে সুন্দর চিত্রগীতের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। অবশ্য এই গীতগুলি অপর কোন জগদানন্দের হওয়াও বিচিত্র নহে।—

'শুনগো মরম সই মর্মকথা তোরে কই
সাঁঝের বেলা গিয়াছিলাম জলে।
নন্দের নন্দন কানু করে লইয়া মোহন বেণু
দাঁড়াইয়াছিল কদমতলে ॥'

জগদানন্দ-রচিত ব্রজবুলির পদগুলি ধ্বনিমাধুর্যে ও শব্দচিত্র-রচনায় শ্রেষ্ঠ কবিদের কীর্তির সমকক্ষতা দাবী করিতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অর্থগৌরবে এইগুলি সাধারণের উপর উঠিতে পারে নাই। জগদানন্দ ছিলেন শব্দপণ্ডিত,—তিনি 'ভাষাশব্দার্ণব' নামে একখানি শব্দকোষও রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। জগদানন্দ-রচিত নিম্নোক্ত ব্রজবুলি পদটি অনুপ্রাস-বাহুল্যের জন্য বাঙলাসাহিত্যে বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে।—

'মঞ্জু বিকচ-কুসুম-পুঞ্জ মধুপ-শবদ গুঞ্জ গুঞ্জ
কুঞ্জরগতি গঞ্জি গমন মঞ্জুল কুলনারী।
ঘন গঞ্জন চিকুরপুঞ্জ মালতী ফুলমালে রঞ্জ
অঞ্জনযুত কঞ্জনয়নী খঞ্জন গতি হারি ॥'

নরহরি চক্রবর্তী: নরহরি চক্রবর্তী সপ্তদশ শতকের শেষপাদে অথবা পরবর্তী শতকের প্রথমপাদে বর্তমান ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। তিনি আত্মপরিচয়-প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন যে তাঁহার পিতা জগন্নাথ ছিলেন বিখ্যাত বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য। নরহরি চক্রবর্তী দুই নামেই পদ রচনা করিয়াছেন,—নরহরি দাস এবং ঘনশ্যাম দাস। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—

'না জানি কি কেতু হৈল মোর দুই নাম।
নরহরি দাস আর দাস ঘনশ্যাম ॥'

নরহরিচক্রবর্তী বিস্তর পদ রচনা ছাড়াও দুইখানি অমূল্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, একখানা 'ভক্তিরত্নাকর'—ইহা বৈষ্ণব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, অপরখানা 'নরোত্তমবিলাস'। নরহরি চক্রবর্তীর ব্রজবুলিভাষায় রচিত পদগুলি ছন্দের ঝঙ্কারে যেমন বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে, কবিত্বের দিক হইতেও তেমনি প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছে।—

'দেবরমণী-বৃন্দ বিরচি বেশ বিবিধ-ভাঁতি।
রাজত থল-মাহি অতুল ঝলকে কনককাঁতি ॥
ভ্রমত গগন পথ অগণন যূথ হিয় উৎসাহ।
মানত দিঠি সফল নিরখি গৌরবর-বিবাহ ॥'

মুসলমান কবিগণ: বৈষ্ণবপদাবলীসাহিত্যে রাধাকৃষ্ণলীলা অথবা চৈতন্যলীলাই বর্ণিতব্য বিষয়; অতএব ইহাকে ধর্মীয়সাহিত্য বলিলে অত্যুক্তি হয়না। অথচ বিস্ময়ের বিষয়, বেশ কয়েকজন মুসলমান কবিও পদরচনায় অগ্রসর হইয়া ছিলেন। সুফীমতের সহিত বৈষ্ণবধর্মের সাদৃশ্য-দর্শনে কবিগণ যেমন পদ রচনায় আগ্রহবোধ করিয়া থাকিতে পারেন, তেমনি আবার সম্পূর্ণ নিরাসক্তভাবেই তাহারা গতানুগতিক রীতির অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র, তাহাও হইতে পারে। ইঁহাদের মধ্যে কেহ যে বৈষ্ণবধর্মের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন নাই, তাহাও আবার বলা চলে না। সৈয়দ মর্তুজার একটি পদে—

'মোরে করহ দয়া দেহ পদছায়া
শুন শুন পরাণ কানু।
কুলশীল সব ভাসাইনু জলে
না জীয়ত তুয়া বিনু॥'

—এই যে আকুতি, তাহা রাধার হইলেও যে কবির মনকে একেবারেই স্পর্শ করে নাই, তেমন কথা বলিতে পারি না। কবিদের মধ্যে কেহ কেহ ব্রজবুলিতেও পদ রচনা করিযাছেন। নসিরমামুদের একটি ব্রজবুলি পদের ভণিতা এইরূপ:

'আগম নিগম বেদসার
লীলায় করত গোঠবিহার
নসির মামুদ করত আশা
চরণে শরণ-দান রি॥'

এই পদটি একান্তভাবে বৈষ্ণবভাবাপন্ন। ইহাতে একদিকে যেমন শব্দ-ঝংকার এবং অলঙ্কারনৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনি ধ্যানতন্ময় কবির আন্তরিকতার সুরটিও অগোচর থাকে নাই। 'পদ্মাবতী' কাব্যের কবি আলাওলও কিছু কিছু পদ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার অঙ্কিত চিত্রে রাধিকা এক পল্লীবালিকার রূপ ধারণ করিয়াছেন।—

'প্রত্যূষ বিহানে কমল দেখিয়া পুষ্প তুলিবারে গেলুম।
বেলা উদানে কমল মুদনে ভ্রমর দংশনে মৈলুম॥
কমল কণ্টকে বিষম সঙ্কটে করের কঙ্কণ গেল।
কঙ্কণ হেরিতে ডুব দিতে দিতে দিন অবশেষ ভেল॥'

আলীরাজাও একজন বিখ্যাত পদকর্তা ছিলেন। ইঁহারা ছাড়া সেখলাল, চাঁদকাজী, লালমামুদ, কবীর প্রভৃতি বহু মুসলমান কবিই পদরচনা করিয়া গিয়াছেন।

'বাংলার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি' গ্রন্থে যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ১০২ জন মুসলমান পদকর্তার সন্ধান দান করিয়াছেন। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের ব্যক্তিত্ব এবং রাধাকৃষ্ণের শাশ্বত লীলার মানবিক ভাবটিই মুসলমান কবিদের পদরচনায় আকৃষ্ট করিয়াছে,—ইহা ছাড়া মুসলমান কবিদের পদরচনার পশ্চাতে অপর কোন যুক্তি-সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই বিষয়ে শ্রীভট্টাচার্য বলেন: 'এই শ্রেণীর মুসলমানরা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, সরস্বতী, গণেশ প্রভৃতি দেবদেবীকে প্রায়শঃ স্বীকার করেন নাই। স্বীকার করিয়াছেন—প্রেমিক-প্রেমিকার মূর্ত প্রতীক রাধাকৃষ্ণকে। ইহারা কৃষ্ণ বলিতে গীতার কৃষ্ণকে জানেন না জানেন রাধাবন্ধু কৃষ্ণকে। এই রাধাকৃষ্ণ আবার অধিকাংশ মুসলমান কবিদের নিকট অপৌরুষেয়। ইহারা বৃষভানুনন্দিনী বা যশোদানন্দন নহেন। 'কানু ছাড়া গীত নাই,' 'কানু ছাড়া উপমা নাই,'—প্রভৃতি প্রবাদের দ্বারা যে প্রেমিক কানুর কথা বলা হইয়াছে, প্রেমের কথা বলিতে যাইয়া সেই কানুর নাম মুসলমান কবিরাও গ্রহণ করিয়াছেন।'

ক্ষণদাগীতচিন্তামণি: গীতচিন্তামণি বা 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' নামক সঙ্কলনগ্রন্থটিই প্রাচীনতম পদসংগ্রহ। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সম্ভবত ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে গ্রন্থটির সঙ্কলন কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ইহাতে ৪৫ জন কবির রচিত তিনশতাধিক পদ সঙ্কলিত হইয়াছে। কবি গ্রন্থটিকে কয়েকটি ক্ষণদায় বিভক্ত করিয়া এক একটিতে এক এক বিষয়ের কবিতার স্থান দান করিয়াছেন। ইহাতে 'হরিবল্লভ' ভণিতায় কবি বিশ্বনাথ চক্রবর্তী নিজেও কিছু পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, গ্রন্থটির অসম্পূর্ণ খণ্ডে চণ্ডীদাসের কোন পদ বিধৃত হয় নাই।

গীতচন্দ্রোদয়: পদকর্তা এবং গ্রন্থকার নরহরি চক্রবর্তী 'গীতচন্দ্রোদয়' নামে যে সঙ্কলন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা খণ্ডিত আকারে পাওয়া গিয়াছে। গ্রন্থটি আটটি অংশে বিভক্ত। ইহাতে ১৪৪৬টি পদ পাওয়া গিয়াছে।

পদকল্পতরু: বৈষ্ণব পদসংগ্রহের ইতিহাসে 'পদকল্পতরু'র স্থান অতিশয় ঊর্ধ্বে। গ্রন্থটির মূল নাম 'গীতকল্পতরু'—গায়কদের মুখে মুখে ইহা

'পদকল্পতরু'তে রূপান্তরিত হইয়াছে। গ্রন্থকার গোকুলানন্দ সেন, কিন্তু ইনি 'বৈষ্ণব দাস' নামেই অধিকতর পরিচিত। ইঁহার বাসস্থান টেঞা-বৈদ্যপুর গ্রাম। পদকল্পতরু চারি শাখায় বিভক্ত। প্রতি শাখা আবার কতকগুলি পল্লবে বিভক্ত। ইহাতে একশত ত্রিশজন কবির তিন সহস্রেরও অধিক পদ সঙ্কলিত হইয়াছে। পদগুলিকে রস-অনুযায়ী সাজাইতে গিয়া বৈষ্ণবদাস রসসাহিত্য-সম্বন্ধে অতিশয় মনোজ্ঞ অথচ পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার অবতারণা করিয়াছেন। গ্রন্থটির গুরুত্ব অনুধাবন করিয়া ড০ সেন ইহাকে 'বৈষ্ণবপদাবলীর ঋগ্বেদসংহিতা'র গৌরব দান করিয়াছেন।

অধ্যায় ঃ দশ

বৈষ্ণব তত্ত্ব সাহিত্য

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই বাঙলাদেশে বৈষ্ণবধর্মের বহুল প্রচলন থাকিলেও চৈতন্যদেবের প্রভাবে তাহা একটা বিশেষ রূপ লাভ করে। চৈতন্য-প্রবর্তিত এই বিশেষ ধর্মমতটিকে 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম' বলিয়া অভিহিত করা হয়। চৈতন্যদেব নিজে প্রধানত নামধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন; তিনি বৈষ্ণব ধর্ম বা দর্শন-সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া গিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই—অবশ্য এই প্রসঙ্গে তাঁহার রচিত 'উপদেশাষ্টক'-এর কথা আসে না। কিন্তু চৈতন্যদেব যে বিরাট ভক্তগোষ্ঠী সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আলোচনা-প্রসঙ্গে তাঁহাদের নিকট অনেক তত্ত্বকথা বলিয়া থাকিতে পারেন। সে যাহা হউক, চৈতন্যদেবের তিরোভাবের পর বাঙলাদেশে নিত্যানন্দ-আদি-প্রচারিত যে বৈষ্ণব ধর্মের প্লাবন বহিয়াছিল তাহাকে একটা আন্দোলন-মাত্র বলা চলে; তাহার পশ্চাতে কোন দর্শন বা তত্ত্ব তাঁহারা দাঁড় করাইতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে চৈতন্যদেব বৃন্দাবনধামের উজ্জীবন ঘটাইয়া তথায় যে ভক্ত-গোষ্ঠীকে স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহারা কোন আন্দোলনে মত্ত না হইয়া বৈষ্ণবধর্ম ও দর্শনের তাত্ত্বিক দিকটা লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন। বৃন্দাবনের ষড়্ গোস্বামীদের দান বাঙলার বৈষ্ণবধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে অসাধারণ।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম

রূপগোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, জীবগোস্বামী, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও গোপাল ভট্ট—এই ষড়্ গোস্বামীদের কেহ কেহ সাধন-ভজনে মত্ত থাকিলেও অন্তত প্রথম তিনজন যে বৈষ্ণবধর্ম ও দর্শনকে একটা বিশিষ্ট তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। রূপগোস্বামী বৈষ্ণব সাহিত্যরসতত্ত্ব, সনাতন গোস্বামী ভাগবতের ব্যাখ্যা এবং জীবগোস্বামী দর্শনের আলোচনা দ্বারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে একটা দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাইয়াছিলেন। গোপালভট্টের পরিচয়-সম্বন্ধে মতান্তরের অবকাশ থাকিলেও তিনি বৈষ্ণব-স্মৃতি রচনা করিয়া উপর্যুক্ত সম্প্রদায়ের আচারানুষ্ঠানাদির মধ্যে একটা সংহতি স্থাপন করিয়াছিলেন। বস্তুত, সম-সাময়িক কালে বৃন্দাবনের ষড়্গোস্বামীরা বাঙলাদেশের প্রবল আন্দোলন হইতে দূরে থাকিয়া স্বস্থচিত্তে সদ্যকথিত মহৎকর্মে প্রবৃত্ত না হইলে

বাঙলার গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম সহজ-সাধন-পদ্ধতির মধ্য দিয়া ন্যাড়া-নেড়ীর কাণ্ডে পরিণত হইত কিনা কে জানে?

চৈতন্যদেবের জীবৎকালে এবং তাঁহার অন্তর্ধানের অব্যবহিত পরেই বাঙলাদেশে বৈষ্ণব সাহিত্য দুইটি প্রধান ধারায় প্রবাহিত হইয়াছিল। ইহাদের একটি চরিত শাখা,—চৈতন্যদেব, তাঁহার পার্ষদবর্গ এবং বৈষ্ণব-মোহান্তদের জীবনীরচনায় অনেকেই অগ্রসর হইয়াছিলেন; দ্বিতীয়টি পদাবলী সাহিত্যশাখা,—এই ধারাতেও অনেক খ্যাত-অখ্যাত কবিবর্গ আপনাদের কবিত্বশক্তি-প্রকাশে সচেষ্ট হইয়াছেন। কিছুকাল পর, যখন প্রথম দিকের আন্দোলনের প্রবলতা কিছুটা মন্দীভূত হইল, তখনই চিন্তাশীল বৈষ্ণবমনীষীরা বৈষ্ণব ধর্মকে একটা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিবার কথা ভাবিয়াছিলেন। ইতোপূর্বে বৃন্দাবনের গোস্বামীরা বৈষ্ণবধর্ম, দর্শন ও তত্ত্ব-সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহাদের সবগুলিই ছিল সংস্কৃত ভাষায় রচিত। এই বার বাঙলা ভাষায় ইহাদের অনুবাদ অথবা এই সমস্ত বিষয়-অবলম্বনে মৌলিক গ্রন্থ রচনার প্রচেষ্টা দেখা দিল। বৈষ্ণবসাহিত্যের এই পরবর্তী বিশেষ ধারাটিকেই 'বৈষ্ণবতত্ত্বসাহিত্য' নামে আখ্যায়িত করা হইল। সংখ্যায় ইহাদের পরিমাণ যথেষ্ট হইলেও দুর্ভাগ্যক্রমে ইহাদের কোনটিই সাহিত্য-হিসাবে উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই। কোন শক্তিমান কবি এই তত্ত্বসাহিত্য-রচনায় অগ্রসর না হওয়ায় এই শাখার সাহিত্য চিরকাল সর্বসাধারণের উপেক্ষাই লাভ করিয়া আসিয়াছে। একমাত্র গবেষক এবং তত্ত্বানুসন্ধিৎসুরাই সাগ্রহে এই ধারার পরিচয়-গ্রহণে সচেষ্ট হইযাছেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের একটি দুর্ভাগ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা হইতেছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, তত্ত্বসাহিত্যগুলির সাহিত্যমূল্য বা কাব্যমূল্য বলিতে প্রায় কিছুই নাই। বৈষ্ণবধর্ম ও দর্শনের সম্বন্ধে তাত্ত্বিক আলোচনাই ইহাদের উপজীব্য। বিষয়টি একান্তভাবেই গদ্যধর্মী—ইহাতে আবেগের বা ভাবপ্রবণতার কোন স্থান নাই; যুক্তি এবং বুদ্ধির চর্চাতেই ইহাতে সিদ্ধিলাভ করা যাইত। বস্তুত বিষয়ের দিক হইতে এই সাহিত্য ছিল যেমন গদ্যাত্মক, রচনা-ভঙ্গীর দিক হইতেও এইগুলিতে তেমনি এক অপুষ্ট গদ্য-রীতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কোন কোন গ্রন্থে ভাঙ্গা গদ্য বা ভাঙ্গা পয়ারে যে গদ্যের পূর্বাভাষ লক্ষিত হয়, যথোপযুক্ত চর্চার ফলে তাহাই পূর্ণ প্রস্ফুটিত গদ্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিত। কিন্ত

বৈষ্ণব সাহিত্যের দুই শাখা

তত্ত্বসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

আমাদের দুর্ভাগ্যের জন্যই হয়তো সম-সময়ে কোন উৎসাহী ব্যক্তিই এইদিকে অগ্রসর হইলেন না। ফলত, বাঙলা গদ্যের জন্য আমাদিগকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে বাঙলা-সাহিত্যের আরও একটি শাখা বিশেষ পুষ্টি লাভ করিয়াছিল, তাহা ভাগবত এবং অন্যান্য পুরাণের অনুসরণে 'কৃষ্ণায়ন কাব্য'। এই বিষয়ে পরে স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হইবে। প্রস্তুত অধ্যায়ে বৈষ্ণব তত্ত্ব সাহিত্যের দুইটি ধারাতেই আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকিবে—(ক) তত্ত্বশাখা (খ) অনুবাদ শাখা।

১. ॥ ঃ তত্ত্বশাখা

বৈষ্ণবধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যের নানাতত্ত্ব নানাদিকে ছড়াইয়া আছে। কবিদের মধ্য কেহ বা তাহাদের কোন একটিকে গ্রহণ করিয়াছেন, কেহ বা একাধিক বিষয়কে অবলম্বন করিয়াই গ্রন্থরচনা করিয়াছেন। বৈষ্ণবতত্ত্ব-বিষয়ে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামী-রচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ।' ইহাতে একদিকে যেমন চৈতন্য-দেবের জীবন-কাহিনী বিবৃত, অপরদিকে তেমনি বৈষ্ণবধর্ম ও দর্শনের বিভিন্ন তাত্ত্বিকদিকের রহস্যও উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। কবিরাজ যে পরিকল্পনা লইয়া চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ-রচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন, তাহা সুস্পষ্ট। শ্রীচৈতন্যদেবের বিস্তৃত জীবন-কাহিনী-রচনার সাধ তাঁহার ছিল না, তিনি 'চৈতন্য-জীবনের তাৎপর্য, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও দর্শনের মূল তত্ত্ব, চৈতন্যশাখানির্ণয় এবং মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলা-সম্বন্ধেই' অধিকতর আগ্রহ বোধ করিয়াছিলেন। তাই দেখা যায়, তাঁহার গ্রন্থের প্রতিটি 'লীলা'তেই তিনি তত্ত্ববিশ্লেষণে যথেষ্ট সময় লইয়াছেন। আদি লীলাতে তিনি 'চৈতন্যাবতারের তাৎপর্য, শাস্ত্রমার্গীয় স্মার্ত বৈষ্ণবধর্ম ও গৌড়ীয় রচনানুগ বৈষ্ণবধর্মের মূল বৈশিষ্ট্য, রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব, চৈতন্য ও কৃষ্ণের সম্পর্ক, চৈতন্যাবতারের আধ্যাত্মিক প্রয়োজনীয়তা এবং প্রেমধর্মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব-বিশ্লেষণে অধিক-তর প্রবণতা ও নিপুণতা'র পরিচয় দান করিয়াছেন। মধ্য-লীলাতেও 'কৃষ্ণদাস বিস্তারিত আকারে গৌড়ীয় ভক্তিবাদ, রাগানুগা ভক্তির ক্রম ও নীতি-আদর্শ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই পর্বের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বাসুদেব সার্ব-ভৌমের সঙ্গে মহাপ্রভুর বেদান্তবিচার ও তাঁহাকে বৈষ্ণব ভক্তিবাদে আনয়ন,

চৈতন্য চরিতামৃতে তত্ত্ব

অষ্টম পরিচ্ছেদে গোদাবরীর তীরে রায় রামানন্দের সঙ্গে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব রসতত্ত্ব ও রসপর্যায়-ব্যাখ্যা, বিংশ-চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদে, সনাতনকে উপদেশের ছলে মহাপ্রভু-কর্তৃক জীবতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব, প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত পরিচয় রহিয়াছে।' চৈতন্য-চরিতামৃতের অন্ত্যলীলায়ও 'কবিরাজ গোস্বামী মহাপ্রভুর সেই অপার্থিব ও ভাগবত জীবনকথার গূঢ় রহস্য ব্যাখ্যা ও আস্বাদন করিতে চাহিয়াছেন।' অতএব দেখা যাইতেছে, চৈতন্য-চরিতামৃত বৈষ্ণবতত্ত্বসাহিত্য-হিসাবে শুধু আদি গ্রন্থই নহে, শ্রেষ্ঠ গ্রন্থও বটে। ড° শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলিয়াছেন, 'ইহাতে সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের দার্শনিক ভিত্তি ও অধ্যাত্ম আদর্শ, গভীর মনীষা, ভক্তি-পরায়ণতা ও অতুলনীয় শাস্ত্রজ্ঞানের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পাণ্ডিত্য, ভক্তি ও কাব্যকুশলতার এরূপ আশ্চর্য সমন্বয় জগতের যে-কোনও ধর্মগ্রন্থে বিরল।'

বৈষ্ণব রস-তত্ত্ব-সম্বন্ধীয় প্রাচীনতম গ্রন্থ সম্ভবত কবিবল্লভ রচিত 'রস-কদম্ব'। কবি তাঁহার গ্রন্থে আত্মপরিচয় দান করিয়াছেন। তাঁহার পিতার নাম ব্রজবল্লভ, মাতার নাম বৈষ্ণবী, কবির জন্মস্থান করতোয়া তীরবর্তী আরোড়া গ্রাম। কবি গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য উদ্ধবদাসের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন। কবি গ্রন্থ-সমাপ্তিকালের তারিখ সুস্পষ্টভাবেই তাঁহার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন,—১৫২০ শকাব্দে (১৫৯৯ খ্রী০) ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি বৃহস্পতি বারে তাঁহার গ্রন্থরচনা সমাপ্ত হয়। কবি গ্রন্থের বিষয়বস্তু গ্রহণ করেন বিভিন্ন পুরাণ, অপরাপর গ্রন্থ এবং রূপ-সনাতনের শিষ্য-প্রশিষ্যদিগের নিকট হইতে। কবির গ্রন্থ বৃহৎ—ইহাতে দুই হাজার পয়ার শ্লোক বর্তমান। গ্রন্থের বাইশটি অধ্যায়ের প্রতিটিতেই কবি এক এক প্রকার 'রস' বর্ণনা করিয়াছেন। শাস্ত্রোক্ত রসের বাহিরে কবি বিভিন্ন রসের কল্পনা করিয়াছেন, —সূত্ররস, শিক্ষারস, স্তুতিরস, আস্থারস, দীক্ষারস ইত্যাদি। অধিকাংশ রসের প্রারম্ভেই বিভিন্ন রাগ-রাগিণীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থে কিছু কিছু কাহিনী বর্ণিত হইলেও প্রধানত রস-তত্ত্ব-সম্বন্ধে আলোচনার উদ্দেশ্যেই গ্রন্থটি রচিত হইয়াছে। গ্রন্থ ও গ্রন্থকার-সম্বন্ধে ড০ সুকুমার সেন বলেন: 'প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে শুদ্ধ তত্ত্বকথাসম্বলিত অল্প যে কয়খানি মৌলিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, রস-কদম্ব তাহার মধ্যে অন্যতম। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের কথা ছাড়িয়া দিলে এবিষয়ে রসকদম্ব দ্বিতীয়রহিত। কবি যে শুধু পণ্ডিত ও তত্ত্ববেত্তা ছিলেন

রসকদম্ব

তাহা নহে, ভাষার উপর তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। কোথাও কবিত্বের আড়ম্বর না করিয়া যতদূর সম্ভব স্বল্পাক্ষরে অথচ স্পষ্ট ও পরিষ্কার করিয়া বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের সারমর্ম সহজভাবে বুঝাইয়াছেন।···কবি যে পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, তাহা লেখক, পাঠক, শ্রোতা ও গায়কের প্রতি উক্তি হইতে বোঝা যায়।···উপমাদির প্রয়োগে কবি যথেষ্ট বৈচিত্র্য ও দক্ষতা দেখাইয়াছেন। সর্বধর্মে সমদৃষ্টি এবং আত্মদৈন্য হইতে কবির উচ্চহৃদয়ের পরিচয় পাই।'

রসকলিকা

নন্দকিশোর দাস-রচিত 'রসকলিকা' অথবা 'রসপুষ্পকলিকা' বৈষ্ণব রসশাস্ত্রবিষয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। নন্দকিশোর নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য অভিরামদাসের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনুমান তিনি ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান ছিলেন। নন্দকিশোর তাঁহার গ্রন্থরচনায় 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' এবং 'উজ্জ্বলনীলমণি' হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থটি ষোলটি 'দল' বা অধ্যায়ে বিভক্ত। বিভিন্ন দলে বিভিন্ন ভাব, রস বা অন্যবিধ লক্ষণ বর্ণনা করা হইয়াছে। নন্দকিশোর দাস রসবিচার করিতে গিয়া দৃষ্টান্ত আহরণ করিয়াছেন চৈতন্যদেবের জীবনী হইতে। এই হিসাবে গ্রন্থটির বিশিষ্টতা স্মরণযোগ্য। রসকলিকায় কয়েকটি বাঙলা এবং ব্রজবুলির পদ পাওয়া যায়। তাহাদের কোন কোনটি কবির স্বরচিত, আবার গোবিন্দদাসাদির পদও ইহাতে বর্তমান গ্রন্থে। গ্রন্থটিতে চৈতন্যচরিতামৃতের প্রভাব সুস্পষ্ট।

রাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী

বৃন্দাবনের ষড়্‌গোস্বামীদের অন্যতম শ্রীরূপগোস্বামী বৈষ্ণব রসসাহিত্য-সম্বন্ধে যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাকে অবলম্বন করিয়া পরবর্তীকালে রস-শাস্ত্র-সম্বন্ধীয় বহু বাঙলা গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এইরূপ একটি গ্রন্থ বৈদ্যবংশীয় রামগোপাল দাস বা গোপালদাস-রচিত 'রাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী'। গ্রন্থকারের পিতার নাম শ্যাম রায়। গোপালদাস ছিলেন শ্রীখণ্ডের রতিকান্ত ঠাকুরের শিষ্য। গুরুর আদেশেই গোপাল দাস আলোচ্য গ্রন্থ-রচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন। গ্রন্থকার গ্রন্থ-রচনার তারিখ-সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবেই বলিয়া গিয়াছেন যে তিনি ১৫৯৫ শকাব্দে (১৬৭৩-৭৪ খ্রীঃ) বৈশাখ মাসে গ্রন্থ আরম্ভ করেন এবং কার্ত্তিকমাসের দীপান্বিতায় গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। গ্রন্থটি বারোটি কোরকে বিভক্ত। ইহাতে মঙ্গলাচরণ, নায়ক-বর্ণন, নায়িকা-পরিবার, ভাব-বিচার প্রভৃতি বিষয়-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে।

উক্ত রামগোপালদাসের পুত্র পীতাম্বর দাস পিতার আজ্ঞায় পিতৃ-গ্রন্থের একটি কোরক অবলম্বন করিয়া 'রসমঞ্জরী' নামে একটি নিবন্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে আটটি অধ্যায় বর্তমান। ইহার প্রধান আলোচ্য বিষয় নায়িকা-বিভাগ। নায়িকাবিভাগকে অবলম্বন করিয়াই ইহাতে বিভিন্ন নায়িকার লক্ষণ ও প্রকারভেদ-সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এই গ্রন্থে কয়েকজন পদকর্তার পদ উদ্ধৃত হইয়াছে,—ইহাতে গ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। পীতাম্বর দাসের আর একখানি নিবন্ধ গ্রন্থ 'অষ্টরসব্যাখ্যা'। ইহাতেও কয়েকজন পদকর্তার পদ উদ্ধৃত হইয়াছে।

রসমঞ্জরী

বৈষ্ণবতত্ত্বশাখা-সম্বন্ধীয় একটি প্রসিদ্ধ পুস্তক 'দিনমণিচন্দ্রোদয়'—গ্রন্থকার মনোহর রায়। গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থে বিস্তৃতভাবেই আত্মপরিচয় দান করিয়াছেন। তিনি রামানন্দ রায়ের ভ্রাতার বংশধর। ইঁহার পিতার নাম গোবিন্দানন্দ রায়। উড়িয়ারাজা তাঁহার ভূসম্পত্তি অধিকার করিলে কবি ভাগ্যান্বেষণে বর্ধমানে চলিয়া আসেন। পরে অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার দেশে ফিরিয়া যান। কবির কাব্য একুশটি 'সূত্রে' বিভক্ত। 'দিনমণিচন্দ্রোদয়কে এক হিসাবে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ব্যাখ্যা বলা যাইতে পারে। রচনা বেশ জোরাল। তবে কাব্যহিসাবে একান্তভাবে মূল্যহীন।'

দিনমণিচন্দ্রোদয়

পরবর্তীকালে বৈষ্ণবতত্ত্ব-অবলম্বনে বহুতর ক্ষুদ্র বৃহৎ 'নিবন্ধ' রচিত হইয়াছিল। ইহাদের অধিকাংশ অখ্যাত কবিদের রচনা হইলেও তাহারা গ্রন্থকাররূপে বিশিষ্ট বৈষ্ণবমোহান্ত বা পদকর্তাদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কৃষ্ণদাসকবিরাজ, শ্রীজীবগোস্বামী, নরোত্তমদাস, বৃন্দাবন দাস প্রভৃতি বিশিষ্ট মনীষীদের ভণিতাযুক্ত হইয়া অনেক-গুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

নিবন্ধ

২. ঃ অনুবাদ শাখা

বৃন্দাবনের ষড়্‌গোস্বামীগণ সংস্কৃত ভাষায় বৈষ্ণবতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্য তাহাদের অনুবাদের প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল। এই বিষয়ে শ্রীনিবাস আচার্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রেরণা এবং প্রবর্তনায় অনেকেই অনুবাদকার্যে

হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। এইরূপ অনুবাদকের মধ্যে অন্যতম ছিলেন যদুনন্দন। ইনি শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিলেও প্রধানত শ্রীনিবাসেরই অনুচর ছিলেন। যদুনন্দন অন্তত চারিখানা কাব্যের অনুবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়ঃ (ক) শ্রীরূপগোস্বামীর বিদগ্ধমাধব অবলম্বনে 'শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণলীলারসকদম্ব' বা 'রসকদম্ব' নামক কাব্য, (খ) উক্ত গোস্বামীর দানকেলি কৌমুদী ভানিকা-অবলম্বনে 'দানলীলাচন্দ্রামৃত' কাব্য; (গ) কৃষ্ণদাসকবিরাজের গোবিন্দলীলামৃত-অবলম্বনে 'গোবিন্দলীলামৃত' কাব্য এবং (ঘ) কৃষ্ণকর্ণামৃত ও কৃষ্ণদাসকবিরাজের সারঙ্গরঙ্গদা টীকা-অবলম্বনে 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' কাব্য। যদুনন্দন প্রতিভাধর কবি ছিলেন। তিনি মৌলিক রচনার মতই সাবলীল ভঙ্গীতে অনুবাদ রচনা করিয়াছিলেন। এই অনুবাদকে আক্ষরিক অনুবাদ না বলিয়া ছায়ানুবাদ বলাই সঙ্গত।

যদুনন্দন

শ্রীরূপগোস্বামী-রচিত উদ্ধবদূত এবং হংসদূত কাব্য দুইটির একাধিক অনুবাদ রচিত হইয়াছিল দেখা যায়। দ্বিজ নরসিংহ তাহার শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের ভিতরেই উদ্ধবদূতের অনুবাদকে স্থান দান করিয়াছিলেন। মাধব গুণাকরের উদ্ধবদূত বৃহৎ গ্রন্থ। বিষ্ণুরাম নন্দীও একটি উদ্ধবগীতা রচনা করিয়াছিলেন। একটি হংসদূতকাব্যের ভণিতায় নরসিংহ, যদুনাথ ও পুটীরামের নাম পাওয়া যায়। অপর একজন নরসিংহ দাস যে হংসদূত রচনা করেন তাহা কুড়িটি অধ্যায়ে বিভক্ত।

উদ্ধবদূত ও হংসদূতের অনুবাদ

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তিনি শ্রীরূপগোস্বামী-রচিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, লঘুভাগবতামৃত এবং উজ্জ্বলনীলমণির সার সঙ্কলন নিম্নোক্তরূপে রচনা করেনঃ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-বিন্দু, ভাগবতামৃতকণা ও উজ্জ্বলনীলমণি-কিরণ।

বিশ্বনাথচক্রবর্তী

অপ্রসিদ্ধ অনুবাদ গ্রন্থ যে কত রচিত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু উৎকর্ষের বিচারে ইহাদের বিশেষ কোন মূল্য না থাকায় এই সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

অধ্যায় ঃ এগারো

অনুবাদ সাহিত্য

চৈতন্য-পূর্বযুগের সাহিত্য-সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে অনুবাদসাহিত্যের উৎপত্তি-সম্বন্ধে যে আলোচনার অবতারণা করা হইয়াছিল, যুগ-বিভাগের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহাকে প্রয়োজনের খাতিরেই সীমাবদ্ধ রাখা হইয়াছিল। অনুবাদ-সাহিত্যের তিনটির মধ্যে দুইটি প্রধান ধারার উদ্ভব ও প্রাথমিক বিকাশেই তাৎকালিক আলোচনা সমাপ্ত হইয়াছিল। প্রস্তুত অধ্যায়ে উক্ত তিন শাখারই সামগ্রিক পরিচয় দান করা হইবে।

বাঙলা সাহিত্যের প্রস্তুতি-পর্বেই যে অনুবাদের প্রতি মনীষীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা ইতোপূর্বেই দেখা গিয়াছে। 'কৃত্তিবেসে, কাশীদেশে আর বামুন ঘেষে—এই তিন সর্বনেশে'—তৃতীয় জন-সম্বন্ধে কিছু জানা যায়না, তবে প্রথম দুইজনকে 'সর্বনেশে' আখ্যা দিলেও যে তাঁহারা যুগধর্মের অনুসরণে যুগমানসেরই পোষকতা করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। চৈতন্যোত্তর কালেও কোন কোন কবি সখেদে স্বীকার করিয়াছেন যে দেশীয় ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিলে নিন্দিত হইতে হয়। কিন্তু সমসাময়িক যুগের নিন্দাস্তুতির উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ অর্থহীন,—কারণ কালের কষ্টি-পাথরে এই সকল নিন্দাস্তুতি অনেক সময়ই অযথার্থ বলিয়া প্রমাণিত হয়। যাহা হউক, চৈতন্য-পূর্বযুগে যে অনুবাদের ধারা শৃঙ্গে শৃঙ্গে প্রতিহত হইয়া উপলখণ্ডের মধ্য দিয়া পথ করিয়া ক্ষীণস্রোতে কোনক্রমে সমভূমিতে নামিবার উদ্যোগ করিতেছিল, চৈতন্যোত্তর যুগে তাহাই সমভূমির স্পর্শ লাভ করিয়া শতধারায় প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল। বস্তুত রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবত,—প্রধানত এই তিনটি মহাকাব্য-পুরাণের কত অনুবাদ যে এই যুগে রচিত হইয়াছিল, তাহার যথাযথ সংবাদ-সংগ্রহ কঠিন ব্যাপার। রামায়ণ এবং ভাগবত-অনুবাদ চৈতন্য-পূর্ব যুগেই শুরু হইয়াছিল, মহাভারতের সৃষ্টি এবং পুষ্টিও এই যুগে।

অনুবাদ সাহিত্যের বিচার

১. রামায়ণ

সাধারণত 'রামায়ণ' বলিতে আমরা আদিকবি বাল্মীকি-কৃত রামায়ণকে বুঝিলেও পরবর্তীকালে ইহারই অনুসরণে অন্তত আরও তিনটি রামায়ণ রচিত হইয়াছিল :—অদ্ভুত রামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ এবং অধ্যাত্ম রামায়ণ। কৃত্তিবাস মূলত বাল্মীকি-রামায়ণ অনুসরণ করিলেও পরবর্তী কবিগণ অন্যান্য রামায়ণ হইতেও যদৃচ্ছ উপাদান আহরণ করিয়া স্ব স্ব গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন। কেহ কেহ বা সম্পূর্ণ ভাবেই ভিন্ন রামায়ণ-অবলম্বনে কাব্য রচনা করিয়াছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কৃত্তিবাসও কিছু কিছু কাহিনী অধ্যাত্ম-রামায়ণ এবং অন্যসূত্র হইতে আহরণ করিয়াছেন।

রামায়ণের বৈচিত্র্য

'অদ্ভুতরামায়ণ' বাল্মীকির রচিত বলিয়া প্রচারিত হইলেও ইহা প্রকৃতপক্ষে বহু পরবর্তী কালের রচনা। ২৭ সর্গে সম্পূর্ণ এই রামায়ণটিতে ১৩৬০টি শ্লোক আছে। সীতা রাবণের কন্যা এবং সীতার হস্তেই সহস্রস্কন্ধ রাবণের মৃত্যু ঘটিয়াছিল,—এই মৌলিক কাহিনীটিই আলোচ্য গ্রন্থটির উপজীব্য। অধিকন্তু ইহাতে সাংখ্যযোগ, ভক্তিবাদ ও শক্তিতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় বিবিধ আলোচনা স্থানলাভ করিয়াছে। মনে হয়, পরবর্তীকালে বৈষ্ণবধর্ম এবং শাক্তধর্মের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য-বিধানের চেষ্টা হইতেই আলোচ্য গ্রন্থটির উদ্ভব হইয়াছিল। ইহাতে রামচন্দ্রকে ব্রহ্ম-রূপে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

১. অদ্ভুত রামায়ণ

'অধ্যাত্মরামায়ণ' কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের রচিত বলিয়া প্রচারিত। বলাবাহুল্য এই গ্রন্থখানিও অনেক পরবর্তী কালের রচনা। ইহাতে মূল রামায়ণের কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থের নামকরণ হইতেই বোঝা যায় ইহাতে তত্ত্বের দিকটাই অধিকতর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। প্রতিটি সর্গেই দেখা যায় যে মহাদেব পার্বতীর নিকট রামকাহিনী এবং রামতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন। শাক্তধর্মের প্রভাববশতই যে গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছিল, ইহা হইতেই তাহা বোঝা যায়। এই গ্রন্থেও রামচন্দ্রের ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

২. অধ্যাত্ম রামায়ণ

'যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ'ও বাল্মীকির নামে প্রচারিত। কিন্তু ইহাও যে পরবর্তীকালের রচনা তাহা না বলিলেও চলিতে পারে। গ্রন্থে বলা হইয়াছে

যে, বাল্মীকি-কৃত ২৪০০০ শ্লোক-বিশিষ্ট সপ্তকাণ্ড রামায়ণ মূল রামায়ণের পূর্বখণ্ড মাত্র। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণই ইহার অপরখণ্ড। রামচন্দ্রের বৈরাগ্যো-দয় হইলে বশিষ্ঠ যেভাবে তত্ত্বোপদেশ দ্বারা তাঁহাকে আবার সংসারধর্মে আগ্রহী করিলেন, তাহাই আলোচ্য-গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য। কিন্তু বিভিন্ন তাত্ত্বিক ও দার্শনিক আলোচনাই গ্রন্থটির বিশেষ সম্পদ। এই গ্রন্থেও রামচন্দ্রের ব্রহ্মত্ব প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

৩. যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ

পূর্বোক্ত তিনখানি গ্রন্থের ঐক্যবদ্ধ আলোচনায় এই কথা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে পরবর্তীকালে ধর্ম ও দর্শনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই রাম-কাহিনীকে পরিবর্তিত করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল এবং এই ভাবেই বিভিন্ন রামায়ণ সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। বাঙলাদেশে কোনকালে রামমন্দির স্থাপিত হয় নাই, রামবিগ্রহ পূজিত হয় নাই, রামায়েৎ সম্প্রদায়ও গড়িয়া ওঠে নাই, কিন্তু রামায়ণ-কাহিনী বাঙলার চির আদরের বস্তু বলিয়াই তাহার অনুবাদকেরও কখন অভাব ঘটে নাই।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে চৈতন্যোত্তর যুগে অনুবাদ সাহিত্যের প্লাবন বহিয়া গিয়াছিল। বস্তুত, কথাটিকে আক্ষরিক ভাবে সত্য বলিয়াই মনে করা চলে। কারণ, একমাত্র রামায়ণের অনুবাদকের নামই পাওয়া যায় পঞ্চাশাধিক; অনুমান করা চলে, এখনও পর্যন্ত অনেক কবিই হয়তো অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়াছেন। তবে লক্ষ্য করা চলে, যশঃপ্রার্থী কবিরা অনেকেই রামায়ণ হইতে নির্বাচিত কাহিনীর বা বিশেষ কোন কাণ্ডেরই অনুবাদ করিয়াছেন মাত্র। রামায়ণের কয়েকটি বিশেষ অংশই যে কবিদের সাগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, আলোচনা-কালে তাহাও প্রমাণিত হইবে।

অদ্ভুতাচার্য : চৈতন্যোত্তর যুগের রামায়ণ-রচয়িতাদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন অদ্ভুতাচার্য্য। অবশ্য এই অদ্ভুতাচার্য নামটির আড়ালে যিনি আত্মগোপন করিয়াছেন, তাঁহার প্রকৃত নাম নিত্যানন্দ আচার্য। নিত্যানন্দ আচার্য অদ্ভুত রামায়ণের অনুবাদ করিয়াছিলেন, এই কারণেই তাঁহার নাম অদ্ভুতাচার্য হইতে পারে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে তিনি 'অদ্ভুত আশ্চর্য' রামায়ণের রচয়িতা বলিয়াই 'অদ্ভুতাশ্চর্য অদ্ভুতাচার্য্য' নাম পাইয়াছিলেন। ডঃ সুকুমার সেন বলেন, 'অদ্ভুতাচার্য কবির নামও নহে, উপাধিও নহে। ইহা রামায়ণ-গায়কদের উদ্ভাবিত।' কিন্তু তাহাই যদি হইবে তবে গ্রন্থের ভণিতায় 'অদ্ভুত আচার্য'

নাম-বৈশিষ্ট্য

এবং 'অদ্ভুত' নামই বা থাকিবে কেন? আমাদের মনে হয়, 'আচার্য'-কৌলিক উপাধিধারী কবি 'অদ্ভুত' রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়াই স্বেচ্ছায় এই উপনামটি গ্রহণ করিয়াছিলেন,—সহজবুদ্ধির এই সিদ্ধান্তটিই সমীচীন।

পরিচয়

অদ্ভুতাচার্য নিত্যানন্দ তাঁহার গ্রন্থে বিস্তৃত আত্মপরিচয়-কাহিনী লিখিয়া গিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায় যে কবির পিতা ছিলেন শ্রীনিবাস (অথবা কাশী) আচার্য, মাতা মেনকা। কবি উত্তরবঙ্গে আত্রেয়ী ও করতোয়ার অন্তর্বর্তী বড়বাড়ী বা অমৃতকুণ্ডা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবি যখন 'সপ্ত বৎসরের শিশু' তখন একদিন 'স্বপ্নাদেশে সাক্ষাৎ হইল রঘুপতি।' তারপর রঘুপতি

'টোনা (তূণ) হইতে অস্ত্র খসাইয়া লৈল হাতে।
এক মহামন্ত্র তার লিখিল জিহ্বাতে॥'

আত্মপরিচয়ের একটি পাঠান্তরে কবি তাঁহার অদ্ভুত-আচার্য নামের কারণ বর্ণনা করিয়াছেন :

'রাম আজ্ঞা করিল রচিতে রামায়ণ।
অদ্ভুত আচার্য নাম তাহার কারণ॥'

কবির কাল

অদ্ভুতাচার্যের জীবৎকাল-সম্বন্ধে মতান্তরের অবসান হয় নাই। কবির খুব প্রাচীন পুঁথি সুলভ না হওয়ায় ড° সুকুমার সেন তাহাকে সপ্তদশ শতকের শেষভাগের কবি বলিয়া মনে করেন। পক্ষান্তরে ড° ভট্টশালী এবং মণীন্দ্রবসু অনুমান করেন যে নিত্যানন্দ ষোড়শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। কিন্তু কবি যেকালেই বর্তমান থাকুন, তাঁহার কাব্য যে কালের নিকষে উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অবশ্য ড° সুকুমার সেন কবি-সম্বন্ধে কঠোর মন্তব্যই করিয়াছেন। তিনি বলেন যে কাব্যটিতে কবিত্বের কোন বালাই নাই। কিন্তু যদি ইহা প্রকৃতই অকাব্য হইত তবে প্রচলিত কৃত্তিবাসের কাব্যে তাহার প্রভাব পড়িতনা কিংবা তাঁহার অদ্ভুত রামায়ণ হইতে প্রচুর অংশ তাহাতে অন্তর্ভুক্ত হইত না।

অদ্ভুতাচার্য শুধু যে সমগ্র রামায়ণই অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহা নহে, তিনি অধ্যাত্ম রামায়ণ এবং অপর কোন কোন সূত্র হইতেও কাহিনী আহরণ করিয়া তাঁহার কাব্যের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ড° সেন অনুমান করেন যে অপরাপর কবিদের রচনাও ইহাতে অঙ্গীভূত হইয়াছে। ফলত ইহার আকার কৃত্তিবাসী রামায়ণকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। নিত্যানন্দ নূতন

সূত্র হইতে উপাদান আহরণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার কাব্যে নূতনত্ব থাকিবেই,—কিন্তু তিনি খাঁটি বাঙালী জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে কোন কোন চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন বলিয়া তাহার মৌলিকত্ব অনাস্বাদিতপূর্ব। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কৌশল্যা-চরিত্রের কথা উল্লেখ করা চলে। সমসাময়িকযুগে বাঙলা দেশে বৈষ্ণব ধর্মের ও পদাবলী সাহিত্যের যে অপূর্ব জাগরণ দেখা দিয়াছিল, সম্ভবত তাহার প্রভাবেই কবি কৌশল্যা-চরিত্রকে যশোদার আদর্শে গঠন করিয়াছিলেন। ফলত কৌশল্যা একেবারে বাঙালী-মা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। শুধু এই একটিমাত্র চরিত্রেই নহে, গ্রন্থের নানা কাহিনী ও চরিত্রের বুননে কবি বাঙালীয়ানা দ্বারাই ফাঁক বোঝাই করিয়াছেন। এই দিক হইতে কাব্যটি বাঙালীর শাশ্বত রস-পিপাসা-বোধকে তৃপ্ত করিতে পারিবে আশা করা যায়। সুধী ঐতিহাসিক যথার্থই বলিয়াছেন: 'এম্‌নি ছিলেন বাঙালির কবি অদ্ভুতাচার্য। বাঙালী চেতনার সার্বিক আদর্শ মহিমাঙ্কনে এবং বাঙালি জীবনের চাপল্য-তরল সাধারণ মুহূর্তের চিত্রণে সমপরিমাণে তাঁর লেখনী ছিল মুক্ত-পক্ষ,—সিদ্ধ হস্ত।'

কাব্য-বিচার

জগদ্রাম ও রামপ্রসাদ রায়: পিতা-পুত্র একসঙ্গে কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হইয়া কাব্য সমাপ্ত করিয়াছেন, এইরূপ দৃষ্টান্ত দুর্লভ। আলোচ্যক্ষেত্রে আমরা সেই দুর্লভ দৃষ্টান্তের সন্ধান পাইয়াছি। রাণীগঞ্জের নিকটবর্তী দামোদর-তীরবাসী ভুলুই গ্রামের বন্দ্যবংশীয় জগদ্রাম রায় এবং তৎপুত্র রামপ্রসাদ রায় একত্রে রামায়ণ রচনা করেন। জগদ্রামের পিতা রঘুনাথ রায় এবং মাতা শোভাবতী। কবি জ্যেষ্ঠভ্রাতার আদেশে কাব্যরচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন বলিয়াই আত্মপরিচয়-শীর্ষক অংশে উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যের নামও 'অদ্ভুত আশ্চর্য রামায়ণ।'

পিতা-পুত্র

পিতাপুত্র-রচিত এই রামায়ণখানি আকারে সুবৃহৎ। ইহাতে সপ্তকাণ্ড রামায়ণের সহিত 'পুষ্করকাণ্ড' নামে একটি কাণ্ড এবং 'রামরাস' নামে অতিরিক্ত একটি খণ্ড যুক্ত হইয়াছে। ইহার 'লঙ্কাকাণ্ড' এবং 'উত্তরাকাণ্ড' রচনা করিয়াছিলেন পুত্র রামপ্রসাদ রায়। অবশিষ্ট অংশ জগদ্রামই রচনা করিয়াছেন। রামপ্রসাদ রায় ভণিতায় জানাইয়াছেন, কীভাবে তিনি পিতাকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

গ্রন্থ-পরিচয়

কবিদ্বয় গ্রন্থ-রচনায় শুধু যে অদ্ভুত রামায়ণেরই সহায়তা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা নহে। পুত্র রামপ্রসাদ রায় বলিয়াছেন:

'সীতারামলীলা নব্য রচিলা সুন্দর কাব্য শ্রীঅদ্ভুত-রামায়ণ নাম।
অদ্ভুত-অধ্যাত্ম মত একত্র করিয়া যুত রচনা বিবিধ রসধাম॥'

অদ্ভুত রামায়ণের সঙ্গে অধ্যাত্ম রামায়ণ হইতেও তাঁহারা উপকরণ আহরণ করিয়াছিলেন। রামপ্রসাদ রায় গ্রন্থটি ১৭১২ শকাব্দে (১৭৯১ খ্রীঃ) সমাপ্ত করিয়াছিলেন। ইহার পূর্বেই পিতাপুত্র সম্মিলিত ভাবে 'দুর্গাপঞ্চরাত্রি' নামেও অপর একখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। অকালে রামচন্দ্র-কর্তৃক দুর্গাপূজাই ইহার বিষয়বস্তু।

পিতাপুত্রের কৃতিত্ব-বিচারে একসঙ্গেই বলা চলে যে উভয় কবিই কাব্য-রচনায় সার্থকতা লাভ করিয়াছেন। যদিও পুত্র পিতার কৃতিত্বের কাছে আপনাকে অতিশয় ক্ষুদ্র বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তৎসত্ত্বেও তাঁহার উক্তিকে নিতান্ত বিনয় বলিয়াই মনে হয়।—

কাব্য-বিচার

'পিতার রচিত কাব্য তাথে অতিশয় ভব্য
প্রত্যক্ষরে সুধা ক্ষরে যাথে।
কেবল রসের সিন্ধু প্রকাশেতে পূর্ণইন্দু
মোর কাব্য খদ্যোত লিখিতে॥'

কবিত্বশক্তিতে কেহই কম নহেন এবং ছন্দেও উভয়ের পারদর্শিতা ছিল।

চন্দ্রাবতী: বাঙলার প্রথম মহিলাকবি চন্দ্রাবতী ছিলেন 'মনসামঙ্গল-কাব্যে'র কবি দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা। দ্বিজ বংশীদাস তাঁহার কাব্যের ভণিতায় বলিয়াছেন যে ১৪৯৭ শকাব্দে (১৫৭৫-৭৬খ্রীঃ) তিনি কাব্যটি সমাপ্ত করেন। অনুমান, কবি চন্দ্রাবতী ঐ কালেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহার কাব্যরচনা-কাল ষোড়শ শতাব্দীর শেষ অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ হইবে,—এইরূপ অনুমান করা যায়। কবি চন্দ্রাবতী প্রধানত গীতিকাব্যকাহিনীর রচয়িতা-রূপেই প্রসিদ্ধ। তাঁহার রচিত 'দস্যু কেনারাম-কাহিনী' ময়মনসিংহ-গীতিকবিতা অন্তর্ভুক্ত এক বাস্তব কাহিনী—উপন্যাসের মতই মনোরম। প্রসিদ্ধ গীতিকাব্য 'মলুয়াসুন্দরী'ও চন্দ্রাবতীর রচিত বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। চন্দ্রাবতী যেমন অপরের কাহিনী রচনা করিয়া গিয়াছেন, তেমনি তাঁহার উপন্যাসোপম জীবন-কাহিনীও অপর কবির কাব্যের উপজীব্য হইয়াছে। চন্দ্রাবতী স্বরচিত কাব্যে বিস্তৃত পিতৃ-পরিচয় দিয়াছেন, আর কবি নয়ানচাঁদ ঘোষ চন্দ্রাবতী-জীবন-কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া যে কাব্য রচনা করিয়াছেন তাহাতে আমরা এই মহিলাকবির ব্যক্তিগত জীবনের এক রোমান্টিক

কবি-কাহিনী

ট্র্যাজেডীর পরিচয় পাই। তিনি জয়চন্দ্র নামক এক বাল্যসহচরের প্রণয়াসক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু জয়চন্দ্র অপর এক মুসলমানকন্যার প্রতি আসক্তি-বশত মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিয়া সেই কন্যাকে বিবাহ করেন। চন্দ্রাবতী কুমারীই থাকিয়া গেলেন। পরবর্তীকালে জয়চন্দ্র আপনার ভুল বুঝিতে পারিয়া আবার চন্দ্রাবতীর কাছে ফিরিয়া আসিলে চন্দ্রাবতী তাহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। জয়চন্দ্র নদীর জলে আত্মবিসর্জন করেন।

চন্দ্রাবতী যে রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন তাহার কোন পুঁথি পাওয়া যায় না। সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার লোকমুখে যাহা শুনিয়াছেন, তাহাই সংগ্রহ করিয়াছেন এবং এই অসম্পূর্ণ অংশটিই বিশ্ব-বিদ্যালয়-কর্তৃক পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকায় সঙ্কলিত হইয়াছে। চন্দ্রাবতীর রামায়ণ তিনখণ্ডে বিভক্ত। ইহাতে বাল্মীকির রামায়ণের প্রভাব সুস্পষ্ট। এখানে সীতা রাবণের কন্যা। প্রথম খণ্ডে রাম ও সীতার জন্মকাহিনীপর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে সীতা-কর্তৃক বনবাস-কাহিনী-বর্ণনা। এই অংশের বর্ণনায় মধুসূদনের প্রভাব এত সুস্পষ্ট যে ইহাতে সংস্কর্তার অদৃশ্য হাত স্পষ্টতই দৃশ্য হইয়া উঠিয়াছে। তৃতীয় খণ্ডের কাহিনীতে কবি যথেষ্ট নূতনত্ব পরিবেষণ করিয়াছেন। ইহাতে ভরত-ভগিনী ককুয়ার ভূমিকা নগণ্য নহে।—চন্দ্রাবতীর কোন পুঁথি পাওয়া না যাওয়া পর্যন্ত কাব্যের সমালোচনা বৃথা। কারণ সংগ্রাহক শ্রুতিলিপিতে যাহা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার প্রামাণিকতা সন্দেহজনক। চন্দ্রাবতী রামায়ণে বিস্তৃত আত্মপরিচয় দান করিয়াছেন। এই অংশে মহিলাকবির বাস্তবচিত্রাঙ্কন-ক্ষমতার অতি সুন্দর পরিচয় বর্তমান। পিতার দারিদ্র্য বর্ণনা করিতে গিয়া চন্দ্রাবতী লিখিয়াছেন :

বৈশিষ্ট্য

'ঘরে নাই ধান চাল চালে নাই ছানি।
আকর ভেদিয়া পড়ে উচ্ছিলার পানি ॥'

দুর্ভাগ্যক্রমে কবির মূল রচনার সহিত আমাদের পরিচয় না ঘটিলেও তাঁহার কবিত্বশক্তির পরিচয় অন্যত্র পাইয়াছি, ইহাই আমাদের ভাগ্য।

রঘুনন্দন গোস্বামী : রঘুনন্দন গোস্বামী-কৃত 'রামরসায়ন' অনেক পরবর্তী কালের (আঃ—১৮৩১ খ্রীঃ) রচনা হইলেও উৎকর্ষে ইহা অনেক প্রাচীনতর কাব্যেরও গৌরব লাঘব করে। কবি রঘুনন্দন গোস্বামী বর্ধমানের নিকটবর্তী মাড় গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনি মহাপ্রভু

নিত্যানন্দের বংশধর। কবি গ্রন্থশেষে আত্মপরিচয়ে নিত্যানন্দ প্রভু হইতে বংশধারা টানিয়াছেন এবং বিস্তৃতভাবে আত্মীয়-পরিজনদের পরিচয় দান করিয়াছেন। কবি জ্যেষ্ঠতাত বংশী-মোহনের নিকট হইতেই দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং প্রতি পরিচ্ছেদের শেষে তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কবির পিতার নাম কিশোরীমোহন।

কবি-পরিচয়

কবির কাব্য অতি বৃহৎ। রামরসায়ন সপ্ত কাণ্ডে বিভক্ত হইলেও ইহার পরিচ্ছেদ-সংখ্যা অসংখ্য। মূল রামায়ণের অনুসরণে তিনি 'উত্তর কাণ্ড' রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে ইহাকে সম্পূর্ণ নূতনই আখ্যা দিতে হয়। ইহাতে সীতার পাতাল-প্রবেশও বর্ণিত হয় নাই। বস্তুত এই খণ্ডে কবির মৌলিক-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ড° সুকুমার সেন কাব্যটি-সম্বন্ধে বলেন: 'রামরসায়ন সুবৃহৎ কাব্য। কিন্তু এই বৃহৎ কাব্যের মধ্যে, কবির অক্ষমতার চিহ্ন এতটুকু নাই। ভাষা এবং ছন্দে রঘুনন্দনের সমান ক্ষমতা ছিল।' রামরসায়ন-ব্যতীতও কবি 'রাধামাধবোদয়' এবং 'গীতমালা' নামে আরও দুইটি কাব্য রচনা করিযাছিলেন। ইহা ছাড়াও তিনি কয়েকটি সংস্কৃত কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

গ্রন্থ-পরিচয়

কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী:—বহু গ্রন্থ-প্রণেতা শঙ্কর চক্রবর্তী সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ অবধি বর্তমান ছিলেন। তাঁহার বিভিন্ন কাব্যের ভণিতায় যে সকল ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাহাতে জানা যায় যে, ইঁহার পিতার নাম মুনিচন্দ্র, বাসস্থান মল্ল-ভূমির অন্তর্গত পানুয়া গ্রাম। কবির উপাধি ছিল 'কবিচন্দ্র'। কখন কখন ইনি কবিচন্দ্র চক্রবর্তী নামেও ভণিতা দিয়াছেন। অনুমান হয়, কবি স্বাধীন মল্লরাজদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। কবির কাব্যে কয়েকজন মল্লরাজেরই নাম পাওয়া যাইতেছে; তাহা হইতে এবং কবি যে পরিমাণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা হইতে অনুমান হয় যে তিনি দীর্ঘজীবী ছিলেন। কবি প্রাচীন বাঙলাসাহিত্যের প্রায় সর্বদিকেই হাত দিয়াছিলেন। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে শিবায়ন, ভাগবতামৃত, রামায়ণ, মহাভারত, মনসামঙ্গল এবং অভয়ামঙ্গলের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহা ছাড়াও তিনি ক্ষুদ্রকায় কয়েকটি পাঁচালীও হয়তো রচনা করিয়াছিলেন।

কবি-পরিচয়

কবিচন্দ্র-কৃত রামায়ণটি সাধারণত 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ' নামেই প্রসিদ্ধ। ইহা

পশ্চিমবঙ্গে বিশেষত মল্লভূমি ও রাঢ়দেশে বহুল প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। কবিচন্দ্রের রচনার উৎকর্ষ-বোধের একটি পরোক্ষ প্রমাণ এই তাঁহার রচনার বহু অংশই কৃত্তিবাসীরামায়ণে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া যথাযথ মর্যাদা লাভ করিয়াছে। ড° সুকুমার সেন মনে করেন যে 'তরণীসেন বধ, অঙ্গদের রায়বার' ইত্যাদি অংশ মূলত কবিচন্দ্রেরই রচনা; লিপিকরদের হস্তক্ষেপেই এইগুলি কৃত্তিবাসী রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। কবিচন্দ্রের রচনাও যে উৎকৃষ্ট, ইহাই তাহার প্রমাণ।

কাব্য-পরিচয়

অপ্রধান কবিবৃন্দ : রামায়ণের প্রধান কবিদের সম্বন্ধে বলা হইল। ইঁহারা ছাড়াও আরো কয়েকজন কবি সম্পূর্ণ অথবা অধিকাংশ রামায়ণের অনুবাদ করিয়াছিলেন; অপরাপর কবিরা রামায়ণের বিশেষ কোন কাহিনী অথবা কাণ্ডেরই অনুবাদ করিয়াছেন।

কৈলাসবসু সম্ভবত সমগ্র রামায়ণেরই অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার কাব্যটি অদ্ভুত রামায়ণের অনুসরণে রচিত বলিলেই যথেষ্ট হইবে না, প্রকৃতপক্ষে এইরূপ মূলানুগ অনুবাদ-প্রচেষ্টা খুবই কম দেখা যায়। কবির কাব্য-রচনা-কাল জানা না গেলেও অনুমান করা হয় যে গ্রন্থকার ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগেই হয়তো গ্রন্থটি রচনা করিয়াছিলেন। কবি 'মহাভাগবত' নামে অপর যে গ্রন্থখানি রচনা করেন, তাহার রচনা-কাল ১৫৬৮ খ্রীঃ বলিয়া জানা যায়।

কৈলাসবসু

রামশঙ্কর সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমেই বর্তমান ছিলেন। তিনি ছিলেন বৈদ্য ('ভিষক') জাতীয় কিন্তু 'দত্তরায়' উপাধিধারী। মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত খোলাপাড়া ও বয়রা ছিল তাঁহার বাসস্থান। তিনি ১৬৬৫ খ্রীঃ নবাব সায়েস্তা খাঁর সঙ্গে এই স্থানে আসিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। কবি 'অদ্ভুত আচার্য' উপাধি ধারণ করিলেও যে অদ্ভুত রামায়ণেরই অনুবাদ করিয়াছিলেন, এইরূপ ধারণা ভ্রমাত্মক। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন :

রামশঙ্কর

'বাল্মীকি বশিষ্ঠ আর অদ্ভুত গ্রন্থকার।
মহাভারত আদি পুরাণ প্রচার॥
এই সব গ্রন্থ শুনি শ্লোক অনুসারে।
পদবন্ধ করি কহে ভিষক শঙ্করে॥'

অতএব তাঁহার রচনায় বাল্মীকি রামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ এবং অদ্ভুত রামায়ণই শুধু নয়, মহাভারত এবং পুরাণের কাহিনীও গৃহীত হইয়াছে।

দ্বিজ লক্ষ্মণ কখন এবং বাঙলাদেশের কোন অঞ্চলে বর্তমান ছিলেন, তাহা বলিবার কোন উপায় নাই। কারণ তাঁহার রচিত পুঁথির বেশ পুরানো অনুলিপিই পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গ উভয় স্থান হইতেই উদ্ধার করা হইয়াছে। ড° সেন বলেন, 'কবি পূর্ববঙ্গের অথবা পশ্চিমবঙ্গের যে স্থানেরই হউন, তাঁহার যশ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যটি বঙ্গদেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে প্রসার লাভ করিতে নিশ্চয়ই কিছু সময় লাগিয়াছে। সুতরাং কবির জন্ম-সময় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পরে নহে, পূর্বে।' ড° সেন আরও অনুমান করেন যে কবি সম্ভবত অধ্যাত্ম রামায়ণের সমগ্র অংশই অনুবাদ করিয়াছিলেন। বন্দ্যঘটীয় লক্ষ্মণ, যিনি মহাভারতের কোন কোন পর্ব অনুবাদ করিয়াছিলেন, তিনি এবং দ্বিজলক্ষ্মণ একই ব্যক্তি কিনা বলা মুস্কিল।

দ্বিজ লক্ষ্মণ

'বুদ্ধাবতার' রামানন্দ ঘোষ সমগ্র রামায়ণের অনুবাদ করিয়াছিলেন কিনা জানা যায় নাই, তাঁহার রচিত পুঁথিতে লঙ্কাকাণ্ড পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। কবির ব্যক্তিগত পরিচয় এবং রচনাকাল-সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিবার উপায় নাই। গ্রন্থটির কাব্যোৎকর্ষও কিছু উল্লেখযোগ্য নয়, কিন্তু তৎসত্ত্বেও যে ইহা দৃষ্টি-আকর্ষণের যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে, তাহার কারণ, একদিকে ভণিতা-অংশে প্রদত্ত কবির ধর্মমত ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের কথা, অপর দিকে কবির আপনাকে 'বুদ্ধাবতার' বলিয়া প্রচার করিবার প্রচেষ্টা। দেশকে ম্লেচ্ছের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্যই কালী বুদ্ধদেবকে শাপ দিয়া আবার নরলোকে পাঠাইলেন এবং তিনিই 'রামানন্দ'-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—কবির কাব্যেই এই কাহিনীর পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি আত্মপরিচয় দিতে গিয়া কখনও আপনাকে 'ব্রাহ্মণ', কখনও 'শূদ্র' বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন।

বুদ্ধাবতার রামানন্দ ঘোষ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে নড়াইলের গঙ্গারাম দত্ত একখানি সুবৃহৎ রামায়ণ-পাঁচালী রচনা করেন। ইহা ছাড়া তিনি আরও তিনখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। দ্বিজ ভবানীনাথ অধ্যাত্মরামায়ণ-অবলম্বনে আপনার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তিনি প্রতিদিন গ্রন্থরচনার জন্য পৃষ্ঠপোষক রাজার নিকট হইতে দশমুদ্রা করিয়া দক্ষিণা লাভ করিতেন বলিয়া জানা যায়। কুচবিহারের রাজা হরেন্দ্রনারায়ণ যে রামায়ণখানি রচনা করিয়াছিলেন, তাহা অনেকখানি

অন্যান্য কবিগণ

মূলানুগ ছিল। তিনি ইহা ছাড়া আরও কোন কোন অনুবাদ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে অনেক কবি রামায়ণের অংশবিশেষের অনুবাদ রচনা করিয়াছিলেন। এইরূপ খণ্ডাংশের মধ্যে 'রায়বার'-জাতীয় কাহিনীর উপরই অধিকাংশ লেখকের পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, 'রায়বার'-জাতীয় রচনাগুলিকে অনুবাদ বলিবার কোন সার্থকতা নাই, কারণ এই ধরণের রচনা মূলে নাই, অপর কোন মূল হইতে ধরণটি গৃহীত হইবার পর কবিগণ স্বস্ব প্রতিভা অথবা কল্পনাসংযোগে ইহাদিগকে রূপদান করিয়াছেন। 'রায়বার' শব্দটির উৎপত্তি 'রাজদ্বার' হইতে। অঙ্গদ, বিভীষণ, কুম্ভকর্ণ, কালনেমি এমনকি শূর্পণখাকেও কবিরা রাজদ্বারে উপস্থিত করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে 'অঙ্গদের রায়বার'টিই সর্বাধিক জনপ্রিয় হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ অধিকাংশ কবিই শুধু অঙ্গদের রায়বার রচনা করিবার দিকেই ঝুঁকিয়াছিলেন। রায়বারের মধ্যে উক্তি-প্রত্যুক্তি বা বাদ-বিতণ্ডার মাধ্যমে অতি লঘু কৌতুক ও স্থূল হাস্যরস পরিবেষিত হইত বলিয়াই সম্ভবত সাধারণ পাঠক বা শ্রোতারা এই বিষয়ের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইতেন, কবিরাও উৎসাহ বোধ করিতেন। কোন কোন কবি হাস্যরসকে আরও ফেনিল করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে রায়বারে হিন্দী ভাষার মিশ্রণ ঘটাইয়াছেন। রায়বার অংশের ছন্দও সবিশেষ লক্ষণীয়—কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই অংশগুলি লঘুচপল ঢামালী বা ধামালী (আধুনিক কালের চতুর্মাত্রিক স্বরাঘাত-প্রধান বা ছড়ার ছন্দে) ছন্দে রচিত। নিম্নে এইরূপ রচনার দুই একটি উদাহরণ দেওয়া হইল :

রায়বার

অঙ্গদ রাবণের রাজসভায় উপনীত হইয়াছে ; রাবণ মায়া পাতিলেন, সভায় যাহারা উপস্থিত ছিল, সকলেই রাবণের রূপ ধারণ করিল।

'যেদিকে অঙ্গদ চাহে সেদিকে রাবণ।
দশমুণ্ড কুড়ি বাহু বিংশতি লোচন।'

একমাত্র ইন্দ্রজিতই ছিলেন স্বমূর্তিতে। অঙ্গদ তাই ইন্দ্রজিতের কাছেই জানিতে চাহিল,—এই অসংখ্য রাবণের মধ্যে কোন্‌টি তাহার পিতা ?—

'কোন্ বাপ দিগ্বিজয় কৈল তিনলোকে।
কোন্ বাপ কোথা গেল সংবাদ দে মোকে॥
কোন্ বাপ চেড়ী-অন্ন খাইল পাতালে।
কোন বাপ বন্ধ অর্জুনের অশ্বশালে॥' —ইত্যাদি।

উপর্যুক্ত পদগুলি কৃত্তিবাসী রামায়ণ হইতে আহৃত হইলেও এইগুলি মূলত কৃত্তিবাসের রচনা নহে বলিয়াই বিশ্বাস করা হয়। কবিরাজ ফকির-ভূষণের লঙ্কাকাণ্ড অথবা অঙ্গদ রায়বারের ভাষা হিন্দীমিশ্রিত। খোশাল শর্মা, রামনারায়ণ, মতিরাম প্রভৃতির রচনাও হিন্দীমিশ্রিত।—

'লঙ্কামোঙ্কা দেকে অঙ্গদ পালট্ ফিরকে আয়ে।
মগন হোকে নাচে অঙ্গদ রামকা দরশন পায়ে॥

—খোশাল শর্মা

কাশীনাথের 'কালনেমির রায়বার' লঘু ছন্দে হইলেও বিশুদ্ধ বাঙলায় লেখা।

'(যায় দেখ) ঘর পোড়াটা মরুক বেটা মায়া পাত গা তুমি।
সরোবরে স্নান করতে যাবে কুম্ভিরিণী॥
(ছলাকরে) পাঠায়ে দেব হুঁশার হবে (কি) কইব তোমার কাছে।
দেখছি ভালে তোর কপালে রাজ পাট্টা আছে॥'

এতদ্ব্যতীত দ্বিজ তুলসীর 'অঙ্গদ রায়বার', দ্বিজরামের 'বিভীষণ রায়বার' এবং মহানন্দ চক্রবর্তী, দ্বিজদুলাল, হটু শর্মা, দ্বিজ গঙ্গানারায়ণ, দ্বিজ পঞ্চানন প্রভৃতি বহু লেখকেরই বিভিন্ন পালা-পুঁথির সন্ধান পাওয়া যায়।

তরণীসেনবধ, লক্ষ্মণ-দিগ্বিজয়, শত্রুঘ্ন-দিগ্বিজয়, রামের স্বর্গারোহণ প্রভৃতি বিষয়-অবলম্বনেও বহু পালা-পুঁথি রচিত হইয়াছিল। কোন কোন কবি একাই হয়তো এইরূপ খণ্ড খণ্ড অনেক পুঁথি রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ভবানীদাসের নাম উল্লেখ করা চলে। উনি 'লক্ষ্মণ দিগ্বিজয়, শত্রুঘ্ন দিগ্বিজয়, রামের স্বর্গারোহণ' ইত্যাদি এবং রামায়ণের বিষয় ছাড়াও 'রাধাবিলাস,' 'গজেন্দ্রমোক্ষণ' আদি পালাও রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইনি সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমদিকেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

খণ্ড-কাহিনী

২. ঃ মহাভারত

জাতির মানস-মুক্তি ঘটিলে পর কী প্রবল বেগে তাহা আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, ইতঃপূর্বে আমরা তাহা দেখিয়াছি। এমনি এক অবস্থায় বাঙলা দেশে অনুবাদ সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য-সাহিত্য-আদি ভিন্নধর্মী রচনার যুগপৎ আবির্ভাব লক্ষ্য করা গিয়াছিল। কিন্তু ঐ

বিশেষ যুগটিতে (চৈতন্য-পূর্ব যুগে) আমরা অনুবাদ শাখার দুইটি ধারা-সম্বন্ধেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখিয়াছিলাম, কারণ রামায়ণ-অনুবাদক কৃত্তিবাস এবং ভাগবত-অনুবাদক মালাধর বসু চৈতন্য-পূর্বকালে বর্তমান ছিলেন। পক্ষান্তরে অপর ধারা মহাভারত শাখার অনুবাদ অতি বাস্তব এবং সঙ্গত কারণেই কিছুটা বিলম্বিত হইয়াছিল। রামায়ণ এবং মহাভারত উভয়ই মহাকাব্য এবং জাতির জীবনে উভয় কাব্যই সমান শ্রদ্ধার আসন লাভ করিয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও পরিবেশ তথা দেশ-কালের পরিপ্রেক্ষিতে বস্তু-মাত্রেরই মূল্যমানের পরিবর্তন ঘটিতে পারে। মনোভূমি উভয় কাব্যকে একই কালে গ্রহণ করিবার পক্ষে উপযোগী অথবা প্রস্তুত ছিল না বলিয়াই রামায়ণ-রচনার অন্তত শতাধিক বৎসর পর মহাভারতের অনুবাদ-প্রচেষ্টা সুরু হইয়াছিল। বলা বাহুল্য রামায়ণ এবং মহাভারতের মৌলিক পার্থক্যের জন্যই ইহাদের মূল্যমানের পার্থক্য অনুভূত হইয়াছিল।

মহাভারতের পশ্চাদ্বর্তিতা

রামায়ণে রামচন্দ্রের বনবাস এবং রাম-রাবণের যুদ্ধ বর্ণিত হইলেও রামায়ণ প্রকৃত পক্ষে গার্হস্থ্য-জীবনের কাব্য। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ উক্তিটি স্মরণ করা যাইতে পারে—'রামায়ণের মহিমা রাম-রাবণের যুদ্ধকে আশ্রয় করিয়া নাই, সে যুদ্ধ ঘটনা রাম ও সীতার দাম্পত্য-প্রীতিকেই উজ্জ্বল করিয়া দেখাইবার উপলক্ষ্য মাত্র।...আমাদের দেশে গার্হস্থ্য আশ্রমের যে অত্যন্ত উচ্চ স্থান ছিল, এই কাব্য তাহাই সপ্রমাণ করিতেছে।...গৃহাশ্রম ভারতবর্ষীয় আর্য সমাজের ভিত্তি। রামায়ণ সেই গৃহাশ্রমের কাব্য।' মৌশুমী আবহাওয়ার দেশ, পলিমাটির দেশ বাঙলা তাই এত সহজে রামায়ণের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। 'ইহাতে যে সৌভ্রাত্র, যে সত্যপরতা, যে পাতিব্রত্য, যে প্রভুভক্তি বর্ণিত হইয়াছে' তাহাই বাঙালী-মনের নিকট গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। এই কারণেই বাঙালীর মানসজাগৃতির উষালগ্নেই বাঙলাদেশে রামায়ণ-চর্চা সুরু হইয়াছিল। মহাভারতকে স্ব-হৃদয়ে গ্রহণ করিবার জন্য তখনও পর্যন্ত আরও কিছুটা প্রস্তুতির অবকাশ ছিল।

রামায়ণের আকর্ষণ

মহাভারতের প্রধান রস বীররস, ইহাতেও গৃহধর্মের চিত্র আছে বটে, কিন্তু তাহা কখনও প্রাধান্য লাভ করিয়া উঠিতে পারে নাই, তাহা একান্ত-ভাবেই অনুষঙ্গ হইয়া রহিল। ক্ষাত্রধর্ম বীরধর্মকে বাদ দিয়া মহাভারতকে কখনও কল্পনা করা যায় না। এমন কি প্রধান নারীচরিত্রগুলিও বরাবর

ক্ষাত্রধর্মের মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ দ্রৌপদীর কথা উল্লেখ করা চলে। পঞ্চপাণ্ডবের এক পত্নী দ্রৌপদী—দ্রৌপদীকে লইয়া পঞ্চ ভ্রাতার মধ্যে বিচিত্র সম্পর্কের টানা-পোড়েনে কী এক অদ্ভুত রোমান্টিক কাব্য নির্মিত হইতে পারিত! অথচ মহাভারতকার সেই দিকেই গেলেন না, তিনি দ্রৌপদীকে যেন ষষ্ঠ পাণ্ডব করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন। বস্তুত ক্ষাত্রধর্মের বিচারে দ্রৌপদী পাণ্ডবদের মধ্যেও কোন কোন পাণ্ডব অপেক্ষা অনেক উগ্রপন্থী। আসলে, গোটা মহাভারতের কেন্দ্রীয় ঘটনা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ; অপর সকল কাহিনী তাহার পোষকতা করিয়াছে মাত্র। অতএব মহাভারতের মূল রসের স্বীকৃতি বাঙালীর পক্ষে সহজসাধ্য হয় নাই। এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা উল্লেখ করা চলে। পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকগণ প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে প্রধানত রাজ-দরবারের আওতায়ই মহাভারতের অনুবাদ শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। আলোচ্য সূত্রের সহায়তায় এই ঘটনাটির তাৎপর্য সহজেই বিশ্লেষণ করা চলে। সমসাময়িক কালের রাজন্যবর্গ—হিন্দু অথবা মুসলমান—স্বভাবতই যুদ্ধ-বিগ্রহের সম্ভাবনার মধ্য দিয়াই কাল কাটাইতেন। মহাভারতের বীররস তাহাদের মনে যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করিত, তাহার জন্যই তাহাদের পক্ষে মহাভারত-অনুবাদের প্রতি লুব্ধ হইবার অবকাশ ছিল। রামায়ণেও যুদ্ধের বর্ণনা আছে,—কিন্তু সেই যুদ্ধ অনেকটা বর্বর যুগের,--গাছ-পাথরের লড়াই। পক্ষান্তরে মহাভারতের যুদ্ধ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত, অধিকন্তু তাহাতে কূটনীতির সম্পর্কও বিজড়িত। অতএব সমসাময়িক রাজন্যবর্গ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মধ্যেই স্ব-কালের চিত্র দেখিতে পাইতেন। এই সমস্ত কারণে বাঙলাদেশে মহাভারত-অনুবাদ-প্রচেষ্টা অনুকূল পরিবেশ-সৃষ্টির অপেক্ষায় কিছুটা বিলম্বিত হইয়াছিল।

মহাভারতের বৈশিষ্ট্য

মহাভারতের সঙ্গে রামায়ণের যে মৌলিক পার্থক্যের কথা ইতঃপূর্বে বলা হইয়াছে, তাহা মূল সংস্কৃত গ্রন্থ-সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। পরবর্তী কালে যখন এইগুলি ভাষান্তরিত হইল, তখন অবশ্যই দেশ-কালের পরিপ্রেক্ষিতে তাহাদের রূপান্তর ঘটিয়াছে। আলোচ্য মহাভারত-প্রসঙ্গটি বিশ্লেষণ করিলেই উক্তিটির যাথার্থ্য উপলব্ধি করা যাইবে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে মহাভারত মূলত বীররসের কাব্য,—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধই ইহার প্রধান লক্ষ্য, অন্য সকল ধারাই এই সমুদ্রের অভিমুখী হইয়া প্রবাহিত হইয়াছে। ভক্তি-বাদের দেশ বাঙলায় বীররস অধিকাংশে ভক্তিরসে পরিণত হইয়াছে। মূল

মহাভারতে কৃষ্ণের ভূমিকা নগণ্য না হইলেও খুব গুরুত্বপূর্ণ নহে, কিন্তু বাঙলা মহাভারতে যেন কৃষ্ণের মাহাত্ম্য-বর্ণনাই প্রধান বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যেখানেই কৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, সেইখানেই বাঙালী কবি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছেন। মূল মহাভারতে কৃষ্ণ আত্মহারা হইয়া ভীষ্ম-বধার্থে উদ্যোগী হইলে ভীষ্ম চারি চরণের মিতভাষণে কৃষ্ণকে বন্দনা করিয়াছেন, আর মহাভারতের অনুবাদক এই উপলক্ষে দীর্ঘ কৃষ্ণ-প্রশস্তির অবতারণা করিয়াছেন। আবার মূলে যেখানে কবি কুরুক্ষেত্রের বর্ণনায় ভয়ঙ্কর রস পরিবেষণের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ বিবৃতি দিয়াছেন, বাঙালী কবি সেখানে সংক্ষিপ্ততম ভাষণে তাঁহার কর্তব্য সারিয়াছেন। মহাভারতে নাই, এইরূপ বহু ঘটনাই বাঙালীর কাব্যে স্থান লাভ করিয়াছে। উদ্দেশ্য – ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য-প্রদর্শন। শ্রীকৃষ্ণকে বিদুরের খুদ প্রদান, রাজসূয় যজ্ঞে বিভীষণের অপমান, পারিজাতহরণ বা অর্জুনকে দুর্যোধনের মুকুট দান-আদির পশ্চাতে শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনই কবির উদ্দেশ্য। সত্যভামার তুলাব্রতের কাহিনীতে চৈতন্য-পরবর্তী যুগের ভক্তিবাদের প্রভাবের পরিচয় তো সুস্পষ্ট,। দ্রৌপদীর চরিত্র-অঙ্কনে বাঙালীকবি যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদীকে যে রূপে দাঁড় করাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে আমরা বাঙালীবধূর মূর্তিতে দেখিয়া পুলকিত হইলেও তাঁহার আসল পরিচয়টি একেবারেই চাপা পড়িয়া গিয়াছে। দ্রৌপদীর যে তেজোদ্দীপ্ত বজ্রগর্ভ কাদম্বিনীতুল্য রূপ-দর্শনে অতি বড় বীর পুরুষের মনেও বিভীষিকার সৃষ্টি হইতে পারিত, সেই দ্রৌপদীকে বঙ্গবালায় রূপান্তরিত করিবার পশ্চাতে সমসাময়িক কবির বাঙালীমনটিই সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ এবং তজ্জাত কূটনৈতিক বাদ-বিতণ্ডাও বাঙালীকবির নিকট হৃদয়গ্রাহী বলিয়া বিবেচিত না হওয়ায় বাঙলা মহাভারতে 'রাজধর্মানুশাসন পর্ব, আপদ্ধর্ম পর্ব ও অনুশাসনপর্ব' বর্জিত হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে, প্রথমদিকে হৃদয়-ধর্মী বাঙালীর নিকট মহাভারত উপেক্ষিত হইলেও, পরে প্রয়োজনের অনুরোধে বাঙালী কবি যখন মহাভারত-অনুবাদে নিরত হইলেন, তখন আপনার রুচিমাফিক ইহাকে ঢালিয়া সাজিয়া লইলেন। মূলের অনেকখানি বর্জিত হইয়াছে, নূতন কাহিনী সংযোজিত হইয়াছে, অধিকন্তু চরিত্রের পরিকল্পনায়ও কবি আপন স্বাতন্ত্র্য-বোধের পরিচয়দান করিয়াছেন। ফলত বাঙলা মহাভারতকে অনুবাদ-কাব্য বলিবার বিশেষ কোন সার্থকতা নাই—বস্তুত ইহা মৌলিক কাব্যই বটে।

বাঙলা মহাভারতে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী

মহাভারত কি অনুবাদ?

বাঙলাভাবায় রচিত মহাভারতের সংখ্যা অপরিমিত। ডঃ সুকুমার সেন প্রায় ৭৬ জন কবির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইঁহারা সকলেই যে গোটা মহাভারত অনুবাদ করিয়াছিলেন তাহা নহে। ইঁহাদের অনেকেই পর্ব বা পর্বাংশেরই মাত্র অনুবাদ করিয়াছেন। লিপিকরদের কাহারও কাহারও নামও এইরূপ অনুবাদকদের তালিকায় ঢুকিয়া পড়া বিচিত্র নহে। তাহা ছাড়া বিভিন্ন লেখকের রচনা একই গ্রন্থের অঙ্গীভূত হইয়াছে, তেমন ঘটনাও বিরল নহে। বস্তুত, যাঁহারা সম্পূর্ণ বা আংশিক মহাভারত রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অল্প কয়জন কবির রচনাই আলোচিত হইবার দাবি রাখে, অপর সকলের রচনা গতানুগতিক, অকাব্য অথবা চর্বিতচর্বণ মাত্র।

অনুবাদের প্রাচুর্য

কবীন্দ্র পরমেশ্বরঃ বাঙলা মহাভারতের আদি কবি কে ছিলেন, এই প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক মীমাংসা আজও হয় নাই। তবে অন্তত চৈতন্য-সমসাময়িক কালেই কবীন্দ্র পরমেশ্বর নামে এক কবি যে সমগ্র মহাভারতকাব্যের সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। সম্ভবত ইনিই বাঙলাভাষায় প্রথম মহাভারতকার। সুলতান হোসেন শাহের লস্কর (সেনাপতি) পরাগল খান যুদ্ধার্থে চাটিগ্রাম (চট্টগ্রাম) ও ত্রিপুরায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। যুদ্ধ জয় করিয়া অতঃপর তিনি এইস্থানেই স্থায়িভাবে বসতি স্থাপন করেন। এই পরগলখাঁই (ইনি জাতিতে হিন্দু ছিলেন কি মুসলমান ছিলেন, তা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভবপর নহে) দিনেকের মধ্যে মহাভারত শুনিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলে কবীন্দ্র সংক্ষিপ্ত মহাভারত রচনা করেন :

আদি অনুবাদ কে?

'এহি সব কথা কহ সংক্ষেপিয়া।
দিনেকে শুনিতে পারি পাঁচালী রচিয়া॥
তাঁহার আদেশমাল্য মস্তকে ধরিয়া।
কবীন্দ্র পরমযত্নে পাঁচালী রচিয়া॥'

কবীন্দ্র সংক্ষেপে পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন বটে, তবে তাহা 'দিনেকে' শুনিবার মত এত সংক্ষিপ্ত হয় নাই। প্রকৃত পক্ষে অতিশয় সীমিত আয়তনের মধ্যেই কবীন্দ্র মহাভারতের যাবতীয় প্রধান কাহিনী সন্নিবিষ্ট করিয়া অসাধারণ কৃতিত্বেরই পরিচয় দান করিয়াছেন। ফলত, ইহা অবশ্য বর্ণনামূলক কাহিনীতেই পর্যবসিত হইয়াছে।

কবির ব্যক্তিগত পরিচয়-সম্বন্ধেও খুব নিশ্চিতভাবে কিছু বলিবার উপায়

নাই। কেহ কেহ মনে করেন যে কবির নাম 'পরমেশ্বর', উপাধি 'কবীন্দ্র'। কিন্তু ড° সেন মনে করেন যে কবির নাম 'কবীন্দ্র'; 'পরমযত্নে' কথাটি লিপিকর-প্রমাদে 'পরমেশ্বরে' পরিণত হইয়াছে। ড° গৌরীনাথ শাস্ত্রীর মতে কবীন্দ্র ছিলেন কোচবিহার-রাজ নরনারায়ণ দেবের মন্ত্রী। ইঁহার নাম ছিল 'বাণীনাথ', রাজমন্ত্রী হইয়া ইনি 'কবীন্দ্রপাত্র' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। আসাম গৌরীপুরের রাজবংশ দাবী করেন যে তাঁহারা উক্ত কবীন্দ্র পাত্রেরই অধস্তন পুরুষ। যাহাই হউক, কবীন্দ্র যে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্তমান থাকিয়া কাব্যখানি রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

কবি-পরিচয়

কবীন্দ্র-রচিত কাব্যের নাম 'বিজয়পাণ্ডবকথা' বা 'পাণ্ডববিজয় কথা' অথবা 'ভারত-পাঁচালী'। কাব্যখানি সংক্ষিপ্ত বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ। কেহ কেহ অনুমান করেন যে কবীন্দ্র-মহাভারত সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই পরাগলখানের মৃত্যু হওয়ায় কবির প্রচেষ্টাও খণ্ডিত হয়। অতঃপর পরাগলপুত্র ছুটিখানের আদেশে গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। কিন্তু এই অনুমান ভ্রান্ত। বস্তুত পরাগলখান জীবিত থাকিতেই কবীন্দ্র অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। এই হেতু গ্রন্থের অপর প্রচলিত নাম 'পরাগলী মহাভারত।'

পব্যগলী মহাভাবত

পরাগলী মহাভারতে আঠারোটি পর্ব বর্তমান থাকিলেও ইহার 'অশ্বমেধ পর্ব'টি শ্রীকরনন্দীর ভণিতা-যুক্ত। ইহা হইতেই অনেকে অনুমান করিয়াছিলেন যে কবীন্দ্র সমগ্র মহাভারতের অনুবাদ করেন নাই, শ্রীকর নন্দী গ্রন্থকে সমাপ্ত করিয়াছিলেন। এই সূত্র ধরিয়াই আবার কেহ কেহ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে কবীন্দ্র-উপাধিধারী কবির প্রকৃত নাম শ্রীকর নন্দী। নিম্নে শ্রীকর নন্দী-সম্বন্ধীয় আলোচনায় এই সমস্যাটির উপর আলোকপাত করা হইবে।

শ্রীকর নন্দী ঃ একই পুঁথির ভণিতায় 'কবীন্দ্র' এবং 'শ্রীকর (শ্রীকরণ) নন্দী'র নাম ব্যবহৃত হওয়ায় এক সময় কোন কোন ঐতিহাসিকের ধারণা হইয়াছিল যে, শ্রীকরণ নন্দী নামক ব্যক্তিই 'কবীন্দ্র' ছদ্মনামে বা উপাধিতে মহাভারতের কোন কোন পর্ব অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু একই বিষয়ের উপর পৃথক ভণিতাযুক্ত পদ-প্রাপ্তির ফলেই বোঝা যায় যে প্রাগুক্ত অনুমান ভিত্তিহীন। বস্তুত কবীন্দ্রের মতই শ্রীকর নন্দীর ভণিতাযুক্ত অনেকগুলি পর্বেরই সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

পরিচয়

অধিকন্তু শ্রীকর নন্দীর পুঁথিতেই এমন কাহিনীর উল্লেখ বর্তমান, যাহা হইতে উভয়ের ভিন্নত্বে কোন সংশয়ের অবকাশ থাকে না।

পরাগল খানের মৃত্যুর পর তৎপুত্র 'ছুটিখান' (ছোটি খান) জৈমিনি মহাভারতের (সম্ভবত কবীন্দ্র-কৃত অনুবাদ) অশ্বমেধ পর্ব-কাহিনী শুনিয়া শ্রীকর নন্দীকে ব্যাস-কৃত উক্ত পর্বের অনুবাদ করিতে আদেশ করিলেন। কারণ, তিনি শুনিয়াছেন যে ব্যাসকৃত রচনা আরও মধুর। পিতা পরাগল খান যেমন দেশীয় ভাষায় মহাভারত অনুবাদ করাইয়া সুকীর্তি অর্জন করিয়াছেন, পুত্রও সেই পদাঙ্কই অনুসরণ করিতে চাহিয়াছিলেন।

'দেশী ভাষা কহি কথা রচিয়া পয়ার।
সঞ্চরউ কীর্তি মোর সকল সংসার॥'

ডঃ সুকুমার সেন অনুমান করেন যে শ্রীকর নন্দী সম্ভবত সমগ্র মহাভারতেরই অনুবাদ করিয়াছিলেন। কবীন্দ্রের গ্রন্থ ছিল জৈমিনীয় মহাভারতের অনুসরণে রচিত এবং সংক্ষিপ্ত; পক্ষান্তরে শ্রীকর নন্দীর গ্রন্থ ছিল বৈশম্পায়ন বা সঞ্জয়-মহাভারতের অনুসরণে রচিত এবং বিস্তৃততর। ছুটিখানের আগ্রহে শ্রীকর নন্দীর গ্রন্থটি রচিত হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে 'ছুটিখাঁর মহাভারত' নামেও অভিহিত করা হয়। শ্রীকর নন্দীর মহাভারতে অনুশাল্ব, চন্দ্রহাস, নীলধ্বজ-জনা, প্রমীলা, অর্জুন, যৌবনাশ্ব, বভ্রুবাহন, হংসধ্বজ প্রভৃতির কাহিনী সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

ছুটিখাঁর মহাভারত

বিজয়-পণ্ডিত ঃ এক সময় মহাভারতের আদি অনুবাদকদিগের মধ্যে বিজয় পণ্ডিতকেও একজন বলিয়া গ্রহণ করা হইত। ৺নগেন্দ্র নাথ বসু সাহিত্য পরিষদ হইতে 'বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত' নামে একখানা গ্রন্থও সম্পাদনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে পশ্চিমবঙ্গবাসী 'বিজয় পণ্ডিত'ই মহাভারতের আদি অনুবাদক এবং পূর্ববঙ্গে এই গ্রন্থই 'পরাগলী মহাভারত'-রূপে পরিচিত হইয়াছে। ডঃ মণীন্দ্র মোহন বসু ইহার বিপরীত কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে 'কবীন্দ্রের রচনা প্রয়োজনমত গ্রহণ ও বর্জন করিয়া ব্যাস-ভারতের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টায় বিজয় পণ্ডিতের গ্রন্থের উৎপত্তি হইয়াছে।' পক্ষান্তরে ডঃ সুকুমার সেন বলেন, 'কবীন্দ্রের 'বিজয়-পাণ্ডবকথা' অজ্ঞ লিপিকরদের হস্তে পড়িয়া 'বিজয় পণ্ডিত কথা' হইয়াছে, এবং তাহা হইতেই বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতের উৎপত্তি।' বস্তুত কবীন্দ্রের মহাভারতের প্রায় সর্বত্রই এইরূপ পুষ্পিকা পাওয়া যায়,—

'বিজয়পাণ্ডব কথা অমৃতলহরী।
শুনিলে অধর্ম খণ্ডে পরলোকে তরি।'

অতএব ইহা হইতে লিপিবিভ্রাটে গ্রন্থের প্রায় সর্বত্রই 'বিজয় পণ্ডিতে'র ভণিতা পাওয়া যাইতে পারে। কবীন্দ্রের মহাভারতই যে বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতে পরিণত হইয়াছে, গ্রন্থের পাঠ মিলাইলেও তাহা উপলব্ধ হইবে। অতএব বিজয়-পণ্ডিতের অস্তিত্বই অস্বীকৃত হইল।

বিজয় পণ্ডিতের অস্তিত্বহীনতা

সঞ্জয়ঃ বাঙলা মহাভারতের ইতিহাসে 'সঞ্জয়' এক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ড° দীনেশ সেন সঞ্জয়কেই আদি মহাভারত-কার বলিয়া বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ড° মণীন্দ্র বসুও সঞ্জয়ের অস্তিত্বে বিশ্বাসী এবং মনে করেন যে, কবীন্দ্রের রচনায়ই সঞ্জয়ের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। কারণ পরাগল খান যে কবীন্দ্রের মহাভারত শুনিবার পূর্বেই অপর মহাভারত শুনিয়াছিলেন, কবীন্দ্রের রচনায় এইরূপ উল্লেখ বর্তমান। অবশ্য বিরোধী পক্ষ অনুমান করেন যে পরাগল খান মহাভারত পাঠ শোনেন নাই, মহাভারত-কাহিনী হয়তো কাহারও মুখে শুনিয়াছিলেন। অতএব কবীন্দ্রের উক্তিতে পূর্বোক্ত মহাভারতের অস্তিত্বের কথা অলীক। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ই প্রথম সিদ্ধান্ত করেন যে সঞ্জয় নামে বা ভণিতায় কোন বাঙালী কবি ছিলেন না। বস্তুত মহাভারতের পৌরাণিক সঞ্জয়, যিনি ব্যাসদেবের প্রসাদে দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকট কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাঁহার নামই ভণিতায় ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু এই অভিমতের বিরুদ্ধে দুইটি যুক্তি প্রবল: ১. কোন কোন ভণিতায় পাওয়া যায় 'সঞ্জয়ে কহিল কথা বাখানে সঞ্জয়'—এখানে স্পষ্টতই পৌরাণিক সঞ্জয় ছাড়াও অপর এক সঞ্জয় (গ্রন্থকার)-এর উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। ২. সঞ্জয় ভণিতায় যে আত্ম-পরিচয় দান করিয়াছেন 'দেব-অংশে উৎপত্তি ব্রাহ্মণ কুমার' অথবা 'ভরদ্বাজ উত্তম বংশ জন্ম সাধুকুলে।'—এই সঞ্জয় কি মহাভারতের পৌরাণিক সঞ্জয় হইতে পারেন? এই প্রসঙ্গে আর একটি সূত্রের উল্লেখ প্রয়োজন। একটি মহাভারতের পুঁথির ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে—

সমস্যা

'হরিনারায়ণদেব দীন হীন মতি।
সঞ্জয়াভিমানে কৈলা অপূর্ব ভারতী॥'

হরিনারায়ণদেব 'সঞ্জয়' উপনামে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।—এই সমস্ত

প্রমাণ-সত্ত্বেও সঞ্জয়কে উড়াইয়া দিবার কোন যুক্তি-সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ড° সুকুমার সেনও মনে করেন যে 'সঞ্জয় কোন বাঙালী কবির নাম মনে করিবার কারণ নাই।' কারণ তাঁহার মতে একজন সংগ্রাহকই বিভিন্ন কবির বিভিন্ন রচনায় জোড়াতাড়া দিয়া এই গ্রন্থখানি সঙ্কলন করিয়াছেন। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে সঞ্জয়-রচিত বলিয়া কথিত মহাভারতে বহু লেখকেরই ভণিতা পাওয়া যায়। কিন্তু প্রশ্ন এই—প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের কোন্ গ্রন্থই বা প্রক্ষেপ হইতে মুক্ত? অতএব শুধু প্রক্ষেপ-বাহুল্যের জন্যই কোন কবির অস্তিত্বকে একেবারে অস্বীকার করায় চরমপন্থাই গ্রহণ করা হয়। ফলত সঞ্জয়-সমস্যার উপর নূতন কোন সূত্র হইতে আলোক-পাত না হওয়া পর্যন্ত এই সম্বন্ধে শেষ কথা বলা সম্ভবপর নয়।

সঞ্জয় মহাভারত যিনিই রচনা করিয়া থাকুন, সঞ্জয় মহাভারতে বহু নূতন আখ্যান এবং বহু আখ্যানের বিস্তৃততর বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ড° মণীন্দ্রবসু অনুমান করেন যে সঞ্জয় মহাভারতস্থ এই সকল নূতন কাহিনী জৈমিনি মহাভারত হইতে গৃহীত। কিন্তু জৈমিনীয় মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব-ব্যতীত অপর পর্বগুলি অপ্রাপ্য-বিধায় ড° বসুর অনুমানের যাথার্থ্য নির্ধারণ সম্ভবপর নহে। পরীক্ষিৎকে দংশন-কারী তক্ষক পরীক্ষিতেরই শ্বশুর, মহী-নামক বানরের শান্তনু-রূপে জন্মগ্রহণ, গান্ধারীর দ্বাদশবর্ষ গর্ভধারণ, খাণ্ডবদাহনকালে নাগিনী এবং তাহার পুত্রের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ—ইত্যাদি অভিনব কাহিনী সঞ্জয়-ভারতেই পাওয়া যায়।

বৈশিষ্ট্য

রামচন্দ্র খানঃ ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়েই মহাভারত-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এইরূপ একজন কবি রামচন্দ্র খান। রামচন্দ্র খান জৈমিনীয় মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার যে দুইখানি পুঁথি পাওয়া যায়, তাহার আত্মপরিচয়শীর্ষক অংশে রীতিমত গোলযোগ দেখা যায়। একখানি পুঁথিতে পাওয়া যায় যে কবি রাঢ়দেশের দণ্ডসিমলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন; তিনি জাতিতে কায়স্থ, পিতার নাম কাশীনাথ এবং মাতা পুণ্যবতী। অপর গ্রন্থমতে কবি ভাগীরথী-তীরবর্তী জঙ্গিপুর সহরবাসী। তাঁহার জন্ম ব্রাহ্মণ কুলে, পিতার নাম মধুসূদন, মাতা পুণ্যবতী। গ্রন্থের রচনাকাল 'শাকেন্দু বেদামুনিষে যুগান্তে পুরাণ'—ইহার নানা রকম অর্থ হইতে পারে। যাহাই হউক ঐ তারিখ ১৫৩০ খ্রীঃ—১৫৫৪ খ্রীঃ-র মধ্যেই পড়ে। অতএব কবি এই কালের মধ্যেই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। সমসময়েই নিত্যানন্দের অপমানকারী রামচন্দ্র খান এবং

নীলাচলগামী চৈতন্যদেবের সহায়ক রামচন্দ্রখান নামক ব্যক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। উঁহারা অভিন্ন ব্যক্তি কিনা বলা সম্ভব নহে; আবার ইহাদের সঙ্গে মহাভারত-রচয়িতা রামচন্দ্র খানের কোন সম্পর্ক আছে কিনা, তাহাও জানিবার উপায় নাই।—রচনার দিক হইতে রামচন্দ্রখানের মহাভারতের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নাই। রচনার ভাষায় কোন কোন স্থলে প্রাচীনত্বের চিহ্ন পাওয়া যায়। অংশ-বিশেষের বাস্তব সরসতাও উপভোগ্য।

অনিরুদ্ধ রামসরস্বতী: কোচবিহার কামতা রাজসভায় কয়েক-শতাব্দী যাবৎ মহাভারত-রচনা-প্রচেষ্টা চলিয়াছিল বলিয়া জানা যায়। রাজা বিশ্বসিংহ বা বিশু কোঁচ-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কবি পীতাম্বর ১৫৪৫ খ্রীঃ 'নল-দময়ন্তী' রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। তারপর তাঁহার পুত্র শুক্লধ্বজ বা প্রসিদ্ধ চিলারায়ের প্রবর্তনায় বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত অনিরুদ্ধ রামসরস্বতী মহাভাবতের কয়েকটি পর্বের অনুবাদ করেন। ইহাদের মধ্যে বনপর্ব, উদ্যোগপর্ব ও ভীষ্মপর্ব প্রধান। অতঃপর তৎপুত্র গোপীনাথ পাঠক দ্রোণ পর্ব পর্যন্ত অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ-কার্য পরবর্তী কয়েক পুরুষ যাবৎই চলিয়াছিল মনে হয়।

দ্বিজ রঘুনাথ: দ্বিজ রঘুনাথ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। তিনি অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার খণ্ডিত আত্মপরিচয় হইতে জানা যায় যে উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দ-দেবের রাজসভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কবি স্বপ্রণীত কাব্য শুনাইয়া-ছিলেন। ১৫৬৭ বা ১৫৬৮ খ্রীঃ মুকুন্দদেব শত্রুহস্তে নিহত হইয়াছিলেন, অতএব কবি ইহার পূর্বেই কাব্যটি সমাপ্ত করিয়াছিলেন, অনুমান করা চলে। প্রচলিত কাশীরাম দাসের মহাভারতের সঙ্গে রঘুনাথ দাসের বিস্ময়কর সাদৃশ্য-দর্শনে অনুমিত হয় যে পরবর্তীকালে একের রচনা অপরের গ্রন্থে প্রবিষ্ট হইয়া থাকিতে পারে। তবে রঘুনাথ জৈমিনির আদর্শে কাব্যটি রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া রঘুনাথের রচনা কোন কোন বিষয়ে অতি বিস্তৃত। রচনায় কবির সংস্কৃত-ভাষাভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়।

কাশীরাম দাস: কাশীরাম দাস মহাভারতের আদি অনুবাদক না হইলেও শ্রেষ্ঠ অনুবাদক। বস্তুত বহুতর মহাভারত অনূদিত এবং প্রকাশিত হইলেও সমগ্র বাঙলাদেশে একমাত্র কাশীরাম দাসের কাব্যই সুপ্রচারিত আছে। গবেষক এবং অনুসন্ধিৎসু-ব্যতীত সাধারণ পাঠকের সঙ্গে অপর

কোন মহাভারতের পরিচয় থাকারও সুযোগ নাই।—কাশীরাম দাস ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকেই তাঁহার কাব্য রচিত হইয়াছিল।

পরিচয়

কাশীরাম দাস তাঁহার কাব্যে যে আত্মপরিচয় দান করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে কবি বর্ধমান জেলার ইন্দ্রাণী পরগণার সিঙ্গিগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কমলাকান্ত, পিতামহ সুধাকর। কবিরা তিনভাই—কৃষ্ণদাস বা কৃষ্ণকিঙ্কর জ্যেষ্ঠ, মধ্যম কাশীদাস স্বয়ং এবং কনিষ্ঠ গদাধর। তিন ভ্রাতাই ছিলেন কবি। কনিষ্ঠ ভ্রাতার কাব্যে যে আত্মপরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে কাশীদাসের উক্তি সমর্থিত হইয়াছে। কাশীরাম পরবর্তী কালে নীলাচলে গিয়া বসবাস করিয়াছিলেন, এইরূপ অনুমান করা হয়।

কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতে একটি প্রবাদ বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে,—

আদি সভা বন বিরাটের কতদূর।
ইহা রচি কাশীদাস গেল স্বর্গপুর॥
ধন্য হইল কায়স্থকুলেতে কাশীদাস।
তিন পর্বে ভারত যে করিল প্রকাশ॥

প্রবাদটি সত্য হইলে স্বীকার করিতে হয় যে কাশীরাম দাস আদিপর্ব, সভা-পর্ব, বনপর্ব এবং বিরাট পর্বের অংশবিশেষ রচনা করিবার পর পরলোক গমন করেন। তাঁহার এই স্বর্গপুর-গমনকে নীলাচল-গমন বলিয়া অভিহিত করিয়া কেহ কেহ এই প্রবাদটির যাথার্থ্য-সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। কিন্তু বিভিন্ন পুঁথিতে প্রাপ্ত সূত্র হইতে জানা যায় যে কাশীরামের ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম দাস জ্যেষ্ঠ-তাতের আদেশে অসমাপ্ত মহাভারত সম্পূর্ণ করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

গ্রন্থকর্তা কে কে

নন্দরাম দাসে বলে শুন শ্যাম রায়।
আমারে অভয় প্রভু দেহ যমদায়॥
জ্যেষ্ঠতাত কাশীদাস পরলোক-কালে।
আমারে ডাকিয়া বলিলেন করি কোলে॥
শুন বাপু নন্দরাম আমার বচন।
ভারত অমৃত তুমি করহ রচন॥

কোন কোন পুঁথিতে আবার নন্দরাম দাস আপনাকে কাশীরামের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

দ্বিজ পদরজ লইয়া কাশীর নন্দন।
জনকের আজ্ঞামত করিল রচন॥

যাহা হউক, এই নন্দরাম সমগ্র মহাভারত অনুবাদ করিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। হয়তো ইনি উদ্যোগপর্ব এবং দ্রোণপর্ব-পর্যন্তই অনুবাদ করিয়াছিলেন। কাশীরামদাসের গ্রন্থের শান্তিপর্ব কৃষ্ণানন্দ বসু-কর্তৃক, স্বর্গারোহণ পর্ব জয়ন্তদাস-কর্তৃক এবং স্ত্রীপর্ব সম্ভবত নিত্যানন্দ ঘোষ-কর্তৃক রচিত হইয়াছিল। দ্বৈপায়নদাস-রচিত বনপর্ব, গদাপর্ব এবং সভাপর্বের পুঁথির সহিত কাশীরামদাসের গ্রন্থের যথেষ্ট সাদৃশ্য বর্তমান। অসম্ভব নহে, কাশীরাম দাসের মহাভারতের এই পর্বগুলি দ্বৈপায়ন দাস রচনা করিয়াছিলেন। এই 'দ্বৈপায়ন দাস কোন কবির নাম-ভণিতা বলিয়া বোধ হয় না' —ডঃ সেন এইরূপ অনুমান করেন। কিন্তু একাধিক ক্ষেত্রে দ্বৈপায়নদাস আপনাকে কাশীরামদাসের পুত্র বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

দ্বৈপায়ন দাসে বলে কাশীর নন্দন।
এতদূরে পাণ্ডবের স্বর্গ আরোহণ॥

অতএব দ্বৈপায়ন দাসের অস্তিত্বকে উড়াইয়া না দিয়া প্রবলতর কোন প্রমাণের অভাবে তাঁহাকে আপাতত আমরা কাশীরামের পুত্র বলিয়াই অভিহিত করিতে পারি।

প্রাগুক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টতই বোঝা যাইতেছে যে, কাশীরামদাসের নামে প্রচারিত মহাভারত বহুজনের সমবেত প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। অতএব সমগ্র গ্রন্থের কৃতিত্বের বা অকৃতিত্বের দায়ভাগী কাশীরাম নহেন। তথাপি আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা গ্রন্থকর্তারূপে কাশীরামদাসের কথাই উল্লেখ করিব।

বাঙলাভাষায় রচিত মহাভারতগুলির মধ্যে কাশীরামদাসের মহাভারতই সম্পূর্ণতা এবং সার্থকতা লাভ করিয়াছে। সাধারণভাবে কাশীরামদাসী মহাভারত ব্যাস-মহাভারতের অনুসরণে রচিত হইলেও এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্যও বড় কম নহে। উভয়ের পর্ব-সংখ্যা সমান হইলেও পর্বের নাম-পার্থক্য বর্তমান। কাশীরামদাসে গদাপর্ব আছে যাহা ব্যাসভারতে নাই, আবার ব্যাসভারতের অনুশাসন পর্ব কাশীরামে অনুপস্থিত। ব্যাসভারতের মহাপ্রস্থান ও স্বর্গারোহণ-পর্ব একত্রে কাশীদাসী ভারতে স্বর্গারোহণ-পর্বরূপে রচিত হইয়াছে। ইহাছাড়া পর্বগুলির মধ্যে কিছু ইতর-বিশেষ হইয়াছে। কাহিনীর দিক হইতে বলা চলে, কাশীদাসী মহাভারত মোটামুটি ভাবে ব্যাস-ভারতের অনুসরণ করিলেও কোন কোন স্থলে গ্রহণ ও বর্জনের নীতি গ্রহণ করিয়াছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উল্লেখ করা

বৈশিষ্ট্য

চলে যে কাশীদাসী মহাভারতে ব্যাস-ভারতের বিদুলার তেজস্বিতার কাহিনী, রুরু-প্রমদ্বরার উপাখ্যান এবং উঞ্ছপরায়ণ ব্রাহ্মণের শক্তু যজ্ঞ-আদি কতগুলি মনোহর কাহিনী একেবারে বর্জিত হইয়াছে। আবার ইহাতে শ্রীবৎস-চিন্তার কাহিনী, অকালে আম্রোৎপত্তির বিবরণ, জনা-প্রবীরের কাহিনী, ভানুমতী ও লক্ষ্মণার স্বয়ংবর-আদি কাহিনী নূতনভাবে সংযুক্ত হইয়াছে, ব্যাস-ভারতে ইহাদের অস্তিত্ব নাই। ব্যাস-ভারতের যে সকল অংশ তত্ত্বালোচনা-পূর্ণ, কাশীদাসী ভারতে সেইগুলি পরিবর্জিত অথবা সংক্ষেপিত হইয়াছে। গীতা ব্যাস-ভারতের একটি অমূল্য সম্পদ, কিন্তু কাশীদাসী মহাভারতে নেহাৎ কাহিনীর সংযোগ রক্ষা করিবার জন্য ইহার উল্লেখমাত্র করা হইয়াছে। অনুগীতাও ইহাতে বর্জিত হইয়াছে। রাজধর্মানুশাসন, আপদ্ধর্ম ও অনুশাসন-পর্ব বাঙলা মহাভারতে প্রায় অনুক্ত বলিলেই চলে। আবার কাশীদাস কখন কখন মূলকাহিনীরও রূপান্তর ঘটাইয়াছেন। যক্ষ-যুধিষ্ঠির সংবাদে কাশীদাসী মহাভারতে মাত্র চারিটি প্রশ্নের উল্লেখ আছে, কিন্তু মূলে প্রশ্ন ছিল শতাধিক। কাশীদাসীভারতে অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া যে সমস্ত দেশে গিয়াছিল, তাহার উল্লেখ ব্যাসের গ্রন্থে নাই, আবার ব্যাসের গ্রন্থে যে সকল দেশের কথা আছে, তাহা বাঙলা মহাভারতে নাই। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় যে ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণের লক্ষ্যভেদ-চেষ্টা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা ব্যাস-ভারতে নাই। কাশীদাসী মহাভারতে যে পারিজাতহরণ, রাজসূয় যজ্ঞে বিভীষণের অপমান কিংবা সত্যভামার তুলাব্রত-আদি কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, ব্যাসভারতে এই সমস্ত কাহিনী অনুপস্থিত। বস্তুত, কাশীদাসী ভারত প্রধানত ভক্তিবাদের প্রবলতার মধ্যে নিপতিত হইয়াছিল বলিয়াই ইহার প্রভাবে বহু কাহিনী বর্জিত, গৃহীত ও পরিবর্তিত হইয়াছিল। ইতঃপূর্বেই বাঙলাদেশে চৈতন্য-দেবের আবির্ভাব ঘটিয়া গিয়াছে, ফলে প্রায় সমগ্রদেশই কৃষ্ণভক্তিতে মাতিয়া উঠিয়াছে। এহেন সময় কাশীরামদাস, যিনি একজন বিশিষ্ট বৈষ্ণব ছিলেন এবং সম্ভবত সেই কারণেই নীলাচলধামে বাসের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তিনি যে আপন গ্রন্থকে সুবিধাজনক ভাবে কৃষ্ণভক্তি-প্রকাশের অনুকূল করিয়া গড়িয়া তুলিবেন, তাহা আর বিচিত্র কি? বাঙলীয়ানার ছাঁচে বাঙলা মহাভারত সৃষ্টি করিয়া কাশীরামদাস যে অসাধ্য সাধন করিয়াছেন, তাহাই তাঁহাকে যুগযুগান্তরকাল বাঙালীমানসে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে,—কাশীরামদাসের ইহাই শ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি।

নিত্যানন্দ ঘোষ: মহাভারতের অনুবাদক নিত্যানন্দ ঘোষ সম্ভবত

বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর অঞ্চলের লোক ছিলেন, কারণ তাঁহার কাব্যের সমস্ত পুঁথিই এই অঞ্চল হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। নিত্যানন্দ ঘোষের গ্রন্থের কোন প্রাচীনতর পুঁথি পাওয়া না যাওয়ায় ডঃ সুকুমার সেন অনুমান করেন যে কবি সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। কিন্তু, 'গৌরীমঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা পাঁকুড়রাজ পৃথ্বীরাজ অন্য রকম সাক্ষ্য দিয়াছেন। তিনি বলেন,

অষ্টাদশ পর্ব-ভাষা কৈল কাশীদাস।
নিত্যানন্দ কৈল পূর্বে ভারত প্রকাশ।

কাশীদাসের কাব্য যদি ১৬০৪-৫ খ্রী°-র দিকে রচিত হইয়া থাকে, তবে নিত্যানন্দ ঘোষ অন্তত ষোড়শ শতাব্দের শেষ দিকে বর্তমান ছিলেন, অনুমান করা চলে। নিত্যানন্দ ঘোষের বিভিন্ন পর্বের পুঁথি পাওয়া গেলেও সম্ভবত তিনি সমগ্র গ্রন্থের অনুবাদ করেন নাই। কেহ কেহ ধারণা করেন যে কবি সাতটি মাত্র পর্বের অনুবাদ রচনা করিয়াছেন।

কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তীঃ 'কবিচন্দ্র' উপাধিধারী শঙ্কর চক্রবর্তী সম্ভবত সপ্তদশ শতকের শেষ এবং অষ্টাদশ শতকের প্রথমদিকে বর্তমান ছিলেন। তিনি একাধিক মল্লরাজার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। তাঁহার কাব্যের ভণিতায় পাওয়া যায়ঃ

দ্বিজ কবিচন্দ্র কয় ভাবি রমাপতি।
লেগোর দক্ষিণে ঘর পানুয়ায় বসতি॥
ব্যাসের আদেশ পায় দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায়
কুঞ্জলালে রক্ষ নারায়ণ॥

মল্লভূমির অন্তর্গত পানুয়ার অধিবাসী কবিচন্দ্রের পিতা ছিলেন মুনিরাম চক্রবর্তী। কুঞ্জলাল সম্ভবত কবির পুত্রের নাম। কবি ছিলেন ভূরি-রচয়িতা। নিম্নোক্ত কাব্যগুলিতে তাঁহার ভণিতা পাওয়া যায়ঃ মহাভারত, রামায়ণ, ভাগবত, শিবায়ন, মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল এবং লক্ষ্মীচরিত্র ও শীতলামঙ্গল নামক পাঁচালী। মল্লরাজ প্রথম গোপাল সিংহদেবের দ্বারা সম্বর্ধিত এবং আদেশ-প্রাপ্ত হইয়াই কবি মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন। গোপাল সিংহদেবের রাজত্বকাল ১৭১২ খ্রীঃ—১৭৪৮ খ্রীঃ। অতএব কবিও এই কালের মধ্যেই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কবিচন্দ্র সমগ্র মহাভারতেরই অনুবাদ রচনা করিয়াছিলেন।

ষষ্ঠীবর সেন ঃ ষষ্ঠীবর সেন ঢাকা জেলার জিনারদি গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। সম্ভবত ইনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। ইঁহার পুত্র ছিলেন গঙ্গাদাস সেন। গঙ্গাদাসও পিতার মত মহাভারত অনুবাদ করিয়াছিলেন।—

গঙ্গাদাস সেন কবি রচিলেক সর্ব।
শ্লোক ভাঙ্গি রচিলেক অষ্টাদশ পর্ব॥

ইহা হইতে অনুমিত হয় গঙ্গাদাস সেন সমগ্র মহাভারতই অনুবাদ করিয়াছিলেন। ষষ্ঠীবর মহাভারতের পর্ব-বিশেষ অথবা সমগ্র গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছিলেন—জানা যায়না। এমন কি পিতাপুত্র সম্মিলিত ভাবে মহাভারত রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন অথবা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন, তাহাও জানিবার উপায় নাই। ষষ্ঠীবর ও তৎপুত্র গঙ্গাদাস যে মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারাই মহাভারত-কাব্যকার কিনা, প্রশ্নটি এখনও মীমাংসিত হয় নাই।

বিভিন্ন শতাব্দীতে আরও বহু কবি মহাভারতের বিশেষ বিশেষ পর্ব বিশেষত অশ্বমেধ-পর্ব রচনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহই উল্লেখ-যোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই। ইঁহাদের মধ্যে দ্বিজ হরিদাসের অশ্বমেধ পর্ব, কৃষ্ণানন্দবসুর শান্তি-পর্ব, অনন্তমিশ্রের অশ্বমেধপর্ব, ঘনশ্যামদাসের কাব্য, রামেশ্বর কাব্য, লক্ষ্মণের কাব্য, কৈলাস বসুর মহাভারত, গোপীনাথদত্তের মহাভারত, গোপীনাথ পাঠকের সভাপর্ব, ঘনশ্যামের অশ্বমেধ পর্ব, কৃষ্ণরামের অশ্বমেধ পর্ব প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা চলিতে পারে।

অন্যান্য কবি

৩. ঃ ভাগবত ও কৃষ্ণায়ন কাব্য

বাঙলাভাষায় ভাগবত-পুরাণের প্রথম অনুবাদ রচনা করেন মালাধরবসু। পরবর্তী কালে বহুকবি (অন্তত ২৪ জন কবির নাম পাওয়া গিয়াছে) ভাগবত-অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলেও, লক্ষ্য করিবার বিষয়, এই অনুবাদগুলি কখনও রামায়ণ-মহাভারতের মত সার্বজনীনতা লাভ করিতে পারে নাই। ইহার প্রধান দুইটি কারণ এই হইতে পারে: প্রথমত রামায়ণ-মহাভারত মহাকাব্যহিসাবে সংস্কৃত সাহিত্যেও ছিল অতুলনীয়; কাজেই অনুবাদেও তাহাদের এই বিশিষ্টতা ও জনপ্রিয়তা ছিল অক্ষুণ্ণ; পক্ষান্তরে ভাগবতপুরাণ

অষ্টাদশপুরাণের (আসলে সংখ্যা আরও অনেক বেশি) একটি মাত্র—অতএব সাহিত্য-হিসাবে ইহা কখনও রামায়ণ-মহাভারতের সমকক্ষতা দাবি করিতে পারে না। দ্বিতীয়ত, ভাগবত-পুরাণের যে সকল অনুবাদ বাঙলাভাষায় প্রচারিত হইয়াছে, তাহাদের প্রায় সবগুলিই কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক। এই কৃষ্ণ 'ভগবান্' নহেন, ইনি যশোদানন্দন ব্রজগোপবালক মানব কৃষ্ণ—যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া বাঙলাদেশে তথা সমগ্র ভারতেই একটি ধর্মগত গোষ্ঠী (বৈষ্ণবগোষ্ঠী) গড়িয়া উঠিয়াছিল; অতএব বাঙলা ভাগবতকাব্যগুলি প্রায় সর্বক্ষেত্রে গোষ্ঠীসাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত হইয়া পড়াতেই ইহাদের কোন সার্বজনীন আবেদন ছিল না। মনে হয়, প্রধানত এই দুইটি কারণেই ভাগবতের প্রচার অপেক্ষাকৃত স্বল্প। অবশ্য কৃত্তিবাস-কাশীদাসের সমকক্ষ কবি-প্রতিভার অভাবও ইহার অন্যতম কারণ হইতে পারে।

ভাগবতের প্রচার-স্বল্পতা

রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদ-সম্বন্ধীয় আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য করিয়াছি যে প্রায় কোন কবিই আক্ষরিক ভাবে রামায়ণ বা মহাভারতের অনুবাদ করেন নাই। তাঁহারা দেশ-কাল ও রুচির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া গ্রহণ-বর্জনের ভিত্তিতে যুগোপযোগী করিয়া রামায়ণ-মহাভারতকে ঢালিয়া সাজাইয়াছেন। এমন কি বাঙালী-স্বভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কেহ কেহ সূত্রান্তর হইতে অথবা কল্পনার সহায়তায়ও নূতন নূতন কাহিনী গ্রন্থদ্বয়ে যোজনা করিয়াছেন। ইহা হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি,—কাব্যরচনা-প্রসঙ্গে কবিরা যুগধর্মকে বিস্মৃত হন নাই। ভাগবতের অনুবাদ-সম্বন্ধেও আমরা একই সত্যে উপনীত হইয়া থাকি। সমসাময়িক বাঙালী-জীবনের সঙ্গে ভাগবতের যোগ কতখানি ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল, তৎসম্বন্ধেও আমরা বিশেষজ্ঞের অভিমত উদ্ধার করিতেছি। ড০ সুকুমার সেন বলেন : 'প্রাচীন হোক আর অর্বাচীন হোক পুরাণগুলি মধ্যকালের বাংলা সাহিত্যে প্রচুর বিষয় যোগাইয়াছিল। তাহা ছাড়া পুরাণগুলির মধ্য দিয়াই মুসলমান অধিকারকালে হিন্দুধর্মের রূপ ও প্রকৃতি অনেক পরিমাণে নির্দিষ্ট হইয়াছিল। ভাগবতের প্রভাব তাহার মধ্যে সবচেয়ে বেশি। পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দে যে ভক্তিধর্ম বাঙলাদেশ হইতে উৎসারিত হইয়া ভারতবর্ষকে প্লাবিত করিয়াছিল তাহার প্রধান শাস্ত্রভিত্তি গীতা আর ভাগবত। চৈতন্যের ধর্ম, তাঁহার গুরুদেব ও তাঁহার অনুচরদের ধর্ম, ভাগবতের উপর নিষ্ঠিত হইয়া দেশীয় সাহিত্যে জীবনসেক

অনুবাদের বৈশিষ্ট্য

করিয়াছিল। কৃষ্ণকথা, যাহা হরিবংশে ও বিষ্ণুপুরাণে পাওয়া গিয়াছিল, তাহা স্থানে স্থানে পরিবর্ধিত ও কবিত্বাভিষিক্ত হইয়া ভাগবতে যেভাবে উপস্থাপিত হইল তাহাই বৈষ্ণবতা ও ভক্তিধর্মের মধ্য দিয়া ভারতীয় ভাবনায় ও সাহিত্যে অভিব্যক্ত হইয়াছে।' বাঙালী কবি যুগধর্মের কথা স্মরণ রাখিয়াই ভাগবত অনুবাদ করিয়াছেন ভাবিয়া চিন্তিয়া। অর্থাৎ প্রায় কোন কবিই নির্বিচারে সমগ্র ভাগবতের অনুবাদ করেন নাই,—সমসাময়িক বাঙালী-চেতনায় যে সমস্ত অংশ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, কবিরা সেই অংশগুলিই বাছিয়া লইয়াছেন। মূল ভাগবত পুরাণ বারোটি স্কন্ধে বিভক্ত, দশম স্কন্ধে কৃষ্ণলীলা এবং একাদশ স্কন্ধে তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। কৃষ্ণ-কাহিনীর পক্ষে এই দুইটি মাত্র স্কন্ধই প্রয়োজনীয় এবং অধিকাশ বাঙালী কবিই (মালাধরবসু সহ) ভাগবতের এই দুইটি মাত্র স্কন্ধের অনুবাদ করিয়াছেন। অতএব বোঝা যাইতেছে, পুরাণ-হিসাবে তাঁহারা ভাগবতকে গ্রহণ করেন নাই, কৃষ্ণকাহিনীর উৎস-হিসাবেই ভাগবতের দ্বারস্থ হইয়া ছিলেন। এই কারণেই ভাগবত-অবলম্বনে রচিত সাহিত্যের নাম 'কৃষ্ণায়ন' হওয়াই সঙ্গত।

মূল ভাগবত-পুরাণের দুইটি স্কন্ধে কৃষ্ণলীলাকাহিনী বর্ণিত হইলেও, লক্ষ্য করিবার বিষয় যে তাহাতে রাধার নাম মাত্রও উল্লেখ করা হয় নাই। ভাগবত-কাহিনী শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যভাবপ্রকাশক। আর মধ্যযুগে বাঙালী শ্রীকৃষ্ণের মধুরভাবেরই সাধনা করিয়াছে এবং এই প্রসঙ্গে রাধিকাও অপরিহার্য। স্বয়ং চৈতন্যদেব ছিলেন রাধাভাবের উপাসক। রাধিকা-বর্জিত কৃষ্ণকাহিনীর কথা ভক্তবৈষ্ণব কল্পনাও করিতে পারেনা। অতএব একমাত্র ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণকাহিনীতে তাঁহাদের রস-পিপাসা কখনও চরিতার্থতা লাভ করিতে পারেনা। তাই তাঁহারা ভাগবত হইতে প্রাপ্ত কাহিনীতে দানলীলা নৌকালীলাদির অনুসরণে রাধা-কাহিনী যোগ করিয়া কৃষ্ণলীলাকাহিনীকে পূর্ণতা দান করিয়াছেন।

চৈতন্য ও ভাগবত

পূর্বে যে কথাটার উল্লেখ করা হইয়াছিল, তাহাই পুনর্বার উচ্চারণ করিতেছি। রামায়ণ-মহাভারতে বাঙালী কবি যেমন বাঙালীর স্বভাব-ধর্মের অনুরূপ করিয়া ঢালিয়া সাজাইয়াছেন, ভাগবতের অনুবাদকরাও সমভাবেই কৃষ্ণকাহিনী রচনা করিয়াছেন। ইহাতে হয়তো শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যভাব ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, হয়তো কাহিনীও রূপান্তরিত হইয়াছে, কিন্তু

বাঙালী যাহা হৃদয় দিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে না, কবিরা সেই বিষয় রচনায় নিরস্ত হইয়াছেন। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়,—'ভাগবতের তত্ত্ব ও কাহিনী বাঙলাভাষায় অনুবাদ করিতে গিয়া এই লেখকগোষ্ঠী......কাহিনীর সূক্ষ্ম ও বাঙালী-রুচিসম্মত রূপান্তরের দ্বারা বাংলা ভাষার শক্তিবৃদ্ধি ও বাঙালীর রসানুভূতির দৃঢ়ীকরণও সাধন করিয়াছিলেন।'

ভাগবতের রূপান্তর

মালাধরবসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ই ভাগবতের আদি অনুবাদ। অতঃপর চৈতন্যদেবের প্রায় সমসাময়িক কালেই আরও কয়েকখানা কৃষ্ণায়ন কাব্য রচিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইহাদের কয়েকটি গ্রন্থের আর কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছেনা। হোসেন শাহের কর্মচারী যশোরাজখান একটি 'কৃষ্ণমঙ্গল' কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। আবার চৈতন্য-পরিকর গোবিন্দ আচার্য এবং পরমানন্দ-রচিত কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্যের কথাও বিভিন্ন সূত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে,—কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন গ্রন্থের সন্ধান পাওরা যায় নাই।

রঘুনাথ পণ্ডিত ঃ সমগ্র ভাগবত-অনুবাদ-সাহিত্যে, সম্ভবত একমাত্র রঘুনাথ পণ্ডিতই সমগ্র ভাগবতের অনুবাদ-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং কৃষ্ণলীলাবিষয়ক স্কন্ধগুলির আক্ষরিক অনুবাদ রচনা করিয়াছিলেন। ভাগবতের আলোচনা-প্রসঙ্গে ইতঃপূর্বে আমরা যেসব মন্তব্য করিয়াছি, অন্তত এই ক্ষেত্রেই ঐ সকল মন্তব্য প্রযোজ্য হইবেনা। কারণ অপরাপর কবিগণ অনেকটা স্বানুভাবাত্মক দৃষ্টিভঙ্গীতে ভাগবতকাব্য রচনা করিয়াছিলেন,—নিজেদের প্রয়োজনের উপযোগী করিয়াই ভাগবত গড়িয়াছিলেন, একমাত্র রঘুনাথই পুরাপুরি বস্তুনিষ্ঠভাবে ভাগবতের অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার পণ ছিল—'মহাভাগবতে না কহিব অন্য কথা।'...অথচ আশ্চর্যের বিষয় রঘুনাথ পণ্ডিত ছিলেন চৈতন্যের সম-সাময়িক এবং চৈতন্য-ভক্তগোষ্ঠীরই অন্যতম। যে রাধা-লীলার স্বাদ স্বয়ং চৈতন্যদেবও গ্রহণ করিয়াছিলেন, রঘুনাথ সেই রাধালীলা-বর্জিত ভাগবতই রচনা করিয়াছেন।

বৈশিষ্ট

মহাপ্রভু যখন গৌড় হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন, তখন পথে বরাহনগরে তিনি রঘুনাথপণ্ডিতের গৃহে রাত্রিবাস করেন। মহাপ্রভু রঘুনাথপণ্ডিতের ভাগবতপাঠ শুনিয়া তাঁহাকে 'ভাগবতাচার্য' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। ১৫৭৬ খ্রীঃ রচিত

কবি পরিচয়

'গৌরগণোদ্দেশদীপিকায়' রঘুনাথপণ্ডিতের কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। অতএব সিদ্ধান্ত করা চলে, রঘুনাথপণ্ডিত ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি কালের মধ্যেই তাহার গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করিয়াছিলেন।—ইহা ছাড়া রঘুনাথপণ্ডিত-সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানিবার উপায় নাই।

পূর্বেই বলিয়াছি, রঘুনাথ পণ্ডিত সমগ্র ভাগবতপুরাণেরই অনুবাদ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে প্রথম নয়টি সর্গ তিনি সংক্ষেপে রচনা করিয়াছেন। মূল অপেক্ষা অধ্যায় সংখ্যা অনেক কমাইয়া কবি কেবল সারসংগ্রহ করিয়াছেন। শেষ তিনটি স্কন্ধ অর্থাৎ দশম হইতে দ্বাদশ স্কন্ধ পর্যন্ত কবি বিশ্বস্ততার সহিত আক্ষরিক অনুবাদ রচনা করিয়াছেন। অনুবাদের ভাষা গম্ভীর ও ওজস্বী, ইহাতে কবি লঘুতার কোন অবকাশ রাখেন নাই। রচনার অংশবিশেষ গীত হইত বলিয়া মনে হয়; তৎসত্ত্বেও কবি ইহার গাম্ভীর্য সর্বত্র অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। কবি স্বেচ্ছায় অন্তত কোন প্রক্ষিপ্ত রচনা ইহার অঙ্গীভূত করেন নাই। ড° সেন বলেন, 'সাধারণ শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের মত কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী লঘু কাব্য নহে। ইহাতে সাধারণ শ্রোতার চিত্ত আকৃষ্ট হইবার মত বিশেষ কিছুই নাই। শ্রীমদ্ভাগবত শুধু ভক্তিকে জাগরিত করেনা, বুদ্ধিকেও উদ্বুদ্ধ করে ইহা তাহারই অনুবাদ।' কবির ভাষাজ্ঞান এবং ছন্দ জ্ঞানও অতিশয় প্রশংসনীয়।

কাব্য-বিচার

ভুরু-ভঙ্গ বিলসিত মুনি মনোহরা।
বিলোল-অলকাবলী কুঞ্চিত কুন্তলা॥
অলসবিলসগতি কমল ঢুলায়।
চকিত চপলদিঠী নন্দঘরে যায়॥

মূল ভাগবতে 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদম্' শ্লোকটিতে যে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, এই কথা রঘুনাথ পণ্ডিতই প্রথম প্রকাশ করেন, অতঃপর জীবগোস্বামী চৈতন্যের অবতারত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। রঘুনাথ পণ্ডিতের কালে চৈতন্য-মাহাত্ম্য পরিপূর্ণ রূপ লাভ করে নাই বলিয়াই কবি হয়তো তাঁহার ভাগবতের অনুবাদে দানলীলা-নৌকালীলাদি-গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নাই।

দ্বিজ মাধব, মাধবাচার্য : 'দ্বিজ মাধব এবং মাধবাচার্য' ইহাদের যে কোন এক নামে অথবা দুইনামে যে অন্তত দুইজন কৃষ্ণমঙ্গল-কাব্যকার ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বিভিন্নসূত্রে মাধবকবি-সম্বন্ধে এত পরস্পর-বিরোধী সংবাদ পাওয়া যায় যে তাহা হইতে সত্য উদ্ধার অসম্ভব

ব্যাপার। বস্তুত একই নামে যদি দুইজন কিংবা ততোধিক কৃষ্ণমঙ্গলকাব্য-রচয়িতা থাকিয়া থাকেন, তবে তাঁহাদের রচনার ভণিতায় এবং পরিচয়ে এত জট পাকাইয়া গিয়াছে যে তাহাদের সম্বন্ধে পৃথক্ আলোচনার অবতারণায় আরও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইতে পারে।

একজন মাধব যে চৈতন্য-সমসাময়িক ছিলেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। কারণ তাঁহার কাব্যে কোথাও আত্মপরিচয় দেওয়া না থাকিলেও, কবি বারবার উল্লেখ করিয়াছেন—

'কহে দ্বিজ মাধব তার দাসের দাস',

অর্থাৎ তিনি চৈতন্যের কোন পারিষদের শিষ্য ছিলেন। কবি দেবকীনন্দন তাঁহার বৈষ্ণব-বন্দনায়ও উল্লেখ করিয়াছেন যে মাধবাচার্য নামে মহাপ্রভুর এক ভক্ত কৃষ্ণমঙ্গল রচনা করিয়াছেন। 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' এবং 'চৈতন্য-চরিতামৃতের' মতে এক মাধবাচার্য ছিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর জামাতা। 'প্রেমবিলাস' মতে কালিদাস মিশ্রের পুত্র এবং দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার ভ্রাতুষ্পুত্র তথা অদ্বৈতাচার্যের শিষ্য মাধব আচার্য বা মাধব মিশ্র শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।—অনুমান চৈতন্যের সমকালবর্তী এই মাধবই আদি বা প্রথম মাধব। ইনি যে ভাগবত অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহা অনেকটা মালাধর বসুর অনুসরণে। কবি ভাগবতের মাত্র শেষ তিনটি স্কন্ধেরই ভাবানুবাদ করিয়াছিলেন, অধিকন্তু অ-ভাগবতীয় কিছু কিছু কাহিনীও অন্যসূত্র হইতে আহরণ করিয়া তাঁহার গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি যে বিষ্ণুপুরাণ বা হরিবংশ-আদি সূত্র হইতে কিছু কিছু উপকরণ আহরণ করিয়াছেন, তাহা স্বীয় গ্রন্থেই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।—

সমস্যা

'রাজরাজ অভিষেক নাহি ভাগবতে।
বিস্তারি কহিব তাহা হরিবংশমতে ॥'

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য এই যে, বাঙালীর অতিপ্রিয় রাধাকৃষ্ণের যুগল-লীলাকাহিনী 'দানলীলা ও নৌকালীলা'র কোন উল্লেখ পুরাণাদিতে না থাকিলেও কবি আলোচ্য গ্রন্থে তাহাও সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ইহাতে রাধা, বড়াই এবং চন্দ্রাবলীর উল্লেখ থাকিলেও ললিতা-বিশাখা অনুপস্থিত।

অপর যে মাধবের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল পাওয়া যায়, তিনি চণ্ডীমঙ্গল-রচয়িতা মাধব হইতে পারেন কিংবা গঙ্গামঙ্গল-রচয়িতা মাধবও হইতে পারেন।

গঙ্গামঙ্গল-এর পুষ্পিকায় মাধব যে ধরণের ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গলেও ঠিক অনুরূপ ধরণের ভণিতা লক্ষ্য করা যায়।

'চিন্তিয়া চৈতন্যচন্দ্র চরণ কমল।
দ্বিজ মাধব কহে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ॥'
'চিন্তিয়া চৈতন্যচন্দ্র চরণ কমল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গামঙ্গল ॥'

গঙ্গামঙ্গলের কোথাও কবি আপনাকে চৈতন্যের দাসের দাস বলিয়া উল্লেখ করেন নাই, অতএব অনুমিত হয়, এই গঙ্গামঙ্গল-রচয়িতাই হয়তো শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের দ্বিতীয় মাধব। কোন কোন গ্রন্থে উভয় মাধবের রচনা মিশিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাতেও দ্বিতীয় মাধবের রচনার অর্বাচীনতা সহজেই নজরে পড়ে। দ্বিতীয় মাধব যে নৌকালীলাদি কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে রাধিকার সখীহিসাবে ললিতা-বিশাখার উল্লেখও বর্তমান। দ্বিজমাধবের রচিত 'ভাগবতসার' নামে যে গ্রন্থটি পাওয়া যায়, তাহা মূলত প্রথম মাধবের 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' হইতে অভিন্ন। অবশ্য ইহার ভিতর দ্বিতীয় মাধবের কিছু কিছু রচনাও অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে।

এই দুইজন মাধব ছাড়াও তৃতীয় কোন মাধবও যদি 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' রচনা করিয়া থাকেন তবে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। কারণ মাধবের পরিচয়-জ্ঞাপক আরও কিছু কিছু পদ উদ্ধার করা চলিত। কিন্তু জটিলতাবৃদ্ধির ভয়ে তাহা পরিহার করা হইল। বস্তুত, নিশ্চিততর কোন প্রমাণ হস্তগত না হওয়ায় দুইজন মাধবেই থামিতে হইল, নতুবা শুধু পরিচয়সূত্র-অনুযায়ী সন্ধান করিলে তাহাদের সংখ্যা চারিজন বা পাঁচজন হওয়াও বিচিত্র নহে।

কৃষ্ণদাস ঃ 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'-রচয়িতা মাধব আচার্যের এক শিষ্য ছিলেন কৃষ্ণদাস। এই কৃষ্ণদাসও একখানি শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল অথবা 'মাধব-চরিত' নামক কাব্য রচনা করেন। কবি তাঁহার গ্রন্থে আত্মপরিচয়সূত্রে বলিয়াছেন, তাঁহার পিতার নাম যাদবানন্দ মাতা পদ্মাবতী। জাহ্নবীর পশ্চিমকূলে কবির বসতি। তিনি আচার্য গোসাঞির (মাধব আচার্য) স্থানে ভৃত্যকার্য করিয়া তাঁহার দয়া আকর্ষণ করেন এবং গুরু-কৃপায় নাম পাইলেন 'কৃষ্ণদাস।' তাঁহার গুরু মাধবাচার্যও যে শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ কৃষ্ণদাসের কাব্যে পাওয়া যায় ঃ

পরিচয়

'মাধব আচার্য বন্দো কবিত্ব শীতল।
যাহার রচিত গীত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ॥'

কবির কাব্যরচনাকালে বৃন্দাবনে যে ষড়্‌গোস্বামীর পরিপূর্ণ প্রতিপত্তি বর্তমান ছিল তাহার পরিচয় গ্রন্থে পাওয়া যায়। অতএব অনুমান,—ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকেই হয়তো কবির কাব্য রচিত হইয়াছিল। কবি তাঁহার কাব্য বৈষ্ণবমোহান্তদের নাম উল্লেখ করিলেও কবি-হিসাবে গুরু মাধবাচার্য এবং বৃন্দাবনদাসের নাম মাত্র পাওয়া যায়।

অন্য অধিকাংশ কবির মতই কৃষ্ণদাসও মূলত ভাগবতকে অনুসরণ করিলেও দানলীলা-নৌকালীলা-আদি অপৌরাণিক কাহিনীকেই বিশেষ প্রাধান্য দান করিয়াছেন। তিনি যদিও বলিয়াছেন,—

দানখণ্ড নৌকাখণ্ড নাহি ভাগবতে।
অজ্ঞ নহি কিছু কহি হরিবংশ মতে॥

কিন্তু মনে হয়, কবি আপনার অজ্ঞতার জন্যই হয়তো জানেন না যে, এই সব কাহিনী হরিবংশেও অনুপস্থিত। যাহা হউক, শুধু কৃষ্ণ-লীলা নহে, রাধাকৃষ্ণের যুগল-লীলার বর্ণনাই ছিল কবির উদ্দেশ্য। এমন কি কৃষ্ণ-কাহিনীকে পরিপূর্ণতা দানের জন্য কবি মহাভারত হইতেও দ্রোপদীর বস্ত্রহরণ-আদি কাহিনী গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে কিছু কিছু রাগ-রাগিনীরও উল্লেখ আছে।

কাব্য-সমস্যা

কাব্য-হিসাবে কৃষ্ণদাসের রচনা সার্থক। কবি চলিত ভাষার ইডিয়ম বা বিশিষ্টার্থক পদগুচ্ছকে সার্থকভাবে তাঁহার কাব্যে ব্যবহার করিয়াছেন। আবার ছন্দ-বৈচিত্র্য সৃষ্টিতেও কবির দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। কবিত্বের দিক হইতেও কৃষ্ণদাসের কাব্যের উচ্চ প্রশংসাই করিতে হয়।

কবিশেখর দৈবকীনন্দন: ড° সুকুমার সেন অনুমান করেন যে বৈষ্ণবপদাবলী-রচয়িতা কবিশেখর বা রায়শেখর বা শেখর এবং 'গোপাল বিজয়'-রচয়িতা কবিশেখর দৈবকীনন্দন অভিন্নব্যক্তি। ড° মণীন্দ্রমোহন বসু ইহাতে আপত্তি উত্থাপন করিলেও তিনি আপনার অভিমতকেও সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, কবি তাঁহার গ্রন্থে আত্মপরিচয়-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে তাঁহার পিতার নাম চতুর্ভুজ, মা হরাবতী, সিংহবংশে কবির জন্ম এবং তাঁহার প্রকৃত নাম দৈবকীনন্দন কিন্তু 'শ্রী কবিশেখর নাম বলে সর্বজন'। কবি একে একে 'গোপালচরিত' নামে মহাকাব্য, 'গোপালের কীর্তনামৃত' এবং 'গোপীনাথবিজয়' নাটক রচনা করেন। কিন্তু—

তবু গোপবেশে মন না পুরে আমার॥
তবেই পাঁচালী করি গোপাল বিজয়ে।

কবি-রচিত মহাকাব্য এবং নাটকটি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। সম্ভবত পদাবলীগুলিকেই তিনি কীর্তনামৃত বলিয়াছেন। চতুর্থ এই 'গোপাল-বিজয়' নামক কৃষ্ণায়ন কাব্য।

কবিশেখরের 'গোপালবিজয়' রামায়ণ-মহাভারতাদির মত বর্ণনাত্মক কাব্য। অপর কৃষ্ণমঙ্গলের মত গীতাত্মক নহে। তবে এই কাব্যটিও অন্যান্য কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের মতই ভাগবতেতর কাহিনীতে পূর্ণ। দানলীলা, নৌকালীলা-আদি কাহিনী ইহাতে বিস্তৃততর ভাবে পরিবেষিত হইয়াছে। এই দিক হইতে বড়ু চণ্ডীদাস-কৃত শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের সহিত ইহার সাদৃশ্য বর্তমান। কবিশেখরের কবিত্বশক্তি প্রশংসনীয়। ভাষায় জটিলতা নাই, ছন্দও সর্বপ্রকার দোষযুক্ত। উপমাদি অলঙ্কারেও কাব্যটি সমৃদ্ধ অথচ পাণ্ডিত্যের আড়ম্বর নাই। গ্রন্থের খুব প্রাচীন পাণ্ডুলিপি পাওয়া না গেলেও ইহার ভাষায় প্রাচীন রূপটি অনেকটা অব্যাহত আছে। মনে হয়, কবি সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই কাব্যটি রচনা করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণকিঙ্কর কৃষ্ণদাসঃ মহাভারত-আলোচনা-প্রসঙ্গে কাশীরামদাসের জ্যেষ্ঠভ্রাতার কবিত্বশক্তির সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছিল। কাশীরামদাসের এই জ্যেষ্ঠভ্রাতাই 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' নামক গ্রন্থের রচয়িতা কৃষ্ণদাস। কবির অপর ভ্রাতাদের কাব্যে আত্মপরিচয়-প্রসঙ্গে কোন কোন সংবাদ পাওয়া গেলেও কৃষ্ণদাস এই বিষয়ে অনেকটা উদাসীন ছিলেন। তিনি শুধু বলিয়াছেন যে গুরুর প্রসাদেই তিনি 'শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর' নাম পাইয়াছেন। তাঁহার পিতৃদত্ত নাম ছিল কৃষ্ণদাস। কবি কৃষ্ণদাস মূল ভাগবতের অনুসরণেই তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছেন। ইহাতে অ-ভাগবতীয় বা অপৌরাণিক কাহিনীর বিশেষ উল্লেখ নাই। এই দিক্ হইতে এই ধারার অন্যান্য কবিদের সঙ্গে তাঁহার পার্থক্য সুচিহ্নিত। তিনি দানখণ্ড-নৌকা-খণ্ডাদির কোন উল্লেখ করেন নাই। কবি সম্ভবত কাশীরামদাসের মহাভারত রচনার অল্প পূর্বেই তাঁহার গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। অতএব, সপ্তদশ-শতাব্দীর প্রারম্ভকালে অথবা ষোড়শশতাব্দীর শেষমুহূর্তে কাব্যখানি রচিত হইয়া থাকিতে পারে। কবি নেহাৎ বর্ণনাত্মক ভঙ্গীতে কাব্যখানি রচনা করিয়াছেন বলিয়া ইহাতে পল্লবিত কবিত্বের অবকাশ কম।

শ্যামদাসঃ 'দুঃখী' শ্যামদাস কিছু কিছু পদ-রচনা ছাড়াও 'গোবিন্দ-মঙ্গল' নামে একখানা কৃষ্ণায়ন কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার কাব্য হইতে জানা যায় যে কবির পিতার নাম শ্রীমুখ এবং মাতার নাম ভবানী।

তবে তাঁহার কাব্যের সম্পাদক লিখিয়াছেন, 'মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কেদারকুণ্ড পরগণার মধ্যে হরিহরপুর নামে এক গ্রাম আছে। এই গ্রাম মেদিনীপুর নগর হইতে প্রায় ৮ ক্রোশ পূর্ববর্তী। এই গ্রামে দুঃখী শ্যামদাসের বাস ছিল। ইনি ভরদ্বাজ গোত্রীয় দে-বংশীয় কায়স্থ।' ড° সেন অনুমান করেন যে এই শ্যামদাস হয়তো কাশীরাম দাসের জ্ঞাতি হইতে পারেন এবং ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁহার বর্তমান থাকাই সম্ভব। কিন্তু ড° মণীন্দ্র বসুর মতে কবি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান ছিলেন। শ্যামদাসের কাব্য প্রধানত ভাগবতের অনুসরণে রচিত হইলেও ইহাতে দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডাদি কাহিনী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই কাহিনীর সহিত শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন-কাহিনীর সাদৃশ্য বিস্ময়কর। কবি তাঁহার গ্রন্থে পাণ্ডিত্য-প্রকাশের চেষ্টা না করিলেও ইহাতে সহজ কবিত্বের স্পর্শ অনুভব করা যায়। ইহাতে কয়েকটি ব্রজবুলির পদও বর্তমান।

ভবানন্দ: 'হরিবংশ' কাব্যের রচয়িতা ভবানন্দ আত্মপরিচয়-প্রসঙ্গে শুধু পিতা শিবানন্দের নামই উল্লেখ করিয়াছেন। এতদতিরিক্ত কোন সংবাদ তাঁহার কাব্য হইতে পাওয়া যায় না। তবে তাঁহার কাব্যের অধিকাংশ পুঁথিই উত্তর ও উত্তর-পূর্ববঙ্গ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং পুঁথির ভাষাও এই অঞ্চলেরই—অতএব সঙ্গত কারণেই অনুমান করা চলে যে কবির জন্মস্থানও ছিল উত্তরবঙ্গে অথবা উত্তর-পূর্ব বঙ্গে। কবি অন্ততপক্ষে সপ্তদশ শতকের শেষপাদের পূর্বেই বর্তমান ছিলেন,—ইহা প্রমাণসিদ্ধ। কবির কাব্যের নাম 'হরিবংশ' হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহার সহিত সংস্কৃত 'হরিবংশে'র কোনই সম্পর্ক নাই! অবশ্য কবি অন্য কথা বলেন:

> 'সত্যবতীসুত ব্যাস নারায়ণ-অংশ।
> সংক্ষেপে রচিল পুণ্যশ্লোক হরিবংশ॥
> সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদবন্ধে।
> লোকে বুঝিবার বোলে দীন ভবানন্দে॥'

কবি কিছুটা ভাগবত, কিছুটা দানখণ্ডাদি-অনুসরণে তাঁহার কাব্য রচনা করিলেও বিষয়ের দিক হইতে ইহাতে বেশ কিছুটা বৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে রাধা, তাঁহার সখী এবং মাতার যে সমস্ত নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা অন্যত্র দেখা যায় না। কবি কোন্ সূত্র হইতে এইগুলি পাইয়াছেন, তাহা জানা যায় না। ভবানন্দের কাব্যে সহজ কবিত্ব-শক্তির স্ফুরণ ঘটিলেও ইহার মধ্যে গ্রাম্যতার ভাব অত্যধিক। এই কাব্যে যে

প্রভূত পরিমাণ বাঙলা ও ব্রজবুলিভাষায় রচিত পদ রহিয়াছে, তাহাদের কোন কোনটির মধ্যে পূর্ববর্তী কবিদের প্রভাব সুস্পষ্ট ; এমন কি ভাষার দিক হইতেও বহুস্থলে ঐক্যবোধ লক্ষ্য করা যায়।

অভিরাম দাস ঃ 'গোবিন্দ-বিজয়' কাব্যের রচয়িতা অভিরামদাসের কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় না। তবে ইনি যে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম অভিরামদাস নহেন, তাহার পরিচয় তাঁহার কাব্যেই নিহিত। কবিচন্দ্রের 'ভাগবতামৃত' গ্রন্থে গোবিন্দবিজয়ের 'রসপঞ্চাধ্যায়' হইতে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত হওয়ায় অন্তত এইটুকু অনুমান করা চলে যে, কবি 'অভিরামদাস' কবি-চন্দ্রের পূর্ববর্তী ছিলেন। অতএব সপ্তদশ শতাব্দীরই কোন সময়ে তাঁহার পক্ষে বর্তমান থাকা সম্ভব হইতে পারে। কবি অভিরামদাসের কাব্যের মধ্যে বিশেষ বৈচিত্র্য নাই। গতানুগতিক ভাবে তিনিও ভাগবত এবং অন্যান্য অপৌরাণিক কাহিনীর সহায়তায় 'গোবিন্দবিজয়' কাব্য রচনা করেন। মনে হয়, মণিহরণ পালাতেই গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছিল।

পরশুরাম ঃ দ্বিজ পরশুরাম একখানি 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার কাব্যে মহাপ্রভু এবং তাঁহার পারিষদ্-বর্গ ও অন্যান্য মোহান্তদের প্রশস্তি বন্দনা আছে। অপরাপর অংশে এতজ্জাতীয় অন্যান্য কাব্যের সহিত ইহার কোন পার্থক্য নাই। ইহাতেও দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডাদি কাহিনী যথেষ্ট আদর লাভ করিয়াছে। কবির পরিচয়-সম্বন্ধে জানা যায়, 'বিপ্র পরশুরামের 'কৃষ্ণ মঙ্গল' ও 'মাধব-সঙ্গীত' প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। কবির নিবাস ছিল 'চম্পকনগরী', ইনি দ্বাদশকল্য গ্রামে কুমার শ্যামশিখরের আশ্রয়ে থাকিয়া 'মাধবসঙ্গীত' গ্রন্থ রচনা করেন। কবির পিতার নাম মধুসূদন রায়, কবি মনোহর দাসের শিষ্যত্ব স্বীকারে ভেকাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।' কিন্তু ডঃ সেনের মতে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের রচয়িতা পরশুরাম 'চক্রবর্তী' উপাধিধারী, পক্ষান্তরে 'মাধব-সঙ্গীত' রচয়িতা কবি 'রায়' উপাধিধারী,—অতএব ইঁহারা পৃথক ব্যক্তি।

বলরামদাস ঃ 'কৃষ্ণলীলামৃত' নামক কৃষ্ণমঙ্গল কাহিনীর রচয়িতা বলরামদাস পদকর্তা বলরামদাস হইতে পৃথক। তিনি তাঁহার গ্রন্থে আত্ম-পরিচয় সূত্রে যে রূপকাশ্রিত কাহিনী রচনা করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে কবি ১৬২৪ শকাব্দে (১৭০২ খ্রী) তাঁহার কাব্য রচনা করেন। কবি সম্ভবত শূদ্রবংশীয় কোন রাজকুমার ছিলেন, পরে সংসার-বৈরাগ্য-বশত দশ বৎসর বৃন্দাবন ধামে বাস করেন। অতঃপর নানাদেশ ঘুরিতে ঘুরিতে

এক সময় পঞ্চালদেশীয় তারা নাম্নী এক বিধবাকে সাধন-সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করেন। ইহা হইতে মনে হয়, কবি ছিলেন সহজিয়াপন্থী। বলরাম সম্ভবত গদাধরের শিষ্য ছিলেন। বলরামদাসের পুঁথি বারোটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। কবি তাঁহার কাব্যের বিষয়-সমূহ গ্রহণ করিয়াছেন ভাগবত এবং ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ হইতে :

'ব্রহ্মবৈবর্তের মতে যে কহিল ভাগবতে
তাহা আমি করি বিবেচন।'

কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী : ইতঃপূর্বে একাধিকবার কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তীর জীবন-কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে কবি ছিলেন ভূরিস্রষ্টা। তাই দেখি, প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের প্রায় সর্বদিকেই ছিল তাঁহার অবারিতগতি। 'রামায়ণ' এবং 'মহাভারতে'র আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় পাইয়াছি। তিনি অনুরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন 'ভাগবতামৃত' বা 'গোবিন্দমঙ্গল' গ্রন্থে। কবি বিভিন্ন মল্লরাজার আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহার অধিকাংশ কাব্য রচনা করিয়াছেন,—এইরূপ উল্লেখ তাঁহার গ্রন্থেই বর্তমান। কিন্তু 'ভাগবতামৃতে' এইরূপ কোন মল্লরাজার উল্লেখ না থাকায় অনুমিত হইতেছে যে, কবি রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিবার পূর্বেই হয়তো এই কাব্যখানা রচনা করিয়াছিলেন। আভ্যন্তরীন প্রমাণ হইতে অনুমান করা যায় যে কবি ১৬৯৪ খ্রীঃর পরবর্তী কোন সময় কাব্যটি রচনা করেন। কবি সামগ্রিকভাবে ভাগবতের অনুবাদ করিয়াছিলেন বলা যায় ; অবশ্য কৃষ্ণলীলাকাহিনী যতখানি বিস্তৃতভাবে পরিবেষণ করিয়াছেন, অপরাপর অংশ তত বিস্তৃত নহে। অধিকন্তু তিনি হরিবংশ এবং ভবিষ্যপুরাণ হইতেও কিছু কিছু কাহিনী গ্রহণ করিয়াছেন। তবে উল্লেখযোগ্য এই যে, ইহাতে নৌকাখণ্ড, দানখণ্ডাদি বর্জিত হইলেও অনেক নূতন এবং অর্বাচীন কাহিনী ইহাতে স্থান পাইয়াছে। কবি পূর্বকৃত মহাজনদের বহু কাব্য হইতেই পয়ার এবং শ্লোকাদি উদ্ধার করিয়াছেন।

জয়নারায়ণ ঘোষাল : ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল ১৮১৩-১৪ খ্রীঃ 'শ্রীকরুণানিধান বিলাস' নামে একখানা কৃষ্ণায়ন কাব্য রচনা করেন। কাব্যখানা অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে রচিত হইলেও ইহাতে প্রাচীন ধারাটি অব্যাহত আছে। রচনার তারিখ উল্লেখ-প্রসঙ্গে কবি বলিয়াছেন 'রচিতে কৃষ্ণের লীলা কৈলা আয়োজন।' প্রধানত কৃষ্ণলীলা-কাহিনী বর্ণনা করিলেও কবি ইহাতে বহুতর দেবলীলার কাহিনীও বর্ণনা

করিয়াছেন : ভ্রাতৃদ্বিতীয়া লীলা, কোজাগরীলীলা, মনসাপূজালীলা, কার্তিক পূজা লীলা ইত্যাদি। বস্তুত বিষয়বস্তুর এই নূতনত্ব ও বৈচিত্র্য উল্লেখযোগ্য। ডঃ সেন বলেন : 'কৃষ্ণলীলার প্রসঙ্গে কবি তখনকার বাঙালী সংসার ও সমাজের একখানি নিখুঁত চিত্র আঁকিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস-রচনায় এই কাব্যটি মূল্যবান উপকরণ যোগাইবে।...কৃষ্ণ গোপীদিগের নিকট যে ভবিষ্যৎবাণী করিতেছেন তাহাতে ভূগোল জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষয়ে কবির মনোভাব বেশ কৌতুকাবহ ঠেকিবে।' কবি জয়নারায়ণ এই কাব্য-রচনার অনেকপূর্বে কাশীখণ্ড অবলম্বনে অপর একটি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

মালাধর বসু ভাগবতের অনুবাদরূপে যে ধারার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা সুদীর্ঘকাল বাঙলাসাহিত্যে প্রবাহ সঞ্চার করিয়াছে। প্রাগাধুনিক যুগের দাশুরায়, রামনিধিগুপ্ত আদি পাঁচালী-কার, কবিয়াল, তর্জাগায়করাও কৃষ্ণলীলা-অবলম্বনে বহু গান রচনা করিয়াছেন। নৌকাখণ্ড-দানখণ্ড-যুক্ত কৃষ্ণলীলা কাহিনী হইতেই পরবর্তীকালে কৃষ্ণযাত্রারও প্রচলন হইয়াছে। বস্তুত পরবর্তী বাঙলাসাহিত্যের বহু কাব্য-কাহিনীই কৃষ্ণলীলা-কাহিনীকে উপজীব্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে।

অধ্যায়ঃ
বারো

মঙ্গলকাব্য-সাহিত্য

আদি-মধ্যযুগের সাহিত্য হিসাবে মঙ্গলকাব্য-সাহিত্য-সম্বন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনার অবতারণা করা হইয়াছে। তথায় মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব, কাব্যোদ্ভবের পটভূমিকা, 'মঙ্গল' শব্দ ও কাব্যের অর্থ—ইত্যাদি-সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্টভাবেই লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। অতএব আলোচ্য অধ্যায়ে ইহাদের সম্বন্ধে পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। আদি মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য ও অন্ত্য-মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের পার্থক্য-সম্বন্ধে অবশ্য অবহিত হওয়া আবশ্যক। আদি মধ্যযুগেই বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব ঘটিলেও বাস্তবে আমরা তৎকালে শুধু 'মনসামঙ্গল' কাব্যেরই সাক্ষাৎ পাইয়াছি। অন্ত্য-মধ্যযুগ বা চৈতন্যোত্তর যুগেই মঙ্গলকাব্যের বিবৃদ্ধি ঘটিয়াছে পরিসরে এবং পরিমাণে। এই কালে মনসামঙ্গল-কাব্যতো আছেই অধিকন্তু আছে চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, শিবমঙ্গল-আদি বহুতর প্রধান ও অপ্রধান মঙ্গলকাব্য। বিষয়ের দিক হইতে যেমন উভয়-যুগে কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়, তেমনি দেখা যায় দৃষ্টি-ভঙ্গীর দিক হইতেও। চৈতন্যোত্তর-যুগে রচিত বলিয়া আমরা স্বভাবতই আশা করিতে পারি যে ইহাদের উপরও ন্যূনাধিক চৈতন্য-প্রভাব পড়িবেই। বস্তুত, তাহাই ঘটিয়াছে। মঙ্গলকাব্যগুলি পুরাণের অনুকরণে লৌকিক কাহিনীকে আশ্রয় করিয়া রচিত হইলেও ইহারা চৈতন্য-প্রভাব-মুক্ত নহে। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে যখন গোটা সমাজ-ব্যবস্থায়ই একটা সামগ্রিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল, সেই পরিবর্তন দেখা দিয়াছিল কবিদের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীতেও। সমাজ-ব্যবস্থায় আর পূর্বতন গোঁড়ামি অক্ষুণ্ণ ছিল না; বর্ণাশ্রম প্রথার মূলও অনেকটা শিথিল হইয়া গিয়াছিল, আর সেই অবসরে ব্রাহ্মণেতর শ্রেণীও মঙ্গলকাব্যে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বৈষ্ণব-ধর্মের মানবিকতাবোধের স্পর্শে মঙ্গলকাব্যগুলিও কথঞ্চিৎ মহিমা লাভ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ কোথায়! অধিকন্তু আদি-মধ্যযুগেই আর্য-অনার্য সমীকরণের যে প্রক্রিয়াটি সক্রিয়তা লাভ করিয়াছিল, চৈতন্যোত্তর-যুগে তাহা যে শুধু ত্বরান্বিত হইয়াছে তাহা নহে, তাহার বিস্তারও ঘটিয়াছে অনেকখানি। এই সমস্ত দিক হইতে অন্ত্য-মধ্যযুগের

অন্ত্য-মধ্যযুগীয় মঙ্গল-কাব্যের বৈশিষ্ট্য

মঙ্গলকাব্যসাহিত্য একটা বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছিল। এই যুগের সাহিত্যকে আমরা আর শতাব্দীতে ভাগ না করিয়া বিষয়ানুযায়ী আলোচনা করিয়া যাইব—। ১. মনসামঙ্গল ২. চণ্ডীমঙ্গল ৩. ধর্মমঙ্গল ৪. শিবায়ন বা শিবমঙ্গল ৫. অন্নদামঙ্গল ৬. বিবিধ। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, ভাগবতের অনুবাদগুলি সাধারণত 'কৃষ্ণমঙ্গল' নামে পরিচিত হইলেও আসলে তাহা অনুবাদ-সাহিত্য বলিয়াই এই অধ্যায় হইতে বর্জিত হইয়াছে।

১. ঃ মনসামঙ্গল

মনসামঙ্গলকাব্যের চরম সমৃদ্ধি ঘটিযাছিল চৈতন্য-পূর্বযুগেই। মনসামঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ তিনজন গ্রন্থকারই আবির্ভূত হইয়াছিলন সমৃদ্ধির যুগে। বিজয় গুপ্ত, নারায়ণদেব এবং বিপ্রদাস পিপলাই—এই তিনজন কবিই চৈতন্য-পূর্ব যুগের। ইহাদের সম্বন্ধে এবং মনসামঙ্গলকাব্যের আদি কবি কানা হরিদত্ত-সম্বন্ধে আদি মধ্যযুগেই আলোচনা করা হইয়াছে। আলোচ্য অধ্যায়ে এই ধারার অন্যান্য কবি এবং তাঁহাদের কাব্য-সম্বন্ধে আলোচনার অবতারণা করা হইবে।

[মনসাদেবী, সর্পপূজা, মনসামঙ্গল-কাব্যের উৎপত্তি ইত্যাদি সম্বন্ধে যাবতীয় তাত্ত্বিক আলোচনার জন্য 'পঞ্চম অধ্যায়' দ্রষ্টব্য]

মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে অন্তত জনপ্রিয়তায় মনসামঙ্গল শ্রেষ্ঠ। ড° দীনেশ সেন যে ৬২ জন মনসামঙ্গলকাব্য-কারের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন গায়ক থাকিলেও মোট কাব্যকারের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। অবশ্য ইহাদের মধ্যে যে স্বল্প কয়জন বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছেন, আলোচনা তাঁহাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে।

দ্বিজ বংশীদাস: চৈতন্যোত্তর যুগের মনসামঙ্গল-রচয়িতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ না হইলেও দ্বিজ বংশীদাস যে একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বংশীদাস তাঁহার কাব্যে যে কালজ্ঞাপক পয়ারটি সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাহাতে বংশীদাসকে ষোড়শ শতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়।—

'জলধির বামেত ভুবন-মাঝে দ্বার।
শকে রচে দ্বিজ বংশী পুরাণ পদ্মার॥'

অর্থাৎ ১৪৯৭ শকাব্দে (১৫৭৫-৭৬ খ্রীঃ) বংশীদাস কাব্যটি রচনা করেন।

কিন্তু ড° সুকুমার সেন পয়ারটির প্রামাণিকতা-সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন : '... দ্বিজ বংশীকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্থাপন করাই সমীচীন বোধ হয়।'

কবি তাঁহার কাব্যে আত্মপরিচয়ে জানাইয়াছেন যে, ফুলেশ্বরী নদীতটে পাটোয়ারী গ্রামে (ময়মনসিংহ জেলা) কবির বাসস্থান ছিল। কবির পিতার নাম যাদবানন্দ, পিতামহ হৃদয়ানন্দ। আবার কবির কন্যা বাঙলার আদি মহিলাকবি চন্দ্রাবতী (রামায়ণ দ্রষ্টব্য) পিতৃ-পরিচয় দান-প্রসঙ্গে আরও অনেক তথ্য জানাইয়াছেন। চন্দ্রাবতী তাঁহার 'দস্যু কেনারামের' কাহিনীতে বলিয়াছেন যে, দ্বিজ বংশীদাস মনসার ভাসান গাহিয়া বেড়াইতেন। একবার তিনি কেনারাম দস্যুর হাতে পড়িলেন। দস্যু কেনারাম দ্বিজ বংশীদাসের গান শুনিয়া দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করিয়া বংশীদাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। কন্যার রচিত এই কাহিনী হইতে পিতা বংশীদাস-রচিত কাহিনীর আবেদন যে কত গভীর ছিল, তাহা অনুমান করা যায়।

পরিচয়

দ্বিজবংশী যে মনসামঙ্গল বা 'মনসার ভাসান' কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহাতে বিষয়বস্তুর দিক হইতে খুব অভিনবত্ব না থাকিলেও পূর্ববর্তী কবিদের সহিত তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যটুকু সুস্পষ্টভাবেই ধরা পড়ে। চৈতন্য-পূর্ব যুগে যেখানে নিতান্ত ধর্মীয় কারণেই মঙ্গলকাব্য রচিত হইত, চৈতন্যোত্তর-যুগে তাহার পটভূমিকা কিছুটা পরিবর্তিত হইল। কবিদের দৃষ্টি ঊর্ধ্বলোক হইতে সরিয়া আসিয়াছে মর্ত্যলোকের দিকে, বাহির হইতে ভিতরের দিকে, দৈবী ঘটনা হইতে মানবিক ঘটনার দিকে। তাই দ্বিজ বংশীর কাব্যে যে সংঘাত সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা দেবতা আর মানবে নয়,—সেই সংঘাত একেবারেই যেন পারিবারিক। অন্যান্য কাব্যসমূহে যেমন গোড়া হইতেই চাঁদ আর মনসার বিবাদ দেখা যায়, এখানে তাহা নহে ; বিদেশ হইতে প্রত্যাগত চাঁদ সনকার মন্দিরে মনসাপূজা দেখিয়া মনসাকে প্রণাম করিলেন এবং স্তুতিপ্রসঙ্গে বলিলেন :

বৈশিষ্ট্য

'যেই দুর্গা সেই তুমি জগতের মাতা।
অভেদ চণ্ডিকা তুমি নাহিক অন্যথা ॥'

কিন্তু বাদ সাধিলেন সাক্ষাৎ চণ্ডী। চণ্ডী মনসার বিমাতা,—বাঙালীর ঘরে সতীন-কন্যা আর বিমাতার দ্বন্দ্ব যেমন বহু পারিবারিক অনর্থের সৃষ্টি করিয়া থাকে, এখানেও সেই আভাষই পাইতেছি। চণ্ডীর ভক্ত চাঁদ

মনসার পূজায় সম্মত হইয়াছেন দেখিয়া চণ্ডী প্রমাদ গণিলেন। তিনি স্বপ্নে চাঁদকে দেখা দিয়া মনসার বিরুদ্ধে উসকাইয়া দিলেন। এইবার চাঁদ মনসার বিরোধী শক্তিতে পরিণত হইলেন। অতঃপর চাঁদের পৌরুষদীপ্ত চরিত্র আর কোন কারণেই মনসাকে স্বীকার করিতে সম্মত নহে। এমন কি তাহার বংশের শেষ সম্বল, সপ্তম-পুত্র লখীন্দরও যখন সর্পদংশনে নিহত হইল, তখনও চাঁদ আপন পৌরুষে অবিচল—

'শতেক লখাই যদি যায় এই মতে।
তেও না পুজিব কানী পরাণ থাকিতে॥
কানীর উচ্ছিষ্ট পুত্র গাঙ্গে ভাসাও নিয়া।
ঢোল, মৃদঙ্গ কাড়া আন ডাক দিয়া॥'

দ্বিজ বংশীদাস একদিকে যেমন বজ্রের মত কঠোর চাঁদ-চরিত্র অঙ্কনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তেমনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন পুষ্পকোমল বেহুলা-চরিত্র-অঙ্কনেও। রচনার মাঝে মাঝে অতিশয় হৃদয়গ্রাহী করুণরসযুক্ত কিছু কিছু পদ পাওয়া যায়। ডঃ সেন অনুমান করেন যে এই পদগুলি কবি-কন্যা চন্দ্রাবতীর রচিত হওয়া অসম্ভব নহে। কবি বংশীদাস পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু অকারণ পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের কোন চেষ্টা তাঁহার কাব্যে দেখা যায় না। অতিশয় জটিল তত্ত্বকথাও তিনি বেশ সহজ এবং অনাড়ম্বর ভঙ্গীতে প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুত 'ভাষার সারল্য এবং অনাড়ম্বর বর্ণনাভঙ্গিই বংশীদাসের রচনার প্রধান বিশেষত্ব।'

কাব্য-বিচার

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ: ক্ষেমানন্দ পশ্চিমবঙ্গের মনসামঙ্গল-কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি 'কেতকা' বা মনসার দাস বলিয়া গ্রন্থের বহুস্থলেই 'কেতকাদাস' ভণিতা দিয়াছেন। গোড়ার দিকে তাহাতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হওয়ায় 'কেতকাদাস' এবং 'ক্ষেমানন্দ'কে দুইজন কবি বলিয়া গণ্য করা হইত। কিন্তু গ্রন্থখানি মনোযোগ দিয়া পড়িলেই দেখা যাইবে, কবি স্পষ্টভাবেই মনসাকে 'কেতকা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন: 'কিয়াপাতে জন্ম হৈল কেতুকাসুন্দরী'—অতএব ক্ষেমানন্দ আপন নামের বিশেষণরূপেই যে কেতকাদাস উপনাম যোগ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। কবি আপন কাব্যে বিস্তৃতভাবেই আত্মপরিচয় দান করিয়াছেন। কবি দামোদর-তীরবর্তী কাঁদড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মস্থানে নানাপ্রকার গোলযোগ দেখা দেওয়ায় কবি কিভাবে রাজা বিষ্ণুদাসের ভ্রাতা

পরিচয়

কাব্য-বিচার

ভারামল্ল-খানের নিকট আশ্রয় লাভ করিলেন, কবি গ্রন্থারম্ভেই তাহার মনোজ্ঞ বিবরণ দান করিয়াছেন। কবি-রচনার এই অংশ মুকুন্দরামের রচনার সহিত সাদৃশ্যযুক্ত। অতঃপর এক সন্ধ্যায় স্বয়ং দেবী মনসা মুচিনীর বেশ ধারণ করিয়া কবির সাক্ষাতে উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে আদেশ করিলেন :

'ওরে পুত্র ক্ষমানন্দ কবিত্বে কর প্রবন্ধ
আমার মঙ্গল গাইয়া বুল।'

কবির আত্মপরিচয় অংশে যে বারাখাঁর উল্লেখ আছে তিনি ১৬৪০ খ্রীঃ-র দিকে উক্ত অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন। অতএব কবিও মোটামুটি এই কালে বর্তমান ছিলেন, অনুমান করা যায়। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ যে এক জন শক্তিমান কবি ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। চরিত্র-চিত্রণে বিশেষত 'নাচনী বেহুলার' চিত্র-রচনায় কবি অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। কাহিনীর নাটকীয়তা অথবা বৈচিত্র্য-সৃষ্টি অপেক্ষাও তিনি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন চরিত্র-সৃষ্টিতে। কেতকাদাসের কবি-দৃষ্টি-সম্পর্কে জনৈক অধ্যাপক অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, "ইনি সম্পূর্ণ রোমান্স-পাগল কবি। কেতকাদাস প্রজাপতির মতই সৌন্দর্যলোভী। চাঁদ ও মনসার দ্বন্দ্ব-বর্ণনা তাঁহার স্বভাবের অনুকূল নহে, তাঁহার সৌন্দর্যসন্ধানী সমগ্র দৃষ্টি পড়িয়াছে বেহুলা-চরিত্রে। তাঁহার বেহুলা শুধু 'বেহুলা' নহে, 'বেহুলা-নাচনী'—একটি অপূর্ব লাস্যময়ী প্রাণচঞ্চলা কিশোরী। তাহাকে দেখিলে বসন্তবায়ু হিল্লোলিত পুষ্পলতিকাকে মনে পড়ে। মনসামঙ্গলের ন্যায় ভয়ঙ্কর কাহিনীর রুক্ষতাকে এই বেহুলা নিজের কিশোরী-জীবনের প্রাণচাঞ্চল্য ও মাধুর্য দিয়া মসৃণ-কোমল করিয়া তুলিয়াছে।"

কাব্য-বিচার

কবি তাঁহার কাব্যে বেহুলার যাত্রাপথে যে সমস্ত স্থানের বিবরণ দান করিয়াছেন তাহাতে কবির সমসাময়িক যুগের ভৌগোলিক জ্ঞানের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া দক্ষিণরাঢ়ের লোকাচারের যে পরিচয় ইহাতে নিবদ্ধ আছে, তাহার ঐতিহাসিক মূল্যও যথেষ্ট। দেবসভায় বেহুলার নৃত্যবর্ণনায় কবি সেকালের নটীনৃত্যের একটি সুন্দর চিত্র উপস্থাপন করিয়াছেন।

মনসামঙ্গলের কবিগণ বেহুলা-লখীন্দরকে শাপভ্রষ্ট উষা-অনিরুদ্ধ বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। ক্ষেমানন্দ এই উষা-অনিরুদ্ধের প্রেমকাহিনী বিস্তৃতভাবে

বর্ণনা করিয়াছেন, গ্রন্থের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এই কাহিনীতেই পূর্ণ। 'রোমান্সপ্রিয় কেতকাদাস উষারূপিনী বেহুলার গোপনপ্রেমকে বিস্তৃতভাবে রসাইয়া রসাইয়া বর্ণনা করিয়া মনসামঙ্গলের অন্তর্গত উষাহরণ পালাকে একেবারে বিদ্যাসুন্দর কাব্যে পর্যবসিত করিয়াছেন।'

দ্বিতীয় ক্ষেমানন্দ : কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ-ব্যতীত আরও একজন ক্ষেমানন্দ নাম বা ছদ্মনামধারী কবি মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থের সম্পাদক ইহাকেই ক্ষেমানন্দের মূল কাব্য বলিয়া মনে করিলেও প্রকৃত ঘটনা তাহা নহে। কারণ এই গ্রন্থের ক্ষেমানন্দ মানভূম অঞ্চলের লোক। তাহা ছাড়া তাঁহার গ্রন্থের ভণিতায় কোথাও 'কেতকাদাস' বিশেষণটি ব্যবহৃত হয় নাই। অতএব তিনি প্রসিদ্ধ ক্ষেমানন্দ নহেন। দ্বিতীয় ক্ষেমানন্দের রচনা কেতকাদাসের রচনার সহিত কোন দিক দিয়াই সাদৃশ্যযুক্তও নহে। ইহার গ্রন্থ অতিশয় সংক্ষিপ্ত—নয়টি দীর্ঘ পদের সমষ্টি মাত্র। রচনাটি কোন কোন দিক হইতে বিশেষত্বযুক্ত। ড° সেন বলেন, এই ক্ষুদ্র কাব্যটির স্বল্পপরিসর বেষ্টনীর মধ্যে চরিত্র কয়টি স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়াছে, বিশেষ করিয়া চাঁদ সদাগরের চরিত্র। চাঁদের নির্ভীক অদম্য পুরুষত্বের নিকট দেবীর মাহাত্ম্য নিতান্ত নিষ্প্রভ হইয়াছে। কাব্যটি কোন্ সময়ে রচিত বলিতে পারি না, তবে চাঁদের চরিত্র হইতে মনে হয়, যে ইহা সপ্তদশ শতাব্দীর রচনা হওয়া অসম্ভব নহে। এই ক্ষুদ্র পাঁচালীটি বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া রাখিবে।'

ষষ্ঠীবর : প্রাচীন বাঙলাসাহিত্যের ইতিহাসে 'ষষ্ঠীবর' নামটি কিছুটা বিভ্রাটের সৃষ্টি করিয়াছে। মহাভারত-অনুবাদক ষষ্ঠীবর সেন ও তৎপুত্র গঙ্গাদাস সেন একত্রে মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন। ড° দীনেশ সেনের মত-অনুযায়ী ইঁহারা ঢাকা জেলার জিনারদি গ্রামে এক বণিক্‌কুলে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ববর্তী মতে এই ষষ্ঠীবরই 'পদ্মাপুরাণ' বা মনসামঙ্গলকাব্যেরও রচয়িতা। কিন্তু শ্রীহট্ট হইতে ষষ্ঠীবরের যে পদ্মাপুরাণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সম্পাদক ষষ্ঠীবরের পরিচয় দিয়াছেন নিম্নোক্তরূপে : 'কবি ষষ্ঠীবর খাঁটি শ্রীহট্টের লোক। বিদেশাগত শাণ্ডিল্য দত্ত-বংশীয় মেদিনীধর দত্ত মৌলবীবাজার মহকুমার ইটা পরগণায় গয়ঘর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহারই বংশে এই কবি জন্মগ্রহণ করেন।' পরবর্তীকালে ড° আশুতোষ ভট্টাচার্যও সম্পাদকের এই উক্তি সমর্থন করিয়াছেন। এই ষষ্ঠীবরের উপাধি ছিল দত্ত এবং ইনি ছিলেন অপুত্রক। অতএব মহাভারতকার ষষ্ঠীবর সেন হইতে

ইনি সর্বাংশে পৃথক্। এই ষষ্ঠীবরের উপাধি ছিল 'গুণরাজখান'। কবির রচনার ভাষায় আধুনিকতা লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ কবিকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে আনিতে চাহেন। ড° সেন ষষ্ঠীবরের গ্রন্থে ভারতচন্দ্রের প্রভাবও লক্ষ্য করিয়াছেন। যদি তাহাই হয় তবে যে তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের লোক হইবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পুঁথিতে অন্যান্য কবিরও ভণিতা পাওয়া যায়। ষষ্ঠীবরের পদ্মাপুরাণে কিছু কিছু অভিনবত্ব লক্ষ্য করা গেলেও ইহাতে উৎকৃষ্ট কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে মাঝে মাঝে সরস পাণ্ডিত্যের চিহ্ন বর্তমান। তাঁহার রচনা বর্ণনাত্মক, গল্প জমাইয়া তোলার দিকেই তাঁহার লক্ষ্য।

জীবন মৈত্র ঃ করতোয়া তীরে লাহিড়ীপাড়া গ্রামের অধিবাসী জীবন মৈত্র ১১৫১সনে (১৭৪৪ খ্রী:) মনসার পাঁচালী রচনা করেন। গ্রন্থকার একাধিক বার যেমন সন-তারিখের উল্লেখ করিয়াছেন, তেমনি সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয়ও প্রদান করিয়াছেন কয়েকবার। কবি মহারাজ রামকান্তের জামাতা রাজা রঘুনাথের রাজ্যে বাস করিতেন। কবির পিতার নাম অনন্তরাম, মাতা স্বর্ণমালা। পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে কনিষ্ঠ ছিলেন জীবনকৃষ্ণ। কবি তাঁহার কৃতিত্বের জন্য 'কবিভূষণ' উপাধি পাইয়াছিলেন। কবির কাব্য দুই খণ্ডে বিভক্ত ঃ দেবখণ্ড ও বণিক্‌খণ্ড। দেবখণ্ডে পৌরাণিক ও মহাভারতীয় কাহিনীর সাহায্যে মনসা দেবীর কথা বর্ণনা করা হইয়াছে এবং বণিক্‌খণ্ডে চন্দ্রধর সদাগরের কাহিনী তথা লখীন্দর-বেহুলার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এই কাব্যে কিছু কিছু নূতন বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যায় এবং বিহারী কাহিনীর সহিত ইহার নিকট সম্বন্ধ অনুমান করা চলে। জীবন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, তাই রচনায় সহজ সরল ভাব অপেক্ষা পাণ্ডিত্যের ভারই অধিক। তবে তিনি বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে লব্ধ নিখুঁত চিত্র রচনায় কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

বাইশা ঃ মনসামঙ্গল কাব্যের প্রসঙ্গে 'বাইশা' কথাটি খুবই প্রচলিত। 'বাইশা' শব্দের অর্থ বাইশজন কবি-কৃত মনসামঙ্গল। আসলে কবির সংখ্যা যে ঠিক বাইশ জনই হইত, তাহা নহে, কম-বেশিও হইতে পারিত। অনেক কবিই সম্পূর্ণ মঙ্গলকাব্য রচনা করিলেও অনেক সময় গায়েনরা কাহিনীর ক্রমপর্যায় অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বিভিন্ন কাব্য হইতে অংশ বিশেষ উদ্ধার করিয়া পালা বাঁধিতেন। কোন একসময় হয়তো কোন পালায় বাইশ কবির লেখা সঙ্কলিত হইয়াছিল এবং তাহা হইতেই 'বাইশা' নামের সৃষ্টি হইয়া থাকিতে

পারে। পরবর্তীকালে সাধারণত অঞ্চল-বিশেষের কবিদের রচনা সংগ্রহ করিয়া এইরূপ অনেক বাইশা কাব্যের সৃষ্টি হইয়াছে।' তবে সাধারণত প্রত্যেক বাইশাতেই একজন বিশিষ্ট কবির রচনাকেই ভিত্তি করা হইয়া থাকে। ইহাতে তাহাদের শ্রেষ্ঠত্বও বজায় থাকে।

২. ॥ চণ্ডীমঙ্গল

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলাসাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা বহুবারই সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছি। বস্তুত এই সমস্যার যেন আর শেষ নাই। উপস্থিত বিষয়ে সমস্যা যেন আরও জটিলতর রূপ ধারণ করিয়াছে। মধ্যযুগের অন্যতম প্রধান সম্পদ চণ্ডীমঙ্গল। কিন্তু এই চণ্ডীকে লইয়া যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে কোন সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া একপ্রকার অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়।

আমাদের প্রাচীনতম সাহিত্য এবং ধর্মগ্রন্থ বেদ ও আনুষঙ্গিক সাহিত্য। এই বৈদিকসাহিত্যে স্ত্রী-দেবতার সাক্ষাৎ পাওয়া গেলেও তাঁহারা কেহই চণ্ডী নহেন। এমন কি দুর্গার সঙ্গেও পরিচয় ঘটিতে পারে, কিন্তু তিনিও আমাদের পরিচিত 'দুর্গা' নহেন। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, পিতৃতান্ত্রিক আর্যসমাজে 'শক্তি' জাতীয়া স্ত্রীদেবতার উদ্ভব ঘটিয়াছিল অনেক পরবর্তীকালে, সম্ভবত অনার্য প্রভাবের ফলেই। মহাভারত এবং পৌরাণিক যুগে শক্তি তথা প্রধানা স্ত্রীদেবতার আবির্ভাব ঘটিলেও তাঁহারা কেহ চণ্ডী নহেন। কোন কোন বৈদিক, পৌরাণিক এবং এমন কি বৌদ্ধদেবীর সহিত চণ্ডীর কোন এক ধরণের সাদৃশ্য যদিবা খুঁজিয়া পাওয়া যায়, তবু চণ্ডী যে প্রত্যক্ষভাবে ইহাদের কাহারও উত্তরসূরী নহেন, তাহা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। বেদে বাক্, রাত্রি, ভুবনেশ্বরী, উপনিষদে উমা-হৈমন্তী, বিভিন্ন গৃহ্যসূত্রে ভদ্রকালী, ভবানীদেবী কিংবা অপরাপর বৈদিক সাহিত্যে অম্বিকা, রুদ্রপত্নী, কাত্যায়নী আদি বিভিন্ন দেবীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে 'মৃগাণাং মাতরম্' অরণ্যানীকে পাইয়াছি। বৌদ্ধদেবীর সংখ্যা অজস্র। জাপানে আছেন প্রাচীনা বৌদ্ধদেবী চনষ্টী (চণ্ডী?); 'মহাবস্তু' অবদানে দেবী অভয়ার (তুং—কবিকঙ্কণের অভয়া-মঙ্গল) পরিচয় পাওয়া যায়। জৈনদের আছেন দেবী সরস্বতী। বৌদ্ধদেবী

প্রাচীনতর সাহিত্যে স্ত্রীদেবতা

বজ্রধাত্রেশ্বরী হইতে শক্তি দেবতা বাসুলীর উদ্ভবও কল্পিত হইতে পারে। কিন্তু প্রাচীনতর কোন সাহিত্যেই আমরা দেবী চণ্ডীর সাক্ষাৎকার লাভ করি না। পরবর্তী যে সকল পুরাণে অথবা অন্যত্র চণ্ডীর সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে, সেই সমস্ত গ্রন্থের প্রাচীনত্ব অবিসংবাদিত নহে। অতএব প্রাচীন আর্যধর্ম, শাস্ত্র বা সাহিত্য হইতে আমরা প্রত্যক্ষভাবে চণ্ডীর উদ্ভব কল্পনা করিতে পারি না। স্বভাবতই, আমরা ধারণা করিয়া লইব, অপর কোন বহিঃপ্রভাব-হইতেই চণ্ডীর উদ্ভব ঘটিয়াছে।

আমরা আদিমধ্যযুগের বিশেষত যুগান্তরকালের আলোচনায় লক্ষ্য করিয়াছি, কীভাবে আর্য-অনার্য সভ্যতার ক্রমিক সমীকরণে হিন্দুধর্ম ও সভ্যতার সৃষ্টি ঘটিয়াছে। প্রাচীন ভারতের অধিবাসী বিভিন্ন অনার্যজাতির প্রভাবে আমরা ধীরে ধীরে আর্যসভ্যতার রূপান্তর ঘটাইয়াছি। আমরা দিয়াছি, লইয়াছি, মিলিয়াছি, মিলাইয়াছি এবং এই ভাবেই আধুনিক ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছি। এই সমীকরণ-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়াই তাহাদের বহু দেব-দেবীকে আপনার করিয়া লইয়াছি। চণ্ডীর ক্ষেত্রেও ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে যে সমস্ত যুক্তি বর্তমান, সংক্ষেপে তাহাদের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

অনার্যসমাজের প্রভাব

'চণ্ডী' শব্দটি মূলত সংস্কৃত নহে, মনে হয় দ্রবিড় অথবা নিষাদ অর্থাৎ অষ্ট্রিক ভাষা হইতে অর্বাচীন সংস্কৃতে ইহা প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ছোট নাগপুরের দ্রবিড়ভাষাভাষী ওঁরাও জাতির মধ্যে 'চাণ্ডী' নামক একদেবীর পরিচয় পাওয়া যায়। এই দেবীর সঙ্গে চণ্ডীমঙ্গলের চণ্ডীর কয়েক দিক হইতেই সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ওঁরাও-দের মতে এই চাণ্ডী বহুরূপধারিণী এবং মৃগয়ার দেবতা। অধিকন্তু ইনি ব্যাধকুলের দৃষ্টি হইতে পশুদের দূরে রাখেন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যোক্ত চণ্ডী গোধিকারূপ ধারণ করিয়াছিলেন এবং পশুদের কালকেতুর দৃষ্টির অন্তরালে রাখিয়া আশ্রয় দান করিয়াছিলেন। চণ্ডী সর্বপ্রথম পশুদের পূজা গ্রহণ করিয়া তৎপর ব্যাধ কালকেতুর পূজা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কাজেই চণ্ডী যে পশুদের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা এবং ব্যাধকুলের পূজনীয়া, তাহার সুস্পষ্ট স্বীকৃতি চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেই বর্তমান।

ওঁরাওজাতির চাণ্ডী

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে যে চণ্ডীর পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, তিনিও তো চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চণ্ডী হইতে পারেন। আমরা

পরবর্তী আলোচনায় দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, পৌরাণিক চণ্ডীর সহিত চণ্ডীমঙ্গলোক্ত চণ্ডীর সম্পর্ক একান্তই গৌণ। অতএব ড° আশুতোষ ভট্টাচার্য সর্বদিক বিবেচনা করিয়া অতি সঙ্গত কারণেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে 'ওরাও সমাজের উপরিবর্ণিত চণ্ডী ও চণ্ডীমঙ্গলের ব্যাধকাহিনী-বর্ণিত চণ্ডীদেবীর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই,—উভয়েই অভিন্ন।'

'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' সম্পাদক সুধীভূষণ ভট্টাচার্য অবশ্য অনার্য-সূত্র হইতে চণ্ডীর উদ্ভবের কথা অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে তন্ত্রের মধ্যে সন্ধান করিলে চণ্ডীর উদ্ভবসূত্র আবিষ্কৃত হইতে পারে। অগত্যা তিনি 'কিরাত মহাজাতির অর্থাৎ মোঙ্গলীয় অনার্যদের ধর্ম জগতে' চণ্ডীর সন্ধান করিতে বলিয়াছেন। পণ্ডিত প্রবর চিন্তাহরণ চক্রবর্তী স্পষ্টতই স্বীকার করিয়াছেন যে হিন্দুদের তন্ত্রের উদ্ভব ঘটিয়াছে সম্ভবত 'দ্রাবিড়াদি বিভিন্ন অনার্যজাতির মধ্যে তান্ত্রিক আচারের অনুরূপ আচার' হইতেই। অতএব এই ক্ষেত্রেও আমাদিগকে চণ্ডীর উদ্ভবের জন্য অনার্যদের দ্বারস্থ হইতে হইতেছে। অতএব ড° ভট্টাচার্যের সিদ্ধান্ত ইহাতেও বিশেষ খণ্ডিত হইল না,—পরিশোধনের সম্ভাবনা রহিল মাত্র।

তন্ত্রে চণ্ডী

অতএব এই বিষয়ে আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, দ্রবিড়, নিষাদ অথবা কিরাত-আদি কোন অনার্য সূত্র হইতেই সর্বপ্রথম চণ্ডীর উদ্ভব হয়; পরবর্তী কালে ইহাতে আমাদের প্রাচীনতর শাস্ত্রোক্ত কোন কোন দেবীর কিছু কিছু প্রভাবও পড়িয়া থাকিবে। এবং আরও পরবর্তী কালে অর্বাচীন পুরাণ সমূহে এবং মঙ্গলকাব্যে এই চণ্ডীর কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। অসম্ভব নহে, ইহার সহিত কোন লৌকিক কাহিনীরও যোগ থাকিতে পারে।

চণ্ডীর উদ্ভবে বিভিন্ন উপাদান

পৌরাণিক চণ্ডীর আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রথমেই একটি সম্ভাব্য ভ্রান্তি-সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। আমাদের প্রধান পুরাণ আঠারোটি, উপপুরাণও অনেকগুলি। ইহাদের মধ্যে পরস্পর-বিরোধী কাহিনীরও অপ্রতুলতা নাই। বিশেষত স্ত্রী-দেবতাদের নাম এবং সম্পর্ক-সম্বন্ধে পুরাণকর্তারা অস্থিরমতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। ভিন্নসূত্র হইতে তাঁহারা যে সকল স্ত্রীদেবতাকে আহরণ করিয়াছেন, তাহাদের অনেকেই শেষপর্যন্ত শিবশক্তি-রূপে প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছেন। গোড়ার দিকে তাঁহারা নামত ভিন্ন হইলেও শেষ পর্যন্ত শিবের সহিত সম্পর্কের খাতিরে তাঁহারা এক ও অভিন্ন হইয়া দাঁড়াইলেন। এইভাবেই আমরা দেখিতে পাই যে দক্ষকন্যা

পৌরাণিক চণ্ডী কে?

সতী, পার্বতী উমা, কালী, দুর্গা, চণ্ডী প্রভৃতি সকল দেবীই শেষ পর্যন্ত এক। কাজেই পৌরাণিক চণ্ডীর আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিতে চাই যে, ইঁহারা সকলেই নিঃসন্দেহে পৌরাণিক দেবী, কিন্তু একজন ব্যতীত অপর কেহই পৌরাণিক চণ্ডী নহেন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত ত্রয়োদশ অধ্যায়টির নাম 'দেবীমাহাত্ম্য' এবং নামান্তর 'সপ্তশতী চণ্ডী'। এই অংশে যে চণ্ডীর কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, তাহাকেই পুরাণোক্ত চণ্ডীর কাহিনী বলা হয়। এখানে চণ্ডী বিষ্ণুমায়া। ইঁহারই স্তবস্তুতি করিয়া ব্রহ্মা যোগনিদ্রামগ্ন বিষ্ণুর উদ্বোধন ঘটাইয়াছিলেন; এই চণ্ডীর হস্তেই শুম্ভ নিশুম্ভ নিহত হইয়াছিল; ইনিই মহিষাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। এই তিনটিই চণ্ডীর প্রধান কাজ। এই চণ্ডী মঙ্গলময়ী অর্থে 'শিবা' কিন্তু শিবগৃহিণী নহেন। ইনি পর্বত-বাসিনী বলিয়া পার্বতী, কিন্তু পর্বত-কন্যা শিবজায়া উমা নহেন। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে নারায়ণের সহিত ইঁহার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর; ইনি বিষ্ণুমায়া, ইনি নারায়ণী (তুং—শক্তিপ্রণাম মন্ত্র: সর্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে)। চণ্ডী গ্রন্থের নানাস্থলেই দেবীকে নানাপ্রকার নামে ভূষিত করা হইয়াছে। দেবী ভগবতী, পরমেশ্বরী, অম্বিকা, দুর্গা, গৌরী, কাত্যায়ণী, শিবদূতী, শাকম্ভরী, ভীমা, ভ্রামরী ইত্যাদি। কিন্তু, লক্ষ্য করিবার বিষয়, দেবীর নাম কোথাও 'উমা' নহে, কিংবা পর্বতকন্যা পার্বতীরূপেও তাঁহার কোন পরিচয় নাই। অথচ চণ্ডীমঙ্গল-কাহিনীর দেবখণ্ডে আমরা যে চণ্ডীর দেখা পাই, তিনি প্রধানত পার্বতী-উমা।

মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত চণ্ডী

চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীতে যে চণ্ডীর কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে সুস্পষ্টভাবেই দুইটি ধারার মিলন দেখিতে পাই। প্রথম দেবখণ্ডে যে দেবীর সাক্ষাৎ পাই, তিনি প্রথমাংশে দক্ষকন্যা সতী, অপরাংশে গিরিদুহিতা উমা। সতী এবং উমার কাহিনী প্রাচীন বহু পুরাণে এবং সাহিত্যে বারবার বলা হইয়াছে। মূলত দুইটি পৃথক্ কাহিনী হইলেও অতি প্রাচীনকালেই ইহাদের সমীকরণ হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। উমাকাহিনীর শেষদিকটায় কবি অবশ্যই কল্পনার সহায়তায় দেবীকে লৌকিক জীবনের সহিত যুক্ত করিয়াছেন। অপর এক কাহিনীর সাহায্যে কবি ইঁহাকে নরখণ্ডের দেবী চণ্ডীরূপে প্রতিষ্ঠিতা করিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে, আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই, দেবখণ্ডে যে দেবীর কাহিনী বর্ণনা করা হইয়াছে, চণ্ডী বলিয়া তাঁহার উল্লেখ কচিৎ-ই

পাওয়া যায়। আবার পুরাণে চণ্ডীর যে যুযুৎসুরূপ দেখা যায়, আলোচ্য চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে তাঁহার বিন্দুমাত্র আভাসও পাওয়া যায়না। যাহাহোক, কাব্যের নরখণ্ডে আবার যে চণ্ডীর সাক্ষাৎ পাইয়াছি, তাহার সঙ্গে পূর্বোক্ত কোন দেবীরই কোন সাদৃশ্য পাওয়া যায়না। এই চণ্ডী পুরাণোক্ত চণ্ডী নহেন, এমনকি চণ্ডীমঙ্গলোক্ত সতী বা উমাও নহেন, ইনি সম্পূর্ণ ভিন্ন এক দেবী, যাঁহার নিকট উৎপীড়িত পশুকুল আশ্রয়ের জন্য আকুল কণ্ঠে আবেদন জানায়, যিনি স্বেচ্ছায় গোধিকারূপ ধারণ করেন এবং ব্যাধজাতির নিকট হইতে পূজা গ্রহণ করেন। বস্তুত, ইনিই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আসল দেবী,—দেবীমঙ্গলচণ্ডী, ইঁহারই মাহাত্ম্য-প্রচারের জন্য চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচিত হইয়াছে। এই দেবীর সাক্ষাৎ লাভের জন্যই আমাদিগকে অনার্যদের দ্বারস্থ হইতে হইয়াছে। অনার্যকুল হইতে আগতা এই দেবীর সহিত মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত চণ্ডীর নাম-সাদৃশ্য ছাড়া অপর কোনই সম্পর্ক নাই। কিন্তু এই দেবীকে জাতে তুলিবার জন্যই দেবখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত পৌরাণিক দেবীদের সঙ্গে ইঁহাকে অভিন্ন দেখাইবার একটা জোড়াতালি-দেওয়া প্রচেষ্টা করা হইয়াছে; কিন্তু সেই চেষ্টাও যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে তাহা যে কোন সতর্ক পাঠকের দৃষ্টি এড়াইবে না। দেবখণ্ডের শেষ অংশে দেখা যায় যে, সাংসারিক অস্বচ্ছলতা এবং অর্থকৃচ্ছ্রতার জন্য হর-গৌরীর মধ্যে প্রবল দাম্পত্য কলহের সৃষ্টি হয়। দেবী তখন কিছুটা স্বচ্ছলতার জন্য মর্ত্যলোকে পূজা-প্রচারে আগ্রহী হইলেন। অথচ ইহার পরই তিনি কালকেতুকে 'সাতঘড়া ধন' পাওয়াইয়া দিলেন। জোড়াতালি দিয়া দুইটি দেবতাকে এক করিবার প্রচেষ্টাই তাঁহার চরিত্রের এই অসঙ্গতির একমাত্র কারণ। কেহ কেহ অনুমান করেন যে চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের নরখণ্ডে যে চণ্ডীর কাহিনী বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা মূলত কোন লৌকিক কাহিনী হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। কোন অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্না মানবীতে দেবীত্ব আরোপ করিয়াই তাঁহাকে কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে, একমাত্র নাম ছাড়া পৌরাণিক চণ্ডীর সহিত চণ্ডীমঙ্গলকাব্যোক্ত কোন চণ্ডীরই কোন সাদৃশ্য নাই। চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের মঙ্গলচণ্ডী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দেবী।

চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীর চণ্ডী

বৃহদ্ধর্ম-পুরাণে একটি শ্লোক আছে—

ত্বং কালকেতুবরদা ছলগোধিকাসি যা ত্বাং শুভা ভবসি মঙ্গলচণ্ডিকাখ্যা।

শ্রী শালবাহন নৃপাদ্ বণিজঃ স্বসূনাঃ রক্ষেঽম্বুজে করিবয়ং গ্রসতী বমন্তী ॥

—'আপনি সুবর্ণগোধিকা মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া কালকেতুকে বর দিয়াছেন, আপনি শুভা মঙ্গলচণ্ডিকা, আপনি মাতঙ্গ ভোজন ও উদ্গীরণ করতঃ কমলে-কামিনীরূপে শ্রীমন্ত সদাগর ও তৎপিতাকে শ্রীশালবাহন-রাজার হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন।'

স্পষ্টতই এখানে চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের কালকেতু-কাহিনী এবং ধনপতিসদাগর-কাহিনীর উল্লেখ বর্তমান। যেহেতু, পুরাণে আছে, সেই হেতু ইহার প্রাচীনত্বের উপর গুরুত্ব আরোপের কোন কারণ নাই; কারণ 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' অতিশয় অর্বাচীন কালে রচিত হইয়াছে। বাঙলাদেশে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য প্রচারিত হইবার পরই সম্ভবত পুরাণের এই শ্লোকটি রচিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অপর কোন সংস্কৃত সাহিত্যে বা পুরাণে কালকেতুর উল্লেখ পাওয়া যায়না। অতএব বাঙলাদেশে চণ্ডীপূজার ইতিহাসের জন্য অন্যত্র সন্ধান চালাইতে হইবে।

যে সকল চণ্ডীমঙ্গলকাব্য পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের কোনটিই ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ববর্তীকালে রচিত নহে। তবে বৃন্দাবনদাস-কৃত 'চৈতন্য ভাগবত'-পাঠে জানা যায় যে, চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বেই বাঙলাদেশে সাড়ম্বরে চণ্ডীর পূজা হইত। বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন :

'ধর্মকর্ম লোকে সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে ॥'

তখনকার দিনে সারারাত্রি জাগিয়া মঙ্গলচণ্ডীর গীত গাওয়া হইত; ইহা হইতে অনুমিত হয় যে অন্তত চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতেই বাঙলাদেশে মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালীও রচিত হইয়াছিল। এই লিখিত প্রমাণগুলি ছাড়া প্রাচীন বাঙলায় চণ্ডীপূজার যে প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা একান্তই পাথুরে প্রমাণ। দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মিত একটি দেবীমূর্তির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে উত্তর বঙ্গে—দেবীর বামদিকে একটি গোধিকামূর্তিও বর্তমান। অতএব এই মূর্তিটি নিঃসন্দেহেই চণ্ডীমূর্তি এবং অন্তত দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বেই যে বাঙলাদেশে চণ্ডীপূজার প্রচলন সুরু হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পৌরাণিক চণ্ডীর সন্ধান অবশ্য আরও অনেক পূর্বেই পাওয়া যায়। দেবীপুরাণ, কালিকাপুরাণ, বামনপুরাণ, বারাহীতন্ত্র আদি বহুগ্রন্থেই চণ্ডীর উল্লেখ এবং কাহিনী পাওয়া যায়। নাগার্জুন গুহার

বাঙলাদেশে চণ্ডীপূজা

এক শিলালিপিতে মাহিষাসুরমর্দিণী দেবীর উল্লেখ বর্তমান। কিন্তু পুরাণোক্ত চণ্ডীর সহিত মঙ্গলচণ্ডীর কোন সম্পর্ক নাই বলিয়া আলোচ্য প্রসঙ্গে ইহাদের উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করিবার প্রয়োজন নাই। একমাত্র গোধাসনা দেবীকেই মঙ্গলচণ্ডী বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত। পুরাণ-গুলির মধ্যে সুস্পষ্টভাবে মঙ্গলচণ্ডিকার উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে, সেখানে বলা হইয়াছে—'মঙ্গলেষু চ যা দক্ষা সা চ মঙ্গলচণ্ডিকা'। যিনি ভক্তের মঙ্গল-সাধনে সক্ষম, তিনিই মঙ্গলচণ্ডিকা। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে চণ্ডীর সঙ্গে 'মঙ্গল' শব্দটি যুক্ত হইবার কারণ-স্বরূপ এক বিরাট তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। যেখানে যত 'মঙ্গল' শব্দ আছে, পুরাণকার তাহাদের সবগুলির সহিত চণ্ডীকে যুক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। প্রথমত দেবী সর্বমঙ্গলা শিবের দ্বারা পূজিতা হইয়াছিলেন; অতঃপর মঙ্গলগ্রহ দ্বারা পূজিতা হইলেন; ইহার পর মঙ্গল নরপতি দেবীকে পূজা করিলেন, মঙ্গলবারে সুন্দরীদের হাতেও দেবী পূজা পাইয়া থাকেন; সর্বশেষ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নরনারীকর্তৃক দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা পূজিতা হইয়া থাকেন। অন্যত্র আরও একটি কাহিনী ইহাদের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে; দেবী মঙ্গল নামক অসুরকে বধ করিয়া মঙ্গলচণ্ডী আখ্যা পাইয়াছেন। কোন এক চণ্ডীমঙ্গলে এই কাহিনীটিও বিবৃত হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ কোন্ কালে রচিত হইয়াছিল, তাহা সুস্থির ভাবে বলা সম্ভবপর নহে। তবে অনুমান হয়, পুরাণটি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন হইলেও সম্ভবত হিন্দুযুগেই রচিত হইয়াছিল। অতএব বাঙলাদেশে অন্তত সেনরাজবংশের আমলেই যে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা প্রায় নিশ্চিত ভাবেই বলা চলে।

অপর সকল মঙ্গলকাব্যে একটি কাহিনীই প্রধান, কিন্তু চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে প্রধান কাহিনী দুইটি, এবং এই দুইটি কাহিনীই পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। শুধু তাহাই নহে, কাহিনী দুইটির উৎপত্তিও ভিন্ন ভিন্ন কালে এবং উভয় কাব্যে চণ্ডীর কাহিনী বর্ণিত হইলেও তাঁহারা যে মূলত কিংবা কুলত এক নহেন, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না।

চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের তিনটি খণ্ড—প্রথম খণ্ড দেবখণ্ড। বিভিন্নদেবতার বন্দনার পর সৃষ্টিতত্ত্ব-আদি বর্ণনা করিয়াই কবি দক্ষযজ্ঞ, সতীর দেহত্যাগ, পার্বতীরূপে পুনর্জন্মলাভ এবং মহাদেবকে স্বামিরূপে প্রাপ্তির কাহিনী কবি পুরাণ-অনুযায়ী রচনা করিয়া গিয়াছেন। অতঃপর হরগৌরীর জীবনযাত্রা-বর্ণনাতেই কবি কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে

নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালীপরিবারের অভাব-অনটনের ফলে যে দাম্পত্যকলহের সৃষ্টি হইয়া থাকে, তেমনি এক কলহের ফলেই দেবী বুঝিলেন, নিজেকে সমাজে-সংসারে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে চিরদিন লাঞ্ছনা-গঞ্জনাই ভোগ করিতে হইবে। অতএব দেবী স্থির করিলেন, মর্ত্যলোকে আপন পূজা প্রচার করিতে হইবে। মহাদেবের সহায়তায় দেবী ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বরকে শাপগ্রস্ত করিয়া মর্ত্যলোকে পাঠাইলেন। এইখানেই দেবখণ্ডের সমাপ্তি। কিন্তু নামে দেবখণ্ড হইলেও চণ্ডীমঙ্গলের কবিরা সাধারণত বাস্তব মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতেই হরগৌরীর জীবনযাত্রার চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন।—গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড, আখেটিক খণ্ড বা কালকেতু-ফুল্লরার কাহিনী। ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর ব্যাধসন্তান কালকেতু-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। দেবী চণ্ডী এই ব্যাধকে সহায় করিয়াই মর্ত্যলোকে পূজা প্রচার করিবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি বনের পশুকুলের পূজা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের অভয় দান করিয়াছেন, স্বয়ং গোধিকার ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছেন, কালকেতুকে মাণিক্যের অঙ্গুরী এবং সাত ঘড়া ধন দিয়াছেন। ওদিকে আবার কলিঙ্গরাজকে স্বপ্নে দেখা দিয়া চণ্ডীপূজা করিতে বলিয়াছেন। কালকেতু ঐ ধনের সাহায্যে অরণ্য কাটিয়া গুজরাট নগর পত্তন করিয়াছে, কিন্তু প্রজা না আসায় চণ্ডী কলিঙ্গরাজ্যে ঝড়-বৃষ্টি-বন্যার উপদ্রব সৃষ্টি করিলে উৎপীড়িত প্রজাকুল নবসৃষ্ট গুজরাটরাজ্যে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। অতঃপর কালকেতুর সহিত কলিঙ্গরাজের যুদ্ধ বাধিল। সেই যুদ্ধে কালকেতু পরাজিত ও বন্দী হইল। অতঃপর চণ্ডীর স্তবস্তুতি পাঠ করিলে চণ্ডীর কৃপায় কালকেতু মুক্তি লাভ করিয়া স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসিল।—এই কালকেতুর কাহিনীতে কোন লৌকিক কাব্যের প্রভাব থাকা বিচিত্র নহে। এইখানে যে চণ্ডীর বর্ণনা করা হইয়াছে, ইনিই ওঁরাও জাতির পূজিতা চণ্ডী,—যিনি পশুকুলের অধিষ্ঠাত্রী এবং ব্যাধকুলের দ্বারা পূজিতা। লক্ষ্য করিবার বিষয়, চণ্ডী পূজা লাভ করিবার জন্য অতিশয় উৎসুক, কিন্তু তাঁহার মধ্যে কোন নীচতার পরিচয় নাই। কিছুটা ছলনার পরিচয় দিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা এত কৌতুকরস-মিশ্রিত যে দেবীর ছলনার কথা ভুলিয়া যাইতে হয়। সাধারণত দস্যুদের দ্বারা পূজিতা চণ্ডীর সম্বন্ধে সাধারণের মনে একটা ভীতির ভাব বর্তমান থাকিলেও এই চণ্ডীর মধ্যে কোন হিংস্রতার পরিচয় পাওয়া যায় না।—গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড বণিকখণ্ড অথবা ধনপতি সদাগরের কাহিনী। বনের রাখালদের

চণ্ডীমঙ্গল কাহিনী

আখেটিক খণ্ড

নিকট হইতে মঙ্গচণ্ডীর পূজা শিখিয়া খুল্লনা স্বগৃহে তাহার প্রচলন করিলে স্বামী ধনপতি তাহার অপরা পত্নী লহনার প্ররোচনায় মঙ্গলচণ্ডীর ঘট ভাঙ্গিয়া দেন। অতঃপর তিনি সিংহল যাত্রা করেন। দেবী এইবার সুযোগ পাইয়া অপমানের প্রতিশোধ লইলেন। ধনপতি কালীদহে কমলে-কামিনী মূর্তি দেখিয়া সেই অলৌকিক কাহিনীর কথা সিংহলরাজকে জানাইলেন। কিন্তু সিংহলরাজকে এই দৃশ্য দেখাইতে না পারায় ধনপতি কারারুদ্ধ হইলেন। অতঃপর পিতা ধনপতির সন্ধানে আসিল পুত্র শ্রীমন্ত সদাগর। সেও স্বয়ং কমলে-কামিনী মূর্তি দেখিল, কিন্তু রাজাকে দেখাইতে না পারায় কারারুদ্ধ হইল। অতঃপর মশানে শ্রীমন্ত চণ্ডীর স্তবস্তুতি পাঠ করিয়া শুধু যে মুক্তি পাইল, তাহা নহে, পিতার সহিত তাহার মিলন ঘটিল এবং রাজকন্যাকেও বিবাহ করিয়া পিতাকে সঙ্গে লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিল। গ্রন্থের এই

বণিক খণ্ড

খণ্ডে যে চণ্ডীর কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, এই চণ্ডীই প্রকৃত মঙ্গলচণ্ডী। এই চণ্ডীর পরিকল্পনায় অনেকেই বৌদ্ধ-প্রভাবের কথা বলিয়া থাকেন। চণ্ডীমঙ্গলের সৃষ্টিতত্ত্বেও এই বৌদ্ধপ্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। বুদ্ধ বা ধর্মকে বলা হয় আদিদেব,—আর চণ্ডীকে বলা হইয়াছে আদ্যাশক্তি। মাণিকদত্ত-রচিত চণ্ডীমঙ্গলের সৃষ্টি-প্রকরণে বৌদ্ধ-শূন্যবাদ এবং বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতের প্রভাবের পরিচয় সুস্পষ্ট। শূন্যপুরাণের ভূমিকায় চারু বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্টতই স্বীকার করিয়াছেন যে 'বৌদ্ধ আদ্যা

কাহিনীতে বৌদ্ধপ্রভাব

ক্রমশঃ হিন্দুর চণ্ডী হইয়া শিবের ভার্যা হইলেন।' মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলেও পাওয়া যায় যে খুল্লনা মঙ্গলচণ্ডীর পূজা শিখিয়াছিলেন বৌদ্ধতান্ত্রিক পঞ্চকন্যার নিকট হইতেই। হিন্দুদের দশমহাবিদ্যার দেবীরা সকলেই মূলত ছিলেন বৌদ্ধদেবী। কমলে-কামিনীর কমলামূর্তির উদ্ভবও তেমনি বৌদ্ধসূত্র হইতেই। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া ড০ ভট্টাচার্য বলিয়াছেন: 'মনে হয়, মঙ্গলচণ্ডী নামক স্বতন্ত্র কোন লৌকিক দেবতার পরিকল্পনার সঙ্গে এই আদ্যার কাহিনী পরবর্তীকালে আসিয়া সংযুক্ত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম যখন হিন্দুধর্মের মধ্যে আত্মগোপন করিতেছিল তখনই হয়তো বৌদ্ধ আদ্যাকে এইভাবে চণ্ডীরূপে ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস দেখা দিয়াছিল।'

চণ্ডীমঙ্গল কাহিনী সুগ্রথিত নহে, ইহাতে যে দুইটি গল্প আছে, তাহা-দিগকে কোন ক্রমেই একসূত্রে যুক্ত করা যায়না, এমনকি দেবখণ্ডে যে দেবতার মাহাত্ম্য-প্রচারই অভীপ্সিত ছিল, তাহার সঙ্গেও পরবর্তী কাহিনী-

প্রোক্ত দেবীর যোগসাধন কষ্টকর,—কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে, মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে চণ্ডীমঙ্গলই শ্রেষ্ঠ। 'বালকোচিত কথা-সাহিত্যের যুগে চণ্ডীমঙ্গলই প্রথম পরিণত যুবমনের পরিচয় দিয়াছে—উত্তেজনাময় প্রাণ-ধর্মের ঊর্ধ্বে প্রশান্ত মনোধর্ম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছে। দেবদানবের যুদ্ধ নহে, দেব-মানবের প্রতিযোগিতা নহে, অতি সাধারণ বর্ণহীন ও তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনায় সম্প্রসারিত মানবজীবনই ইহাতে প্রধানভাবে বর্ণনীয়। বাঙ্গালীর সুখদুঃখ, সামাজিক দলাদলি, কুসংস্কার, বারমাস্যা, রন্ধনপ্রণালী, ভোজ্য-তালিকা, বেশভূষা, বিবাহ-বিধি, পরনিন্দা প্রভৃতি অতি সাধারণ ব্যাপারকেও চণ্ডীমঙ্গলে আস্বাদ্য করিয়া তোলা হইয়াছে।' মনসামঙ্গলের কবি যেমন প্রত্যক্ষভাবে দেবতা ও মানবের দ্বন্দ্বের অবতারণা করিয়া অলৌকিক কাহিনী জমাইয়া তুলিয়াছেন, চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী তদ্রূপ নহে। এখানেও চণ্ডী পূজালোলুপা, কিন্তু কখনও উগ্র হইয়া আত্মপ্রকাশ করেন নাই; বস্তুত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চণ্ডী অন্তরালেই অবস্থান করিতেছেন। এমন কি কাহিনীর গঠনেও তাঁহার ভূমিকা অতি নগণ্য। গল্প চলিয়াছে আপন স্বভাবে। তাই চণ্ডীমঙ্গলের গল্প এত স্বাভাবিক, এত বাস্তব ও এত মানবিক। কী হরগৌরীর জীবন যাত্রায়, কী পশুদের ক্রন্দনে, কী কালকেতুর নগরপত্তনে, সর্বত্রই কবিদের বাস্তব, মানবমুখী এবং সমাজ-সচেতন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। চরিত্র-চিত্রণেও চণ্ডীমঙ্গলের কবিরা সর্বাধিক কৃতিত্বের পরিচয় দান করিয়াছেন। এমন কি চণ্ডীমঙ্গলকাহিনীর দেবী চণ্ডী অলৌকিক শক্তির অধিকারিণী হইলেও দেব-দেবীর মধ্যে তিনিই সর্বাধিক লৌকিক। মানুষের সুখদুঃখের সঙ্গে তিনিও জড়িত। কালকেতু বাঁকে করিয়া ঘড়া-বোঝাই ধন বহিয়া লইতেছে, পিছনে পিছনে চণ্ডীও চলিয়াছেন, তাঁহার কাঁখেও একঘরা ধন। কে বলিবে ইনি দেবী?

কাহিনী বিচার

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেন যে চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে, বিশেষত কালকেতুর কাহিনীতে সমসাময়িক যুগের সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাস অতি সুন্দরভাবে বিধৃত হইয়াছে। প্রাচীন বর্ণগত কৌলীন্য-প্রথা কীভাবে ক্রমশ কাঞ্চন-কৌলীন্যকেই স্বীকার করিয়া লইল, তাহার এক অতি উপাদেয় কাহিনী এই চণ্ডীমঙ্গল। বিত্তবান্ অনার্য ব্যাধসন্তানকে দমাইয়া রাখিবার জন্য ব্রাহ্মণ্য-সমাজাশ্রিত কলিঙ্গরাজ বিধিমত চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রজাসাধারণও প্রথমত অনার্য

চণ্ডীমঙ্গলে সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাস

রাজার রাজ্যে বসবাসে অনিচ্ছুকই ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাঞ্চনকৌলীন্যেরই জয় হইল, কলিঙ্গরাজ অনার্য ব্যাধ-সন্তান কালকেতুর সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন।

চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীর বিশ্লেষণ হইতে অতঃপর আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, এই কাব্যটিতেই উপন্যাসের ধর্ম অনেকটা পরিমাণ বর্তমান, ফলত এই দিক হইতে চণ্ডীমঙ্গলকেই সর্বাধিক আধুনিক ও প্রাগ্রসর কাব্য বলিয়া অভিহিত করা চলে।

অন্যান্য-মঙ্গলকাব্যরচয়িতার সংখ্যা যেমন সীমাহীন, চণ্ডীমঙ্গলের ক্ষেত্রে কিন্তু তাহা নহে। ড° সেন ১৯ জন চণ্ডীমঙ্গল-রচয়িতার কথা বলিলেও উল্লেখযোগ্য কবির সংখ্যা একান্তই মুষ্টিমেয়। কাহিনীর দিক হইতে কবিরা বিশেষ কোন স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিতে পারেন নাই। মোটামুটি গতানুগতিক-ভাবেই সকলে কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন।

মাণিক দত্ত ঃ চণ্ডীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁহার কাব্যের একাধিকস্থলে তাঁহার পূর্ববর্তী মাণিক দত্তের কথা উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

'মাণিক দত্তেরে আমি করিয়ে বিনয়।
যাহা হৈতে হৈল গীত পথপরিচয়॥'

অনেকেই অনুমান করেন যে এই মাণিক দত্ত চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের আদি গ্রন্থকার। ড° দীনেশ সেন মাণিকদত্তকে ত্রয়োদশ শতকের লোক বলিয়া মনে করেন। অসম্ভব নহে, যুগান্তর কালেই মাণিক দত্ত প্রথম চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু মাণিক দত্তের রচিত গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে বলিয়াই সমস্যা দাঁড়াইয়া গিয়াছে। মাণিকদত্তের গ্রন্থে চৈতন্যদেব এবং তাঁহার অনুচর-পরিকরদের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে; ইহাতে 'ফিরিঙ্গী' শব্দের প্রয়োগও লক্ষ্য করা যায়। কেহ কেহ ইহাতে কবি-কঙ্কণের প্রভাবও দেখিতে পাইয়াছেন। ইহার ভাষায়ও প্রাচীনত্বের লক্ষণ বিশেষ নাই। অতএব এই গ্রন্থের রচয়িতা মাণিকদত্তকে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কেন, ষোড়শ শতাব্দীতে স্থাপন করাও কষ্টকর।

পবিচয় ও কাল

ড° সুকুমার সেন বলেন, "প্রাপ্ত পুঁথির মাণিকদত্ত অষ্টাদশ শতাব্দের আগেকার লোক না হওয়াই সম্ভব। তিনি খানিকটা পুরাণো মাল-মশলা ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু সে মাল-মশলা পূর্বতন কোন মাণিকদত্ত-এর কাছে নেওয়া কিনা এবং নেওয়া হইলে কতটা নেওয়া তাহা

বলিবার উপায় নাই।" ডঃ সেনের উক্তি হইতে একটি সংশয়ের আভাষ পাওয়া যাইতেছে। মাণিকদত্ত কি দুইজন ছিলেন? যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে একজনকে চৈতন্য-পূর্ববর্তী যুগে স্থাপন করা চলিতে পারে। অপরজন হয়তো পূর্বতন মাণিকদত্তের নিকট হইতে প্রাপ্ত কিছু কিছু মাল-মশলা ব্যবহার করিয়াছিলেন। আর মাণিকদত্ত যদি একজনই হইয়া থাকেন, তবে সুনিশ্চিত ভাবেই তাঁহার কাব্যে প্রক্ষেপের প্রাচুর্য অসাধারণ।

কবির ব্যক্তিগত পরিচয়-সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থের সম্পাদক বলেন যে কবি মাণিক দত্ত সম্ভবত মালদহ জেলার ফুলুয়া নগরে (ফুলবাড়ী গ্রাম) জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কবির কাব্যে যে সমস্ত স্থানের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতেও অনুমিত হয় যে তিনি মালদহ অঞ্চলের লোক হইতে পারেন। কবির কাব্যপাঠে জানা যায় যে তিনি খঞ্জ ও বধির ছিলেন, দেবীর বরেই স্বাভাবিক দেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কবির কাব্যের সৃষ্টি পত্তন অংশে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বর্তমান। সপ্তদশ শতাব্দীর ধর্মমঙ্গল কাব্যসমূহে যে ধরণের সৃষ্টি-তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে, মাণিক দত্তের কাব্যেও তাহারই অনুরূপ কাহিনী দেখা যায়। চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীতে এই বৌদ্ধপ্রভাব বিস্ময়কর। অবশ্য মুকুন্দরামের কাব্যেও 'আদিদেব ঠাকুর নিরঞ্জন' এবং 'বৌদ্ধরূপ' ঠাকুর জগন্নাথের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু বৌদ্ধমতের এত সুস্পষ্ট প্রভাব ধর্মমঙ্গল-ব্যতীত অপর কোন কাব্যেই পাওয়া যায়না। মাণিক দত্তের কাব্যেও কালকেতু-ফুল্লরার কাহিনী এবং ধনপতি সদাগরের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। কাহিনীর দিক হইতে বৈশিষ্ট্য না থাকিলেও কোন কোন চরিত্র-সৃষ্টিতে মাণিকদত্ত কিছু কিছু নূতনত্বের পরিচয় দিয়াছেন: শিবধর্ম হইতে উদ্ভূত সবলকেতু ও ধবলকেতু নামে দুই ক্ষত্রিয় বীর শাপগ্রস্ত হইয়া ব্যাধরূপে জন্মগ্রহণ করে এবং তাহাদের বংশেই কালকেতু জন্মগ্রহণ করে। মাণিকদত্তের ভাঁড়ুদত্ত নিছক 'ভিলেন' (villain) চরিত্র নহে; ভাঁড়ু শিবের উপাসক বলিয়াই চণ্ডীর কোপে পড়িয়া সর্বস্বান্ত হইয়াছিল এবং পরে দুর্গার শরণাপন্ন হইয়া রক্ষা পায়। এই ভাঁড়ু গ্রন্থনায়ক কালকেতুর প্রতিদ্বন্দ্বী—ভাঁড় মাত্র নহে।

কাহিনী-বিচার

মাণিকদত্তের কাব্যে হেঁয়ালী-জাতীয় কিছু কিছু ছড়ার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এইগুলিকে প্রাচীনত্বের নিদর্শন বলিয়াই গ্রহণ করা চলে। কবি তাঁহার কাব্যের নাম বলিয়াছেন 'ভবানী মঙ্গল' বা 'দুর্গামঙ্গল।'

দ্বিজ মাধব ঃ চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের অন্যতম প্রধান কবি দ্বিজমাধব স্বীয় গ্রন্থে আত্মপরিচয় এবং গ্রন্থ-রচনাকালের উল্লেখ করিলেও তাহা মানিয়া লইবার পক্ষে অসুবিধার কারণ রহিয়াছে। তিনি আত্ম-পরিচয়-জ্ঞাপক শ্লোকে বলিয়াছেন ঃ

'পরাশর পুত্রজাত মাধব যে নাম।
কলিকালে হইত জগত অনুপাম ॥'

জন্মস্থানহিসাবে কবি নবদ্বীপের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ কেহ এই প্রসঙ্গে সপ্তগ্রামের কথাও উল্লেখ করিয়া থাকেন। আবার 'শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল' কাব্যের কবি মাধব আচার্যও আত্মপরিচয়-সূত্রে বলিয়াছেন ঃ

'পরাশর নামে দ্বিজকুলে অবতার।
মাধব তাহার পুত্র বিদিত সংসার ॥'

এই মাধব আচার্যও ষোড়শ শতাব্দীতে নবদ্বীপ-ধামে জন্ম গ্রহণ করেন। আবার ময়মনসিংহ জেলার যশোদলগ্রামের গোস্বামীদের নিকট তাঁহাদের পূর্বপুরুষ বলিয়া কথিত 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'-রচয়িতা মাধব আচার্যের নামে 'মাধব-বংশতত্ত্ব' নামে যে কুলপঞ্জিকা আছে, তাহাতে জানা যায় যে গঙ্গাতীরবাসী পরাশর-পুত্র মাধব পরবর্তীকালে ময়মনসিংহ জেলার মেঘনা-তীরে আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। অতএব মনে হয়, 'শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল'-রচয়িতা মাধব আচার্যের আত্মপরিচয়শীর্ষক অংশ অনুলিপিকারদের

সমস্যা

কল্যাণে দ্বিজমাধবের গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই অনুমানের স্বপক্ষে আরও একটি প্রবল যুক্তি এই যে, দ্বিজমাধব-রচিত চণ্ডীমঙ্গলগ্রন্থ প্রধানত চট্টগ্রাম ও কিছু কিছু নোয়াখালি এবং রংপুর অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। মাধবের জন্মস্থানরূপে পরিচিত নবদ্বীপ, সপ্তগ্রাম কিংবা ময়মনসিংহ অঞ্চলে একখানি গ্রন্থও পাওয়া যায় নাই। আবার গ্রন্থে যে সমস্ত ভৌগোলিক তথ্য পাওয়া যায়, তাহা নবদ্বীপ-সন্নিহিত অঞ্চলেরই অনুরূপ। অতএব, মাধবের জন্মস্থান নির্ণয় করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দ্বিজমাধব নবদ্বীপে কাব্য রচনা করিয়া যদি তাহা লইয়া চট্টগ্রামে চলিয়া আসিয়া থাকেন, তবেই এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে। কিন্তু ইহা নেহাৎই কষ্ট-কল্পনা মাত্র। অতএব চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে প্রোক্ত শ্লোকটিকে প্রক্ষিপ্ত মনে করাই সঙ্গত।

দ্বিজমাধব তাঁহার কাব্যে কাল-পরিচয়-জ্ঞাপক শ্লোকে বলিয়াছেন :

'ইন্দুবিন্দু বাণধাতা শক নিযোজিত।
দ্বিজমাধব গায়ে সারদাচরিত॥'

অর্থাৎ কবি ১৫০১ শকাব্দে (=১৫৭৯ খ্রীঃ) কাব্য রচনা করেন। তিনি আবার অন্যত্র বলিয়াছেন :

'পঞ্চগৌড় নামে স্থান পৃথিবীর সার।
একাব্বর নামে রাজা অর্জুন অবতার॥'

কিন্তু ১৫৭৯ খ্রীঃ যদিও আকবর সিংহাসনে আসীন ছিলেন, তবু সমগ্র বঙ্গে বিশেষত পূর্ববঙ্গে তাহার প্রতাপ বিস্তৃত হয় নাই। কবির প্রদত্ত শকের হিসাব এবং আকবরের উল্লেখের মধ্যে সঙ্গতিবিধান কষ্টকর। ডঃ সুকুমার সেন তারিখ-সম্বন্ধীয় পদটির যে পাঠান্তর আবিষ্কার করিযাছেন—'ইন্দুবিন্দুবাণ-দাতা সব নিয়োজিত'—তাহাতে কবির গ্রন্থ ১৬৪৪ খ্রীঃ—১৬৪৭ খ্রীঃ মধ্যে রচিত হইয়াছিল বলিয়া বোঝা যায়। কিন্তু ইহাতেও আকবরের সঙ্গে কালের সঙ্গতি বজায় থাকেনা। অতএব এতদুভয়ের কোন স্থলে একটা প্রমাদ বর্তমান থাকা অসম্ভব নহে।

দ্বিজ মাধব স্বীয় কাব্যকে 'সারদাচরিত' এবং কোথাও 'সারদামঙ্গল' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থে ইহার নাম প্রদত্ত হইয়াছে 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত।' কিন্তু মনে হয়, সেকালে মঙ্গলচণ্ডীর গীত বলিতে বোধ হয় মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালীকেই বুঝাইত।

সারদামঙ্গল

কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থটি পাঁচালীমাত্র,—এই বিবেচনায় ইহার 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' নামকরণ সঙ্গত হয় নাই। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা চলে যে চট্টগ্রাম অঞ্চলে 'সুকবি মাধবাচার্য-বিরচিত জাগরণ' নামক ব্রতকথা বা পাঁচালীজাতীয় গ্রন্থের বিস্তৃতি ও প্রচার যথেষ্ট।

মাধবের কাব্য তিনখণ্ডে বিভক্ত : দেবখণ্ড, আখেটিক খণ্ড এবং বণিক্ খণ্ড। অন্যান্য কাব্যের সহিত কাহিনীর দিক দিয়া ইহার কোন পার্থক্য নাই, তবে ইহাতে একটি পুরাণ-কথিত কাহিনী যুক্ত আছে, যাহা অপর কোন মঙ্গলকাব্যেই পাওয়া যায় নাই। কাহিনীটি দেবীকর্তৃক মঙ্গলদৈত্য বধ। মূলকাহিনী আরম্ভ হইবার পূর্বেই কবি দেবীকে দিয়া মঙ্গলদৈত্য বধ করাইয়া লইয়াছেন। ইহার পর গতানুগতিক ভাবেই কাহিনী অগ্রসর হইয়াছে।

দ্বিজমাধব গভীর তথ্যানুসন্ধানী দৃষ্টির সাহায্যে জীবনকে দেখিয়াছেন এবং সেই দৃষ্টির আলোকে কাব্যখানি রচনা করিয়াছেন ; এই কারণেই

তাঁহার কাব্যে বাস্তবতা এমন স্পষ্ট। বস্তুত, বাঙলাসাহিত্যে ইহার পূর্ববর্তী কোন কাব্যে এমন সার্থক ভাবে বাস্তবরস-সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষিত হয় নাই। ভাঁড়ুদত্তের চরিত্র-সৃষ্টিতেও কবি অপরিসীম দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। ভাঁড়ুর কূটবুদ্ধি, চাতুরী ও বঞ্চনার চিত্রটি যেমন উজ্জ্বল হইয়া চিত্রিত হইয়াছে, তেমনি স্পষ্টভাবে অঙ্কিত হইয়াছে ভাঁড়ুর অপরাধ এবং শাস্তিবিধানের কাহিনী। অন্যত্র 'আনুপূর্বিক সঙ্গতি রক্ষা করিয়া পূর্ণাঙ্গ চরিত্র সৃষ্টির এমন মৌলিক প্রয়াস' লক্ষ্য করা গেলেও কবিকঙ্কণের তুলনায় মাধবের অঙ্কিত চিত্রগুলি অনেকটা ধূসর বলিয়াই মনে হয়। কাহিনীর দিক হইতেও দ্বিজ মাধবের কাব্য অনেকটা অপরিসর,—কবি তেমন আঁট-সাট করিয়া গল্প জমাইয়া তুলিতে পারেন নাই। অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন কবি মুকুন্দরামের পাশে দ্বিজ মাধবকে তত উজ্জ্বল বলিয়া মনে না হইলেও অপরাপর মঙ্গলকাব্যে তাঁহার তুল্য কবি যে কমই ছিলেন, তাহা প্রায় নিঃসন্দেহে বলা চলে। মুকুন্দরাম যদি শিল্পীকবি হইয়া থাকেন, তবে দ্বিজ মাধব ছিলেন স্বভাবকবি।

কাব্য-বিচার

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঃ মঙ্গলকাব্যের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁহার কাব্যে যে আত্মপরিচয় দান করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়, কবির পৈতৃক বাসভূমি ছিল বর্ধমান জেলার দামুন্যা (দামিন্যা) গ্রাম। 'গৌড়বঙ্গ-উৎকল-অধিপ' রাজা মানসিংহের রাজত্বকালে (১৫৯৪-১৬০৫ খ্রীঃ) প্রজার পাপের ফলে মামুদ শরীফ হইলেন ডিহিদার। তাহার অত্যাচারে কবিকে দেশত্যাগ করিতে হইল। কবি পথে কোথাও আনুকূল্য লাভ করিলেন, কোথাও প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হইলেন। যাহা হউক কুচট্যা নগরে উপনীত হইয়া কবি তথায়,—

'তৈল বিনা কৈলুঁ স্নান করিনু উদক পান,
শিশু কাঁদে ওদনের তরে।'

এই স্থানে ক্ষুধায় ভয়ে পরিশ্রমে কবি নিদ্রা গেলেন, তখন 'চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে।' চণ্ডী তাঁহাকে কাব্য-রচনার নির্দেশ দান করিলে কবি ব্রাহ্মণ-ভূমি আড়রা নগরে রাজা বাঁকুড়ারায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কবির পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া রাজা কবিকে পুত্র রঘুনাথের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করিলেন। কালক্রমে রাজা বাঁকুড়ারায়ের মৃত্যু ঘটিলে 'রাজগুণে অবদাত' রঘুনাথ রাজা হইলেন। তাঁহারই সভার সভাসদ্ রূপে কবি তাঁহার কাব্য রচনা করেন। কাব্যের নামরূপে তিনি 'অভয়ামঙ্গল'ই বারবার ব্যবহার

করিয়াছেন, কদাচিৎ বলিয়াছেন 'নৌতুনমঙ্গল।' কবির অন্যান্য পরিচয়ে জানা যায়,—কবির পিতা হৃদয়মিশ্র, পিতামহ জগন্নাথ মিশ্র, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কবিচন্দ্র। সম্ভবত কবির পুত্র শিবরাম, পুত্রবধূ চিত্রলেখা, কন্যা যশোদা এবং জামাতা ছিলেন মহেশ। এই আত্মপরিচয়ে কোন তারিখের উল্লেখ না থাকিলেও হিসাবে মিলিতেছে না। কারণ মানসিংহের রাজত্বকালে ডিহিদার মামুদ শরীফের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়াই যদি কবিকে গৃহত্যাগ করিতে হয়, তবে তাহা ১৫৯৪ খ্রীঃ-র পরবর্তী কোন সময় হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তখনই রাজা রঘুনাথ আবার রাজারূপে অধিষ্ঠিত। রঘুনাথের রাজত্বকাল ১৫৭৩ খ্রীঃ—১৬০৩ খ্রীঃ। বাঁকুড়া রায়কে যে শুধু তখন পাওয়া যাইতেছে না, তাহা নহে; কবির বর্ণনা-অনুযায়ী তখন রঘুনাথ সম্ভবত শিশুই ছিলেন। আবার কবি যে কালে ডিহিদারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, ঐতিহাসিক মতে ঐকালে নাকি ডিহিদার-পদেরই উদ্ভব হয় নাই। অতএব মুকুন্দরামের বর্ণনায় কোথাও ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে অথবা প্রক্ষেপ ঢুকিয়াছে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে।—এই অসঙ্গতির উপর যুক্ত হইয়াছে আরও একটি তথ্যঘটিত অসঙ্গতি। কবিকঙ্কণের কোন পুঁথিতে একটি তারিখ-জ্ঞাপক পদ পাওয়া যায়—

গ্রন্থোৎপত্তিতে আত্মকাহিনী

'শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কত দিনে দিলা গীত হরের বণিতা॥'

ইহা হইতে দুইটি তারিখ পাওয়া যায়—১৪৬৬ শক (১৫৪৪ খ্রীঃ) অথবা ১৪৯৯ শক (১৫৭৭ খ্রীঃ)। পূর্বোদ্ধৃত আত্মপরিচয়ের সঙ্গে ইহার সামঞ্জস্য-বিধান কষ্টকর। মুকুন্দরামের কাল-সম্বন্ধে যাঁহারা গবেষণা করিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই ধরিয়া লইয়াছেন যে মানসিংহের কালেই কবির কাব্য সমাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু কবির উক্তিতে তাহার সমর্থন নাই,—তিনি স্পষ্টতই বলিয়াছেন যে মানসিংহের কালে তিনি গৃহত্যাগ করিয়াছেন। অতএব কবির উক্তিকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিলে মনে হয়, কবি সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে হয়তো কাব্য রচনা করিয়াছেন। যাহা হউক, আরও নূতন কোন তথ্য আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত কবিকঙ্কণের কাল-সমস্যার সমাধান হইবে না বলিয়াই মনে হয়। ['বাসুলী-মঙ্গল'-রচয়িতা কবিচন্দ্র মুকুন্দের পুঁথিতেও কালজ্ঞাপক এই পয়ারটি পাওয়া যায়। নামসাদৃশ্যে ঐ শ্লোকটি কবিকঙ্কণের গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিতে পারে।]

কবির কাল

তাঁহার কাব্যে রাস্তবতা এমন স্পষ্ট। বস্তুত, বাঙলাসাহিত্যে ইহার পূর্ববর্তী কোন কাব্যে এমন সার্থক ভাবে বাস্তবরস-স্থষ্টির প্রয়াস লক্ষিত হয় নাই। ভাঁড়ুদত্তের চরিত্র-স্থষ্টিতেও কবি অপরিসীম দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। ভাঁড়ুর কুটবুদ্ধি, চাতুরী ও বঞ্চনার চিত্রটি যেমন উজ্জ্বল হইয়া চিত্রিত হইয়াছে, তেমনি স্পষ্টভাবে অঙ্কিত হইয়াছে ভাঁড়ুর অপরাধ এবং শাস্তিবিধানের কাহিনী। অন্যত্র 'আনুপূর্বিক সঙ্গতি রক্ষা করিয়া পূর্ণাঙ্গ চরিত্র স্থষ্টির এমন মৌলিক প্রয়াস' লক্ষ্য করা গেলেও কবিকঙ্কণের তুলনায় মাধবের অঙ্কিত চিত্রগুলি অনেকটা ধূসর বলিয়াই মনে হয়। কাহিনীর দিক হইতেও দ্বিজ মাধবের কাব্য অনেকটা অপরিসর,—কবি তেমন আঁট-সাট করিয়া গল্প জমাইয়া তুলিতে পারেন নাই। অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন কবি মুকুন্দরামের পাশে দ্বিজ মাধবকে তত উজ্জ্বল বলিয়া মনে না হইলেও অপরাপর মঙ্গলকাব্যে তাঁহার তুল্য কবি যে কমই ছিলেন, তাহা প্রায় নিঃসন্দেহে বলা চলে। মুকুন্দরাম যদি শিল্পীকবি হইয়া থাকেন, তবে দ্বিজ মাধব ছিলেন স্বভাবকবি।

কাব্য-বিচার

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী : মঙ্গলকাব্যের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁহার কাব্যে যে আত্মপরিচয় দান করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়, কবির পৈতৃক বাসভূমি ছিল বর্ধমান জেলার দামুন্যা (দামিন্যা) গ্রাম। 'গৌড়বঙ্গ-উৎকল-অধিপ' রাজা মানসিংহের রাজত্বকালে (১৫৯৪-১৬০৫ খ্রীঃ) প্রজার পাপের ফলে মামুদ শরীফ হইলেন ডিহিদার। তাহার অত্যাচারে কবিকে দেশত্যাগ করিতে হইল। কবি পথে কোথাও আনুকূল্য লাভ করিলেন, কোথাও প্রতিকুল অবস্থার সম্মুখীন হইলেন। যাহা হউক কুচট্যা নগরে উপনীত হইয়া কবি তথায়,—

'তৈল বিনা কৈলুঁ স্নান করিনু উদক পান,
শিশু কাঁদে ওদনের তরে।'

এই স্থানে ক্ষুধায় ভয়ে পরিশ্রমে কবি নিদ্রা গেলেন, তখন 'চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে।' চণ্ডী তাঁহাকে কাব্য-রচনার নির্দেশ দান করিলে কবি ব্রাহ্মণ-ভূমি আড়রা নগরে রাজা বাঁকুড়ারায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কবির পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া রাজা কবিকে পুত্র রঘুনাথের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করিলেন। কালক্রমে রাজা বাঁকুড়ারায়ের মৃত্যু ঘটিলে 'রাজগুণে অবদাত' রঘুনাথ রাজা হইলেন। তাঁহারই সভার সভাসদ্ রূপে কবি তাঁহার কাব্য রচনা করেন। কাব্যের নামরূপে তিনি 'অভয়ামঙ্গল'ই বারবার ব্যবহার

করিয়াছেন, কদাচিৎ বলিয়াছেন 'নৌতুনমঙ্গল।' কবির অন্যান্য পরিচয়ে জানা যায়,—কবির পিতা হৃদয়মিশ্র, পিতামহ জগন্নাথ মিশ্র, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কবিচন্দ্র। সম্ভবত কবির পুত্র শিবরাম, পুত্রবধূ চিত্রলেখা, কন্যা যশোদা এবং জামাতা ছিলেন মহেশ। এই আত্মপরিচয়ে কোন তারিখের উল্লেখ না থাকিলেও হিসাবে মিলিতেছে না। কারণ মানসিংহের রাজত্বকালে ডিহিদার মামুদ শরীফের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়াই যদি কবিকে গৃহত্যাগ করিতে হয়, তবে তাহা ১৫৯৪ খ্রীঃ-র পরবর্তী কোন সময় হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তখনই রাজা রঘুনাথ আবার রাজারূপে অধিষ্ঠিত। রঘুনাথের রাজত্বকাল ১৫৭৩ খ্রীঃ—১৬০৩ খ্রীঃ। বাঁকুড়া রায়কে যে শুধু তখন পাওয়া যাইতেছে না, তাহা নহে; কবির বর্ণনা-অনুযায়ী তখন রঘুনাথ সম্ভবত শিশুই ছিলেন। আবার কবি যে কালে ডিহিদারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, ঐতিহাসিক মতে ঐকালে নাকি ডিহিদার-পদেরই উদ্ভব হয় নাই। অতএব মুকুন্দরামের বর্ণনায় কোথাও ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে অথবা প্রক্ষেপ ঢুকিয়াছে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে।—এই অসঙ্গতির উপর যুক্ত হইয়াছে আরও একটি তথ্যঘটিত অসঙ্গতি। কবিকঙ্কণের কোন পুঁথিতে একটি তারিখ-জ্ঞাপক পদ পাওয়া যায়—

গ্রন্থোৎপত্তিতে আত্মকাহিনী

'শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কত দিনে দিলা গীত হরের বণিতা॥'

ইহা হইতে দুইটি তারিখ পাওয়া যায়—১৪৬৬ শক (১৫৪৪ খ্রীঃ) অথবা ১৪৯৯ শক (১৫৭৭ খ্রীঃ)। পূর্বোদ্ধৃত আত্মপরিচয়েব সঙ্গে ইহার সামঞ্জস্য-বিধান কষ্টকর। মুকুন্দরামের কাল-সম্বন্ধে যাঁহারা গবেষণা করিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই ধরিয়া লইয়াছেন যে মানসিংহের কালেই কবির কাব্য সমাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু কবির উক্তিতে তাহার সমর্থন নাই,—তিনি স্পষ্টতই বলিয়াছেন যে মানসিংহের কালে তিনি গৃহত্যাগ করিয়াছেন। অতএব কবির উক্তিকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিলে মনে হয়, কবি সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে হয়তো কাব্য রচনা করিয়াছেন। যাহা হউক, আরও নূতন কোন তথ্য আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত কবিকঙ্কণের কাল-সমস্যার সমাধান হইবে না বলিয়াই মনে হয়। ['বাসুলী-মঙ্গল'-রচয়িতা কবিচন্দ্র মুকুন্দের পুঁথিতেও কালজ্ঞাপক এই পয়ারটি পাওয়া যায়। নামসাদৃশ্যে ঐ শ্লোকটি কবিকঙ্কণের গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিতে পারে।]

কবির কাল

মুকুন্দরাম প্রাচীন ও মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। যে একমাত্র কবি তাঁহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সমর্থ, তিনি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র। ভারতচন্দ্র কাব্যের রূপকার হিসাবে উৎকৃষ্টতর হইলেও কবিকঙ্কণ জীবনশিল্পী-হিসাবে মহত্তর। কবিকঙ্কণের কাব্যে যে বাস্তবানুভূতি, চরিত্রসৃষ্টি-প্রচেষ্টা কিংবা বৃহত্তর মানবতাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়, ভারতচন্দ্রের কাব্যে তাহা একান্তভাবে অনুপস্থিত। অতএব সামগ্রিক বিচারে মুকুন্দরামকেই শ্রেষ্ঠতার আসন দান করা হয়। মুকুন্দ-রামের কাব্য বিশ্লেষণ করিলেই তাঁহার কাব্যরচনা-শক্তির যথার্থ পরিচয় পাওয়া যাইবে।

কাব্য-পরিচয়

গ্রন্থারম্ভেই কবি গ্রন্থোৎপত্তি-বর্ণনায় যে আত্মপরিচয় জ্ঞাপন করিয়াছেন, তেমন বাস্তব, সরস ও মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ সাহিত্যিক রচনা সমগ্র প্রাচীন ও মধ্য যুগের কোন গ্রন্থেই সুলভ নয়। অতঃপর কবি যে কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন তাহা তাঁহার উদ্ভাবিত নহে বলিযাই ইহাতে মৌলিকতার অবকাশ কম। কিন্তু যে দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া তিনি কাহিনী পরিবেষণ করিয়াছেন, কবির মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায় সেই দৃষ্টিভঙ্গীতে। কবি হরগৌরীর জীবনযাত্রার যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহাতে আদিদেব ও জগন্মাতার দেবত্ব হয়তো ক্ষুন্ন হইযাছে, কিন্তু সমসাময়িক যুগের বাঙালী নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, কোন ঐতিহাসিকের পক্ষেও ইহা অপেক্ষা বাস্তব ও নিখুঁত চিত্র অঙ্কন করা সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ। মেনকা ও গৌরীর কলহ, শিবের ভিক্ষা, শিব ও গৌরীর কলহ—ইহাদের মধ্যে যে জীবন-রস-রসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাই কবির কাব্যের বস্তু-সঞ্চয়কে বাস্তবরসে পরিণত করিয়াছে। বস্তুত এই বাস্তবতাই মুকুন্দরামের কাব্যের প্রাণ। পশুদের কাতর ক্রন্দনে, কালকেতুর জীবন-যাত্রায়, ফুল্লরার প্রার্থনায়, কালকেতুর রাজ্যপত্তনে—সর্বত্রই মুকুন্দরামের বাস্তবচিত্রাঙ্কন-ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। বাস্তবতার পরিচয় দ্বিজ মাধবের কাব্যেও বর্তমান। কিন্তু মাধবের কাব্যে তাহা নিছক বস্তু-সঞ্চয়ই হইয়া রহিয়াছে, মুকুন্দরাম একই উপাদানকে জীবনরসে নিষিক্ত করিয়া বাস্তবরসে পরিণত করিয়াছেন।

মানবিকতা ও বাস্তবতা

মুকুন্দরামের অপর বিশিষ্টতা প্রকাশ পাইয়াছে চরিত্র-চিত্রণে। এই বিষয়েও মধ্যযুগের অপর কোন কবি তাঁহার সমকক্ষতা দাবি করিতে পারেন না। দেব-দেবীর চরিত্রে তিনি মানবিকতা আরোপ করিয়া সজীব ও

স্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছেন। মানব চরিত্রগুলি ততোধিক সমৃদ্ধ। গ্রন্থের নায়ক কালকেতুর সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন:

'শয়ন কুৎসিত বীরের ভোজন বিটকাল।
ছোট গ্রাস গেলে যেন তে-আঁটিয়া তাল॥'

আমাদের ভাগ্য যে কবি কালকেতুকে ভদ্রবীর করিয়া তোলেন নাই। ফুল্লরা সখী বিমলার বাড়িতে গেলে বিমলা তাহাকে বলে,

'আস্থ গো প্রাণের সই বস্থ গো বুহিনী।
মোর মাথায় গোটাকত দেখহ উকুনী॥'

কবি যেন এক একটা চরিত্রকে আমাদের চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন। একমাত্র ভদ্র চরিত্রগুলিতেই কবি যেন কিছুটা অসহায় হইয়া পড়িয়াছেন, নতুবা ব্যাধ-চরিত্র কিংবা খল কুটিল চরিত্র-অঙ্কনে মুকুন্দরাম অতুলনীয়। মুকুন্দরামের মুরারি শীল এবং তৎপত্নী 'বাণ্যানী'-চরিত্র এককথায় অনবদ্য। এত স্বল্পপরিসরে এমন জীবন্ত চরিত্রসৃষ্টির নিদর্শন যে কোন কালেই দুর্লভ। মুকুন্দরামের ভাঁড়ুদত্ত এবং দুর্বলাদাসীও নানা কারণেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। 'মুকুন্দরাম খুব বৃহৎ মহৎ বিস্ময়কর বিশাল চরিত্র সৃষ্টি করিতে না পারিলেও সাধারণ, প্রত্যক্ষ, পরিচিত ও পাঁচাপাঁচি বাস্তব চরিত্রাঙ্কনে অসাধারণ কুশলতা দেখাইয়াছেন।' (ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়)

চরিত্র সৃষ্টিতে দক্ষতা

বস্তুত বাস্তবতা, চরিত্রসৃষ্টিক্ষমতা এবং উদার মানবিকতাবোধের জন্য মুকুন্দরামের কাব্য খ্যাতির উত্তুঙ্গ চূড়ায় আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই সমস্ত লক্ষণ বিচার করিয়াই আধুনিক সমালোচকগণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলকে উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সুস্পষ্টভাষায় বলিযাছেন: 'দক্ষ ঔপন্যাসিকের অধিকাংশ গুণই তাঁহার মধ্যে বর্তমান ছিল। এ যুগে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি যে কবি না হইয়া একজন ঔপন্যাসিক হইতেন তাহাতে সংশয় মাত্র নাই।' ডঃ সুকুমার সেনের মতে, 'নিপুণ পর্যবেক্ষণ, জীবনে আস্থা, ব্যাপক অভিজ্ঞতা ইত্যাদি যে সব গুণ ভালো উপন্যাস-লেখকের রচনায় আমরা প্রত্যাশা করি, সে সব গুণ, সেকালের পক্ষে যথোচিত পরিমাণে মুকুন্দরামের কাব্যে পাই।' সুদীর্ঘ কাল পূর্বে মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত কবিকঙ্কণের কাব্য পাঠ করিয়া লিখিয়াছিলেন: 'The thought and feelings and sayings of his men and women

কাব্যে উপন্যাসের লক্ষণ

are perfectly natural, recorded with fidelity which has no parallel in the whole range of Bengali Literature'. প্রাচ্য সাহিত্যরসিক ই. বি. কাওয়েল (E. B. Cowell) মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল-পাঠে সন্তোষ লাভ করিয়া তাহার অংশবিশেষ ইংরেজীভাষায়ও অনুবাদ করিয়াছিলেন। উক্ত কাব্য-সম্বন্ধে তাঁহার সুস্পষ্ট অভিমত: 'It is this vivid realism which gives such a permanent value to the description.'

কেহ কেহ মুকুন্দরামকে দুঃখবাদী কবি বলিযা মনে করিয়া থাকেন। এই সিদ্ধান্তের পশ্চাতে সম্ভবত নিম্নোক্ত যুক্তিগুলিই প্রধান: মুকুন্দরাম যে আত্ম-পরিচয় দান করিয়াছেন, তাহাতে স্বীয় জীবনের অপরিসীম দুঃখ-দুর্গতির কাহিনী বর্তমান; পশুগণের কাতর ক্রন্দনে কবির ব্যথাতুর জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়; ফুল্লরার বারমাস্যায় দুঃখের অতি বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে; পরিশেষে গরীব দুঃখীদের জীবন-চিত্রেই কবি-প্রতিভার সমধিক স্ফূর্তি লক্ষ্য করা যায়। তথ্য হিসাবে উপযুক্ত উদাহরণগুলি সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইলেও সিদ্ধান্তটি সমীচীন বলিয়া মনে হয়না। কারণ মুকুন্দরামের যে প্রখর বাস্তবানুভূতি ছিল তাহাতে বাস্তবদুঃখের চিত্রাঙ্কনে তাঁহার সার্থকতা ঘটিবেই। কবি যদি সহৃদয় হন (অবশ্য, কবিমাত্রই সহৃদয় হইয়া থাকেন), তবে অপরের দুঃখবেদনাকে আপন অন্তর দিয়া অনুভব করিয়া অনুরূপ-ভাবে আবার তাহাকে প্রকাশ করিতে পারেন। অতএব দুঃখের বাস্তবচিত্রণে কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়াই যে কবি দুঃখবাদী হইবেন, তেমন সিদ্ধান্ত অসঙ্গত। বস্তুত, মুকুন্দরাম যেমন দুঃখের চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তেমনি প্রতিটি দুঃখের শেষেই আশার আলোও দেখাইয়াছেন। তাঁহার কোন কাহিনীরই পরিণাম দুঃখময় নয়। পক্ষান্তরে কবি যে রঙ্গ-রসিক ছিলেন, তাহার পরিচয়ও গোপন রাখেন নাই। বহু চরিত্রেই অসঙ্গতি দেখাইয়া কবি যে রগড় করিয়াছেন, তাহাও তাঁহার দুঃখবাদী মনের পরিচায়ক নহে। অতএব কবি দুঃখবাদী ছিলেন—এই অভিমত ভ্রান্ত।

কবি কি দুঃখবাদী

মুকুন্দরামের ধর্মমত-সম্বন্ধে বহু বাদ বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। কবির পিতামহ গোপালমন্ত্রে দীক্ষা লইয়াছিলেন, কবি চৈতন্যবন্দনা করিয়াছেন, গ্রন্থের বহুস্থলেই কবির বিষ্ণুভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়—এই সকল লক্ষণ হইতেই কেহ কেহ কবিকে বৈষ্ণব বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন।

পক্ষান্তরে কবি শাক্তকাব্য রচনা করিয়াছেন, কৌলিক ধর্মে চক্রাদিত্য-শিবের সেবক ছিলেন, শিবের কৃপায় কবিত্ব শক্তি লাভ করিয়াছেন, গ্রন্থে সর্বদেবতারই বন্দনা করিয়াছেন,—এই সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া কি তবে কবিকে শাক্ত, শৈব সবই বলিব? বস্তুত যে কোন স্মার্ত ব্রাহ্মণের মতই কবি ছিলেন পঞ্চোপাসক। যে কোন শৈব অথবা শাক্ত আনুষ্ঠানিকভাবে বিষ্ণুপূজা করিয়া থাকেন, কিন্তু কোন বৈষ্ণব দায়ে না পড়িলে শিব বা শক্তির ধার ঘেঁষেননা—তাঁহাদের এই অনুদারতা সর্বজনবিদিত; অতএব মুকুন্দরাম যে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেননা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কবির ধর্মমত

সর্বশেষ, মুকুন্দরামের কাব্যের অপর একটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াই বক্তব্য শেষ করিব। আমরা বিভিন্ন অনুবাদ সাহিত্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে দেখিয়াছি, শ্রেষ্ঠ কবিদের সকলেই তত্তৎ কাব্যকে বাঙালীজীবনের সহিত খাপ খাওয়াইয়া নূতনভাবে রচনা করিয়াছেন। কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, মালাধর বসু প্রভৃতি প্রধান কবিদের সকলের সম্বন্ধেই উক্তিটি প্রযোজ্য। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম এই বিষয়ে পথপ্রদর্শকের গৌরব লাভ হইতে বঞ্চিত হইলেও তিনি যে বাঙালীজীবনের শ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে হরগৌরীর জীবনযাত্রার কাহিনী উল্লেখ করা চলে। বস্তুত, বলিয়া না দিলে বুঝিবার উপায় নাই,—এই কাহিনী কোন দেবতার লীলাকাহিনী। এই কাহিনীকে গদ্যভাষায় রূপান্তরিত করিয়া অনায়াসে আধুনিক বাঙালীর জীবনচিত্র বলিয়া চালাইয়া নেওয়া চলে। মুকুন্দরাম তাঁহার কাব্যে এই যে শাশ্বত বাঙালীজীবনের কাহিনী রচনা করিয়াছেন, ইহাকেই তাহার কবি-কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়া মনে করি।

বাঙালীর জীবনশিল্পী

অপ্রধান কবিগণঃ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের প্রধান কবির সংখ্যা একেবারেই মুষ্টিমেয়। যে সকল কবির কাব্য-সম্বন্ধে বিস্তৃত-ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহার বাহিরে স্বল্পসংখ্যক কবি স্বল্পতর প্রতিভা লইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। নিম্নে তাঁহাদের পরিচয় প্রদত্ত হইল।

'দ্বিজ জনার্দনে'র নামে প্রচারিত পুস্তিকাটিকে পাঁচালী বলাই সঙ্গত। গ্রন্থটি আয়তনে অতিশয় ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে কালকেতু এবং ধনপতি—উভয় গল্পই বর্তমান। তবে মূল কাহিনী ধনপতির; কালকেতুর কাহিনী

ইহার অঙ্গীভূত হইয়াছে মাত্র। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহা পাঁচালী; মঙ্গলকাব্য এবং ইহার ক্ষেত্র পৃথক্। অতএব ডঃ দীনেশ সেন ইহার উপর যে কারণে গুরুত্ব আরোপ করেন, তাহা এই: 'এইরূপ কোন চণ্ডীর গীতকে অবলম্বন করিয়া মাধবাচার্য তাঁহার কাব্য গঠন ও চরিত্রগুলির রেখাপাত করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই।' দীনেশবাবু গ্রন্থের প্রাচীনত্ব বুঝাইবার জন্য যে সকল সন-তারিখ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা নির্ভরযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়না।

দ্বিজ জনার্দন

মুকুন্দরামের কাব্যের একস্থলে একটি শ্লোক পাওয়া যায়—

'বন্দিলুঁ গীতের গুরু শ্রীকবিকঙ্কণ।
প্রণাম করিয়া পিতামাতার চরণ॥'

এই কবিকঙ্কণ-সম্বন্ধে অনেকেই অনুমান করেন যে, উক্ত-উপাধিক ব্যক্তি হয়তো মুকুন্দরামের সঙ্গীতবিদ্যার গুরু ছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, মেদিনীপুর-বাসী বলরাম কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের পূর্বেই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। মুকুন্দরাম প্রাগ্‌বর্তী মাণিকদত্তের সঙ্গে তাঁহার নামও উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত বলরাম কবিকঙ্কণ নামেই শুধু বর্তমান। তাঁহার কাব্যের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। বহুকষ্টে তাঁহার পুঁথির নকলের যে নকল আবিষ্কার করা হইল তাহাও কোন গ্রন্থ নহে, কয়েকটি খণ্ডিত পত্র মাত্র। অতএব, তাঁহার পুঁথি আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত এই বিষয়ে আলোচনা নিরর্থক।

বলরাম কবিকঙ্কণ

সম্প্রতি দ্বিজ রামদেব-রচিত 'অভয়ামঙ্গল' নামক একখানি গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। গ্রন্থে রচনার তারিখ দেওয়া হইয়াছে: 'ইন্দুবাণ রিসিবাণ বেদসহ জিত' অর্থাৎ ১৫৭১ শকাব্দ বা ১৬৪৯ খ্রীঃ। কবি দ্বিজমাধব এবং মুকুন্দরামের পরবর্তী ছিলেন। কবি সম্ভবত চট্টগ্রাম বা ত্রিপুরা অঞ্চলের লোক ছিলেন। ডঃ ক্ষুদিরাম দাস গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে দ্বিজরামদেবের কাব্য মাধবের কাব্য হইতেও উৎকৃষ্ট। তিনি আরও বলিয়াছেন, 'রামদেবের গ্রন্থে শতাধিক উৎকৃষ্ট পদের সংস্পর্শে আসিতে হয়। ইহার অধিকাংশ রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কে রচিত। ঘটনাবিশেষের প্রারম্ভে তদুচিত পদ-সন্নিবেশের এই কৌশলটি রামদেব তৎকাল-প্রচলিত চৈতন্যমঙ্গল গান হইতে পাইয়া থাকিবেন।' যাহা হউক, এখনও গ্রন্থটির সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

দ্বিজরামদেব

কবি মুক্তারাম সেন তাঁহার 'সারদামঙ্গল' গ্রন্থটি সম্ভবত ১৬৬৯ শকাব্দে

(১৭৪৭ খ্রীঃ) রচনা করিয়াছিলেন। কবি তাঁহার গ্রন্থে বিস্তৃত আত্মপরিচয় দান করিয়াছেন। তাহাতে জানা যায় যে কবির পিতার নাম মধুরাম,—জাতিতে বৈদ্য, কবি চট্টগ্রামের অন্তর্গত দেবগ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার জনৈক পূর্বপুরুষ যশোহর জেলার কালিয়া গ্রাম হইতে চট্টগ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। গ্রন্থে যে হরিলাল-নামে ভণিতাটি পাওয়া যায়, তাহা কবিরই নামান্তর বলিয়া মনে হয়।

মুক্তারাম সেন

কবির কাব্যটি ক্ষুদ্রকায়, রচনাভঙ্গীও অনেকটা পাঁচালী-জাতীয়। লক্ষণীয় বিষয় এই, কবি চট্টগ্রামের অধিবাসী হইলেও তাঁহার কাব্যে দ্বিজ মাধবের কোন প্রভাব নাই। মুক্তারামের কাব্যের ভাষা সরল, পাণ্ডিত্য-প্রকাশের কোন প্রচেষ্টা দেখা যায় না।

দ্বিজ হরিরাম একখানা বৃহৎ চণ্ডীমঙ্গলকাব্য রচনা করিলেও তাঁহার সম্বন্ধে খুব বেশি সংবাদ জানা যায়না। তবে তিনি বিদ্রোহী শোভাসিংহের আশ্রয়ে থাকিয়া কাব্যখানি রচনা করিয়াছেন, এই অনুমানে তাঁহাকে সপ্তদশ শতকের শেষ ও অষ্টাদশ শতকের কবি বলিয়া মনে করা হয়। ডঃ দীনেশ সেন হরিরামকে কবিকঙ্কণের পূর্ববর্তী বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা যথার্থ নহে। মুকুন্দরামের কাব্যের সহিত তাঁহার কাব্যের বিস্ময়কর সাদৃশ্য হইতে বরং ইহাই প্রমাণিত হয় যে কবি হরিরাম মুকুন্দরামের দ্বারাই প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। কবির রচনায় পাণ্ডিত্য এবং কবিত্বের পরিচয় পাওয়া গেলেও চরিত্র-চিত্রণে তিনি প্রধান কবিদের কাছেও দাঁড়াইতে পারেন না।

দ্বিজ হরিরাম

ভবানীশঙ্কর দাস 'মঙ্গলচণ্ডীপাঞ্চালিকা' নামে যে গ্রন্থখানি রচনা করেন, আকারে তাহা নাতিবৃহৎ। কবি তাঁহার কাব্যে যে আত্মপরিচয় দান করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে তাঁহার পিতার নাম ছিল নয়ন রায়, নিবাস চট্টগ্রাম জেলার চক্রশালাপুরী, কবি জাতিতে কায়স্থ। ১৭০১ শকাব্দে (১৭৭৯ খ্রীঃ) কবি কাব্য রচনা করিয়াছেন বলিয়া গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। কবি শিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। গ্রন্থে প্রচুর সংস্কৃত শব্দ ও ক্রিয়াপদের ব্যবহার দ্বারা পাঠকের বিপত্তি ঘটাইয়াছেন। স্থলবিশেষে তিনি এমন সন্ধিযুক্ত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার পণ্ডিতী ভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়, রসবোধের নহে।—

ভবানীশঙ্কর

'যা হোস্তে হইলোৎপত্তি ভবাচ্যুতধাতা।'
'শৃণুধ্বং সাধব সব কর অবধান।'

গ্রন্থে অনেকগুলি রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, কবি এইগুলিকে 'ঘোষা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই পদগুলিতেই প্রকৃতপক্ষে তাঁহার কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

৩. ঃ ধর্ম-মঙ্গল

প্রধান তিনটি মঙ্গলকাব্যের মধ্যে ধর্মমঙ্গল একটি হইলেও ইহার উদ্ভব ঘটিয়াছিল অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে। যদি বা চৈতন্য-পূর্ব যুগেই কাব্যটির উৎপত্তি হইয়া থাকে, তবে তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। ধর্মমঙ্গলকাব্যে ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রাচীন আর্য-সাহিত্যে ধর্ম শব্দটীর অভাব নাই, এমন কি একজন ধর্মঠাকুরকেও খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে। মৃত্যু-দেবতা যমের অপর নামই তো ধর্মরাজ। কিন্তু ধর্মমঙ্গলকাব্যে যে ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রচার করা হইয়াছে, তাহার সহিত ধর্মরাজ যমদেবতার দূরতম সম্পর্কও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মনসা এবং চণ্ডীর উদ্ভবের জন্য যেমন আমাদিগকে প্রধানত অনার্য-সমাজের দ্বারস্থ হইতে হইয়াছিল, ধর্মঠাকুরের জন্যও আমাদিগকে সেই পথই অবলম্বন করিতে হইবে। বস্তুত, মনসা এবং চণ্ডীর উপর যদিও বা আর্যদেব-দেবীদের কিছুটা প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, ধর্মঠাকুরের ক্ষেত্রে সেই প্রভাবও প্রায় দুর্লক্ষ্য বলিয়াই অনুভূত হয়।

ধর্মঠাকুরের উদ্ভব ঃ

ধর্মঠাকুরের পূজা বাঙলাদেশের একটা বিশেষ অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ; বস্তুত উত্তর-রাঢ়ভূমির বাহিরে ধর্মঠাকুর প্রায় অপরিচিত বলিলেই হয়। ধর্মঠাকুর শুধু যে স্থানীয় দেবতা তাহাই নহে, তিনি ঐ স্থানের আদিম অধিবাসীদেরই দেবতা। আর্য-আগমনের পূর্বে এই অঞ্চলটি প্রধানত নিষাদ বা অষ্ট্রীকজাতীয় আদিম অধিবাসীদের দ্বারাই অধ্যুষিত ছিল। অবশ্য একসময় প্রায় গোটা বাঙলাদেশেরই ছিল এই অবস্থা। তারপর কালক্রমে বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চল আর্যসভ্যতার কবলিত হইল। সম্ভবত এই উত্তররাঢ়-অঞ্চলই শেষ পর্যন্ত আপন স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। অতঃপর সেনরাজবংশের কালে, অথবা খুব আগে হইলে পালরাজবংশের কালেই বাংলাদেশের এই অঞ্চলটিতে আর্যসভ্যতা বিস্তার লাভ করে। ইহার পরবর্তী কাহিনী প্রায় সর্বত্রই এক। প্রথমে আর্য ও অনার্যের বিরোধিতা এবং পরে কিছুটা নিজেদের প্রয়োজনে, কিছুটা বহিঃশক্তির

আক্রমণে বাধ্য হইয়া উভয় শক্তির মধ্যে একটা সমীকরণের প্রক্রিয়া চলিতে আরম্ভ করে। এই ভাবেই অনার্য সমাজ হইতে মনসা এবং চণ্ডী কিছুটা আর্যভাবধারায় সংস্কৃত হইয়া আর্যসমাজে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছিলেন। ধর্মঠাকুরও এই উপায়েই আর্যসমাজে গৃহীত হইলেন, কিন্তু সংস্কারের ফলে প্রাগুক্ত দেবীরা ক্রমে যে শ্রদ্ধা ও মর্যাদার আসন লাভ করিয়াছিলেন, ধর্মঠাকুরের কপালে ততটা জুটিল না। রাঢ় অঞ্চলে আর্য্যসভ্যতা-বিস্তারে অনেকটা বিলম্ব হইয়াছিল বলিয়াই ধর্মঠাকুরের প্রভাব এবং তৎসম্বন্ধীয় সংস্কার অনার্যদের মনে এত দৃঢ়মূল হইয়া গিয়াছিল যে পরবর্তীকালে ধর্মঠাকুরের উপর কোনপ্রকার সংস্কারই বোধ হয় তাহাদের পক্ষে সহনীয় ছিল না। তাই, ধর্মঠাকুর অপেক্ষাকৃত আদিমরূপেই আর্যসমাজে গৃহীত হইলেন। ধর্ম-ঠাকুরের উপর মাজা-ঘষার কাজটা খুব কম হইয়াছিল বলিয়াই উচ্চবর্ণের আর্যসমাজ ধর্মঠাকুরকে প্রায় কোন কালেই স্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই। ব্যাধদের দেবতা চণ্ডী পরবর্তী কালে উচ্চবর্ণের হিন্দুর গৃহে স্থান লাভ করিয়াছেন; মেয়েদের হাতেই মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত ন্যস্ত থাকিলেও চণ্ডী-পূজায় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সহায়তাও আবশ্যক হয়। কিন্তু ধর্মঠাকুরের পূজার অধিকার পূর্বাপরই পঞ্চমবর্ণের হাতে রহিয়া গিয়াছে। ধর্মপূজায় ডোম-জাতীয় পুরোহিতদেরই অগ্রাধিকার স্বীকৃত হয়; অবশ্য নিম্নবর্ণের আরও কোন কোন শ্রেণীর লোকও ধর্ম-পূজা করিয়া থাকেন। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণরাই অবশ্য ধর্ম্মমঙ্গলকাহিনী রচনা করিয়াছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও স্বীকার করিয়াছেন, 'জাতি যায় তবে প্রভু যদি করি গান'— ধর্মমঙ্গলকাব্য-রচয়িতার জাতি যাইবার আশঙ্কা ছিল। আবার ধর্মঠাকুর যখন ব্রাহ্মণদের হাতে পড়িলেন, তখন অবশ্য তাঁহাকে কিছুটা মাজা-ঘষা করিয়া একেবারে—

মূলত অনার্য সমাজ হইতে

> শঙ্খচক্রগদাপদ্ম চতুর্ভুজ ধারী।
> আঁখির নিমেষে হলো সেই ব্রহ্মচারী॥'

ধর্মঠাকুরকে চতুর্ভুজ নারায়ণে পরিণত করিয়া ফেলা হইয়াছে। ধর্মঠাকুরের পূজার যে সমস্ত উপকরণ এখনও প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইতেও তাঁহার অনার্যত্বের পরিচয় পাওয়া যাইবে। শূকর, ছাগ, শাদা মোরগ, পায়রা, মদ ইত্যাদি উপকরণ এখনও পর্যন্ত ধর্মঠাকুরের পূজায় প্রয়োজনীয় বলিয়াই বোঝা যায় যে অন্যান্য গ্রাম্য দেব-দেবীর মতো

ধর্মঠাকুরের আর্যীকরণ কখনও সম্পূর্ণ হয় নাই ; আদিমকালের ধর্মঠাকুর প্রায় অপরিবর্তিতই আছেন, শুধু উপরে এক আর্য-আবরণ পড়িয়াছে মাত্র।

ধর্মঠাকুরের কোনও প্রকার মূর্তি নাই। সাধারণত কূর্মাকৃতি একখণ্ড শিলাকেই ধর্মঠাকুর বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই শিলাখণ্ডের উপরিভাগ অনেকটা বৌদ্ধস্তূপের আকৃতি বিশিষ্ট ; পরন্তু বৌদ্ধ ত্রিশরণের অন্যতম 'ধর্ম' ; বুদ্ধদেবের নামান্তরও ধর্ম। এই সাদৃশ্য হইতেই মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ডঃ দীনেশ সেন প্রভৃতি মনে করেন যে ধর্মঠাকুর প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধদেবতা মাত্র। কিন্তু এই স্থূল সাদৃশ্যটুকুর বাহিরে যে বিপুলতর বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়, তাহাতে ধর্মঠাকুরকে বৌদ্ধদেবতা বলিয়া মানিয়া লওয়াও সহজ নহে।

বৌদ্ধপ্রভাব

অবশ্য ধর্মমঙ্গলে যে সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহার 'শূন্যতাবাদে' এবং 'আদিদেব নিরঞ্জনে'র পরিকল্পনায় কিছুটা বৌদ্ধ-প্রভাব থাকা বিচিত্র নহে। হয়তো হিন্দুদের আগেই স্থানীয় অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করিয়াছিল এবং বৌদ্ধগণ আদিম গ্রাম্যদেবতা ধর্মঠাকুরকে একটু মাজিয়া ঘষিয়া লইয়াছিলেন। নতুবা বৌদ্ধধর্মের মূলনীতি অহিংসাবাদের কোন সমর্থনই ইহাতে নাই। পূজায় বলিদান তো আবশ্যিক বটেই, এমন কি, ধর্মঠাকুরের ভক্তগণ যে ভাবে আত্মনির্যাতন করিয়া থাকেন, তদনুরূপ কৃচ্ছ্রতা বৌদ্ধ-ধর্মে নিন্দিতই হইয়া থাকে।

কেহ কেহ আবার কূর্মাকৃতি শিলাখণ্ডকে বিষ্ণুর কূর্মাবতার মনে করিয়া ধর্মের উপর হিন্দুপ্রভাব আরোপের কথা বলিয়া থাকেন। এই প্রসঙ্গে শিব, সূর্য এবং যমের কথাও অপরেরা উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু এই সকল ভাবনায় আমরা বড় জোর আত্মতুষ্টি লাভ করিতে পারি, কিন্তু বস্তুতই কি ধর্মঠাকুরের পূজাপ্রকরণ-পদ্ধতি আদির মধ্যে হিন্দুপ্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়? অন্তত সহস্রাধিক বৎসর হিন্দু-সংস্পর্শে আসিবার পরও যেখানে ধর্মের পূজায় শূকর বা মুরগী বলি দেওয়া হয়, এবং ডোম পুরোহিতই পূজার কার্য সমাধান করিয়া থাকেন, তখন প্রভাবের কথাটা বড় বেশি শোনায়। প্রাচীন অনার্য জাতির আদিম সংস্কারই যে দেশকালপাত্রভেদে সামান্য মাত্র রূপ পাল্টাইয়া বর্তমান ধর্মদেবতায় পরিণত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ডঃ সুকুমার সেনের সিদ্ধান্ত—'বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন স্তরের অনেক ঐতিহ্য ও কল্পনা ধর্মঠাকুরে

ধর্মঠাকুর কি কূর্মাবতার?

পরিণতি লাভ করিয়াছে।' এই অভিমতে কোন বিশিষ্টতা আরোপ না করিয়া সাধারণভাবে গ্রহণ করিলে বোধ হয় ইহাকে মানিয়া লওয়া চলে।

'ধর্ম' নামটি যে যমরাজের নাম নহে, কিংবা বৌদ্ধ ত্রিশরণের 'ধর্ম'ও নহে, ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় তাহা সুনিশ্চিত ভাবেই প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে অষ্ট্রীক ভাষায় কূর্মের প্রতিশব্দ 'দড়ম্' হইতেই 'ধর্মে'র উৎপত্তি হইয়াছে। যে শিলাখণ্ডকে (সাধারণত অধিকাংশ শিলাই প্রায় কূর্মাকৃতি হইয়া থাকে) আদিম নিষাদজাতি দেবতা ভাবিয়া পূজা করিত, তাহাই 'দড়ম্', যাহা আর্য-সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসিয়া 'ধর্মে' রূপান্তরিত হইয়াছে। বস্তুত, ধর্মঠাকুরের এই উদ্ভবকাহিনীই সর্বাধিক সম্ভাব্য বলিয়া মনে হয়। আর এই কথাও নিশ্চিতভাবেই বলা চলে যে, যে সকল অনার্যদেবতা আর্যস্তরে উন্নীত হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে ধর্মঠাকুরের মধ্যেই আদিমরূপটি সর্বাধিক প্রকট।

'ধর্ম' নামের উৎপত্তি

ধর্মঠাকুর একখণ্ড শিলামাত্র ; অধিকাংশস্থলেই কোন গাছেরনীচে কখনও বা খোলা মাঠের মধ্যেই তাঁহার আস্তানা। ধর্মঠাকুরের মন্দিরের সন্ধান কদাচিৎই পাওয়া যায়। ধর্মঠাকুর গ্রামদেবতা, স্থানভেদে তাঁহার নামেরও বৈচিত্র্য আছে—বাঁকুড়া রায়, যাত্রাসিদ্ধি রায়, কালু রায়, বুড়া রায়, দলু রায়, জগৎ রায় প্রভৃতি। ধর্মঠাকুর প্রধানত দাতা, নিঃসন্তানা নারীকে সন্তান দান করেন, অনাবৃষ্টি হইলে ফসল দান করেন। কুষ্ঠরোগীকে রোগ হইতে মুক্তিদান করেন। নানা প্রকার মানত করিয়াই ধর্মঠাকুরের পূজা দেওয়া হয়। অনেকেই ধর্মঠাকুরকে মাটির ঘোড়া দান করেন। ধর্মঠাকুরের পূজারীদের সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হইয়াছে যে তাহারা'পণ্ডিত'উপাধিধারী হইলেও জাতিতে অব্রাহ্মণ। প্রধানত ডোমজাতির পুরোহিতরাই ধর্মপূজার বিশেষ অধিকারী। ব্রাহ্মণদের উপবীত-ধারণের মত ধর্মঠাকুরের পূজারীরা তাম্রধারণ করেন। অবশ্য ব্রাহ্মণপুরোহিতদের তাম্র-ধারণের কোন প্রয়োজন হয় না।

ধর্মঠাকুর

ধর্মঠাকুরের পূজা দুই প্রকার : নিত্য এবং মানত পূজা। নিত্য পূজা নেহাৎই আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন হয় আর মানত পূজা দীর্ঘকালব্যাপী বহুজনের চেষ্টায় সম্পন্ন হয়, এই বিশেষ আড়ম্বরপূর্ণ পূজার নাম 'গৃহভরণ' বা 'ঘরভরা'। এই উপলক্ষ্যে বারটি শিলা একত্র করা হয় এবং বারদিন

ধরিয়া অনুষ্ঠান চলে। অনুষ্ঠানের শেষ দিনে গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই গাজন অনুষ্ঠানে আত্মনিপীড়নের চরম দৃষ্টান্ত দেখা যায়। কোন কোন 'পাটভক্ত্যা' লৌহ শলাকায় শয়ন করিয়া 'শালে ভর' দেন, কেহ বা দেহের কোন না কোন অঙ্গে 'বাণ' ফোড়েন। গাজনে বারজন পুরুষ'ভক্ত্যা'ও চারিজন 'আমিনী বা নারী ভক্ত্যা'র প্রয়োজন হয়। ধর্মঠাকুরের পূজায় এমন অনেকগুলি পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হয়, সাধারণভাবে যাহাদের অর্থ উদ্ধার করা কষ্টকর।—নিরাকার ব্রহ্মের স্ত্রীরূপে কল্পিত শিলাখণ্ডকে বলা হয় 'কামিন্যা', ধর্মের সেবায়েতের নাম 'দেয়াসী' (দেবদাসী), দেয়াসীর প্রধান সহায়ক 'ধামাৎকর্নী', বলির পশুর নাম 'লুয়ে', আর বারদিন গাহিবার উপযোগী পালাগানকে বলা হয় 'বারমতি'।

পূজা পদ্ধতি

ধর্মঠাকুরের পূজার উপকরণ সম্বন্ধে আগেও বলা হইয়াছে। মূলত ধর্ম-ঠাকুরের নিকট নরবলি দেওয়া হইত বলিয়াই বিশ্বাস করা হয়। এখনও শূকর, ছাগ, মোরগ বা পায়রা বলি দেওয়া হয়। বলিতে হাঁড়ি-কাঠের প্রয়োজন হয় না। ভোজনরত পশুকে আকস্মিক আঘাতে হত্যা করা হয়। মাংস ছাড়া চুণ, মদ্য এবং পিষ্টকও ধর্মঠাকুরের পূজার অন্যতম উপকরণ। চাঁপা ফুল এবং চাঁপা কলা ধর্মঠাকুরের প্রিয় ফুল ও ফল।

পূজার উপকরণ

ধর্মঠাকুর নিরঞ্জন হইলেও তিনি স্বয়ং ধবল বর্ণ। অপর সকল ধবল বস্তুও ইহার প্রিয়; এমন কি ধবল কুষ্ঠের দেবতা বলিয়াও তিনি প্রসিদ্ধ। ধর্মঠাকুর ক্রুদ্ধ হইলে কুষ্ঠ হয় এবং তিনি তুষ্ট হইলে আক্রান্ত ব্যক্তি কুষ্ঠ হইতে মুক্তি পাইয়া থাকে। ধর্ম-ঠাকুর নিরাকার হইলেও কখন কখন তিনি সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ বা ফকিরের বেশ ধারণ করেন। এমন কি জুতা-মোজা পায়ে দিয়া তিনি অশ্বারোহী সৈনিক-মূর্তিও ধারণ করিয়া থাকেন।—এই সকল হইতে অনুমান করা চলে যে, মুসলমান শাসনকালেও সমসাময়িকযুগের প্রভাবে ধর্মঠাকুরের পোষাক-পরিচ্ছদেও কিছুটা পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

ধর্মের মূর্তি

ধর্ম-সাহিত্য বলিতে যাহা বোঝায়, তাহাকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে; (ক) ধর্মপূজা পদ্ধতি বা ধর্ম পুরাণ ও (খ) ধর্মমঙ্গল কাব্য। প্রাচীনযুগের সাহিত্য-আলোচনা-প্রসঙ্গে যে'শূন্যপুরাণের' কথা হইয়াছে, তাহাই 'ধর্মপূজা পদ্ধতি' বা 'ধর্মপুরাণ' জাতীয় সাহিত্য। শূন্যপুরাণ আসলে কোন পুরাণ বা সাহিত্যই নহে,

ধর্ম-সাহিত্যের দুইটি রূপ

প্রকৃতপক্ষে ইহা ধর্মপূজা-পদ্ধতি মাত্র। গ্রন্থের সম্পাদক ইহাতে বৌদ্ধধর্মের শূন্যবাদের পরিচয় পাইয়া ইহার শূন্যপুরাণ নামকরণ করিয়াছেন। বস্তুত এই নামটির জন্যই অনেক ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়া থাকে। 'রামাই পণ্ডিত' নামক কোন ব্যক্তির ভণিতায় গ্রন্থটি রচিত। কোথাও কোথাও 'গোসাঞি পণ্ডিতে'র কথাও আছে। মনে হয়, রামাই পণ্ডিত এবং গোঁসাই পণ্ডিত অভিন্ন হইতে পারেন। রামাই পণ্ডিত ঐতিহাসিক ব্যক্তি—এই ধারণায় অনেকেই তাঁহার সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়াছেন। ইহার ফলে রামাই পণ্ডিতের কাল নবম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে যে কোন সময়ই হইতে পারে। আবার কেহ কেহ আদৌ রামাই পণ্ডিতের অস্তিত্বেই বিশ্বাসী নহেন। ডঃ সুকুমার সেন বলেন, 'রামাই পণ্ডিতের কাহিনীর যদি কিছু ঐতিহাসিকত্ব থাকে, তবে তাহা উচ্চগ্রামের হোমিওপ্যাথিক মাত্রায়, তাহা হইতে ইতিহাস গঠন করা যায় না, উপন্যাসের পরিকল্পনা হইতে পারে।' রামাই পণ্ডিতের জীবন-কাল ধরিয়া একদল ঐতিহাসিক শূন্যপুরাণকে প্রাচীনযুগের অন্তর্ভুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু বিষয়গত এবং ভাবতাত্ত্বিক প্রমাণে আধুনিক ঐতিহাসিকগণ শূন্যপুরাণের ঐ দাবীকে নস্যাৎ করিয়া দিয়াছেন। শূন্যপুরাণের মধ্যে বিভিন্ন কালে রচিত অংশের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। ইহাদের প্রাচীনতম অংশ ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীরও হইবে কিনা সন্দেহ, আর অর্বাক্তন অংশ অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। শূন্যপুরাণে 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' নামক যে অংশটি সংযুক্ত হইয়াছে (ইহার নামান্তর 'কলিমা জালাল'), তাহা ১৭৩৫ খ্রীঃ রচিত সহদেব চক্রবর্তীর 'অনিল পুরাণে' পাওয়া যাইতেছে। অনুমান, অনিল পুরাণ হইতেই ইহা শূন্যপুরাণে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এই শূন্যপুরাণের একান্নটি অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম পাঁচটি অধ্যায়ে সৃষ্টিতত্ত্ব এবং পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে বিভিন্নপ্রকার পূজা-পদ্ধতি বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। শূন্যপুরাণের এই সৃষ্টিতত্ত্বে মহাযান বৌদ্ধধর্মের এবং নাথপন্থীদের মতবাদের প্রভাব খুব সুস্পষ্ট। ধর্মমঙ্গল কাব্যের সৃষ্টিতত্ত্বও ইহার অনুরূপ। অপর কোন কোন মঙ্গল কাব্যেও ধর্ম মঙ্গলের সৃষ্টিতত্ত্বের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই সৃষ্টিতত্ত্বের সহিত ধর্মঠাকুরের প্রচার-কাহিনী বিশেষ ভাবে জড়িত, বিশেষত ইহার কাহিনীতে যে বৈচিত্র্য আছে, তাহাও অভিনব। নিরঞ্জন নিরাকার প্রভুর সৃষ্টির ইচ্ছা হইলে

রামাই পণ্ডিত ও শূন্য পুরাণ

নিজের কায়া হইতে নিরঞ্জন ধর্মের সৃষ্টি হইল। ধর্মের হাই হইতে উল্লুকের জন্ম হইল। অতঃপর ধর্মের ঘাম হইতে আদ্যাশক্তির সৃষ্টি হইল। আদ্যাশক্তির মন হইতে কামদেবের জন্ম হইল। আদ্যা যৌবনের ভার সহ্য করিতে না পারিয়া বিষ পান করিলে তিনি গর্ভবতী হইলেন এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের জন্ম দান করিলেন। জন্মগ্রহণ করিয়াই তাঁহারা তপস্যা করিতে চলিয়া গেলেন। তখন নিরঞ্জন ধর্ম তাঁহাদিগকে পরীক্ষা করিতে গেলেন। পরীক্ষায় একমাত্র মহাদেবই উত্তীর্ণ হইলেন। তখন ধর্মের আদেশে শিব আদ্যাশক্তিকে বিবাহ করিলেন।

সৃষ্টিতত্ত্ব

ধর্মের পূজার জন্যই আদিত্য রামাই-পণ্ডিতরূপে নরলোকে জন্মগ্রহণ করেন। ধর্মমঙ্গল কাব্যের সদাডোম আর হরিশ্চন্দ্রের পালায় রামাই পণ্ডিতের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে।

ধর্মসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ধর্মমঙ্গলকাব্য। ধর্মমঙ্গল কাহিনীতে ধর্মের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইলেও ইহার প্রধান আকর্ষণ ইহার কাহিনী। কাহিনীতে বৈচিত্র্য যেমন আছে, তেমনি আছে বিস্তৃতি। সোমঘোষের পুত্র ইছাইঘোষ পার্বতীর অনুগ্রহে গৌড়েশ্বরের সামন্তরাজ ত্রিষষ্ঠিগড়ের কর্ণসেনকে পরাজিত করিয়া নিজে সিংহাসনারোহণ করেন। এই যুদ্ধে কর্ণসেনের ছয়পুত্রই নিহত হইয়াছিলেন, সেই শোকে কর্ণসেনপত্নীও দেহত্যাগ করেন। গৌড়েশ্বর কর্ণসেনের প্রতি সহানুভূতিবশত তাহার সহিত আপন শ্যালিকা রঞ্জাবতীর বিবাহ দিলেন। কিন্তু ইহাতে রাজ-শ্যালক এবং রাজার পাত্র মহামদ অতিশয় রুষ্ট হইলেন। গৌড়েশ্বর কর্ণসেন-রঞ্জাবতীকে ময়নাপুরে পাঠাইয়া দিলেন। রঞ্জাবতী 'শালেভর' দিয়া ধর্মঠাকুরের অনুগ্রহে এক পুত্র লাভ করেন, পুত্রের নাম হইল লাউসেন। তাহার খেলার সাথীরূপে ধর্ম রঞ্জাবতীকে কর্পূরসেন নামে আর একটি পুত্র দান করেন। হনুমান ইহাদের দুইজনকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দান করেন। এদিকে মহামদ কর্ণসেন বা রঞ্জাবতীর কিছু করিতে না পারিয়া লাউসেনের অনিষ্ট করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কর্পূরসেনকে সঙ্গে লইয়া লাউসেন গৌড়যাত্রা করিয়াছেন, পথে চরিত্রবলে পার্বতীকে সন্তুষ্ট করিয়া জয়খড়্গ লাভ করিলেন। পথে কামদল বাঘ এবং কুম্ভীরকে হত্যা করিয়া এবং গণিকার ছলনাকে ব্যর্থ করিয়া লাউসেন গৌড়ে পৌঁছিলেন। কিন্তু মহামদের চক্রান্তে তিনি সেখানে বন্দী হইলেও ধর্মের অনুগ্রহে আবার মুক্তিলাভ করিলেন। ইহার পর মহামদের প্ররোচনায় গৌড়েশ্বর লাউসেনকে কামরূপবিজয়

ধর্মমঙ্গল কাহিনী

অভিযানে পাঠাইলেন। লাউসেন কালুডোমের সহায়তায় কামরূপ-যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন এবং রাজকন্যা কলিঙ্গাকে বিবাহ করিলেন। ইহার পর লোহগণ্ডারের শিরশ্ছেদ করিয়া লাউসেন সিমুলের রাজকন্যা কানাড়াকেও বিবাহ করেন। এইবার মহামদ লাউসেনকে পাঠাইলেন পিতৃশত্রু ইছাই ঘোষকে দমন করিবার জন্য। ইছাই ঘোষ ছিলেন দেবীর কৃপাপুষ্ট। কিন্তু ধর্মঠাকুরের কৃপায় লাউসেন ইছাই ঘোষকেও পরাজিত এবং নিহত করিলেন। এই সময় গৌড়েশ্বরের রাজ্যে পাপ দেখা দিলে পাপ দূরীকরণের জন্য মহামদের পরামর্শে রাজা লাউসেনকে আদেশ করিলেন। লাউসেন তখন পশ্চিমে সূর্যোদয় ঘটাইবার জন্য হাকন্দ গমন করেন এবং দুশ্চর তপস্যায়ও ধর্মকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিয়া অবশেষে নিজ দেহ নবখণ্ডে বিভক্ত করিয়া আহুতি প্রদান করিলে ধর্মঠাকুর সন্তুষ্ট হইয়া পশ্চিমে সূর্যোদয় ঘটাইলেন। এদিকে লাউসেনের অনুপস্থিতির সুযোগে মহামদ লাউসেনের রাজ্য বিনষ্ট করিলেন। কিন্তু লাউসেন ধর্মের কৃপায় আবার সকলকে বাঁচাইয়া তুলিলেন এবং রাজ্যও ফিরিয়া পাইলেন। মহামদ পাপের ফলে কুষ্ঠারোগাক্রান্ত হইয়াও ধর্মের কৃপায় রক্ষা পাইলেন, শুধু চিহ্ন রহিয়া গেল। লাউসেনও কিছুদিন রাজত্ব করিবার পর পুত্র চিত্রসেনের হাতে রাজ্যভার দিয়া স্বর্গে গমন করিলেন।

ধর্মমঙ্গলকাব্যে এই লাউসেন-রঞ্জাবতীর কাহিনীই প্রধান হইলেও ইহাতে আর একটি গল্প আছে,—সদাডোমের গল্প। সদাডোমের নিকট ধর্মঠাকুরের পূজাপ্রচার এবং সদাডোমের ভক্তিপ্রদর্শনের কাহিনীই ইহার উপজীব্য। এই কাহিনীর প্রসঙ্গেই আবার হরিশ্চন্দ্র-রোহিতাশ্বের (লুইধর) কাহিনীও সংযুক্ত হইয়াছে।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের অন্তর্গত গৌড়েশ্বর, কর্ণসেন, সোমঘোষ, ইছাইঘোষ, লাউসেন প্রভৃতির ঐতিহাসিকতা লইয়া বিস্তর গবেষণা হইয়াছে, এখনও চলিতেছে। কিন্তু আশঙ্কা হইতেছে, শেষপর্যন্ত না পর্বতের মূষিক প্রসব হয়! কারণ, প্রাগুক্ত নায়কদের কাহারো অথবা সকলের পক্ষেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি হইতে কোন বাধা নাই, কিন্তু ইহাদিগকে উপকরণ-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া যেভাবে কাহিনী গঠন করা হইয়াছে, তাহাতে যে ইতিহাসের সামান্যতম মর্যাদাও রক্ষিত হয় নাই, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ডঃ সুকুমার সেন গৌড়েশ্বরের রাজসভার ঐতিহাসিকতা কিছুটা স্বীকার করিলেও বলিয়াছেন : 'লাউসেনের ঐতিহাসিকত্ব লইয়া অনেকেই মাথা ঘামাইয়াছেন। রামাই পণ্ডিতের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি লাউসেনের সম্বন্ধেও তাহাই খাটে। লাউসেন

বলিয়া কোনকালে কেহ ছিলেন বলিয়া মনে করিবার কোন হেতু নাই। ধর্মমঙ্গল কাহিনীকে ইংরাজীতে Adventure অথবা Exploits of Lausena বলা যাইতে পারে। লাউসেনের কাহিনীগুলি প্রকৃতপক্ষে মধ্যযুগের বাঙ্গালার Folk-tale বা উপকথা মাত্র; ইহার মধ্যে ঐতিহাসিক তথ্য খুঁজিতে গেলে ঠকিব। Adventure বা কেরামতি-কাহিনী বলিয়া ধর্মমঙ্গল কাব্য মনসামঙ্গল কাব্যের অপেক্ষা অনেক অংশে সুখপাঠ্য'। পূর্ববর্তী গবেষকগণ ধর্মমঙ্গল কাব্যের বিভিন্ন চরিত্রের ঐতিহাসিকতা লইয়া যেভাবে আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে গৌড়েশ্বরকে কেহ দেবপাল, কেহবা লক্ষ্মণসেন বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। ঢেক্করীর ঈশ্বরঘোষের যে তাম্রশাসনখানি আবিষ্কৃত হইয়াছে, কেহ কেহ এই ঈশ্বরঘোষকেই গ্রন্থোক্ত ইছাই ঘোষ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাম্রশাসনে এবং গ্রন্থে ঈশ্বর ঘোষের পিতৃ-পরিচয়ে অনৈক্য দেখিতে পাওয়া যায়। লামা তারানাথ লবসেন নামে একজন গৌড়ের রাজার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ কেহ ইঁহাকেই লাউসেন বলিয়া মনে করেন। আবার অনেকেই অনুমান করেন যে ইনি গৌড়েশ্বর দেবপালের খুল্লতাত ভ্রাতা জয়পাল। হরিশ্চন্দ্র রাজাকে বৈদিক হরিশ্চন্দ্র, ও রামায়ণের হরিশ্চন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্র পর্যন্ত অনেক জল্পনা-কল্পনাই করা হইয়াছে। বস্তুত, ধর্মমঙ্গল কাব্যের বিভিন্ন চরিত্রের সাদৃশ্যযুক্ত নাম ইতিহাসে পাওয়া গেলেও ঐ বিচ্ছিন্ন নামগুলিকে একত্র জড়াইয়া ইতিহাস-রচনার অপচেষ্টা পরিত্যাগ করাই সঙ্গত।

ধর্মমঙ্গলের ঐতিহাসিকতা বিচার

ধর্মমঙ্গল কাহিনীর পশ্চাতে অবশ্য কোন ঐতিহাসিক কাহিনীর ইঙ্গিত থাকা বিচিত্র নহে, তবে অধিকতর সম্ভাব্য ব্যাপার এই হইতে পারে যে—কোন লৌকিক কাহিনীর সহিত বিভিন্ন পৌরাণিক এবং কোন কোন ঐতিহাসিক কাহিনীর বিভিন্ন অংশ যোজনা করিয়াই ইহার মূল কাহিনীকে গড়িয়া তোলা হইয়াছে। ইহাতে দুর্বৃত্ত মহামদ এবং তদীয় ভাগিনেয় অসাধ্য-সাধন-পটু লাউসেনের কাহিনীতে কংস-কৃষ্ণ কাহিনীর, ইহার বিভিন্ন যুদ্ধে এবং ইছাই ঘোষের কাটামুণ্ড জোড়া লাগায় রামায়ণের যুদ্ধ এবং মায়ামুণ্ডের কাহিনীর প্রভাব সুস্পষ্টভাবেই বর্তমান। এইগুলি ছাড়াও কর্পূরসেনের চরিত্রে রামভ্রাতা লক্ষ্মণ এবং লব-ভ্রাতা কুশের, কালুডোমের পত্নী লখাই-র চরিত্রে মহাভারতের বিদুলা-চরিত্রের প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। কোন

ধর্মমঙ্গল বিভিন্ন কাহিনী

কোন স্থলে নাথসাহিত্যেরও প্রভাব পড়িয়াছে। এইভাবে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন কাহিনীকে জোড়া-তাড়া দিয়া গঠন করিবার ফলে যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে ড০ দীনেশ সেন পর্যন্ত বলেন, 'ধর্মমঙ্গলের সমস্ত যিনি পড়িয়া উঠিতে পারিবেন তাঁহার ধৈর্যের বিশেষ প্রশংসা করা উচিত হইবে।'

ধর্মমঙ্গলকাব্যের কাব্য-ধর্ম-সম্বন্ধে যত পরস্পর-বিরোধী অভিমত প্রচারিত হইয়াছে, প্রাচীন অপর কোন সাহিত্য-সম্বন্ধেই এতটা হয় নাই বলিয়াই মনে হয়। ড০ সুকুমার সেন একদিকে যেমন ধর্মমঙ্গলকাব্যকে 'উপকথা' বা 'কেরামতি কাহিনী' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তেমনি আবার এই কথাও বলিয়াছেন : 'প্রাচীন বাংলাসাহিত্যে মহাকাব্য বলিয়া যদি কিছু থাকে তবে তাহা ধর্মমঙ্গল।' ড০ আশুতোষ ভট্টাচার্য ধর্মমঙ্গলকাব্যকে পশ্চিম বঙ্গের 'জাতীয় মহাকাব্য' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আবার কোন কোন ইতিহাসকার সোজাসুজি ইহাকে 'প্রাচীন বঙ্গের কিশোরধর্মী সাহিত্য' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ধর্মমঙ্গলকাব্যের কাহিনীতে ঐক্যবোধের একান্ত অভাব। পূর্বাপর কাহিনীর প্রায় সর্বত্র অলৌকিকত্বের এত সমাবেশ যে ইহাতে রূপকথা বা পৌরাণিক কাহিনীরই আমেজ পাওয়া যায়। ইহাতে যে সমস্ত উপকাহিনী যোজনা করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একমাত্র 'কানাড়া' কাহিনীতেই কিছুটা কাব্যধর্ম অক্ষুণ্ণ আছে, নতুবা গল্পের কোথাও কাব্যরস জমিয়া উঠে নাই। কাব্যের আঙ্গিকের দিক হইতেও কোন কাব্যে বিশেষ উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য-প্রচারই ধর্মমঙ্গলকাব্যের প্রধান লক্ষ্য। কবিরা ধর্মঠাকুরের প্রাধান্য দিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার পাশাপাশি চণ্ডীকেও স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু ফল হইয়াছে বিপরীত। ধর্মঠাকুর অপেক্ষাও চণ্ডীর মধ্যেই অধিকতর মানবিকতার এবং সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। ফলে ধর্ম-ভক্ত ব্যতীত সাধারণ পাঠকের দৃষ্টিতে চণ্ডীর মাহাত্ম্যই অধিকতর প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। ধর্মমঙ্গল-কাব্যে অনেক যুদ্ধ, অনেক অসমসাহসিকতার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহা বীররসাত্মক কাব্য হইয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই। সর্বোপরি, ধর্মমঙ্গলে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য দেব-দেবীদের লড়াই এত উগ্র হইয়া উঠিয়াছে যে, ইহাতে মানবিকতার আবেদন তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে।

কাব্য বিচার

ময়ূর ভট্ট : ধর্মমঙ্গলকাব্যের পরবর্তী কবিদের অনেকেই আদিকবি ময়ূরভট্টের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ঘনরাম বলিয়াছেন :

'হাকন্দপুরাণ মতে* ময়ূর ভট্টের পথে
জ্ঞানগম্য শ্রীধর্ম সভায়।'

ইহা হইতে বোঝা যায়, ধর্মমঙ্গলকাব্যের আদি কবি ময়ূরভট্ট 'হাকন্দ-পুরাণ' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কবি ময়ূরভট্ট কিংবা তাঁহার কাব্য 'হাকন্দপুরাণে'র কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। অনেকেই অনুমান করেন যে, অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের আদি কবিদের মতই ময়ূরভট্টও চৈতন্য-পূর্ব যুগান্তর কালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহাও নিছক অনুমান মাত্র। তবে এত বিভিন্ন কবি তাঁহাদের গ্রন্থে ময়ূরভট্টের নাম উল্লেখ করিয়াছেন যে তাঁহার অস্তিত্বকে কখনও উপেক্ষা করা যায় না। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ময়ূরভট্টের একখানি পুঁথি দেখিয়াছিলেন বলিয়া 'বৌদ্ধগান ও দোহা'র ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু গ্রন্থখানির আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় ময়ূরভট্ট-রচিত বলিয়া কথিত যে 'শ্রীধর্মপুরাণ' খানি সম্পাদনা করিয়াছেন, তাহার প্রামাণিকতা অস্বীকৃত হইয়াছে। ড° সুকুমার সেন ইহাকে অষ্টাদশ শতকের কবি রামচন্দ্র বাড়ুজ্জের রচিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আচার্য যোগেশচন্দ্র ততদূর যাইতেও রাজি নহেন, তিনি মনে করেন যে গ্রন্থের উদ্ধার কর্তা ডোমপণ্ডিত এবং ছাত্রবৃত্তি-পাশ আশুতোষ পণ্ডিতই হাল আমলে গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থটির ভাব ও ভাষা উৎকট রকমে আধুনিক, অতএব ইহার সম্বন্ধে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। ড° আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় অনুমান করেন যে, এই ময়ূরভট্ট 'সূর্যশতক'-রচয়িতা এবং বাণের সমসায়িক হইতে পারেন। শোনা যায়, ময়ূরভট্ট তাঁহার এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ার (কন্যা অথবা ভগ্নী এবং বাণ-পত্নী) শাপে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন এবং 'সূর্যশতক' রচনা করিয়া কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন।

কবি ও কাব্য-পরিচয়

খেলারাম: খেলারাম একখানা পুঁথি রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু সেই পুঁথির সামান্য অংশমাত্রই নাকি পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে নিম্নোক্ত-ভাবে গ্রন্থ-রচনা কালের উল্লেখ করা হইয়াছে:

'ভুবন শকে বায়ু মাস শরের বাহন।
খেলারাম করিলেন গ্রন্থ আরম্ভন॥
হে ধর্ম এ দাসের পুরাও মনস্কাম।
গৌড়কাব্য প্রকাশিতে বাঞ্ছে খেলারাম॥'

ইহা হইতে ১৪৪৯ শকাব্দে (১৫২৭ খ্রীঃ) খেলারাম গ্রন্থরচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু নগেন্দ্র নাথ বসু

খেলারামের যে গ্রন্থ দেখিয়াছেন, তাহাতে কালবাচক কোন পয়ার দেখিতে পান নাই বলিয়াই আলোচ্য পয়ারটির প্রামাণিকতা সংশয়াতীত নহে। গ্রন্থে কবি এই কথাও বলিয়াছেন :

'তোমার কৃপায় যদি গ্রন্থ সাঙ্গ হয়।
অষ্ট মঙ্গলায় দিব আত্মপরিচয়॥'

কিন্তু গ্রন্থটি সমাপ্ত হইয়াছিল কিনা, আর জানা যায় নাই। কবির পরিচয়ও এতাবৎ অজ্ঞাতই রহিয়া গিয়াছে। কবি গ্রন্থের নাম 'গৌড়কাব্য' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

রূপরাম চক্রবর্তী : ড° সুকুমার সেনের মতে রূপরাম চক্রবর্তীর কাব্যই সন-তারিখযুক্ত প্রাচীনতম ধর্মমঙ্গল কাব্য। কিন্তু ইহাতে কবি হেঁয়ালী-ছন্দে যে তারিখ প্রদান করিয়াছেন, ইহার অর্থ-বোধে কোন দুই জনই প্রায় একমত হইতে পারিতেছেন না।

'শাকে সীমে জড় হৈলে যত শক হয়।
চারি বাণ তিনযুগে ভেদে যত রয়॥
রসের উপরে রস তাহে রস দেহ।
এই শাকে গীত হৈল লেখা কর্যা লহ॥'

ইহার আবার একটি পাঠান্তরও আছে। যাহাহউক ইহার পাঠ-উদ্ধার করিয়া বিভিন্ন পণ্ডিতব্যক্তি রূপরামের যে কাল নিরূপণ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি যেমন ১৫৯০ খ্রীঃ-র হইতে পারেন, তেমনি ১৬৪৯ খ্রীঃও তাঁহার কাল হইতে পারে; এমন কি ১৭২৬ খ্রীঃ হওয়াও বিচিত্র নহে। কিন্তু রূপরামের কাব্যে শাহজাদা সুজার উল্লেখ ('রাজমহলের মধ্যে যবে ছিল শুজা।') হইতে মনে হয় যে কবি ১৬৪৯ খ্রীঃ-র দিকেই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কবির কাব্যে যে আত্ম-পরিচয় দান করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে কবির পিতার নাম শ্রীরাম চক্রবর্তী, মাতা দৈবকী বা দময়ন্তী। বর্ধমান জেলার শ্রীরামপুর গ্রামে ছিল কবির নিবাস। রূপরাম তাঁহার কাব্যে বিস্তৃতভাবে আত্মকাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।—কবির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রত্নেশ্বর ছিলেন বড় 'নিদারুণ'। তাঁহার অত্যাচার কবির জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল। এই আত্মকাহিনীতেই কবি জানাইয়াছেন যে একদিন ধর্ম-ঠাকুর তাঁহাকে দেখা দিয়া বলিয়াছেন :

কবি-পরিচয় ও কাল

'আমি ধর্মঠাকুর বাঁকুড়া রায় নাম।
বার দিনের গীত গাও শোন রূপরাম॥'

রূপরাম নানা জায়গা ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে গোয়ালা ভূমির রাজা গণেশের আশ্রয় লাভ করিলেন এবং তথায় কাব্য রচনা করিয়া গীত গাহিতে সুরু করেন। শোনা যায় ধর্মঠাকুরের পূজার অপরাধে (অথবা হাঁড়ি-জাতীয়া কন্যার প্রতি আসক্তি-বশত ?) রূপরাম সমাজে পতিত হইয়াছিলেন। রূপরামের আত্মকাহিনীমূলক অংশটুকু-সম্বন্ধে ডঃ সুকুমার সেন বলিয়াছেন, 'পুরানো বাঙ্গলা সাহিত্যে যদি আধুনিক ছোট গল্পের মত কোন জীবন-রস-নিটোল রচনা থাকে, তবে তাহা রূপরামের এই আত্মকাহিনী !' কবিকৃতি-হিসাবে রূপরামের কাব্য খুব উচ্চাঙ্গের না হইলেও তাঁহার রচনার সাবলীলতা এবং সরলতা প্রশংসনীয়।

শ্যামপণ্ডিত : শ্যামপণ্ডিত যে ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহার একখানি পুঁথির লিপিকাল ১৭০৩ খ্রীঃ। অতএব ইনি অন্তত সপ্তদশ শতকে জীবিত ছিলেন, আশা করা যায়। শ্যামপণ্ডিতের বাসস্থান ছিল শ্রীরামনগর গ্রাম। তাঁহার গ্রন্থে যে 'ধর্মদাস' ভণিতা পাওয়া যায়, তাহা যেমন তাঁহার বিশেষণ হইতে পারে, তেমনি অন্য কোন কবির নামও হইতে পারে। শ্যাম-পণ্ডিত যে ধর্মের সেবক ছিলেন তাহা তাঁহার উপাধি হইতেও অনুমান করা চলে। কবির গ্রন্থে কিছু কিছু নূতনত্বের পরিচয় পাওয়া যায়—তিনি ইছাই ঘোষকে ঈশ্বর ঘোষ এবং তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বিজয় ঘোষ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ঢেকুরের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে ইহাতে 'ত্রিহট্টগড়' বলিয়া। শ্যামপণ্ডিতের গ্রন্থে কতকগুলি স্থানীয় বিশেষত্ব দেখিয়া অনুমান করা চলে যে, কবি বীরভূম অঞ্চলের লোক ছিলেন।

সীতারাম দাস : সীতারাম দাস তাঁহার কাব্যে যে আত্মপরিচয় দান করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে কবির পিতার নাম ছিল দেবীদাস। কবি তাঁহার মাতামহ প্রসিদ্ধ অম্বগোষ্ঠীয় শ্যামদাসের গৃহে ইন্দাসে জন্মগ্রহণ করেন। কবির পৈতৃক নিবাস ছিল সম্ভবত বর্ধমান জেলার সুখসায়র গ্রামে। কবি গ্রন্থ-রচনার তারিখ বলিয়াছেন :

'সীতারাম দাস গায় ধর্মপদতলে।
এই পুঁথি হইল হাজার চারি সালে ॥'

ড০ সুকুমার সেন অনুমান করেন যে কবি ১০০৪ মল্লাব্দে (১৬৯৮ খ্রীঃ) গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা ১০০৪ বাঙলা সালও হইতে পারে। এই ক্ষেত্রে কবিকে শতাব্দী কাল পূর্বে স্থাপন করিতে হয়। যাহা হউক, কবি যেকালে গ্রন্থ রচনা করেন, তৎকালে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের পক্ষে ধর্মঠাকুরের পাঁচালী

রচনাও যে অপরাধ-জনক বিবেচিত হইত, তাহার পরিচয় সীতারাম দাসের কাব্যেও বর্তমান। তিনি যে নেহাৎ দায়ে পড়িয়াই কাব্য-রচনায় বাধ্য হইয়াছেন, তাহা তাঁহার উক্তি হইতেই পাওয়া যায়।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের রাঢ় অঞ্চলের কবিদের বিশেষত ধর্মমঙ্গল-কাব্যের কবিদের রচনায় একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য : গ্রন্থোৎপত্তির কারণ-বর্ণনা-প্রসঙ্গে সুদীর্ঘ আত্মবিবরণদান। আত্মবিবরণী পাঠ করিলে দেখা যায়—এই বিবরণগুলির কাহিনী প্রায় একই প্রকার। প্রায় সদৃশ পরিস্থিতিতে পড়িয়াই কবিরা কাব্য রচনা করিয়া থাকেন। কাজেই সন্দেহ হয়—এইগুলি কি প্রকৃতই আত্মকথা? গতানুগতিকার প্রশ্ন বাদ দিয়াও যদি ইহাদিগকে সত্য বলিয়া অভিহিত করা হয়, তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, এই রচনাগুলিই বাঙলা সাহিত্যে আত্মজীবনীমূলক রচনার পথিকৃৎ। কোন কোন কাহিনী উপন্যাসের মত মনোরম। বস্তুত ধর্মমঙ্গল কাব্যের বৈশিষ্ট্যই আত্মপরিচয়ে। মঙ্গলকাব্যরূপে অধিকাংশ লেখকের রচনায় বিশেষ কোন পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া না গেলেও আত্মপরিচয় অংশগুলি যথার্থই মূল্যবান্। ইহাতে সমসাময়িক যুগের অঞ্চল-বিশেষের যে চিত্রাত্মকরূপ বিবৃত হইয়াছে, ঐতিহাসিকের নিকটও তাহা আদরণীয় বলিয়া বোধ হইবে।—সীতারাম দাসের রচনায়ও এইরূপ সুন্দর একটি চিত্র পাওয়া যায়।

সীতারাম দাস তাঁহাদের গৃহদেবতা গজলক্ষ্মীর কৃপায় বনমধ্যে ধর্ম-ঠাকুরের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন এবং ধর্মঠাকুরের আদেশেই কাব্য-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ফৌজের উপদ্রবে বাড়িঘর বিনষ্ট হইলে খুল্লতাতের আদেশে সীতারাম বনে গিয়াছিলেন কাঠ আনিতে। সেখানে একজনের নিকট শুনিলেন, সিপাহী বেগার ধরিতে আসিতেছে। এই শুনিয়াই তিনি দিশাহারা হইয়া ছুটিতে ছুটিতে এক সন্ন্যাসীর দর্শন পাইলেন। পথে সন্ন্যাসী আত্মপরিচয় দিয়া বলিলেন :

> প্রভু বলে নিরঞ্জন নৈরাকার আমি।
> আমার মঙ্গলগীত কর গিয়া তুমি॥'

ধর্মঠাকুর নারায়ণপণ্ডিতের গৃহে বাস করেন। নারায়ণপণ্ডিতও ধর্ম-ঠাকুরের স্বপ্ন পাইয়া সীতারাম দাসকে ধর্মমঙ্গল রচনা করিতে অনুরোধ করেন। কবি চল্লিশ দিনে বারমতি পালা শেষ করেন।

সমসাময়িক কালে সীতারাম দাস নামে যে ব্যক্তি 'মনসামঙ্গল কাব্য' রচনা করিয়াছেন, তিনি এবং এই কবি অভিন্ন হইতে পারেন।

রামদাস আদক : রামদাস আদক তাঁহার গ্রন্থের নাম বলিয়াছেন 'অনাদি মঙ্গল, অনাদ্য মঙ্গল বা ধর্মপুরাণ।' কবির পিতার নাম রঘু, জাতিতে কৈবর্ত। কবির বাসস্থান ছিল ভুরশুট পরগণার হায়াৎপুর গ্রাম। গ্রামের মণ্ডল অতিশয় অত্যাচারী চৈতন্য সামন্ত অনাদায়ী খাজনার জন্য কবি-পিতার অনুপস্থিতিতে কবিকে কারারুদ্ধ করেন। তথা হইতে কবি কোন-প্রকারে মুক্তি পাইয়া মাতুলালয় গোরটি যাইবার পথে এক সিপাহীর সাক্ষাৎ পাইলেন। সিপাহী তাঁহাকে বেগার খাটাইবার জন্য তাঁহার মাথায় মোট চাপাইয়া দিলেন। তারপর কবির কাতর ক্রন্দনে অকস্মাৎ সিপাহী অদৃশ্য হইলেন এবং তৎস্থলে ব্রাহ্মণবেশধারী ধর্মঠাকুর আবির্ভূত হইলেন। ধর্মঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন :

'আজি হৈতে রামদাস কবিবর তুমি।
জাড়গ্রামে কালু রায় ধর্ম হই আমি॥'

ধর্মঠাকুর তাঁহাকে কাব্য রচনা করিতে আদেশ দিলেন। কবি ১৬৬২খ্রীঃ গ্রন্থ রচনা করেন। আধুনিক গায়কের পুঁথি-অবলম্বনে পুস্তকটি মুদ্রিত হওয়ায় ইহাতে প্রক্ষেপের আর অন্ত নাই। ডঃ সুকুমার সেন বলেন, 'ইহার বারো আনাই রূপরামের রচনা, ভণিতা শুধু রামদাসের।' অতএব গ্রন্থের আলোচনায় রামদাসের কবিত্বশক্তির সত্যকার কোন পরিচয় পাওয়া যাইবে না।

ঘনরাম চক্রবর্তী : ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবিদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ঘনরাম চক্রবর্তী। ধর্মমঙ্গল কাব্য সমূহের মধ্যে তাঁহার গ্রন্থই সর্বপ্রথম মুদ্রিত হইয়াছিল বলিয়াই যে তিনি সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাহা নহে, উৎকর্ষেও তাঁহার কাব্যই সর্বাগ্রগণ্য।

ঘনরাম চক্রবর্তী তাঁহার গ্রন্থে সে সমস্ত ভণিতা দান করিয়াছেন তাহাতেই আপন পরিচয় পর্যাপ্তরূপে প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহার পিতার নাম গৌরীকান্ত,

পরিচয়

মাতা সীতা, কবির বাসস্থান ছিল বর্ধমান জেলার কৃষ্ণপুর গ্রাম। কবি বর্ধমানের মহারাজা কীর্তিচন্দ্রের গুণগান করিয়াছেন, অতএব, হয়তো তিনি কোন কারণে মহারাজের কৃপা-ভাজন হইয়া থাকিতে পারেন, অথবা পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়া থাকিতে পারেন। কোন কোন পুঁথিতে ঘনরাম চক্রবর্তীর গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ-সূত্রে

আত্মপরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু রচনার এই অংশের প্রামাণিকতা সন্দেহাতীত নয়।—

ঘনরাম তাঁহার অধ্যাপকের পূজার জন্য যখন ফুল তুলিতেছিলেন, তখন তাঁহার পায়ে কাঁটা ফোটে; কিন্তু ফুল অপবিত্র হইয়া যাইবে ভয়ে কবি আর পায়ে হাত দিয়া কাঁটা খুলিলেন না, ঐভাবেই বাড়ি গেলেন। অধ্যাপক পূজায় বসিয়া দেখিলেন, তাঁহার ইষ্টদেবতার পায়ে বেগুন-পাতাসমেত কাঁটা বিঁধিয়া রহিয়াছে। অভিমানে অধ্যাপক ঘর ছাড়িয়া পুরীর দিকে যাত্রা করিলেন। কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া হনুমানের আদেশমতো রামচন্দ্রের পূজা করিতে লাগিলেন। অতঃপর গুরুর আদেশে ঘনরাম রামায়ণ রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু পরদিন পুঁথি খুলিয়া দেখেন যে রামচন্দ্রের ধ্যান ও বন্দনাস্থলে ধর্ম-ঠাকুরের ধ্যান ও বন্দনা লিখিত রহিয়াছে। তখন ঘনরাম ধর্মমঙ্গল রচনায়ই প্রবৃত্ত হইলেন।

আত্মকাহিনী

কাহিনীটি প্রামাণিক হউক বা না হউক, অন্তত একটি কথা সত্য যে কবি ছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক। সম্ভবত কবি রামায়ণ-গায়কও ছিলেন। কবি কাব্যে গ্রন্থ-রচনাকাল-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:

‘শক লিখি রামগুণ রস সুধাকর।
মার্গকাদ্য অংশে হংস ভার্গব বাসর॥
সুলক্ষ বলক্ষ পক্ষ তৃতীয়াখ্য তিথি।
যামসংখ্য দিনে (দণ্ডে ?) সাঙ্গ সঙ্গীতের পুঁথি॥’

কবি ১৬৩৩ শকাব্দে (=১৭১১ খ্রীঃ) গ্রন্থটি সমাপ্ত করিয়াছিলেন।

কবির কাব্য অন্যান্য ধর্মমঙ্গলের মতই বারোদিন গাহিবার উপযোগী ২৪ পালায় বিভক্ত। বিষয়ের দিক হইতে নূতনত্ব বিশেষ কিছু নাই। কিন্তু পরিবেষণের দিক হইতে তিনি যথেষ্ট অভিনবত্ব দেখাইয়াছেন। ‘কবি-রত্ন’ উপাধি-ধারী ঘনরাম পণ্ডিতব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার রচনায় ইহার প্রভাব যথেষ্ট। একদিকে তিনি যেমন বিভিন্ন পুরাণ হইতে প্রভূত পরিমাণ উপকরণ আহরণ করিয়াছিলেন, তেমনি অলঙ্কারও ব্যবহার করিয়াছেন যথেষ্ট, বিশেষত অনুপ্রাসেই কবির সমধিক প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। ঘনরামের রচনায় যথেষ্ট সাবলীলতা থাকিলেও কদাচিৎ উৎকট পাণ্ডিত্য-প্রকাশের চেষ্টায় রচনার গতি বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। যেমন ‘উত্তর দিক’ অর্থে তিনি ব্যবহার করিয়াছেন ‘বিরাট-তনয় মুখ’ অথবা উষা—অর্থে ‘গোবিন্দ-তনয়সুত-জায়া।’

আবার যখনই কবি সার্থকভাবে অলঙ্কারকে ব্যবহার করিতে পারিয়াছেন, তখনই তাহা কাব্যের সম্পদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে :

‘রাহুত মাহুত হানে যূথে যূথ
কোটাল যম-খণ্ডাতি।
ছাড়ি সিংহনাদ গণি পরমাদ
হুতাশে হটায়ে হাতী॥

ধর্মমঙ্গলকাব্যের পূর্ববর্তী কবিগণ শুধু কাহিনীই রচনা করিয়া গিয়াছেন। আপন কবি-স্বভাব দ্বারা তাহাতে রস সঞ্চার করা কিংবা মার্জিত বুদ্ধি দ্বারা তাহার সংস্কার সাধন করা সম্ভবপর হয় নাই। ঘনরামই সর্বপ্রথম ধর্মমঙ্গল কাব্যে রস সঞ্চার করিয়া এবং কাব্যের সংস্কার সাধন করিয়া ইহাকে সর্বসাধারণের পক্ষে গ্রহণযোগ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। ঘনরামের হাতেই ধর্মমঙ্গলকাব্য প্রথম গ্রাম্যতামুক্ত হইল এবং আপন সম্প্রদায়ের বাহিরেও শ্রদ্ধার আসন লাভ করিল।

কাব্য-বিচার

পুরাণাদি প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র এবং কাব্যাদিতে বিখ্যাত পণ্ডিত ঘনরাম ধর্মমঙ্গলকে ইহার নিজস্ব অন্ত্যজ পরিমণ্ডল হইতে উদ্ধার করিয়া হিন্দু-মহিমা দান করিয়াছিলেন। সম্ভবত ঘনরামের কাব্য হাতে পাইবার ফলেই হিন্দু-সাধারণ ইহাকেও মনসামঙ্গল এবং চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের মতই আপনাদের বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। অন্যথায় ধর্মমঙ্গলকাব্য একান্তভাবেই একটা বিশেষ স্থানে এবং একটা বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যেই চিরকাল সীমাবদ্ধ থাকিত। এই বিশেষ দিকটি ছাড়াও ঘনরাম কবিপ্রতিভার বলে ধর্মমঙ্গলকে যে কাব্যরূপ দান করিয়াছিলেন, তাহার সার্থক স্বীকৃতি মিলিয়াছে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের কাব্যে। ভারতচন্দ্র যে ঘনরামের কাব্য হইতে প্রচুর ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতেই ঘনরামের উৎকর্ষ প্রমাণিত হয়। ঘনরাম কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোকের সুন্দর ও সুষ্ঠু অনুবাদ রচনা করিয়া গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ঘনরাম যে কেমন ভাব-ভূয়িষ্ঠ পদরচনা করিতে পারিতেন, তাহার পরিচয়ও তাঁহার ধর্মমঙ্গলকাব্যে বর্তমান। এই পদগুলি প্রকৃতপক্ষে প্রবাদ-প্রবচনেরই মর্যাদা লাভ করিয়াছে :

‘হাতে শঙ্খ দেখিতে দর্পণ নাই খুঁজি।’
‘না করে মিথ্যারে ভয় বিশেষে ঘটক।’
‘বিবাহ বিষয়ে মিথ্যা নাহি দোষ তায়।’
‘সুব্যঞ্জন ঝোল ঝালে কুটুম্বিতা হালাহোলে
পরকালে কেহ কার নয়।’

মাণিক গাঙ্গুলি ঃ মাণিক গাঙ্গুলি 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের আর একজন প্রসিদ্ধ কবি। তাঁহার গ্রন্থে যে কাল-পরিচয়-জ্ঞাপক শ্লোকটি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে লিপিকর-প্রমাদ মারাত্মক আকারে দেখা দিয়াছে। ইহাকে প্রমাদ-মুক্ত করিয়া নিম্নোক্তভাবে ইহার পাঠান্তর কল্পনা করা হইয়াছে।—

'শাকে ঋতু সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে।
সিদ্ধ (সিদ্ধি ?) সহ যুগ পক্ষে যোগ তার সনে॥
বারে হল্য মহীপুত্র তিথি অব্যাহৃতি।
শর্বরী শরাগ্নি দণ্ডে সাঙ্গ হইল পুঁথি॥'

ইহার অর্থ উদ্ধার করিয়া কবির গ্রন্থসমাপ্তির যে কাল নির্ধারণ করা হইয়াছে, তাহাতে প্রচুর মতভেদের অবকাশ রহিয়া গিয়াছে। আচার্য যোগেশচন্দ্র পাইয়াছেন ১৭০৩ শকাব্দ (১৭৮১ খ্রীঃ), ড° দীনেশ সেন মনে করেন ১৪৬৯ শকাব্দ (১৫৪৭ খ্রীঃ)। অন্য অনেকেই ইহার মধ্যবর্তী অপরাপর কালের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ ছাড়া ইহার কাল-নিরূপণ সম্ভব নহে। যে পুঁথিটি-অবলম্বনে গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে তাহার লিপিকাল ১৮০৯ খ্রীঃ, অতএব অপেক্ষাকৃত আধুনিকই বলিতে হয়। বহু প্রাচীন পুঁথিও আধুনিক কালে লিখিত হইলে তাহাতে আধুনিকতার ছাপ পড়ে। কাজেই মাণিক গাঙ্গুলির গ্রন্থে আধুনিকতার চিহ্ন হইতে কিছুই বোঝা যায়না। কেহ কেহ আবার ইহারই মধ্যে কিছু কিছু প্রাচীনত্বের লক্ষণও দেখিতে পাইয়াছেন। পক্ষান্তরে অন্য মতাবলম্বীরা 'সুরিক্ষার পাটে বন্দী বিদগ্ধ বিদেশী পুরুষের তালিকায় কৃত্তিবাস, চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম, কাশীরাম, খেলারাম, ঘনরাম প্রভৃতি নামগুলি' হইতে গ্রন্থের আধুনিকতার কথাই বলিতে চাহেন। আবার এই নামগুলি পরবর্তী কালে প্রক্ষিপ্তও হইয়া থাকিতে পারে। অতএব মাণিক গাঙ্গুলির গ্রন্থ রচনা-কাল সমস্যাই রহিয়া গেল।

কাল-বিচার

মাণিক গাঙ্গুলি গ্রন্থে যে আত্মপরিচয় দান করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে কবির পিতার নাম গদাধর, মায়ের নাম কাত্যায়নী। কবিরা ছয় সহোদর ছিলেন। তাঁহার জন্মস্থান বেলডিহা গ্রাম। কবি 'গ্রন্থোৎপত্তির কারণ' বর্ণনা-প্রসঙ্গে এক বিস্তৃত কাহিনীতে জানাইয়াছেন, কীভাবে ধর্মঠাকুর পথিমধ্যে তাঁহাকে দেখা দিয়া তাঁহাকে ধর্মমঙ্গলকাব্য রচনা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন।—

'গীত রচ ধর্মের গৌরব হ'বে বাড়া।
নকল লেখিয়া দিব লাউসেনী দাঁড়া॥

বিশ্বের কারণ আমি বাঁকুড়া রায় নাম।
না করিবে প্রকাশ হইবে সাবধান ॥'

ধর্মঠাকুর তাঁহাকে বারদিনের মধ্যে বারমতি পালা সমাপ্ত করিতে বলিয়াছিলেন। কবি অতঃপর পদ্য-রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কবির কাব্য অন্যদের মতই ২৪ পালায় বিভক্ত। কাহিনীভাগে সামান্য বৈচিত্র্য দেখা দিলেও মূলত একই প্রকার। মার্কণ্ড মুনির ধর্মপূজার উল্লেখ ইহার প্রাচীনত্বের দ্যোতক। কবি গতানুগতিক কাহিনী রচনা করেন নাই; তিনি যে সংস্কৃত সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া পাণ্ডিত্যের সঙ্গে রসও আহরণ করিয়াছিলেন, আলোচ্য গ্রন্থে তাহার পরিচয়ও বর্তমান। লখ্যা ডোমনীর চরিত্র-সৃষ্টিতে তাঁহার কবি-কল্পনা সার্থকতা লাভ করিয়াছে। কবি সংস্কৃত সাহিত্যে পণ্ডিত ছিলেন বলিযাই অনুপ্রাসাদি অলঙ্কার এবং অপ্রচলিত শব্দ প্রয়োগে খুবই তৎপর ছিলেন।

কাব্য-বিচার

'অম্ভোরুহ অঙ্ঘ্রিযুগে আমার প্রণাম।'

তাঁহার রচনায় মাঝে মাঝে বেশ সরসতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার রচিত কোন কোন পংক্তিতে প্রবাদ-প্রবচনের স্বাদও পাওয়া যায়।—

'চাকর কুকুর তুল্য ডাকে কেন এত।'
'যেই অঙ্গে দৃষ্টি পড়ে সেই অঙ্গ রয়।'

সহদেব চক্রবর্তী: সহদেব চক্রবর্তীর রচিত গ্রন্থের নাম 'অনিলপুরাণ, ধর্মপুরাণ বা ধর্মমঙ্গল'। কবি গ্রন্থরচনা-কাল সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন—

'দ্বিজ সহদেব গায় পূর্ব তপ ফলে।
যাহারে করিলে দয়া একচল্লিশ সালে ॥...
চৈত্রের চতুর্থদিন পূর্ণিমার তিথি।
হেন দিনে যারে দয়া কৈল যুগপতি ॥'

অনেকেই অনুমান করেন ১১৪১ সালের ৪ঠা চৈত্র পূর্ণিমার দিন কবি শিবের দয়া লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ১১৪১ সালের ৪ঠা চৈত্র পূর্ণিমা ছিল না; ইহার একশ বছর আগে বা পরেও ছিল না। অতএব রচনার কোথাও প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। ড° সুকুমার সেন এই তারিখ হইতে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে সহদেব চক্রবর্তীর গ্রন্থরচনা-কাল কল্পনা করিয়া থাকেন। কবির পিতার নাম বিশ্বনাথ, জন্মস্থান হুগলী জেলার রাধানগর গ্রাম। সহদেব চক্রবর্তীর গ্রন্থটি প্রধানত 'অনিল পুরাণ' নামেই প্রসিদ্ধ। ইহাকে

তিনি কোন কোন স্থলে ধর্মমঙ্গল বলিলেও ইহা প্রকৃতপক্ষে ধর্মমঙ্গল নহে। কারণ ধর্মমঙ্গলকাব্যের যে প্রধান ঘটনা 'লাউসেনের কাহিনী' তাহাই ইহাতে সম্পূর্ণ বর্জিত হইয়াছে। ইহাতে শিবায়নের মত হর-গৌরী-কাহিনী, ধর্মপুরাণের মত ধর্মের মাহাত্ম্য বর্ণনা এবং গোর্খবিজয়ের মত মীননাথ-গোরক্ষনাথের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে হরিশ্চন্দ্র রাজার কাহিনীও বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কতকগুলি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন বিষয় ইহাতে সন্নিবিষ্ট হওয়ায় গ্রন্থটি সামগ্রিকতা লাভ করিতে পারে নাই। ইহাতে চরিত্র-সৃষ্টিরও কোন প্রয়াস নাই; কাব্য-হিসাবে গ্রন্থটির বিশেষ মূল্য নাই। তবে তাঁহার ভাষায় কোন কোন স্থলে গ্রাম্যতার পরিচয় পাওয়া গেলেও মাঝে মাঝে বেশ সরল ও মর্মস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে। রচনায় সংস্কৃত সাহিত্যের এবং বৈষ্ণব কবিদের প্রভাবের পরিচয় বিদ্যমান।

কবি ও কাব্য-বিচার

অপ্রধান কবিগণঃ ইতঃপূর্বে ধর্মমঙ্গলকাব্যের যে সকল কবির বিবরণ প্রদত্ত হইল, তাহাদের বাহিরে আরও অনেকেই কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের কাহারও রচনায় তেমন কোন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহাদের অনেকেই অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। আবার সকলেই যে সম্পূর্ণ ধর্মমঙ্গলকাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহা নহে, অনেকেই অংশবিশেষ-অবলম্বনে খণ্ডকাব্যও রচনা করিয়া গিয়াছেন।

নরসিংহ বসু ১৭৩৭ খ্রীঃ তাঁহার ধর্মমঙ্গলকাব্য-রচনা আরম্ভ করেন। তাঁহার পিতার নাম ঘনশ্যাম, মাতা নবমল্লিকা। কবির বাসস্থান ছিল বর্ধমান জেলার শাঁখারী গ্রাম। নবাবের উকিল নরসিংহ বসু নবাব-সরকারে টাকা জমা দিতে যাইবার পথে বিশ্রামকালে এক সন্ন্যাসী তাঁহাকে ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করিতে বলেন। অতঃপর তাঁহার তিন জন বন্ধুও এই বিষয়ে আগ্রহ প্রদর্শন করিলে কবি ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন।

নরসিংহ বসু

হৃদয়রাম সাউ ১১৫৬ সালে ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। কবির পিতার নাম গোবিন্দ, তাঁহার পৈতৃক নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার খুরুল গ্রাম। অবশ্য কবি মাতুলালয়েই প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। দেবসেবার অংশ-গ্রহণে বঞ্চিত হওয়ায় কবি মনোদুঃখে আত্মহত্যা করিতে গেলে ধর্মঠাকুর তাঁহাকে দেখা দেন। তাঁহার নির্দেশমত হৃদয়রাম এক হ্রদ হইতে ধর্ম ঠাকুরের মূর্তি উদ্ধার করিয়া তাঁহার সেবায়

হৃদয়রাম সাউ

নিযুক্ত হন। ধর্মের গীত রচনার জন্য স্বপ্নাদেশ পাইয়া কবি ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন।

ধর্মমঙ্গল-রচয়িতা গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত পরিচয় কিংবা কাল-সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায় না। ড° দীনেশ সেন ইঁহাকে পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি বলিয়া মনে করিলেও বসন্ত চট্টোপাধ্যায় ইঁহার জীবৎকাল স্থির করিয়াছেন অষ্টাদশ শতাব্দী। গোবিন্দরামের রচনায় প্রাচীনতার কিছু কিছু চিহ্ন পাওয়া যায়। রামনারায়ণ নামক অপর এক কবিরও একখানা ধর্ম মঙ্গল কাব্য পাওয়া গিয়াছে। তাঁহারও পরিচয় এবং রচনাকাল-সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। তবে ভাষায় আধুনিকতার লক্ষণ দেখিয়া ইঁহাকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্থাপন করা চলে। রামায়ণ-মহাভারত-

অন্যান্য কবিগণ

কৃষ্ণমঙ্গল আদি বহু গ্রন্থ-প্রণেতা কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী একখানা ধর্মমঙ্গল কাব্যও রচনা করিয়াছিলেন। বীরভূম জেলার শ্যামপণ্ডিতের ধর্মমঙ্গল কাব্য পাওয়া গেলেও তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে অজয় নদের উত্তর তীরে একমাত্র তিনিই ধর্মমঙ্গলের কবি।

পরবর্তীকালে ধর্মপূজার কিছু কিছু প্রসার ঘটিয়াছিল। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় ঐ সমস্ত অঞ্চলে নূতন কোন ধর্মমঙ্গল কাব্য রচিত হয় নাই। রাঢ়-দেশই ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদি উৎসভূমি, এই স্থানেই তাহার সমৃদ্ধি, ইহার সমাপ্তিও এইস্থানেই।

৪. শিবায়ন কাব্য

শিবের প্রভাব বাঙলাদেশে যেমন বহুব্যাপক, তাহাতে তাঁহাকে বাঙলার 'জাতীয় দেবতা' বলিয়া অভিহিত করিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। 'ধান ভানতে শিবের গীত'—কথাটা শুধুই কথার কথা নয়, বস্তুত বাঙ্গালীর স্বভাবই এমন যে অপ্রসঙ্গেও শিবের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বাঙলাদেশে মঙ্গলকাব্যগুলির কথা উল্লেখ করা চলে। চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে এবং মনসামঙ্গল কাব্যে যথাক্রমে চণ্ডী এবং মনসার মাহাত্ম্য-বর্ণনাই কবিদের অভিপ্রেত অথচ গ্রন্থের প্রথমার্ধ শিব-কাহিনীতেই পূর্ণ। ধর্ম-মঙ্গলকাব্যের ধর্মঠাকুরকে কেহ কেহ শিব বলিয়াই অনুমান করেন। অন্তত কাব্যে যে দেবতাত্রয়ের

উল্লেখ আছে, তাঁহাদের মধ্যে শিবই শ্রেষ্ঠ এবং এই কারণেই আদ্যাশক্তি শিবকেই পতিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। নাথ-সাহিত্যেও শিবেরই প্রাধান্য লক্ষিত হইয়া থাকে। যে সমস্ত লৌকিক দেব-দেবী অনার্য সমাজ হইতে আর্যসমাজে গৃহীত হইয়াছেন, তাহাদিগকে শিবের সঙ্গে কোন প্রকারে সম্পর্কযুক্ত করিতে পারিলেই যেন তাহারা অনার্য-কলঙ্ক হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন,—ইহাই ছিল কবিদের ধারণা। কুলীনের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিয়া অনেকেই যেমন জাতে উঠিবার সুযোগ লাভ করিতেন, সেই একই মনোবৃত্তি হইতেই বাঙালী কবিরা তাঁহাদের উপাস্য দেব-দেবীকে শিবের হাতে সম্প্রদান করিতেন। এই দিক হইতে বিচার করিলে বাঙলার প্রায় তাবৎ মঙ্গল-কাব্যই শিবমঙ্গলও বটে। অবশ্য বয়সের দিক হইতে শিবায়ন কনিষ্ঠ হইলেও শিব-সম্বন্ধীয় এই মনোভাব যে আধুনিক, তাহা নহে। শিবের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া 'শিবগীত' রচিত হইয়াছিল অতি প্রাচীনকালেই। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবতে পাওয়া যায়ঃ

শিবের সর্ব-ব্যাপকতা

'একদিন আসি এক শিবের গায়ন।
ডমরু বাজায় গায়—শিবের কথন।'

চৈতন্য মহাপ্রভু যখন শিব-গীত শুনিতে পাইলেন, তখন সেই রাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিত-তনু কৃষ্ণাবতার চৈতন্যদেবের মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা বিস্ময়করঃ

'শঙ্করের গুণ শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর।
হইলা শঙ্কর মূর্তি দিব্য জটাধর॥
এক লাফে উঠে তার কান্ধের উপর।
হুঙ্কার করিয়া বোলে মুঞি সে শঙ্কর॥'

অপর দেবতা-সম্বন্ধে বৈষ্ণবদের যে অসহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায়, এখানে তাহার ব্যতিক্রম দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। বস্তুত শিব যে অসাম্প্রদায়িক এবং সর্ব্বজনীন দেবতা, তাহার পরিচয় এখানেও সুস্পষ্ট। এই সমস্ত কারণেই শিবকে বাঙলার 'জাতীয় দেবতা'র পদ দান করিলে যে বিশেষ আপত্তির কারণ থাকিবে না, তাহা অনুমান করা চলে।

শিব পুরাণাশ্রিত দেবতা হইলেও বৈদিক দেবতা নহেন। কিন্তু ইহাতে শিবের অর্বাচীনতা প্রমাণিত হয় না, কারণ তাঁহাকে প্রাগার্য দেবতা বলিয়াই অনুমান করা হইয়া থাকে। সেই দিক হইতে বিচার করিলে শিবকে

ভারতের প্রাচীনতম দেবতা বলিয়াই অভিহিত করা চলে। আর্য-পূর্ব ভারতে মোহেন-জে-দড়োয় যে সকল সীল-মোহর পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে শিবের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে,—এই অভিমত ক্রমশ অবিসম্বাদিত্ব লাভ করিতেছে। বেদে শিবকে পাওয়া না গেলেও রুদ্রদেবতা আছেন। পরবর্তীকালে রুদ্র যে কেবল নামান্তরই হইয়াছিল তাহা নহে, রুদ্র শিবের সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে প্রাচীন দ্রাবিড় জাতির দেবতা ছিলেন শিবশম্ভু। পরবর্তীকালে হিন্দুপুরাণ তাঁহাকে আত্মসাৎ করিয়াছেন। পৌরাণিক শিবের উপর বৌদ্ধ এবং জৈনপ্রভাবের কথাও বহুশ্রুত। ডঃ ভট্টাচার্য বলেন: 'গৌতম বুদ্ধের জীবনাদর্শ হইতে পৌরাণিক শিবের পরিকল্পনা হইয়াছিল, সেই জন্য বাংলার বৌদ্ধমত পৌরাণিক শৈবধর্মমতের মধ্যেও নিজের আদর্শেরই সন্ধান পাইল। জিন তীর্থঙ্করের জীবনাদর্শও গৌতম বুদ্ধ এবং এই পৌরাণিক শিবের আদর্শ হইতে স্বতন্ত্র ছিলনা, সেইজন্য এই বিরাট জৈনসম্প্রদায়ও ক্রমে নব প্রতিষ্ঠিত শৈবসম্প্রদায়েরমধ্যেই বিলীন হইয়া গেল। এইভাবে দেখিতে পাই, খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পর হইতে বাংলার শৈবধর্ম এক বিরাট সম্প্রদায়ে পরিণত হয়।' বস্তুত পৌরাণিক শিব সংহারের দেবতা হইলেও প্রধানত তিনি আশুতোষ—ঔদার্যে এবং সহনশীলতায় তিনি তুলনারহিত। এই কারণেই তিনি যেমন সহজেই পরকেও আপন করিতে পারেন, তেমনি অপর সকল সম্প্রদায়ও তাঁহাকে সহজেই আপন করিয়া লইয়াছিল। এই ভাবেই প্রাগার্য, আর্য, দ্রাবিড়, বৌদ্ধ এবং জৈন মতের সমন্বয়ে সঙ্কর দেবতা শঙ্করের উদ্ভব ঘটিয়াছিল এবং এই শিবশঙ্করই পুরাণ-সমূহের অন্যতম প্রধান দেবতা। এই শিবের কাহিনীই বিভিন্ন ধর্মমঙ্গল কাব্যের (শিবায়ন কাব্যেও) প্রথম ভাগ অধিকার করিয়া আছে। শিবায়নকাব্যের লৌকিক খণ্ডে যে শিবের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, তিনি অপর এক স্বতন্ত্র শিব—ইঁহাকে 'লৌকিক শিব' আখ্যা দেওয়া চলিতে পারে।

শিবের উদ্ভব

লৌকিক শিবের উদ্ভব ঘটিয়াছে বাঙলার কৃষককুল হইতে। অসম্ভব নহে, শিবনামধারী কোন নিম্নবিত্ত গৃহস্থই হয়তো বা নাম-সাদৃশ্যে শিবায়ন কাব্যের 'শিব' হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। কিন্তু যেভাবেই এই শিবের উদ্ভব ঘটিয়া থাকুক, ইনি মূলে হয়তো বাঙলার কৃষককুলের দেবতা ছিলেন, কিন্তু কবি ইঁহাকে কৃষক-রূপেই চিত্রিত করিয়াছেন। এই শিব হয়তো মূলত

কোচজাতির দেবতা ছিলেন, কারণ শিবায়ন-কাব্যে কোচজাতির সহিতই তাঁহার সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠতম। ইনি কুটনী-সাহচর্যেই দীর্ঘকাল কাটাইয়া ছিলেন। আবার ঘটনান্তরে দেখা যায়, শিব শাঁখারীর ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছেন। অতএব শাঁখারী-জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত কোন দেবতার সঙ্গেও ইহার যোগাযোগ থাকা অসম্ভব নহে। তবে কৃষক-দেবতা শিবের সঙ্গে পৌরাণিক দেবতা শিবের সাদৃশ্য অন্যান্য প্রভাবের ফলে হওয়াটাও বিচিত্র নহে। শিব বলদ-বাহন, তিনি সিদ্ধি ভক্ষণ করিয়া থাকেন। কৃষকেরও অনন্য-সহায় বলদ, কৃষকরাও দিনান্তে পরিশ্রমের পর একটু 'নেশাভাঙ' করিয়া থাকে। এই লৌকিক শিবের প্রভাবই যে পৌরাণিক শিবকে কিছুটা রূপান্তরিত করিয়াছে, তেমন সম্ভাবনাকেও উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

লৌকিক শিব

শিবায়ন কাব্যগুলি প্রকৃতপক্ষে মঙ্গলকাব্য কিনা এই বিষয়ে কেহ কেহ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। বিষয়টি সম্বন্ধে আলোচনা করিলেই ইহার স্বরূপ বোঝা যাইবে। শিব-সাহিত্য দুইটি প্রধান ধারায় বিভক্ত : ১. 'মৃগলুব্ধ' বা শিব চতুর্দশীর মাহাত্ম্য-সূচক কাব্য এবং ২. 'শিবমঙ্গল' বা 'শিবায়ন' কাব্য। প্রথমজাতীয় গ্রন্থে অর্থাৎ 'মৃগলুব্ধ' কাব্যে শুধু পৌরাণিক শিবের কাহিনীই লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। বিভিন্ন পুরাণ-অবলম্বনে বাঙালী কবিগণ শিবমাহাত্ম্য-রূপে মৃগলুব্ধ রচনা করিয়াছেন। ইহাতে কোন লৌকিক দেবতার কাহিনী স্থান লাভ করে নাই। বস্তুত, ইহাকে বিভিন্ন পুরাণের সারানুবাদ বলিয়াই অভিহিত করা চলে। মঙ্গলকাব্যের লক্ষণ ইহাতে একেবারেই অনুপস্থিত। দ্বিতীয় ধারার কাব্য অর্থাৎ 'শিবায়ন' অবশ্যই অপর সকল মঙ্গলকাব্যের অনুসরণে রচিত। ইহার দেবখণ্ডে পৌরাণিক হর-পার্বতীর কাহিনী এবং নরখণ্ডে লৌকিক শিবের কাহিনী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয়, অপরাপর মঙ্গল কাব্যের নরখণ্ডে সাধারণ মানব-মানবীর কাহিনীই বর্ণিত হইয়া থাকে আর দেবতা অনেকটা অন্তরালে থাকিয়া স্বীয় মাহাত্ম্য-প্রচারে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। সেখানে দেবতার সঙ্গে প্রকাশ্যে মানুষের দ্বন্দ্ব ('মনসামঙ্গল') অথবা মানুষে মানুষে দ্বন্দ্বের মধ্যেই দেবতা আত্মপ্রতিষ্ঠার উপায় খোঁজেন (চণ্ডীমঙ্গল), অথবা দুই পক্ষীয় মানুষের সঙ্গে দুই দেবতাও দ্বন্দ্বে রত হইয়া থাকেন (ধর্মমঙ্গলে ধর্ম ও চণ্ডী); কিন্তু দেবতারা কখনও কাহিনীর নায়ক-নায়িকার স্থান অধিকার করেন না।

শিবায়ন কাব্য কি মঙ্গলকাব্য?

কিন্তু আলোচ্য শিবায়ন কাব্যে দেখা যাইতেছে, কাহিনীর নায়কই শিব। কাহিনীর বিষয়বস্তু : দারিদ্র্য-পীড়িত হর-পার্বতীর জীবনযাত্রা তথা দাম্পত্য-কলহ। দ্বন্দ্ব বলিতে এখানে স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া। আরো লক্ষণীয়, অন্য সকল মঙ্গলকাব্যে দেবতার মাহাত্ম্য-প্রচারের যে উগ্র প্রচেষ্টা দেখা যায়, আলোচ্য গ্রন্থে দেবতা সে দায় হইতে মুক্ত। অতএব 'শিবায়ন'কে যদি বা মঙ্গলকাব্য বলা যায়, তবু যে ইহা আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল, তাহাতে মত-ভেদের অবকাশ নাই।

'মৃগলুব্ধ' গ্রন্থে প্রধানত শিবচতুর্দশীব্রত-পালনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হইয়াছে। সংস্কৃত 'শম্ভু-রহস্য' বা 'শিব রহস্য' নামক গ্রন্থে বর্ণিত শিবচতুর্দশী ব্রতকথা এবং অন্যান্য পুরাণ-কাহিনী অবলম্বন করিয়া 'মৃগলুব্ধ' কাহিনী রচিত হইয়াছে।—রাজা মুচুকুন্দ শিবচতুর্দশীব্রত-উপলক্ষ্যে রাত্রি জাগরণ করিয়াছেন, রাণী তাঁহাকে শিবের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া একটি গল্প বলিলেন। কোন এক ব্যাধ প্রাণপণ চেষ্টায়ও কোন মৃগ সংগ্রহ করিতে পারিল না। এদিকে নিশাগমে প্রবল ঝড় উঠিল ; ভয়ে ব্যাধ এক বেলগাছে উঠিয়া গাছের পাতা নীচে ছিঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল। গাছের নীচে ছিল শিবলিঙ্গ, আর সেই দিন ছিল শিবচতুর্দশী। ব্যাধ-নিক্ষিপ্ত বেলপাতা শিবলিঙ্গের উপর পড়িলে মহাদেব তুষ্ট হইয়া ব্যাধকে বরদান করিলেন। মহাদেবের বরে পরদিনই ব্যাধের জালে এক মৃগ ধরা পড়িল। সঙ্গিনী মৃগী মৃগকে ছাড়িয়া দিবার জন্য ব্যাধকে বিহিত অনুরোধ করিলেও যখন ব্যাধ তাহাতে রাজি হইল না, তখন মৃগী পাপের কথা, পাপ হইতে মুক্তির উপায়স্বরূপ শিবচতুর্দশীর ব্রতকথা ইত্যাদি শুনাইলে ব্যাধের জ্ঞান-দৃষ্টি লাভ হইল। সে মৃগকে ছাড়িয়া দিল। ব্যাধও ব্যাধ-জীবন ত্যাগ করিয়া শিবের শরণ লইল।—রাজা মুচুকুন্দের কাহিনী বহু পুরাণেই বর্ণিত হইয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয়, 'মৃগলুব্ধ'-গ্রন্থের এই কাহিনীতে পৌরাণিক কাহিনীই বিবৃত হইয়াছে।

মৃগলুব্ধ-র কাহিনী

শিবায়নের কাহিনীটি অন্যপ্রকার। ইহাতেও অতি সংক্ষেপে শিব-চতুর্দশীর মাহাত্ম্য-রূপে মৃগলুব্ধের কাহিনীও বর্ণিত হইয়াছে। যাহা হউক শিবায়নের দেবখণ্ড অপর সকল মঙ্গলকাব্যেরই অনুরূপ। দক্ষযজ্ঞ হইতে আরম্ভ করিয়া দারিদ্র্যের জন্য হরপার্বতীর কলহ অংশ পর্যন্ত বিশেষ কোন বৈচিত্র্য নাই। ইহার পরই আরম্ভ হইল প্রকৃত শিবায়ন কাহিনী। সংসারের দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য পার্বতী মহাদেবকে মর্ত্যলোকে গিয়া

চাষবাসে মন দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। মহাদেব ইন্দ্রের নিকট হইতে জমি পাট্টা লইয়া বিশ্বকর্মাকে দিয়া চাষের যন্ত্রপাতি বানাইয়া কুবেরের নিকট হইতে বীজধান গ্রহণ করিলেন। অতঃপর ভীমের সহায়তায় মহাদেব চাষ আরম্ভ করিলেন। জমিতে ফসল ফলিল। মহাদেব ফসলের মায়ায় আবদ্ধ হইয়া স্বর্গের কথা ভুলিয়া গেলেন। কৈলাস হইতে দেবী মশা, মাছি, ডাঁশ ইত্যাদি প্রেরণ করিলেন পৃথিবীতে; ইহাদের কামড়ে মহাদেব অস্থির, তবু তিনি স্বর্গে ফিরিয়া যান না। তখন পার্বতী বাগ্দিনীর ছদ্মবেশে নরলোকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাগ্দিনীর রূপে মুগ্ধ হইয়া মহাদেব তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিলে দেবী কৌশলে তাঁহার আংটিটি লইয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন। পরে মহাদেবও স্বর্গে গিয়া আংটির জন্য অতিশয় অপ্রস্তুত হইলেন। এদিকে পার্বতী মহাদেবের নিকট শাঁখা চাহিয়াছিলেন, কিন্তু না পাইয়া রাগ করিয়া বাপের বাড়ি চলিয়া গেলেন। এইবার মহাদেব শাঁখারীর ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া পার্বতীকে ছলনা করিতে গেলেন। যাহা হউক, এখানে শঙ্কর শঙ্করীর হাতে শাঁখা পরাইয়া দিলে আবার তাঁহাদের মিলন ঘটিল।

শিবায়নের কাহিনী

'শিবায়ন'-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত দুইটি কাহিনী হইতেই দেখা যাইবে, ইহাদের সঙ্গে সাধারণ মঙ্গলকাব্যের সাদৃশ্য খুব স্পষ্ট নহে। প্রথমটি অর্থাৎ মৃগলুব্ধ কাহিনীটি তো একেবারেই পুরাণের ছাঁদে রচিত, ইহাতে লৌকিক জীবনের বিশেষ কোন পরিচয়ই নাই। পরবর্তী 'শিবায়ন' কাহিনীটিতে যদি বা লৌকিক জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়, তবু ইহাতে দেবতার মাহাত্ম্য-প্রচারের উৎকট ইচ্ছার কোন প্রকাশ নাই বলিয়াই ইহার মধ্যে কোন দ্বন্দ্বের সম্ভাবনাও দেখা যায় নাই। ফলত, কাহিনীতে একটা মন্থরতারই পরিচয় বর্তমান। এই দিক হইতে শিবায়ন-কাব্যকে অনেকটা কৃষ্ণমঙ্গল-ধর্মী বলিয়া অভিহিত করা চলে। শিবায়ন-কাব্যে শিবের মাহাত্ম্য-প্রচার নহে, তাঁহার জীবন-ধর্মেরই প্রকাশ ঘটিয়াছে। তবে এই শিব সাধারণ কৃষক সমাজেরই প্রতিনিধি-স্থানীয়; শিব-পার্বতীর নামের স্থলে যদি অপর কোন নায়ক-নায়িকার নাম প্রদান করিয়া কবি কাব্যটি রচনা করিতেন, তবে তাহা সমসাময়িক যুগের একখানি প্রামাণিক আলেখ্যের মর্যাদা লাভ করিতে পারিত। সমালোচক নন্দগোপাল সেনগুপ্ত যথার্থই বলিয়াছেন: 'এ দেবাদিদেব মহেশ্বর এবং জগন্মাতা পার্বতীর

কাহিনী-বিচার

কৈলাসজীবন নয়, এ অতীত বাংলার কোন শিবদাস ভট্টাচার্য এবং তস্য ভার্যা পার্বতীঠাকুরাণীর জীবন-কাহিনী।'

শিব-চরিত্রের কিছু কিছু দুর্বলতার পরিচয় পুরাণে এবং সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যেও পাওয়া যায়; কিন্তু শিবায়ন-কাব্যে শিবের যে দুর্গতিবিধান করা হইয়াছে, তাহা তুলনাবিহীন। কোচ-যুবতী এবং বাগ্দিনীর রূপমুগ্ধ মহাদেব-চরিত্রে দেবত্বের কোন স্পর্শ নাই-ই, এমনকি নীচ শ্রেণীর মানুষদের মধ্যেও এই ধরণের চরিত্র নিন্দিত হইয়া থাকে। মনে হয়, কবি জনরুচির তাগিদেই কামুক ও লম্পট শিবের চরিত্র অঙ্কন করিবার মত ইতরতার আশ্রয় লইয়াছিলেন। শিব-চরিত্রের মধ্য দিয়া আমরা সমসাময়িক যুগমানসের চিত্রকেই প্রত্যক্ষ করি। মনে রাখা দরকার, শিবায়ন কাব্যগুলি রচিত হইয়াছিল একেবারে অবক্ষয়ের যুগে। কাহিনীর দিক হইতে এই অবাঞ্ছিত অবস্থাকে এড়াইয়া যাইতে পারিলে অবশ্য আমরা রসের সন্ধান পাইব। ইহাতে গৃহ-জীবনের যে আদি-মধুর রসাত্মক চিত্র অঙ্কন করা হইয়াছে, তাহার তুলনা সমগ্র মধ্যযুগের সাহিত্যেই বিরল। ইহা ছাড়া পল্লীবাঙলার জনজীবনের যে বাস্তব চিত্র ইহাতে অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাও তুলনাবিহীন। ইহার দেবতা অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মত অপদেবতা নহেন, ইনি খাঁটি মানব। ইহার কাহিনীর মধ্যে আমরা পরিপূর্ণ মানব-জীবনেরই স্বাদ লাভ করিয়া থাকি। এই দিক হইতে শিবায়ন-কাব্য অনন্য।

বৈশিষ্ট্য

রতিদেব ঃ 'শিবানন্দ' কাব্যের যে ধারাটি শিবচতুর্দশী-মাহাত্ম্য-প্রচারে নিয়োজিত হইয়াছিল, রতিদেব সম্ভবত সেই ধারার আদি কবি। কবি-প্রদত্ত তারিখ (রস অঙ্ক বায়ুশশী শকের সময়) হইতে জানা যায় যে কবি ১৫৯৬ শকাব্দে (১৬৭৪ খ্রীঃ) পুঁথি রচনা আরম্ভ করেন। কবির পিতার নাম গোপীনাথ, মাতা মধুমতী বা মধুবতী। কবির নিবাস ছিল চট্টগ্রাম জেলার সুচক্রদণ্ডী গ্রাম। কবির রচিত পুঁথির নাম 'মৃগলুব্ধ'। কাব্যখানি আকৃতিতে বেশি বড় নহে। ইহাতে যে শিবকাহিনী পরিবেশিত হইয়াছে, তাহা সর্বাংশে পৌরাণিক। কবি যে সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যে কৃতবিদ্য ছিলেন, তাহার প্রমাণ গ্রন্থটিতে সুলভ। গ্রন্থটি মূলত অনুবাদ-জাতীয় বলিয়াই ইহাতে চরিত্রসৃষ্টির কিংবা কবির মৌলিকত্ব-প্রদর্শনের বিশেষ অবকাশ নাই। কবি ভক্ত ছিলেন। রচনায় ভক্তের আকুলতার সঙ্গে সহজ সরল কবিত্ব শক্তির মিশ্রণে বেশ

মৃগলুব্ধ

হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠিয়াছে। হরিণীর বিলাপে উৎকৃষ্ট করুণ রসের পরিচয় পাওয়া যায়।

রামরাজা ঃ 'মৃগলুব্ধ'-পুঁথির আর একজন গ্রন্থকার রামরাজা। গ্রন্থে কবি যেমন গ্রন্থরচনাকাল-সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত রাখিয়া যান নাই, তেমনি আত্মপরিচয়-সূত্রেও নিজের সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। ফলত, কবির সম্বন্ধে আমরা প্রায় অন্ধকারেই রহিয়াছি। একমাত্র ভণিতায়ই কবি মাঝে মাঝে আপনার নামটি উচ্চারণ করিয়াছেন ঃ

'শঙ্কর কিঙ্কর শিশু রামরাজে গাএ।'

গ্রন্থটির আবিষ্কর্তা মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ কবির পরিচয়-সম্বন্ধে বলেন ঃ 'সাধারণতঃ চট্টগ্রামের বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বড়ুয়া মগদের মধ্যেই নামের সহিত রাজা শব্দের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত অধিক দেখা যায়।...... এই সব বিবেচনা করিয়া আমার খুবই সন্দেহ হইতেছে, কবি রামরাজ কোন বড়ুয়া মগ-বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।' ড° সুকুমার সেন

মৃগ লুব্ধ

অনুমান করেন যে কবির নাম 'রামরায়' বা 'শিশুরাম রায়'ও হইতে পারে। রামরাজার কাব্যের বিষয়বস্তু যে রতিদেব হইতে অভিন্ন, তাহাই নহে, উভয়ের রচনায় বহু সাদৃশ্যও বর্তমান। কে কাহার নিকট ঋণী, বলা মুস্কিল! অবশ্য এমনও হইতে পারে যে, উভয় কবিই হয়তো অপর কোন তৃতীয় সূত্র হইতে স্ব-স্ব কাব্যের উপাদান আহরণ করিয়াছিলেন। রামরাজাও সংস্কৃত সাহিত্যে পণ্ডিত ছিলেন, তবে কবিত্ব-শক্তিতে তিনি রতিদেবের সমান ছিলেন না বলিয়াই মনে হয়।

'মৃগলুব্ধ' পুস্তকের প্রচার বিশেষ হয় নাই বলিলেই চলে। ড° ভট্টাচার্য মনে করেন, "একমাত্র চট্টগ্রামের অন্তর্গত চন্দ্রনাথ ও আদিনাথের নব প্রতিষ্ঠিত শৈব তীর্থগুলিকে কেন্দ্র করিয়াই এই সাহিত্য পুষ্টি লাভ করিয়াছিল, ইহার অন্যত্র প্রসার সম্ভব হয় নাই।'

রামকৃষ্ণ রায় ঃ সম্ভবত রামকৃষ্ণ রায়ই সর্ব বৃহৎ 'শিবায়ন'-রচয়িতা। তাঁহার কাব্যেই প্রথম নানাকাহিনী যুক্ত হইয়াছিল। কবি আত্মপরিচয় দান করিয়াছেন,—পিতা সর্ব শাস্ত্রে ধীর কৃষ্ণ রায়, মাতা রাধাদাসী। কবি জাতিতে কায়স্থ, তাঁহার বাসস্থান হাওড়া জেলার রসপুর গ্রাম। কবি যৌবনাগমেই সম্ভবত ১৬২৫ খ্রী° কিংবা সন্নিহিত কোন কালে কাব্যটি রচনা করিয়াছিলেন। ১৬৮৪ খ্রী° বর্ধমানরাজ কবির বাটী আক্রমণ করিয়া

তাঁহাদের কুলবিগ্রহকে অধিকার করিয়া লইলে নব্বুই বৎসর বয়স্ক কবি শোকে প্রাণত্যাগ করেন। কবি তাঁহার গ্রন্থের নাম বলিয়াছেন 'শিবায়ন' বা 'শিবের মঙ্গল'। কবির কাব্যের প্রথমাবধি 'কবিচন্দ্র' উপাধি হইতে মনে হয় যে এই গ্রন্থ-রচনার পূর্বেই তিনি অপর কোন কবি-কৃতির নিদর্শন-রূপেই উপাধিটি লাভ করিয়াছিলেন। সম্ভবত আগে তিনি ভক্তিরসাত্মক পদাবলী সাহিত্য রচনা করিয়াছিলেন।

কবি-পরিচয়

রামকৃষ্ণ রায়ের 'শিবায়ন' কাব্যটি ২৬টি পালায় বিভক্ত। কিন্তু পালা-গুলিতে কোন অনিবার্য কাহিনী-সংযোগ লক্ষিত হয় না। 'কাশীখণ্ড, হরিবংশ, কালিকাপুরাণ, বৃহন্নারদীয়, শান্তিপর্ব, স্কন্দপুরাণ' প্রভৃতি হইতে শিবসম্বন্ধীয় কাহিনী সঙ্কলন করিয়া কবি ইহাতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এই কাহিনীগুলি পরস্পর-সম্পর্কিত নহে, তবু কবি যতখানি সম্ভব, ইহাদিগকে যোগযুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কবির কাব্যে গ্রাম্যতা প্রায় নাই বলিলেই চলে। সম্ভবত বৈষ্ণব কবিতার প্রভাব হইতেই এইরূপ হইয়া থাকিতে পারে। ছন্দের মধ্যে তিনি যথেষ্ট বৈচিত্র্যের পরিচয় দান করিয়াছেন :—

গ্রন্থ-পরিচয়

'যত বিলাসিনী রচিল বেশ
বান্ধিল লোটন কুটিল কেশ
অলক তিলক অপরিশেষ
চিত্রবসন ওড়নি।'

ভারতচন্দ্রের পূর্বে এইরূপ ছন্দের প্রয়োগ বিস্ময়কর বলিয়াই মনে হয়। রামকৃষ্ণের 'শিবায়নে' কিছু কিছু গদ্য-রচনার নিদর্শন পাওয়া যায়,—'বচনিকা' নামক এই রচনাগুলি সাহিত্যিক গদ্যরূপেই বিবেচিত হইতে পারে। সম্ভবত বাঙলা-সাহিত্যে সাহিত্যিক গদ্যের ইহাই প্রাচীনতম নিদর্শন।—

কাব্য-বিচার

'ভাইরে নারদের পরিহাসে, মেনকা রোদন করিতেছেন এমত সময়ে কেমন স্ত্রীলিঙ্গ দেবতাসকল আসিতেছেন অবধান কর।'

শিবায়নে কাহিনীর দিক হইতে সামগ্রিকতা নাই, চরিত্র সৃষ্টি-প্রচেষ্টা নাই তথাপি 'ইহাকে শিব-বিষয়ক একটি কোষ-গ্রন্থ (encyclopaedia) বলা যাইতে পারে। বিভিন্ন ক্ষেত্র হইতে শিবপ্রসঙ্গের এমন সুনিপুণ সংকলন বাংলাসাহিত্যে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। এই দিক দিয়া বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই কাব্যখানির একটা বিশিষ্ট স্থান আছে।'

(ড° ভট্টাচার্য)

কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তীঃ মল্লভূমির কবি শঙ্কর চক্রবর্তী-সম্বন্ধে ইতঃপূর্বে অনেকবারই আলোচনা করা হইয়াছে। বস্তুত প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলাসাহিত্যে এমন অপর কোন কবির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নাই, যিনি একই সঙ্গে এত অধিক গ্রন্থ এবং বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। রামায়ণ-মহাভারত হইতে আরম্ভ করিয়া কবি প্রায় সর্বপ্রকার মঙ্গলকাব্য এবং পদাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন। শঙ্কর চক্রবর্তী শিব-সম্বন্ধীয় যে কাব্যখানি রচনা করিয়াছেন, তাঁহার নাম 'শিবমঙ্গল'। ইহাতে কবি শিবের লৌকিক কাহিনী যোগ করিয়া প্রকৃতপক্ষে বাঙলাসাহিত্যে নূতন কাব্যধারার সৃষ্টি করিয়াছেন। কবির ব্যক্তিগত পরিচয় পূর্ববর্তী অধ্যায়-সমূহে প্রদত্ত হইয়াছে। আনুমানিক ১৬৮০ খ্রী০ কবি মল্লরাজ বীরসিংহের রাজত্ব-কালে কাব্যটি রচনা করেন। কবি এই কাব্যেই প্রথম শিবের লৌকিক জীবনের অবতারণা করিয়া 'মৎস্য ধরা পালা', 'শঙ্খপরা পালা' যোগ করেন। 'মৎস্য ধরা' পালাতেই চাষী শিবের কাহিনী বর্ণনা করা হইয়াছে। মর্ত্যলোকে চাষ-বাসে রত শিব কৈলাসের কথা ভুলিয়া গেলে পার্বতী বাগ্দিনীর ছদ্মবেশে শিবের চাষ-ক্ষেতে আসিয়া মাছ ধরিতে আরম্ভ করেন এবং শিবকে ভুলাইয়া ভালাইয়া কৈলাসে লইয়া আসেন। শঙ্খ-ধরার পালাটি অন্যান্য কবিদের কাব্যেরই অনুরূপ। কবির পাণ্ডিত্য-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই,—কিন্তু এই পাণ্ডিত্য কখনও দুর্ভর হইয়া কাব্যের উপর চাপিয়া বসে নাই। তাঁহার রচনার ভাষা বেশ সহজ ও সরল। ড° সুকুমার সেন শিবায়ন-প্রণেতা কবিচন্দ্রকে শঙ্কর চক্রবর্তী হইতে পৃথক্ কোন ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন।

রামেশ্বর ভট্টাচার্যঃ শিবায়ন কাব্যের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য। রামেশ্বরের পিতার নাম লক্ষ্মণ চক্রবর্তী, মাতা রূপবতী। কবির পূর্ব নিবাস ছিল মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত যদুপুর গ্রাম। কিন্তু হেমৎ সিংহ নামক কোন ব্যক্তির অত্যাচারে পীড়িত হইয়া কবি কর্ণগড়ের রাজা রাজসিংহের আশ্রয় লাভ করেন। রাজার মৃত্যুর পর

পরিচয়

তৎপুত্র যশোবন্ত সিংহ রাজা হইয়া কবির পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং তাঁহারই আদেশে কবি তাঁহার শিবায়ন-কাব্য রচনা করেন। কবি কিন্তু তাঁহার গ্রন্থে সর্বত্র ইহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন 'শিবসঙ্কীর্তন'-রূপে। কিন্তু 'রামেশ্বরের শিবায়ন' নামটিই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কবি তাঁহার গ্রন্থে কাব্য-রচনার কাল উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

'শকে হাস্ত চন্দ্রকলা রাম করতলে।
রাম হাস্ত বিধিকান্ত পড়িল অনলে॥'

কিন্তু ইহার পাঠোদ্ধার করিয়া কবির গ্রন্থ রচনা-কাল আবিষ্কার করা এখনও পর্যন্ত সম্ভবপর হয় নাই। তবে প্রায় শতাব্দীকাল পূর্বে যখন এই গ্রন্থ প্রথম মুদ্রিত হয়, তখন সম্পাদক টীকায় ১৬৩৪ শকাব্দকে গ্রন্থ-রচনাকাল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অপর সূত্র হইতেও এই কালের সমর্থন পাওয়া যায়। অতএব কবি আনুঃ ১৭১২ খ্রী° কিংবা সন্নিহিত কালে গ্রন্থটি রচনা করিয়াছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থেই শিবের লৌকিকজীবন-সম্বন্ধে বিস্তৃত কাহিনী পাওয়া গেলেও কবি পৌরাণিক কাহিনী-রচনায়ও যথেষ্ট যত্ন লইয়াছেন।

কাব্য-বিচার

সংস্কৃত সাহিত্যে কৃতবিদ্য রামেশ্বর শুধু যে পুরাণ হইতেই তাঁহার কাব্যের উপাদান গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা নহে; তিনি কালিদাসের 'কুমারসম্ভব'কেও কাজে লাগাইয়াছেন। কবির কাব্যে কোন কোন স্থলে সংস্কৃতের অনুবাদই পাওয়া যায়। ফলে শিবায়ন-কাব্যের পৌরাণিক অংশে আড়ষ্টতা ও কৃত্রিমতার পরিচয় বর্তমান। কবির সর্বাধিক কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে লৌকিকখণ্ডে। এখানে কবি হরপার্বতীর গৃহস্থালির যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা আমরা নিত্যনিয়ত আমাদের চোখের সম্মুখে দেখিতে পাই। বস্তুত এত বাস্তব চিত্রের নিদর্শন মধ্যযুগে একান্তই দুর্লভ।

'তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী।
দুটি সুতে সপ্ত মুখ পঞ্চমুখ পতি॥...
তিন জনে বার মুখ পাঁচ হাতে খায়।
এই দিতে এই নাই হাঁড়ি পানে চায়॥...
সুক্তা খেয়ে ভোক্তা চায় হস্ত দিয়া শাকে।
অন্নপূর্ণা অন্ন আন রুদ্রমূর্তি ডাকে॥
কার্তিক গণেশ ডাকে অন্ন আন মা।
হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য ধরে খা॥'

দরিদ্রের সংসারে অভাবের জ্বালা যে কী ভয়ঙ্কর, হরগৌরীর জীবন-কাহিনীতে তাহারও সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। পার্বতীর হাতে শাঁখা নাই; স্বামীর কাছে একজোড়া শাঁখার আবেদন জানাইয়া বলিয়াছেন:

'লজ্জায় লোকের মাঝে লুকাইয়া রই।
হাত নাড়া দিয়া বাড়া কথা নাহি কই॥'

গৃহিণী হাত নাড়া দিয়া কথা বলিতে পারেন না, এই দুঃখের কথায়ও গৃহপতি মুখ নাড়া দিয়া বলিলেন :

'ভিখারীর ভার্যা হয়ে ভূষণের সাধ।
কেন অকিঞ্চন সনে কর বিসম্বাদ॥
বাপ বটে বড়লোক বল গিয়া তারে।
জঞ্জাল ঘুচুক যাও জনকের ঘরে॥'

নিরুপায় পার্বতী জনকের গৃহেই যাইতে বাধ্য হইলেন। তখন আবার মহাদেব, 'বাপের কিরা', 'ভাইযের কিরা' দিয়া তাঁহাকে ঘরে লইয়া আসিলেন।

ড° সুকুমার সেন রামেশ্বরের কৃতিত্ব স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, 'অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে রামেশ্বর অন্যতম। ইঁহার কাব্যে ভারতচন্দ্রের মত ভাষার চটক নাই সত্য কিন্তু সহানুভূতি এবং মানবিকতা রামেশ্বরের শিবায়নে যেমন আছে এমন অষ্টাদশ শতাব্দীর অপর কোন কবির কাব্যে পাই না।'

রামেশ্বরের কাব্যে দোষও আছে। তিনি যদিও বলিয়াছেন,—

'ভব-ভাব্য ভদ্র কাব্য ভণে রামেশ্বর।' এবং
'মধুক্ষর মনোহর মহেশের গীত।'

কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহার কাব্যকে ভদ্র আখ্যা দেওয়া সম্ভবপর নহে। ইহাতে শিবের মধ্যে মানবিকতা আরোপ করিতে গিয়া কবি যে কিছুটা ইতরতারও প্রশ্রয় দিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য ড° ভট্টাচার্য রামেশ্বরের সমর্থন-উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন, '...শেষোক্ত চিত্রগুলি নিতান্ত বাস্তবধর্মী বলিয়া ইহাদের মধ্য হইতে গ্রাম্যতার ভাব সম্পূর্ণ দূর হইতে পারে নাই।'

কবির কাব্যে অনুপ্রাসাদি অলঙ্কার-ব্যবহারেও নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়।

অপর কবিগণ : 'শিবায়ন' কাব্যের কবি-সংখ্যা প্রচুর নহে। সম্ভবত লৌকিক শিবের কাহিনী অনেকের মনঃপূত হয় নাই অথবা অপর সকল মঙ্গলকাব্যেই শিব-কাহিনী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে বলিয়াই কবিগণ অধিক সংখ্যায় শিবায়ন-রচনায় অগ্রসর হন নাই। অপর অল্প যে কয়জন শিবায়ন-কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে দ্বিজ কালিদাস অন্যতম। দ্বিজ কালিদাসের কাব্যের নাম 'কালিকা-বিলাস'—কিন্তু ইহাতে দেবী কালিকার কাহিনী নাই, শিবমাহাত্ম্যই ইহার উপজীব্য। গ্রন্থকারের কাল অথবা পরিচয়-সম্বন্ধে

কিছু জানিবার উপায় নাই। তিনি তাঁহার কাব্যে 'কুমারসম্ভব' এবং পুরাণের কিছু কিছু অনুবাদ করিয়াছেন।

৫ ॥ কালিকামঙ্গল

অষ্টাদশ শতাব্দী বাঙলাদেশের ইতিহাসে একটা স্মরণীয় কাল। অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত মুঘলশাসন তখন অস্তগত-মহিমা; আঞ্চলিক সুলতানরাই তখন বাহুবলের দাপটে যাহার যাহার অধিকার রক্ষায় ব্যস্ত। মুঘল-সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা, শিল্প-সংস্কৃতির যুগও তখন অবসিতপ্রায়। কেন্দ্রে কিংবা অঞ্চলে সর্বত্রই কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার শৈথিল্যের সুযোগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামীরাই প্রবল প্রতাপশালী হইয়া উঠিলেন। দেশের জনসাধারণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ রহিল এই ভূস্বামীদেরই। উর্ধ্বতন শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে জনগণের যোগাযোগ অবিচ্ছিন্ন না থাকিবার ফলেই রাষ্ট্রীয়শাসনের উর্ধ্বস্তরে কোন পরিবর্তনাদি ঘটিলে তাহা জন-মানসে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিতে পারিত না। ভূস্বামীরাই উপরওয়ালার তুষ্টিবিধান করিয়া স্বমহিমায় বিরাজিত থাকিতেন। মুঘল রাজপুরুষদের ভোগ-বহুল বিলাসী জীবনকে আপনাদের আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া তাহারা তৃপ্তি অনুভব করিতেন। ওদিকে সুচতুর ইংরেজ বণিক-কোম্পানীর লুব্ধদৃষ্টি পড়িল রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর। তারপর যাহা ঘটিল, তাহা ভোজবাজির মতই ব্যাপার। 'বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে'—এমন অনায়াস-চতুরতার সঙ্গে বাঙলার শাসনভার ইংরেজ আপনার হাতে তুলিয়া লইল যে, সাধারণ বাঙালী কিছু বুঝিবারও অবকাশ পাইল না। ফলে পলাশীর যুদ্ধের মত একটা বিরাট ঘটনাও বাঙলাদেশের সাহিত্যে বিন্দুমাত্র ছায়াপাত করিতে পারিল না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর পটভূমিকা

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভাবনা-চিন্তা মূলত পূর্ববর্তী ভাবনা-চিন্তা হইতে পৃথক ছিল। যে বিদেশী, বিধর্মী শক্তির প্রবলতা আকস্মিকভাবে বাঙালীর জীবনকে পরাভূত করিয়াছিল এবং যাহার ফলে বাঙালী দেবতার আশ্রয় লইয়া ধর্মের মধ্যেই সান্ত্বনা খুঁজিয়াছিল,—সেই অবস্থার ক্রমিক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। শাসকসম্প্রদায়ের সঙ্গে ক্রমে বাঙালীর হৃদয়ের যোগ স্থাপিত হইয়াছিল। বাঙালীর দৃষ্টি আবার বহির্মুখী হইবার অবকাশ পাইল। নগর-

জীবনে তখন বিলাসিতার স্রোত চলিয়াছে,—গ্রামের সাধারণ মানুষও লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়াছিল সেই বিলাস-বহুল জীবনযাত্রার দিকে। সেই অবক্ষয়ের যুগে স্বভাবতই মানুষের ধর্মবুদ্ধি বা নীতিবুদ্ধির স্থান অধিকার করিয়াছিল দেহাত্মবুদ্ধি এবং তীক্ষ্ণ বাস্তবতাবোধ। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কারণে গড়িয়া উঠিয়াছিল প্রচুর 'কালিকামঙ্গল' বা 'বিদ্যাসুন্দর কাব্য'। এই বিষয়ে একজন আধুনিক সমালোচক যথার্থই বলিয়াছেন: 'সমাজে ধর্মের হইয়াছিল অধঃপতন, প্রেম পরিণত হইয়াছিল ইন্দ্রিয়বিলাসে। নাগরিক বাঙালীর মনে দেবতা, ধর্ম ও পরলোক-সম্বন্ধীয় বিশ্বাসের দৃঢ়তা শিথিল হইয়া গিয়াছিল। এই অবস্থার অনিবার্য ফল দেহবুদ্ধির প্রাবল্য ও বস্তুতান্ত্রিক জীবনের প্রতিষ্ঠা। বিদ্যাসুন্দর কাব্য যতই অশ্লীল হউক না কেন, ইহা বস্তুনিষ্ঠ বটে। ইহা আদর্শ-সর্বস্ব, নির্জীব, শূন্যচারী নহে; ইহা প্রত্যক্ষ, দেহনিষ্ঠ ও সত্য। এইজন্য ইহাদের মধ্যে জাতি পাইয়াছে মোহমুক্তির সন্ধান।'

কালিকামঙ্গলের পটভূমিকা

কালিকামঙ্গল আসলে কোন মঙ্গলকাব্যই নহে,—ইহার বাহিরের রূপটাই শুধু মঙ্গলকাব্যের, আসলে ইহা রোম্যান্টিক যৌবনের কাব্য। আদিরসাত্মক, উত্তেজনাময় বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীর উপর একটা ভদ্র খোলস চাপাইয়া ইহাকে মঙ্গলকাব্যের রূপ দিবার অভিপ্রায়েই এই কাব্যে কালিকাদেবীর আবির্ভাব ঘটানো হইয়াছে। বস্তুত, কোন কোন বিদ্যাসুন্দর কাব্যে কালিকাদেবীর আদৌ কোন ভূমিকা নাই।

কালিকামঙ্গল কি মঙ্গল-কাব্য?

দেবী কালিকা বা কালী চণ্ডীর মতই অনার্য সমাজ হইতে তন্ত্রের মধ্য দিয়া আর্য সমাজে গৃহীত হইয়াছেন। অবশ্য পরবর্তীকালে অনেক পুরাণেই কালিকার কাহিনী এবং মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। লিঙ্গপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ এবং বিশেষভাবে কালিকাপুরাণের নাম এই প্রসঙ্গে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। কেহ কেহ অনুমান করেন যে আসামের নরমুণ্ডশিকারী নাগা জাতির নিকট হইতে এই কালীর পরিকল্পনা গৃহীত হইয়া থাকিতে পারে। বাঙলাদেশে চণ্ডী অপেক্ষাও কালীর প্রভাব এবং জনপ্রিয়তা অনেক বেশি। অবশ্য কালীর নানাপ্রকার রূপভেদও কল্পনা করা হইয়াছে: রক্ষাকালী, দক্ষিণাকালী, ভদ্রকালী, মহাকালী, শ্মশানকালী প্রভৃতি। অষ্টম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ ইলোরা

কালিকার উদ্ভব

গিরিগাত্রে যে কালীমূর্তি পাওয়া যায়, সম্ভবত, তাহাই আমাদের দেশে কালীর প্রাচীনতম রূপ।

চোর-তস্করেরা কালী পূজা করিয়া থাকে এবং এইরূপ কাহিনী-অবলম্বনে বাঙলাদেশে বহু 'চোরের পাঁচালী'ও রচিত হইয়াছে। বাঙলাদেশের বাহিরেও এইরূপ কাহিনীর অসদ্ভাব নাই। আলোচ্য 'কালিকামঙ্গল' বা 'বিদ্যাসুন্দরকাব্য'ও আসলে এইরূপ 'চোরের পাঁচালী'-জাতীয় কাহিনী-অবলম্বনে রচিত।

'কালিকামঙ্গল' বা 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের উৎস-সম্বন্ধে বিতর্কের অবকাশ রহিয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন যে সংস্কৃত ভাষায় বররুচি-রচিত যে 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য পাওয়া যায় তাহাই বাঙলা বিদ্যাসুন্দরের উৎস। কিন্তু কোন কোন বিশিষ্ট মনীষী ঠিক ইহার বিপরীত অভিমতই পোষণ করেন। তাঁহাদের মতে বাঙলা বিদ্যাসুন্দরকেই কোন বাঙালী কবি সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে ড০ আশুতোষ ভট্টাচার্যের অভিমত একটু বিস্তৃতভাবেই উদ্ধৃত করিতেছি। "বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানম্' নামে বাংলা ও নাগরীর অদ্ভুত মিশ্র অক্ষরে লিখিত ও বিক্রমাদিত্যের সভাকবি বররুচি-কর্তৃক রচিত বলিয়া উল্লেখিত একটি সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। পুঁথিখানি কোন বাঙ্গালী লিপিকর-কর্তৃক অত্যন্ত আধুনিককালে লিখিত—তাহা যে কেহ ইহা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। বাংলাদেশে প্রচলিত জনশ্রুতি-অনুসারে বররুচি এই শ্রেণীর একখানি কাব্যের রচয়িতা ও উজ্জয়িনী এই কাহিনীর ঘটনা-স্থান। অতএব মনে হয়, এই জনশ্রুতি ভিত্তি করিয়াই এই সংস্কৃত উপাখ্যানখানি পরবর্তীকালে কোন বাঙ্গালী-কর্তৃক রচিত হইয়াছে,—ইহা হইতে বাংলা বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর উদ্ভব হইয়াছে, বিবেচনা করা সঙ্গত নহে।'

বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীর অপর একটি সম্ভাব্য উৎস: বিল্হণ-রচিত 'চৌর-পঞ্চাশিকা' নামক একখানি সংস্কৃত কাব্য। রাজকন্যার সহিত অবৈধ প্রেমে আবদ্ধ কবি ধরা পড়িয়া মশানে নীত হইলে নাকি এই পঞ্চাশটি শ্লোক আবৃত্তি করিয়া রাজরোষ হইতে মুক্তিলাভ করেন এবং রাজকন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ঘটনাটি অবশ্যই অনুমান মাত্র,—ইহা কবির ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনী না হইয়া অপর কাহারো অথবা কল্পিত হওয়াও বিচিত্র নহে। যাহা হউক, বিল্হণের এই 'চৌর পঞ্চাশিকা'কেই বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীর মূল

বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর উৎস

বলিয়া গ্রহণ করা চলে। আবার ভাগবতের ঊষা-অনিরুদ্ধের কাহিনীতেও প্রায় অনুরূপ ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। কাশ্মীর-কবি বিল্‌হণের কাব্য অপেক্ষা ভাগবতের সহিতই বাঙালী কবিদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা সম্ভব,—সেই দিক হইতে বিচার করিলে বলিতে হয়,—বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীটি ভাগবত হইতে গৃহীত এবং 'চৌর পঞ্চাশিকা'টি ইহারই ভিতর সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কোন কোন প্রাচীনতর বিদ্যাসুন্দর কাব্যে 'চৌর পঞ্চাশিকা'টি একেবারেই বর্জিত হইয়াছে দেখা যায়। লক্ষ্য করিবার বিষয়,মূলরূপে উল্লেখিত গ্রন্থ দুইটির কোনটিতেই দেবী কালিকার কোন উল্লেখ নাই; আবার একাধিক বাঙলাকাব্যেও কালিকা দেবী বর্জিত হইয়াছেন। অতএব বিদ্যা-সুন্দর কাহিনীতে কালিকা যে আরোপিত, তাহা বুঝিতে কোন কষ্ট হয় না।

সুন্দর নামে এক রাজপুত্র গভীর রাত্রিতে ভদ্রকালীর আরাধনায় দেবীকে সন্তুষ্ট করিয়া বরলাভ করিলেন যে তিনি রাজকন্যা বিদ্যার সাক্ষাৎলাভ করিবেন। অতঃপর দেবী-প্রদত্ত এক শুকপক্ষীকে সঙ্গে লইয়া বিদ্যার পিতৃরাজ্যে উপনীত হইলেন। তথায় বৃদ্ধা মালিনীকে মাসী বলিয়া ডাকিয়া তাহার গৃহেই আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ইহার পর মালিনীর সহায়তায় সুন্দর বিদ্যার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিলেন,—সরোবর-স্নানকালে তাহাদের সঙ্কেতে ভাব-বিনিময়ও হইল। অতঃপর কালিকার বরে সুন্দরের গৃহ হইতে বিদ্যার মন্দির পর্যন্ত এক সুড়ঙ্গপথ নির্মিত হইলে সুন্দর প্রতি রজনীতে বিদ্যার সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন। ইহারই মধ্যে তাহারা গন্ধর্বমতে পরিণয়সূত্রেও আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ইতোমধ্যে বিদ্যার গর্ভ-লক্ষণ দেখা দিলে রাজা অতিশয় রুষ্ট হইয়া নগরপালকে চোর ধরিতে আদেশ করিলেন। নগরপাল কিছুতেই চোর ধরিতে না পারিয়া অবশেষে বিদ্যার মন্দির সিন্দুর দ্বারা লিপ্ত করিয়া দিল। ফলে সুন্দরের পরিচ্ছদে সিন্দুর চিহ্ন লাগিল। রজকগৃহ হইতে সিন্দুর-চিহ্নিত কাপড়ের সূত্র ধরিয়া নগরপাল সুন্দরকে অপরাধী সাব্যস্ত করিল। বিচারে সুন্দরের শূলদণ্ডের আদেশ হয়। শ্মশানে সুন্দর কালিকার আরাধনা করিলে দেবী আবির্ভূতা হইয়া রাজাকে সুন্দরের পরিচয় দান করিয়া তাহাকে মুক্তি দিতে আদেশ করেন। অতঃপর রাজার সম্মতিতে সুন্দর বিদ্যাকে বিবাহ করিয়া স্বদেশে লইয়া গেলেন।

বিদ্যাসুন্দর কাহিনী

কাহিনী হইতে পরিষ্কার বোঝা যাইতেছে, ইহাতে বিদ্যা এবং সুন্দরের কাহিনীই প্রধান, দেবী কালিকার ভূমিকা এখানে একান্তই গৌণ। শুধুমাত্র

ইহার উপর একটা মঙ্গলকাব্যের আবরণ দেওয়া ছাড়া কালিকার অন্তর্ভুক্তির অপর কোন উপযোগিতাই নাই। অবশ্য কাহিনীটির আঙ্গিক বিচার করিলেও মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে ইহার একটা রূপগত সাদৃশ্য উপলব্ধি করা যাইবে। সেই দিক হইতেই 'কালিকামঙ্গল' বা 'বিদ্যাসুন্দর'কে মঙ্গলকাব্য বলিয়া আখ্যায়িত করা যায়। অন্যথায়, ভাব ও রসের বিচারে এবং অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিলেও বোঝা যাইবে—বিদ্যাসুন্দর একান্তই আদিরসাত্মক কামভাবোত্তেজক রোম্যান্টিক কাব্যমাত্র। সমগ্র প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে এই ধরণের অপর কোন সাহিত্য নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও অবশ্য আদিরস আছে, কোথাও কোথাও অশ্লীলতাও আছে, কিন্তু এমন নগ্নভাবে আদিম প্রবৃত্তির ও আদিরিপুর উত্তেজনা-সৃষ্টির প্রয়াস তাহাতে নাই। বিদ্যাসুন্দরে একমাত্র ইন্দ্রিয়লালসারই খোরাক পাওয়া যায়, ইহা একান্তভাবেই শারীর কাব্য। ইহাতে যে উচ্ছৃঙ্খলতা এবং অশ্লীলতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা একমাত্র সেকালের রাজসভায়ই স্থান লাভ করিতে পারিত, গৃহস্থঘরে এই কাব্যের প্রবেশ একেবারেই অবাঞ্ছিত। অন্যান্য কাব্য হইতে অশ্লীলতার দৃষ্টান্ত দিয়া কেহ কেহ বিদ্যাসুন্দর কাব্যের অশ্লীলতাকে লঘু করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু কুকার্যের নজির গ্রহণ-যোগ্য নহে, এই বিচারে তাহাদের এই সমর্থনকেও বাতিল করা চলে। বিদ্যাসুন্দর কাব্যের এই অশ্লীলতাকে বাদ দিলে অবশ্য ইহাতে প্রশংসা করিবার মত উপাদানও যথেষ্ট রহিয়াছে। ইহা দেবতা ও ধর্ম-সম্পর্ক-বর্জিত বলিয়া ইহাতে মানবিক আবেদনই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। অধিকন্তু বাস্তবতা ইহার অপর এক অপূর্ব সম্পদ। বিদ্যাসুন্দর কাব্যের কাহিনীবিন্যাসে, চরিত্র-সৃষ্টিতে ও কথোপকথনে লঘু কৌতুকের ছড়াছড়ি। হাস্যরসাত্মক কাহিনীটি অতিবাস্তব আধুনিক উপন্যাসের মতই সুখপাঠ্য। বিদ্যাসুন্দর কাব্যে অনেকেই একটা তীব্র স্যাটায়ার-বোধের পরিচয় পাইয়াছেন। সমসাময়িক ধনিক সমাজের অন্দর-মহলে কিভাবে পাপের বাসা সৃষ্টি হইয়াছিল, বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীতে যেন তাহারই একটি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। বস্তুত লঘু কৌতুকের সাহায্যে ইহাতে অভিজাত সমাজের অবক্ষয়েরই একটি সুন্দর চিত্র তুলিয়া ধরা হইয়াছে। যদি কোন কবি সচেতনভাবে এই উদ্দেশ্য লইয়া কাব্যটি সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে স্বীকার করিতেই হইবে যে, বাঙলা সাহিত্যে বিদ্যাসুন্দর কাব্যেই সর্বপ্রথম আধুনিকতার প্রকাশ ঘটিয়াছে।

কাহিনীর বিচার

কবি কঙ্ক ঃ 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের আদি কবি কে ছিলেন, এই বিষয়ে গুরুতর মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। ড° আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন যে, 'কবি-কঙ্কের রচনা হইতে অনুমান করিতে পারা যায়, তিনি চৈতন্যের সমসাময়িক লোক।' কারণ তাঁহার রচনায় চৈতন্য-দর্শনের আকুতি প্রকাশ পাইয়াছে—

'কবে বা হেরিব আমি গৌরার চরণ।
সফল হইবে মোর মনুষ্য জনম ॥······
হউক বা না হউক পদ না ছাড়িব।
বাজন্ত নূপুর হৈয়া চরণে লুটিব ॥'

পক্ষান্তরে ড° সুকুমার সেন বলেন, 'কঙ্কের রচনা ষোড়শ শতাব্দীর হওয়া অসম্ভব।······অতএব কবি কঙ্ককে বাংলা বিদ্যাসুন্দর কাব্যের প্রথম কবি মনে করা চরম বিচার-মূঢ়তা।' ড° সেন আরও মনে করেন যে, কবি কঙ্কের রচনাটি সত্যনারায়ণের পাঁচালী মাত্র, বিষয় বিদ্যাসুন্দর-কাহিনী। এই জন্যই এই কাব্য যে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগের আগে রচিত হইতে পারে না, এই বিষয়ে তিনি নিঃসংশয়। কিন্তু স্কন্দ-পুরাণেও যখন সত্যপীরের পরিচয় পাওয়া যায়, তখন ষোড়শ শতাব্দীর কঙ্কের রচনায় সত্যপীরের অন্তর্ভুক্তি অসম্ভব হইবে কেন ?

কবি কঙ্ক তাঁহার কাব্যে যে আত্মপরিচয় দান করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে তাঁহার পিতার নাম গুণরাজ, মাতা বসুমতী। কবির বাসস্থান ময়মনসিংহ জেলার বিপ্রগ্রাম। তিনি ব্রাহ্মণ-সন্তান হইলেও মুরারি ও কৌশল্যা নামক এক চণ্ডাল-দম্পতি দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছিলেন— 'ময়মনসিংহ গীতিকা'য় 'কঙ্ক ও লীলা' নামে একটি পালাগানে কবি কঙ্কের প্রেম-কাহিনীর একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

কঙ্কের কাব্যের নাম বিদ্যাসুন্দর নহে, 'পীরের পাঁচালী'। জানা যায় যে কবি-কঙ্ক তাঁহার গুরুর আদেশে সত্যপীরের বা সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন। কবির কাব্য আদিরসাত্মক নহে, এবং ইহাতে 'চৌর পঞ্চাশিকা'রও কোন প্রভাব পড়ে নাই।

শ্রীধর ঃ শ্রীধর কবিরাজের যে দুইখানি খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে গৌড়ের নবাব হোসেন শাহের পৌত্র ফিরোজ শাহের উল্লেখ বর্তমান। ফিরোজ শাহ ১৫৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দে অল্প কিছু দিনের জন্য সিংহাসনে ছিলেন। অতএব সম্ভবত ইহার সমসময়েই কবি তাঁহার কাব্য সমাপ্ত করিয়াছিলেন। এই বিচারে শ্রীধরকে বিদ্যাসুন্দর-কাব্যের অন্যতম প্রাচীন

কবি বলিয়াই অভিহিত করিতে হয়। কবির কাব্যে আত্মপরিচয়ের কোন সূত্র পাওয়া যায় নাই। তবে চট্টগ্রাম অঞ্চলেই পুঁথি দুইখানি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া, অনুমান হয়, কবি ঐ অঞ্চলেরই লোক ছিলেন। কবি শ্রীধর তাঁহার কাব্যে মাঝে মাঝে সংস্কৃত গদ্য 'বচনিকা' ব্যবহার করিয়াছেন। আবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার পদ্য অনুবাদও প্রদান করিয়াছেন। মনে হয়, অতি প্রাচীনকালে স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক গ্রন্থে সন্নিবেশ করা একটি রীতি বলিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনেও অনুরূপ ব্যাপার দেখা যায়।

শ্রীধরের কাব্যে পাণ্ডিত্য আছে, তবে কবিত্বের পরিচয় কম। তিনি বিদ্যার যে রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র-সম্মত। পরবর্তীকালেও এই রীতিই অনুসৃত হইয়াছে।

সাবিরিদ্ খাঁঃ সাবিরিদ্ খাঁ-রচিত বিদ্যাসুন্দর-পুঁথির অংশবিশেষ মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে আত্মপরিচয়-সূত্রে কবি বলিয়াছেন যে তাঁহার পিতার নাম নাসুরাজা মল্লিক। জি ঠাকুর নামক তাঁহার একজন পূর্বপুরুষ তিন সিকে পরগণার সরকার ছিলেন। কবির পূর্বপুরুষগণের নাম হইতে মনে হয় যে তাঁহারা মূলত বোধ হয় মগ-জাতীয় ছিলেন। সাবিরিদ্ খাঁ সম্ভবত চট্টগ্রাম অথবা নোয়াখালি-অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। কবির কাব্যে রচনাকাল-সম্বন্ধীয় কোন সূত্র পাওয়া যায় না। তবে ভাষায় বহু প্রাচীনত্বের চিহ্ন বর্তমান থাকায় ড° ভট্টাচার্য মনে করেন, '...পুঁথিখানি ষোড়শ শতাব্দীর পরবর্তী যুগে রচিত হইতে পারে না। অতএব মনে হয়, শ্রীধর কবিরাজের মাত্র অল্পকাল পর, কিংবা সমসাময়িক কালেই সাবিরিদ্ খাঁ তাঁহার বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করেন।' শ্রীধরের কাব্যের সঙ্গে আলোচ্য কাব্যের সাদৃশ্যও বিস্ময়কর। মনে হয়, উভয়ই এক সূত্র হইতে উপাদান আহরণ করিয়াছেন অথবা একের উপর অপরের প্রভাব পড়িয়াছে। কবি সাবিরিদ্ খাঁও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার কাব্যেও মাঝে-মাঝে সংস্কৃত শ্লোক সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভে তিনি পদ্যেই সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া অতঃপর তাহারও বাঙলা পদ্যানুবাদ দিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে পাণ্ডিত্যের পরিচয় অতিশয় প্রকট বলিয়া সহজ কবিত্বের প্রকাশ নাই। বিস্ময়ের বিষয়,—মুসলমান কবির কাব্য হইলেও ইহাতে আরবী-ফার্সীর কোন প্রভাব নাই। সাবিরিদ্ খাঁ ছন্দ-সৃষ্টিতে কিছুটা বৈচিত্র্য দেখাইয়াছেন, ইহা ছাড়া তাঁহার কাব্যে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য কিছু নাই।

গোবিন্দদাস : কবি গোবিন্দদাসের 'কালিকমঙ্গল' সুবৃহৎ কাব্য। কবি চট্টগ্রাম জেলার দেআঙ্গ বা দেবগ্রামে বাস করিতেন বলিয়া গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। কবির পরিচয় অথবা কাল-সম্বন্ধে ইহার অধিক কোন প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যায় না। তবে একটি পয়ারে পাওয়া যায়,—

'অক্ষর বাণ শশী শক পরিমিত।
এই কালে রচিত কালিকা চণ্ডীর গীত ।।'

ইহা হইতে ১৫৩৪ শকাব্দ (=১৬১২ খ্রীঃ) পাওয়া গেলেও ড° সেন ইহার প্রামাণিকতায় বিশ্বাসী নহেন। ড০ দীনেশ সেন মনে করেন যে ১৫৯৫ খ্রীঃ কবি গ্রন্থটি রচনা করিয়াছেন। আবার ড০ সেন অন্য সূত্র হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে গ্রন্থটির লিপিকাল ১১১৬মঘীসন বা ১৭৫৪-৫৫ খ্রীঃ।—এই সমস্ত পরস্পর-বিরোধী অভিমতের মধ্য হইতে প্রকৃত সত্যের উদ্‌ঘাটন সম্ভব নহে।

'কবির রচিত 'কালিকামঙ্গল' পাঁচ অংশে বিভক্ত—প্রথম খণ্ডে বৃত্রাসুর বধ ও দেবী-মাহাত্ম্য প্রচার, দ্বিতীয় খণ্ডে ইন্দ্র-অহল্যা-কাহিনী, তৃতীয় খণ্ডে সুরথ-সমাধি কাহিনী, চতুর্থ খণ্ডে বিক্রমাদিত্যের কাহিনী ও শেষ খণ্ডে বিদ্যাসুন্দর কাহিনী। স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে, গ্রন্থে বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীটি প্রাধান্য লাভ করে নাই, কবির বিশেষ লক্ষ্য ছিল, কালিকার মাহাত্ম্য-প্রকাশের দিকেই। প্রাচীন পুরাণাদিতে বিভিন্ন প্রসঙ্গে কালিকার যে সমস্ত মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, কবি গোবিন্দদাস আলোচ্যগ্রন্থে ঐ সমস্ত একত্র সঙ্কলন করিয়াছেন। পরন্তু ইহার গঠন-বৈশিষ্ট্যও মঙ্গলকাব্যের অনুরূপ নহে। গোবিন্দদাসের গ্রন্থে পাত্র-পাত্রীদের নাম-ধাম-সম্বন্ধে নূতনত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। গোবিন্দদাস যে ভক্ত কবি ছিলেন, তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট। কবি অনেকগুলি গানও রচনা করিয়াছিলেন,—ইহাদের কোন কোনটি ব্রজবুলি পদ।

কৃষ্ণরাম : কৃষ্ণরামদাস অপর কয়েকটি মঙ্গলকাব্য-সহ 'কালিকা-মঙ্গল'ও রচনা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণরামদাসের পিতার নাম ভগবতীদাস, বাসস্থান ২৪ পরগণার নিমতা গ্রাম। কবি 'রায়মঙ্গল, ষষ্ঠীর পাঁচালী, শীতলা মঙ্গল এবং কালিকামঙ্গল' রচনা করেন। 'কালিকামঙ্গলে' কবি গ্রন্থ রচনা-কাল-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

'সারসা সানের নেত্র ভীমাক্ষিবর্জিত মিত্র
তেজিয়া ঋষির পক্ষ তবে।
বিধুর মধুর নাম রচনাতে কহিলাম
বুঝ সকল বিচারিয়া সভে॥'

আলোচ্য সঙ্কেতটির যথার্থ অর্থ বাহির করিতে না পারিয়া অনেকেই কৃষ্ণ-রামের কাল-সম্বন্ধে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াছেন। সম্প্রতি ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ-শক্তির সাহায্যে যে অর্থ আবিষ্কার করিয়াছেন; তাহা অন্যসূত্রেও সমর্থিত হয়। তিনি বলেন কবি ১৫৮৬ শকাব্দে (= ১৬৬৫ খ্রীঃ) কাব্যটি রচনা করিয়াছিলেন। কবি তাঁহার গ্রন্থে 'ক্ষিতি-পাল অরংসাহা' এবং নবাব 'সায়েস্তাখাঁ'রও উল্লেখ করিয়াছেন। ১৬৬৪খ্রীঃ সায়েস্তা খাঁ বাঙলার সুবেদার ছিলেন। অতএব কবির কাল-সম্বন্ধে আর অনুমান নিষ্প্রয়োজন। কবি বলিয়াছেন, তিনি কুড়ি বৎসর বয়সে এই কাব্যটি রচনা করেন, অতএব অনুমান করা চলে, ইহাই তাঁহার প্রথম রচনা।

প্রাণরাম চক্রবর্তী নামক একজন 'কালিকামঙ্গল'-রচয়িতা লিখিয়াছেন :

'বিদ্যাসুন্দরের এই প্রথম বিকাশ।
বিরচিলা কৃষ্ণরাম নিমতা যার বাস ॥'

তাঁহার মতে, কৃষ্ণরাম আদি বিদ্যাসুন্দর-রচয়িতা। কিন্তু প্রাণরামের এই উক্তি নির্ভরযোগ্য নহে। কৃষ্ণরামের কাব্যে পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও তাহার ভাষা বেশ সরল। ইহাতে বিদ্যাসুন্দর-কাহিনী-বর্ণিত হইলেও কবি গ্রাম্যতার প্রশ্রয় দেন নাই। তাঁহার কাব্যের ভাষা বেশ মার্জিত।

কবিশেখর বলরাম চক্রবর্তী ঃ বলরাম চক্রবর্তী-রচিত মাত্র এক-খানি পুঁথিই পাওয়া গিয়াছে। গ্রন্থে কবি আত্মপরিচয় দান করিয়াছেন অতি সংক্ষেপে,—তাঁহার পিতার নাম দেবীদাস, মাতা কাঞ্চন। তাঁহার বাসস্থান-সম্বন্ধে তিনি কিছুই উল্লেখ করেন নাই। গ্রন্থের সম্পাদক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মনে করেন যে কবি পূর্ববঙ্গীয় ছিলেন। কিন্তু তাঁহার কাব্যে পশ্চিমবঙ্গের দেবতাদেরই বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া ডঃ সেন ও ডঃ ভট্টাচার্য তাঁহাকে পশ্চিমবঙ্গীয় বলিয়া মনে করেন। কবির উপাধি ছিল কবিশেখর। কবির গ্রন্থে কালনির্দেশক কোন সূত্র আবিষ্কৃত না হওয়ায় তাঁহার রচনাকালের জন্য পরোক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভর করতে হয়। তাঁহার কাব্যে ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের কোন প্রভাবের পরিচয় না থাকায় অনুমান করা হয় যে, তিনি অন্তত অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধেই বর্তমান ছিলেন। কবি-কৃত 'কালিকামঙ্গলে' বিদ্যাসুন্দর-কাহিনী থাকিলেও তিনি কালিকার মাহাত্ম্য-বর্ণনাতেই অধিকতর আগ্রহের পরিচয় দান করিয়াছেন। বিদ্যা-সুন্দরের কাহিনীতেও কবির সংযম লক্ষণীয়। তিনি কখনও মাত্রা ছাড়াইয়া

উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দেন নাই। এই দিক হইতে তিনি ছিলেন আদর্শ-স্থানীয়। কবির কাব্যে পাণ্ডিত্যের পরিচয় বর্তমান, আবার তাঁহার সহজ কবিত্বও প্রশংসনীয়।

রামপ্রসাদ সেন: কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন সম্ভবত ১৭২০ খ্রীঃ বর্তমান ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত কুমারহট্ট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কুমারহট্ট সাম্প্রতিক কালে হালিশহরের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কবি তাঁহার গ্রন্থে আত্মপরিচয় দিয়াছেন: তাঁহার পিতার নাম রামরাম সেন। মনে হয়, রামপ্রসাদ সম্পন্ন গৃহস্থ ঘরের সন্তান ছিলেন। কর্মসূত্রে তিনি কলিকাতার নিকটবর্তী কোন এক ধনী ব্যক্তির নিকট কর্মগ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর সংসারের ভার কাঁধে পড়িলে তিনি দিশাহারা হইয়া যান। শোনা যায়, তিনি তাঁহার মনিবের হিসাবের খাতায় গান লিখিতেন। মনিব রামপ্রসাদের কবিত্বশক্তি এবং ভক্তি-দর্শনে তাঁহার জন্য মাসোহারার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রও তাঁহার শ্যামাসঙ্গীত শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি এবং একশত বিঘা জমি দান করিয়াছিলেন।

পরিচয়

রামপ্রসাদের কবি-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি তাঁহার শ্যামাসঙ্গীতে। তাঁহার রচিত 'বিদ্যাসুন্দর' শ্যামাসঙ্গীতের তুলনায় অনেক হীনপ্রভ। রামপ্রসাদের স্বীকৃতি হইতে জানা যায় যে তিনি রাজকিশোরের আদেশেই এই কাব্যটি রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু রামপ্রসাদ এই কাব্য কবে রচনা করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে সঠিক কিছু বলিবার উপায় নাই। ড০ ভট্টাচার্য মনে করেন যে রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্রের ২।১ বৎসর পূর্বে অথবা পরে তাহার বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন। আবার ড০ সেন মনে করেন যে রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদের পূর্বে কিছুতেই রচিত হইতে পারে না। অধিকন্তু তিনি এই কাব্যে ভারতচন্দ্রেরও প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছেন।

কাব্য-রচনা-কাল

রামপ্রসাদের কাব্যের নাম 'কবিরঞ্জন'। কালিকার মাহাত্ম্য-বর্ণনাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীই ইহার মূল লক্ষ্য। কথিত আছে, রামপ্রসাদের 'কবিরঞ্জন' তাহার কালিকা-মঙ্গল কাব্যের অন্তর্গত ছিল। কালক্রমে কাব্যের পূর্ব-পর অংশ বিনষ্ট হইয়াছে, একমাত্র বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীই রক্ষা পাইয়াছে। কিন্তু রামপ্রসাদের কালিকা-মঙ্গল বলিয়া স্বতন্ত্র কোন পুঁথি পাওয়া যায় না।

রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর' কাহিনীতে কিছু কিছু মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।—কিন্তু তৎসত্ত্বেও ভারতচন্দ্রের তুলনায় তাহার কাব্যের উৎকর্ষ অনেক কম। ড° সেনের ভাষায়, 'ভারতচন্দ্রের কাব্যের সহিত রামপ্রসাদের কাব্য তুলনা করিলে দেখা যায় যে, শিল্পচাতুর্যে এবং ভাষার মনোহরিত্বে ভারতচন্দ্রের কাব্য রামপ্রসাদের কাব্যের তুলনায় অনেক শ্রেষ্ঠ; কিন্তু চরিত্র-চিত্রণে অপকৃষ্ট। রামপ্রসাদের কাব্যে সকল চরিত্রগুলিই স্বাভাবিক হইয়াছে, কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্যে চিত্রগুলি typical, প্রায় যেন satirical এবং এইজন্য ভারতচন্দ্রের কাব্যের কাছে রামপ্রসাদের কাব্য অনেকটা নিষ্প্রভ। রামপ্রসাদের কাব্যের আর একটি মহৎ গুণ আছে, কাব্যটি ঘরুয়াভাবে (human touch) ওতপ্রোত।'

কাব্যবিচার

শ্যামাসঙ্গীতে রামপ্রসাদের ভক্তিভাবের সঙ্গে বিদ্যাসুন্দরের অশ্লীলতার সামঞ্জস্য বিধান করা কষ্টকর। সম্ভবত ভারতচন্দ্র অপেক্ষা রামপ্রসাদের কাব্য আরও অশ্লীল, আরও অমার্জিত। রামপ্রসাদ ছন্দের দিক হইতে কিছুটা বৈচিত্র্য প্রদর্শন করিলেও ভারতচন্দ্রের তুলনায় তাহা তত উল্লেখযোগ্য নয়। ভাষাশিল্পের দিক হইতে তো রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্রের পাশেই দাঁড়াইতে পারেন না। কখন কখন অনাবশ্যক পাণ্ডিত্যের ভারেও রামপ্রসাদের কাব্য পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে। এককথায় বলা চলে, বিদ্যাসুন্দর কাব্যে রামপ্রসাদের স্বাভাবিক নৈপুণ্য প্রকাশিত হয় নাই।

ভারতচন্দ্র রায় ঃ ঃ অন্নদামঙ্গল

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় 'অন্নদামঙ্গল' রচনা করিয়াছেন। 'কালিকামঙ্গল' বা 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য ইহার একটি অংশমাত্র। কাজেই অন্নদামঙ্গলের আলোচনায় স্বভাবত বিদ্যাসুন্দর অন্তর্ভুক্ত হইলেও অতিরিক্ত অংশও যথেষ্ট থাকিবে। ভারতচন্দ্রের প্রতিভার বিচার হইবে অন্নদামঙ্গলের সামগ্রিক আলোচনায়, পৃথকভাবে বিদ্যাসুন্দরের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

ভারতচন্দ্রের জন্ম-তারিখ-সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও সাম্প্রতিকতম অভিমত এই যে তিনি ১৭০৭ খ্রীঃ পাঁড়ুয়া বা রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবি বিস্তৃতভাবে যে আত্মপরিচয় দান করিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে ভুরসুটের রাজবংশীয় নরেন্দ্র রায় ছিলেন তাঁহার পিতা। বর্ধমান-রাজ কীর্তিচন্দ্র তাঁহার রাজ্য অধিকার করিলে ভারতচন্দ্র মাতুলালয়ে পলাইয়া যান ৷

অতঃপর এক টোলে কিছুকাল সংস্কৃত পাঠ করিয়া মাত্র চৌদ্দবৎসর বয়সেই বিবাহ করেন। তাঁহার অভিভাবকগণ বিরক্ত হইলে ভারতচন্দ্র দেবানন্দপুরে রামচন্দ্র মুন্সীর আশ্রয়ে থাকিয়া পারসী-ভাষা শিক্ষা করেন। এই স্থানেই তিনি সত্যনারায়ণের একখানি পাঁচালী রচনা করেন। ইহার পর তিনি গৃহে ফিরিয়া আসেন এবং কর্মোপলক্ষ্যে একবার বর্ধমান গমন করেন। তথায় রাজ-রোষে পতিত হইয়া কারারুদ্ধ হন। উৎকোচ দিয়া তিনি কারাগার হইতে পলায়ন করেন এবং এক সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ের সহিত মিশিয়া নানাস্থান পরিভ্রমণ করেন। অতঃপর আবার বাড়ি ফিরিয়া আসেন এবং কর্ম-সন্ধানে ফরাসডাঙ্গার দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ রায়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। গুণগ্রাহী ইন্দ্রনারায়ণ তাঁহাকে ১৭৪৭ খ্রীঃ কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে সভাকবি নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে 'কবি রায়গুণাকর' উপাধি দান করেন। কবি এখানেই রাজার আদেশে 'অন্নদামঙ্গল' রচনা করেন। গুণগ্রাহী রাজাও গুণের পুরস্কার-স্বরূপ ভারতচন্দ্রকে প্রচুর ভূ-সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। কবি ১৭৬০ খ্রীঃ বহুমূত্র রোগে প্রাণ ত্যাগ করেন।

পরিচয়

ভারতচন্দ্র দুইটি সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচনা করেন, একটি হীরারাম-রায়ের আদেশে, অপরটি রামচন্দ্র মুন্সীর আদেশে। শেষেরটি রচনা করেন ১১৪৪ সনে। কৃষ্ণনগরে আসিবার পর তাঁহার প্রথম গ্রন্থ সংস্কৃতের অনুবাদ : 'রসমঞ্জরী'। 'অন্নদামঙ্গল' রচিত হয়, ১৬৭৪ শকাব্দে বা ১৭৫২ খ্রীঃ।

'বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা ॥'

কবির গ্রন্থ তিনখণ্ডে বিভক্ত : প্রথম খণ্ডে অন্নদামঙ্গল, দ্বিতীয় খণ্ডে বিদ্যাসুন্দর, তৃতীয় খণ্ডে ভবানন্দ-মানসিংহ কাহিনী। অন্নদামঙ্গল প্রধানত পুরাণাশ্রিত। বিদ্যাসুন্দর লৌকিক কাহিনী এবং ভবানন্দ-মানসিংহ-কাহিনী প্রধানত ঐতিহাসিক ঘটনার উপর ভিত্তি করিয়া রচিত।

কবি গ্রন্থোৎপত্তি-সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, একদিকে দেবীর আদেশ অপর-দিকে রাজার আদেশ—এই উভয় আদেশের ফলেই তিনি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। যে অন্নপূর্ণা মহারাজকে স্বপ্নে দেখা দিয়াছিলেন, মহারাজ ভারতচন্দ্রকে সেই অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্য-বর্ণনা করিতেই অনুরোধ করিয়াছিলেন; কাব্যের আদর্শ-হিসাবে কবিকঙ্কণের চণ্ডীর কথাও বিশেষভাবেই উল্লেখ

গ্রন্থোৎপত্তির কারণ

করিয়াছেন। কিন্তু চতুর কবি এই সঙ্গে অনেকগুলি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি রাজার আদেশ মত অন্নদামঙ্গল রচনা করিয়াছেন, রাজার পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারকে কুবের-বংশজাত এবং দেবীর কৃপাপুষ্ট-রূপে বর্ণনা করিয়াছেন এবং রাজা ও তাঁহার সভাসদ্‌দের মনোরঞ্জন করিবার জন্য কৌশলে গ্রন্থের মধ্যে বিদ্যাসুন্দরের রোমাঞ্চকর কাহিনী সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

সমগ্র গ্রন্থের নাম 'অন্নদামঙ্গল' হইলেও আসলে প্রথম খণ্ডই অন্নদামঙ্গল। ইহাতে অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতই দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগ হইতে আরম্ভ করিয়া হরগৌরীর কোন্দল পর্যন্ত কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এই অংশে কবি প্রধানত মুকুন্দরামেরই অনুসরণ করিয়াছেন। এই অংশে শিবের কাশীপ্রতিষ্ঠা এবং ব্যাসকাহিনী অতিরিক্ত যোগ করা হইয়াছে। ইহার পর হরিহোড়ের কাহিনী। দেবীর কৃপায় বড়গাছি গ্রামের বিষ্ণু হোড় পুত্ররূপে লাভ করিল হরিহোড়কে। হরি হোড় অতি দরিদ্র অবস্থা হইতে লক্ষপতি হইল। কিন্তু তাহার পারিবারিক কলহের সুযোগ লইয়া দেবী তাহার গৃহ ত্যাগ করিয়া আন্দুলিয়া গ্রামের ব্রাহ্মণ রাম সমাদ্দারের বাড়িতে উপনীত হইলেন। রাম সমাদ্দারের পুত্র ভবানন্দ মজুমদারকে দেবী কৃপা করিবেন, স্থির করিলেন।—এইখানেই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড সমাপ্ত হইয়াছে।

কাহিনী : ১

দ্বিতীয় খণ্ডে বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীই প্রধান। প্রতাপাদিত্যকে দমন করিবার জন্য মানসিংহ বর্ধমান আসিয়াছেন। এইখানে সুন্দরের সুরঙ্গ দেখিয়া মানসিংহ কানুনগো ভবানন্দ মজুমদারের নিকট ইহার কাহিনী জানিতে চাহিলেন।—ভবানন্দ বিস্তৃতভাবে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী পরিবেষণ করিলেন।

কাহিনী ২

তৃতীয় খণ্ডে আবার পূর্ববর্তী অংশের সঙ্গে যোগসাধন করা হইয়াছে। মানসিংহ যশোরে উপনীত হইয়াছেন। তথায় দেবীর কৃপায় ও ভবানন্দের সহায়তায় মানসিংহ প্রতাপ সিংহকে দমন করিলেন এবং উপাধি-দানের উদ্দেশ্যে ভবানন্দকে লইয়া দিল্লী গমন করিলেন। দিল্লীতে দেবী অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্য প্রদর্শিত হইল এবং দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে ভবানন্দ রাজা উপাধি লাভ করিলেন।

কাহিনী ৩

ভারতচন্দ্রের কৃতিত্ব সর্বাধিক প্রকাশ পাইয়াছে গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে। এই খণ্ডে হরি হোড় ও ভবানন্দ-কাহিনী তাহার স্বকল্পিত। অবশিষ্ট অংশ

তিনি প্রধানত কবিকঙ্কণ, ঘনরাম ও স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ড হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। রচনার বহু অংশে কবিকঙ্কণ এবং ঘনরামের সঙ্গে বেশ মিল রহিয়াছে। তবে পূর্বোক্ত কবিদ্বয় যেমন আন্তরিকতার সাহায্যে পৌরাণিক কাহিনীসমূহ বর্ণনা করিয়াছেন, ভারতচন্দ্রে সেই আন্তরিকতার অভাব। তিনি দেবীর কৃপার অপেক্ষায় ছিলেন না। তিনি রাজার তুষ্টিবিধান এবং সভাসদদের মনোরঞ্জন করিবার জন্যই কলম ধরিয়াছিলেন; তাই, অনেকটা দায়সারা ভাবেই পৌরাণিক অংশ রচনা করিয়াছেন। অবশ্য আন্তরিকতার অভাব কবি অন্য প্রকারে পোষাইয়া দিয়াছেন। ছন্দে-অলঙ্কারে ভারতচন্দ্রের এই খণ্ড অপূর্ব। বিশেষত ভারতচন্দ্রের বিরুদ্ধে যে উচ্ছৃঙ্খলতা এবং অশ্লীলতার অভিযোগ আনা হয়, আলোচ্য অংশ তাহা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। অধিকন্তু এই খণ্ডেই মুহূর্তের জন্য তিনি যে ঈশ্বরী পাটনীর আবির্ভাব ঘটাইয়াছিলেন, তেমন সজীব চিত্র প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে কমই আছে।

প্রথম খণ্ডের বিচার

অন্নদামঙ্গলের দ্বিতীয় খণ্ড প্রধানত 'বিদ্যাসুন্দর' হইলেও ইহা একান্ত-ভাবেই বিদ্যাসুন্দর নহে। বিদ্যাসুন্দর মূলকাহিনীর অন্তর্ভুক্ত একটি উপকাহিনী মাত্র। ভারতচন্দ্র অসাধারণ কুশলতায় পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাহিনীকে যুক্ত করিয়া তাহার মধ্যে আবার একটা লৌকিক কাহিনীকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ঘটনাক্রমে ভবানন্দ মজুমদার মানসিংহের নিকট বিদ্যাসুন্দর-কাহিনী ব্যক্ত করিয়াছেন। এই বিষয়ে জনৈক গ্রন্থকার মন্তব্য করিয়াছেন :'বিদ্যাসুন্দর অন্নদামঙ্গলেরই অন্তর্গত উপকাব্য, কিন্তু ইহার দেবতা অন্নদা নহে, কালিকা। কাহিনী বৈধ নহে, অবৈধ, প্রেম এবং রসও পৃথক, হাস্য নহে আদি। উভয়ের মধ্যে সত্যকার আন্তরিক যোগ কিছুমাত্র নাই। ইহার নিরাপত্তা আশঙ্কা করিয়াই কবি ইহাকে অন্নদামঙ্গলের আশ্রয়ে রাখিয়াছেন কিন্তু ফল হইয়াছে বিপরীত। বিদ্যাসুন্দরের জনপ্রিয়তা হইয়াছে বেশী, আশ্রিতই আশ্রয়দাতাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। এই জনপ্রিয়তার মূল বিদ্যাসুন্দরের বিষয়বস্তুর মধ্যেই নিহিত। এইরূপ উত্তেজক রোমান্স প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে আর নাই।'

দ্বিতীয় খণ্ডের বিচার

বাঙলা ভাষায় যত বিদ্যাসুন্দর রচিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ভারত-চন্দ্রের কাব্য যে শুধু শ্রেষ্ঠ তাহাই নহে, ভারতচন্দ্র অনতিক্রমনীয়। তৎসত্ত্বেও ভারতচন্দ্রের অখ্যাতিও বিদ্যাসুন্দরের জন্যই। তাঁহার বিরুদ্ধে প্রধান

অভিযোগ—অশ্লীলতা। কিন্তু ইহার জন্য ভারতচন্দ্রকে দায়ী করা সম্ভবত সঙ্গত নহে। কারণ অশ্লীলতা ভারতচন্দ্রের ভাষায় নহে, অশ্লীলতা রহিয়াছে কাহিনীর গঠনে। যিনিই বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়াছেন, তাঁহার কাব্যেই অশ্লীলতা দেখিতে পাওয়া যায়। অপরেরা অল্প ক্ষমতাবশত ভাষাকেও অশ্লীল করিয়া তুলিয়াছেন। এই বিষয়ে ভারতচন্দ্রের কৃতিত্বের পরিচয় দিতে গিয়া ড° ভট্টাচার্য লিখিয়াছেন: 'ভাষাগত অশ্লীলতা বা গ্রাম্যতা ভারতচন্দ্রে একেবারেই নাই, তাঁহার মধ্যে যে অশ্লীলতা আছে, তাহা ভাব বা অর্থগত অশ্লীলতা; তাহারও প্রকাশভঙ্গির মধ্যে কোনও প্রত্যক্ষতা (directness) ছিল না। অশ্লীলতা যে সাহিত্যিক শিল্পসাধনার বিষয় তাহা ভারতচন্দ্রের রচনাতেই প্রথম বুঝিতে পারা গেল।' এই বিষয়ে প্রমথচৌধুরীর উক্তিটিও স্মরণীয়: 'ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতার ভিতর 'আর্ট' আছে, অপরের আছে শুধু 'নেচার'।' বস্তুত ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর আদর্শ নাগরিক সাহিত্য—গালাগালি দিতে গিয়াও ভারতচন্দ্র গ্রাম্যতার সহায়তা গ্রহণ করেন·নাই।

অশ্লীলতার পরিচয়

বিদ্যাসুন্দরের চরিত্র-সৃষ্টিতে ভারতচন্দ্র বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই। তাঁহার অঙ্কিত চরিত্রগুলি জীবন্ত নহে, যেন 'স্বর্ণপুত্তলী'। ইহারই মধ্যে উল্লেখযোগ্য হীরা মালিনী। তাহার 'কথায় হীরার ধার', বুড়া বয়সেও কিছু ঠাট বজায় রহিয়াছে, তবু তাহা কৃত্রিমতার ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে নাই। হীরাও একটি type হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

চরিত্র-সৃষ্টি

কেহ কেহ অনুমান করেন, রাজবংশের সন্তান ভারতচন্দ্রকে বহু দুঃখকষ্ট বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়া অন্নসংস্থান করিতে হইয়াছিল বলিয়াই অভিজাত ধনিকদের সম্বন্ধে তাঁহার মনে একটা চাপা বিদ্বেষের ভাব বর্তমান ছিল। বিদ্যাসুন্দর রচনা করিতে গিয়া তিনি অতি কৌশলে সেই বিদ্বেষকে চরিতার্থ করিয়াছেন। রাজার এবং সভাসদদের সম্মুখেই রাজান্তঃপুরের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়া আপন মনে যেন একটা হিংস্র উল্লাস অনুভব করিয়াছিলেন।

অন্নদামঙ্গলের তৃতীয় খণ্ড বা ভবানন্দ-মানসিংহ খণ্ডত্রয়ের মধ্যে সর্বাধিক দুর্বল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দের প্রশস্তিবন্দনার উদ্দেশ্য লইয়া কবি এই খণ্ডটি রচনা করিয়াছেন। মনে হয়, ইহার উপর বিশেষত্ব ও গুরুত্ব আরোপ করিবার জন্যই তিনি ইহাতে একটা ইতিহাসের প্রলেপ দিয়াছেন।

সমসাময়িকযুগের ভারত-বিখ্যাত মুঘল-সেনাপতি রাজা মানসিংহ এবং বাঙলার বারভুইঞার অন্যতম প্রতাপাদিত্য ঐতিহাসিক পুরুষ। কবি দেখাইয়াছেন যে এতদুভয়ের মধ্যে যখন যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তখন ভবানন্দ মজুমদার রাজা মানসিংহকে সহায়তা করেন এবং প্রত্যুপকার-স্বরূপ মুঘল-দরবার হইতে 'রাজা' উপাধি লাভ করেন। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকগণ মানসিংহ ও প্রত্যাপাদিত্যের মধ্যে যুদ্ধের কথা অস্বীকার করেন। মনে হয়, বিভিন্ন সূত্র হইতে সাবধানতা সহকারে তথ্য বাছাই করিতে পারিলে ভারতচন্দ্র প্রকৃত ইতিহাসই রচনা করিতে পারিতেন। কিন্তু, ভারতচন্দ্রের ইতিহাস-রচনার প্রবণতা কিংবা শ্রদ্ধায় কিছুই ছিল বলিয়া মনে হয় না। তিনি প্রায় লোকশ্রুতিতে নির্ভর করিয়াই এই কাহিনীটি রচনা করিয়াছেন। ফলে ইহাতে ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষিত হয় নাই। অন্য কোন দিক দিয়াও এই খণ্ডের উৎকর্ষ প্রমাণিত হয় না। কাহিনীও জমাট-বাঁধা নহে, ইতস্তত-বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলি কোন ঐক্যসূত্রে বিধৃত নহে। চরিত্র-সৃষ্টিতেও কবি বিশেষ পারঙ্গমতা দেখাইতে পারেন নাই। ফলে অন্নদামঙ্গলের তৃতীয় খণ্ডই সর্বাধিক অপঠিত থাকিয়া গিয়াছে।

তৃতীয় খণ্ডের বিচার

সামগ্রিক বিচারে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কাব্য। একমাত্র কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলকে বাদ দিলে সমগ্র প্রাচীন ও মধ্যযুগের অপর কোন মঙ্গলকাব্যই ইহার সমকক্ষতা দাবি করিতে পারে না। ভারতচন্দ্র বিভিন্ন ভাষায় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন এবং বহুতর গ্রন্থও পাঠ করিয়াছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থে তিনি তাহার উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার সর্বতোমুখী জ্ঞানের সঙ্গে স্বভাবসিদ্ধ কবিত্বশক্তি যুক্ত হইবার ফলেই তাঁহার রচিত কাব্য অসাধারণ জনপ্রিয়তা-অর্জনে সক্ষম হইয়াছে। কবি যদি কাব্যে কেবল প্রাণসৃষ্টি করিতে পারিতেন, তবে তাঁহার অন্নদামঙ্গল অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইবার সুযোগ পাইত।

ভারতচন্দ্রের কৃতিত্ব

বিভিন্ন ভাষায় ভারতচন্দ্রের পাণ্ডিত্যের কথা বলা হইয়াছে। বস্তুত সে যুগের অপর কোনও কবিরই বিভিন্ন ভাষার উপর এতখানি অধিকার ছিল বলিয়া জানা যায় না। তিনি যেমন খাঁটি সংস্কৃতভাষায় কবিতা রচনা করিয়াছেন, তেমনি 'যাবনী-মিশাল' ভাষাতেও সমান কৃতিত্বের পরিচয় দান করিয়াছিলেন। যেখানে যে ভাষাটি সর্বাধিক উপযোগী হইবে, সেখানে সেই ভাষাটিই ব্যবহার করিয়াছিলেন।

পাণ্ডিত্য

কাব্যের মূল সত্যটি তিনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি ভাষা-সম্বন্ধে এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়াছিলেন :

'যেহোক সেহোক ভাষা কাব্য রস লয়ে।'

অন্নদামঙ্গল কাব্যে কবি অকৃপণহস্তে রস পরিবেষণ করিয়াছেন, —হয়তো কোন রস একটু কড়াপাক হইয়া গিয়াছে, কখনো বা গাঁজিয়া গিয়াছে।

ভাবগূঢ় ব্যঞ্জনাময় বাক্য-রচনায় ভারতচন্দ্র প্রকৃতই অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁহার রচিত বহু পদই প্রবাদবাক্যের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। এই সৌভাগ্য বাঙলার অল্প কবির কপালেই জুটিয়াছে। —'বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমানী', 'খুঞা তাঁতী হয়ে দেহ তসরেতে হাত', 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন', 'হাবাতে যত্তপি চায় সাগর শুকায়ে যায়'—ইত্যাদি অসংখ্য ভারতচন্দ্রীয় পদ এখনও লোকের মুখে মুখে ফিরিয়া থাকে।

প্রবচন-রচনা

ভারতচন্দ্র তাঁহার কাব্যের বিভিন্ন অধ্যায়ের গোড়ায় কিছু কিছু 'বিষ্ণুপদ' যোগ করিয়াছেন। এই কবিতাগুলি যে শুধু বৈষ্ণবপদাবলীরই সমধর্মী, তাহা নহে—ইহাদের মধ্যে আধুনিক যুগের গীতিকবিতারও পূর্বাভাস লক্ষ্য করা যায়। ড° ভট্টাচার্য বলেন, 'যে গীতি-সুর ও গীতিরস ইতিপূর্বে মঙ্গলকাব্যের কাহিনীর অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছিল, ভারতচন্দ্রের মধ্যে আসিয়া তাহাই স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীন পরিচয় লাভ করিল।'

গীতিকবিতা

ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ পরিচয় শব্দ-শিল্পীরূপে। ছন্দে-অলঙ্কারে তিনি কাব্যকে বস্তুতই রাজসভার উপযোগী করিয়াই সাজাইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন, 'রাজসভাকবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান, রাজকণ্ঠের মণিমালার মত, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা তেমনি তাহার কারুকার্য।' ছন্দে ভারতচন্দ্র যে বৈচিত্র্য ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তৎপূর্ববর্তী কেন, তৎপরবর্তীও অঙ্গুলিমেয় কয়েকজন ছাড়া সারা বাঙলা সাহিত্যে তাঁহার জুড়ি নাই। বাঙলা তানপ্রধান পয়ার ও ত্রিপদীছন্দেই তিনি অধিকাংশ পদ রচনা করিয়াছেন। এমন নিখুঁত মিল বা অন্ত্যানুপ্রাস তৎকালে খুব কমই দেখা যাইত। আবার পয়ারের মধ্যেও মালঝাঁপ-আদি অন্তর্ভুক্ত করিয়া তিনি বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছেন। খাঁটি সংস্কৃত ভুজঙ্গপ্রয়াত, তোটক-আদি বিভিন্ন ছন্দকেও কবি অপূর্ব কৌশলে বাঙলা ভাষায় রূপায়িত করিয়াছেন। আবার ভাবের

শব্দ-শিল্প
ছন্দ-অলঙ্কার

অনুসারী করিয়া ছন্দ ব্যবহার করায় তাঁহার রচনা অসাধারণ কাব্যোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। এমনকি আধুনিক ছড়ার ছন্দ অর্থাৎ তাৎকালিক ধামালী-ছন্দের ব্যবহারেও কবি নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। অলঙ্কার-ব্যবহারেও কবির ক্ষমতা ছিল নিরঙ্কুশ। তাঁহার রচিত অনেকগুলি পদই বাঙলা অলঙ্কারের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত-হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। —অনুপ্রাস, যমক, ব্যতিরেক এবং ব্যাজস্তুতি অলঙ্কারেই কবির বিশেষ প্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দীমিশ্রিত বাঙলা কবিতা-রচনায়ও কবি সার্থকতা লাভ করিয়াছেন।

ভারতচন্দ্রের কৃতিত্ব-বিচারে তাঁহার সম্বন্ধে শেষকথা—তিনি ছিলেন হাস্যরসিক, ব্যঙ্গনিপুণ একজন উঁচুদরের স্যাটায়ারিষ্ট। সামাজিক কুপ্রথা এবং অভিজাত-জীবনের নানাপ্রকার অসঙ্গতির প্রতি বক্রোক্তি-নিক্ষেপে তিনি একজন নিপুণ শিল্পী ছিলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে তিনি দেবতার কৃপাপ্রার্থী ছিলেন না, ফলে তাঁহার ব্যঙ্গবাণ হইতে দেবতারাও নিস্তার পান নাই। 'খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাসাহিত্যে সর্বসংস্কারমুক্ত যে যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, ভারতচন্দ্রের ব্যঙ্গপ্রধান রচনার ভিতর দিয়াই তাহার প্রথম সোপান রচিত হইয়াছিল।.........তাঁহার

হাস্যরস

ভক্তিহীন ব্যঙ্গোক্তি, তাঁহার সর্বব্যাপী ও সুগভীর সামাজিক অভিজ্ঞতা প্রভৃতির ভিতর দিয়া তিনি তাঁহার 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে তাঁহার ব্যক্তি-প্রতিভার ছাপ মুদ্রিত করিয়া দিয়া তিনি মঙ্গলকাব্যের যুগাবসান ঘটাইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে এই বিশেষত্বগুলি তাঁহার ঐহিক প্রীতির নিদর্শন রূপে গণ্য হইবার মর্যাদা লাভ করিয়া তাহাকে আধুনিক যুগেরও অগ্রদূত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবার যোগ্যতা দান করিয়াছে।' (ড° ভট্টাচার্য)

অপ্রধান কবিগণঃ আরও কয়েকজন কবি 'কালিকামঙ্গল' বা বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্রের সমসময়ে নিধিরাম আচার্য নামে একজন কবি 'কালিকামঙ্গল' রচনা করেন। কবির উপাধি ছিল কবিরত্ন, সম্ভবত তিনি চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। দ্বিজ রাধাকান্তের 'কালিকামঙ্গল' কাব্যে আধুনিকতার প্রভাব সুস্পষ্ট। সম্ভবত ভারতচন্দ্রের প্রভাবেই তিনি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। প্রাণরাম চক্রবর্তী সম্ভব ১৬৬৬খ্রীঃ তাঁহার কাব্য রচনা করেন। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। কবীন্দ্র-ভণিতাযুক্ত কালিকামঙ্গলে ভারতচন্দ্রের প্রভাব নাই, অতএব তিনি তৎপূর্ববর্তী কালের হইতে পারেন। তাঁহার কাব্যে বৈষ্ণব-প্রভাব লক্ষণীয়।

কালিকামঙ্গলের দুইটি স্পষ্ট ধারার পরিচয় পাওয়া যায়। একটি পশ্চিম-

বঙ্গের, অপরটি প্রধানত চট্টগ্রামের। চট্টগ্রামের ধারায় কালিকার প্রভাব অপেক্ষাকৃত বেশি, ফলত ইহাতে কিছুটা ধর্মীয় ভাবও বর্তমান ; মনে হয় এই ধারাটিই প্রাচীনতর। পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ইহাতে অষ্টাদশ শতাব্দীর নাগরিক জীবনের বিলাসিতাকেই প্রশ্রয় দান করা হইয়াছে।

৬. অপ্রধান মঙ্গলকাব্য

বাঙলা সাহিত্যে 'মঙ্গলকাব্যে'র উদ্ভব, পটভূমিকা-ইত্যাদি সম্বন্ধে ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। ইহাতে একটা কথা স্পষ্ট হইয়াছে যে প্রধানত লৌকিক গ্রামদেবতাদের মাহাত্ম্য-কীর্তনই মঙ্গলকাব্যগুলির প্রধান লক্ষ্য ছিল। মূলত 'মঙ্গল' শব্দটি অনেকটা সঙ্কীর্ণ এবং গোষ্ঠীগত অর্থে ব্যবহৃত হইলেও পরবর্তী কালে ইহার ব্যবহার এবং অর্থেরও প্রসার লাভ ঘটিয়াছে। এই জন্যই দেখি ভাগবত-পুরাণের অনুবাদ হইয়াছে 'কৃষ্ণমঙ্গল' এবং 'গোবিন্দমঙ্গল', জীবনী-সাহিত্য হইয়াছে 'চৈতন্যমঙ্গল', 'অদ্বৈত মঙ্গল', পৌরাণিক দেব-দেবীদের কাহিনী হইয়াছে 'দুর্গামঙ্গল, ভবানীমঙ্গল, গঙ্গা-মঙ্গল', আবার একান্ত লৌকিক কাহিনী বিদ্যাসুন্দর হইয়াছে'কালিকামঙ্গল'। অবশ্য লৌকিক দেবতাদের মাহাত্ম্য-প্রচার শাখাটি কোনকালেই স্তিমিত হয় নাই অথবা প্রধান প্রধান কয়টি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রহিল না। মনসা, চণ্ডী, ধর্ম ও শিবের পরেও অন্যান্য বহু দেবতা এই মঙ্গল কাব্যের সাহায্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং প্রসার লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের মাহাত্ম্য-প্রচারক কাব্যগুলিকেই 'অপ্রধান মঙ্গলকাব্য'-রূপে আখ্যায়িত করা হইয়াছে। এই মঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাহিনী বলিতে বিশেষ কিছু নাই—প্রধানত দেবতারাই ইহাদের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। এই সমস্ত গ্রাম্যদেবতাদের মাহাত্ম্য-কীর্তনের জন্য কোন প্রতিভাশালী লেখকও অগ্রসর হইয়া আসেন নাই বলিয়াও অপ্রধান মঙ্গলকাব্যগুলি আপন গোষ্ঠীর বাহিরে বিশেষ পরিচিতি লাভ করিতে পারে নাই। প্রধান মঙ্গলকাব্যগুলিতেও সাম্প্রদায়িকতার প্রমাণ সুস্পষ্ট কিন্তু তৎসত্ত্বেও কাহিনীর আকর্ষণেই হউক কিংবা রচনার গুণেই হউক, এইগুলি অনেকটা অসাম্প্রদায়িক তথা সার্বজনীন আগ্রহের সৃষ্টি

মঙ্গলকাব্যের প্রাচুর্য

করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু অপ্রধান মঙ্গলকাব্যগুলি মঙ্গলকাব্যের বহিরঙ্গ লইয়া কোন প্রকারে বাঁচিয়া আছে মাত্র। ইহাদের কোনটিই সম্ভবত মঙ্গল-কাব্যের সমৃদ্ধি-যুগে সৃষ্টি হয় নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাই ইহাদের মধ্যে অষ্টাদশ শতকীয় অবক্ষয়ের চিহ্ন বর্তমান।

গঙ্গামঙ্গল: 'গঙ্গামঙ্গল' কাব্যের একজন শ্রেষ্ঠ কবি মাধবাচার্য বা দ্বিজ মাধব। এই মাধব কবির অপর কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। ইনি যেমন 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা মাধব হইতে পারেন, তেমন 'কৃষ্ণ-মঙ্গল'-রচয়িতা মাধবও হইতে পারেন; এমন কি ইনি যদি তৃতীয় কোনো মাধব হইয়া থাকেন, তাহা হইলেও আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। তবে 'গঙ্গামঙ্গল' কাব্যে ইনি যে ভণিতা দান করিয়াছেন, তাহা কৃষ্ণমঙ্গলের ভণিতারই অনুরূপ। কবি ভণিতায় বারবার চৈতন্যদেবের উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয় যে কবি বোধহয় বৈষ্ণব ছিলেন। ইহাতে মাঝে মাঝে ব্রজবুলি পদেরও ব্যবহার দেখা যায়। গ্রন্থে গঙ্গার উদ্ভব এবং ভগীরথ-কর্তৃক গঙ্গা আনয়ন-কাহিনীই প্রাধান্য লাভ করিলেও অন্যান্য অনেক পৌরাণিক কাহিনী ইহাতে স্থানলাভ করিয়াছে। এই মঙ্গল কাব্যটি পৌরাণিক,—কোন লৌকিক দেবতার মাহাত্ম্য ইহাতে বর্ণিত হয় নাই।

মাধব

দ্বিজগৌরাঙ্গ অপর একখানি 'গঙ্গামঙ্গল' রচনা করিয়াছিলেন। গঙ্গা-তীরস্থ কাষ্ঠশালী গ্রাম ইঁহার বাসস্থান ছিল। কবি সম্ভবত সপ্তদশ শতকে বর্তমান ছিলেন। গঙ্গার পশ্চিমতীরস্থ 'গুপ্তপল্লী যশোহর ধামে' বৈদ্যবংশীয় কবি জয়রাম একখানি ক্ষুদ্রাকৃতি 'গঙ্গামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। তাঁহার রচনার উৎস 'ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ'। দ্বিজ কমলাকান্ত-রচিত 'গঙ্গামঙ্গল' অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। মনে হয় কবির 'গঙ্গার সমীপে বসত কোগ্রামেতে স্থিতি' ছিল।

দ্বিজগৌরাঙ্গ ও জয়রাম

দুর্গাপ্রসাদ মুখুটি-রচিত 'গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী' গঙ্গামঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার থাকে। কবির বাসস্থান ছিল উলা-বীরনগর। তাঁহার পিতার নাম ছিল আত্মারাম, মাতা অরুন্ধতী। গ্রন্থোৎপত্তির কারণ-প্রসঙ্গে কবি বলিয়াছেন যে গঙ্গাদেবী কবিপত্নীকে স্বপ্নে দেখা দিয়াছিলেন এবং বলেন:

দুর্গাপ্রসাদ

'ভাষায় আমার গান নাই।
তোমার পতিরে কবে প্রকাশ হইবে তবে
যে বাঞ্ছা করিবে দিব তাই'॥

কবি দুর্গাপ্রসাদ অপর কোন আদর্শের অভাবে নিজেই বিভিন্ন পুরাণ ঘাঁটিয়া এই গঙ্গামঙ্গল কাব্যটি রচনা করেন। এজাতীয় গ্রন্থের মধ্যে ইহাই বৃহত্তম। প্রধানত ভগীরথ-কর্তৃক গঙ্গা-আনয়ন ইহার মূল বিষয়-বস্তু হইলেও ইহাতে অনেক নূতন নূতন কাহিনীও যুক্ত হইয়াছে। গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী গানের জন্যই রচিত হইয়াছিল। ইহাও অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মত আট পালায় বিভক্ত। ইহাতে কবির বাস্তবদৃষ্টি এবং সরসতার পরিচয় পাওয়া যায়।

গৌরীমঙ্গল : 'গৌরীমঙ্গল' কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি পাঁকুড়ের ভূস্বামী পৃথ্বীচন্দ্র। পৃথ্বীচন্দ্র কাব্যে আত্মপরিচয়-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে তিনি ১২১৩ সালে গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার পিতার নাম বৈদ্যনাথ, কবি ত্রিবেদী উপাধি-ধারী ব্রাহ্মণ। গৌরীমঙ্গল অতি বৃহৎ কাব্য। ইহা পাঁচ খণ্ডে এবং ৪১৯ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম দেবখণ্ড—ইহা সংস্কৃত-পুরাণাদির অনুকরণে রচিত। দ্বিতীয় অবন্তী খণ্ড—ইহাতে অবন্তী-নরপতি শালবাহনের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। রাজার মৃত্যুর পর রাণীকে সান্ত্বনা দান-প্রসঙ্গে রামায়ণ-মহাভারতের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে। তৃতীয় যুদ্ধখণ্ড, শালবাহন-পুত্র জীমূতবাহনের যুদ্ধ ও পিতৃরাজ্য-উদ্ধার ইহার বর্ণিত বিষয়। প্রসঙ্গক্রমে তান্ত্রিকধর্মের মাহাত্ম্য এবং তীর্থ-মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হইয়াছে। চতুর্থ—নীতিখণ্ড। ইহাতেও জীমূতবাহনের ধর্মরাজ্য স্থাপন, নীতিপ্রতিষ্ঠা-আদি বর্ণিত হইয়াছে। পঞ্চম—স্বর্গখণ্ডে বৃদ্ধ জীমূতবাহনের কাহিনী এবং দেবীর কৃপায় জীমূত-বাহনের স্বর্গলাভ-কাহিনী প্রদত্ত হইয়াছে।

পৃথ্বীরাজ

কবি বাঙলাভাষায় রচিত বিভিন্ন কাব্য এবং কবিদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত কোন কোন কাব্যের এখন আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। এই সব কাব্য দেখিয়া শুনিয়াই কবির মনেও কাব্যরচনার বাসনা জন্মে।—

'মূর্খের স্বভাব মনে করিল রচন।
দোষ না লইবে কেহ গুণবান্ জন ॥'

কবি 'ভূষণ্ডী রামায়ণ' নামে একটি সংক্ষিপ্ত রামায়ণও রচনা করিয়াছিলেন।

শিবচরণ সেন-রচিত 'গৌরীমঙ্গল' সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার কাহিনী-অবলম্বনে রচিত। ইহাতে মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত চণ্ডীকাহিনীই বর্ণিত হইয়াছে। আবার কালকেতুর উপাখ্যানও ইহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। কবি সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান ছিলেন।

শিবচরণ

শীতলা মঙ্গল ঃ শীতলা বসন্তরোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং রোগের উপশমকারিণী দেবী। শুধু বাংলাদেশে নহে, ভারতের প্রায় সর্বত্রই এই দেবীর পূজা প্রচলিত আছে। কাশীতে এক শীতলা-মন্দির আছে। উড়িষ্যায় এই দেবীর নাম 'ঠাকুরাণী', আসামে 'আই', দাক্ষিণাত্যেও 'শীতলাম্মা' নামে এই জাতীয় এক দেবী আছেন। অনেকেই শীতলাদেবীকে বৈদিক 'তক্মন্' বা 'অপ্‌দেবী'র সঙ্গে যুক্ত করিতে বৃথা চেষ্টা করিয়া থাকেন। আবার অনেকেই বৌদ্ধদেবী 'হারীতী'র সঙ্গে ইঁহার সম্পর্ক অনুমান করেন। কেহ কেহ প্রাচীন পুরাণেই শীতলার সন্ধান করিয়া থাকেন। কিন্তু মনে হয়, এই সমস্ত অনুমান-কল্পনার পশ্চাতে কোন সত্য নাই। অন্যান্য লৌকিক দেবতার মতই শীতলা-ও অনার্য সমাজ হইতেই গৃহীতা। দাক্ষিণাত্যের 'শীতলাম্মা'র সহিতই ইহার সম্পর্ককে বরং সহজে স্বীকার করিয়া লওয়া চলে।

দেবীর উদ্ভব

শীতলামঙ্গলের বিশেষ কোন কাহিনী নাই—একখানি শীতলামঙ্গলের চারিটি পালায় চারিটি স্বতন্ত্র কাহিনীর পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে প্রধান 'চন্দ্রকেতুর পালা'—ইহাতে মনসামঙ্গলের প্রভাব সুস্পষ্ট।

নিত্যানন্দকেই শীতলামঙ্গলের আদি কবি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে। কবির কাব্যটি 'গোকুল পালা' রূপেই বিখ্যাত। তিনি আত্ম-পরিচয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে তাঁহার পিতার নাম মহামিশ্র—কবির উপাধি ছিল চক্রবর্তী। তাঁহার নিবাস ছিল কাঁটাদিয়া গ্রাম। নিত্যানন্দ মেদিনীপুরের কাশীযোড়ার রাজা রাজ-নারায়ণের সভাসদ্ ছিলেন। উক্ত রাজা এবং কবি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে বর্তমান ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। ইঁহার কাব্যে পাওয়া যায় যে, গোকুলে কৃষ্ণ-বলরামের বসন্তরোগ হইলে পর শীতলাপূজা করিয়া তাঁহারা মুক্তিলাভ করেন। নিত্যানন্দের ভাষা মার্জিত, সরল ও সহজ, তবে আধুনিকতার লক্ষণ প্রকট।

নিত্যানন্দ

শীতলামঙ্গলের অপর কবি বল্লভ। সম্ভবত কবি অষ্টাদশ শতকে বর্তমান ছিলেন এবং তিনি ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী। কবি ঘোরতর বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ছিলেন বলিয়াই মনে হয়—'পাষণ্ড বৈষ্ণবের মুণ্ডে পড়ুক বজ্জর'। ইনি স্বয়ং বসন্ত-চিকিৎসক এবং গ্রহবিপ্রজাতীয় ব্রাহ্মণ হইতে পারেন। কারণ তাঁহার কাব্যে যে বিভিন্ন জাতীয় বসন্ত এবং তাহার চিকিৎসাপ্রণালী বর্ণিত হইয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা-ব্যতীত

বল্লভ

সম্ভব নহে। কবির রচনা সরল, সহজ এবং স্থানবিশেষ কবিত্বময় হইলেও বিশেষ মার্জিত বা গ্রাম্যতামুক্ত নহে।

দুর্গামঙ্গল : 'দুর্গামঙ্গল' প্রধানত পৌরাণিক কাহিনী-অবলম্বনে রচিত হইলেও কাব্যকারগণ কোন সুনির্দিষ্ট কাহিনীর অনুসরণ করেন নাই। সম্ভবত ভবানীপ্রসাদ রায়ই দুর্গামঙ্গলকাব্যের আদি কবি। কবি বৈদ্যজাতীয় 'কর' উপাধিধারী ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল নয়নকৃষ্ণ। কবির নিবাস ময়মনসিংহ জেলার কাঁটালিয়া গ্রাম। কবি জন্মান্ধ ছিলেন এবং শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন হইয়া অতি দুঃখে জীবন কাটান। ভবানীপ্রসাদের কাব্য প্রধানত মার্কণ্ডেয়চণ্ডী-অবলম্বনে রচিত হইলেও ইহাতে রামচন্দ্রের দুর্গাপূজা-আদি কাহিনীও বিবৃত হইয়াছে। কবি জন্মান্ধ ছিলেন, সেই বিবেচনায় তাঁহার কৃতিত্বকে পরিপূর্ণ মর্যাদা-দান সঙ্গত। তাঁহার রচিত অনুবাদগুলি প্রকৃতই মনোহর।

ভবানীপ্রসাদ

কবি রূপনারায়ণ ঘোষ যে দুর্গামঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহাও মূলত মার্কণ্ডেয়পুরাণ-অবলম্বনে রচিত। কবি সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বর্তমান ছিলেন। তাঁহার নিবাস ছিল ময়মনসিংহ জেলার আদাজান গ্রামে। কবির সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে যে পারদর্শিতা ছিল, তাহার পরিচয় গ্রন্থেই সুলভ। তাঁহার রচনার মাঝে মাঝে ব্রজবুলি ভাষায় রচিত পদ পাওয়া যায়।

রূপনারায়ণ

কবি রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে হরিনাভি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবির পিতার নাম রামধন। কবি 'তর্কপঞ্চানন' এবং 'কবিকেশরী' উপাধি পাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার রচিত 'দুর্গামঙ্গল' কাব্যটি দুইটি স্বতন্ত্র খণ্ডে বিভক্ত—গৌরীবিলাস ও কঙ্কালীর অভিশাপ এবং নলদময়ন্তী। মনে হয়, আসলে 'গৌরীবিলাস'ই তাঁহার প্রকৃত দুর্গামঙ্গল কাব্য। কবি দেবী ভুবনেশ্বরীর স্বপ্নাদেশ পাইয়াই কাব্যটি রচনা করিয়াছিলেন। ইহা মূলত পৌরাণিক পার্বতী-উমার কাহিনী। কালিদাসের 'কুমার সম্ভবে'র প্রভাব ইহার উপর সুস্পষ্ট। মনে হয়, ভারতচন্দ্রের প্রভাবেই তিনি কোন কোন ছন্দ রচনা করিয়াছেন।

রামচন্দ্র

বাসুলী-মঙ্গল : রাঢ় অঞ্চলে বাসুলী বা বিশালাক্ষী যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও চণ্ডীদাসের কারণেই তাঁহার খ্যাতির অধিকতর বিস্তৃতি ঘটিয়াছে। কিন্তু বাসুলীদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন-উপলক্ষ্যে রচিত 'বাসুলী-

মঙ্গল' কাব্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় নাই। কবিচন্দ্র মুকুন্দ-রচিত 'বাসুলীমঙ্গল'ই এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। কবির পিতার নাম বিকর্তন মিশ্র, মাতা হারবাতী, কবি জাতিতে ব্রাহ্মণ। নামসাদৃশ্য থাকিলেও ইনি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম কিংবা 'জগন্নাথ মঙ্গল'-রচয়িতা মুকুন্দভারতী হইতে পৃথক। কবির নিবাস ছিল সম্ভবত বর্ধমান জেলায়। তাঁহার গ্রন্থে যে রচনাকালের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাহা প্রামাণিক হইলে কবিকে ষোড়শ শতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত করিতে হয়: 'শাকে রস রথ (রস?) বেদ শশাঙ্ক গণিতে'—লক্ষ্য করিবার বিষয়, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের কাব্যেও এই তারিখটি পাওয়া গিয়াছে। মুকুন্দরামের কাব্যে এই শ্লোকাংশটি প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই এখন অনেকে মনে করিয়া থাকেন। যদি তাহাই হয়, তবে অনুমান করা চলে যে কোন লিপিকর হয়তো নামসাদৃশ্যের জন্য 'বাসুলী-মঙ্গলে'র মুকুন্দের ভণিতা চণ্ডীমঙ্গলে যোগ করিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু যেহেতু পরবর্তী কোন কবি ইঁহার নাম উল্লেখ করেন নাই এবং ইঁহার রচনার ভাষাও অপেক্ষাকৃত আধুনিক, এই হেতু, কবিকে এত প্রাচীনকালে ঠেলিয়া দেওয়া চলে না। যাহা হউক, এই বিষয়ে আরও অনুসন্ধানের প্রয়োজন।—কবিচন্দ্র মুকুন্দ-রচিত 'বাসুলী-মঙ্গল' বারোটি পালায় বিভক্ত। ইহার প্রথম সাতটি পালায় প্রথমে পৌরাণিক সতী ও উমার কাহিনী বিবৃত করিয়া পরে কবি মার্কণ্ডেয় পুরাণের কাহিনী-অবলম্বনে সুরথরাজার কাহিনী, মধুকৈটভ-বধ, মহিষাসুর বধ ও শুম্ভনিশুম্ভ-নিধনকাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থের অবশিষ্ট পালায় বর্ধমানের ধুসদত্ত সদাগরের কাহিনী তথা লৌকিক কাহিনীটি স্থান লাভ করিয়াছে। মূলত ধনপতি সদাগরের কাহিনীটির অনুকরণেই এই কাহিনীটি গঠিত হইয়াছে। এই ধুসদত্তের উল্লেখ অবশ্য মুকুন্দরামের এবং কেতকাদাসের কাব্যেও বর্তমান।—কবির কাব্যে সংস্কৃত সাহিত্য এবং বৈষ্ণবপদাবলীর প্রভাব বর্তমান; ইহার ভাষাও গ্রাম্যতামুক্ত।

কবিচন্দ্র মুকুন্দ

ষষ্ঠী মঙ্গল: 'দেবী ভাগবত', 'ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ'-আদি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন পুরাণগুলিতে ষষ্ঠীদেবীর নাম পাওয়া গেলেও ইনি একেবারেই লৌকিক দেবতা। পরে ইহার আভিজাত্য-প্রতিষ্ঠার জন্য ইঁহাকে কাত্যায়নী বা দুর্গার সহিত অভিন্নরূপে দেখানো হইয়াছে। শিশুর জন্মের ষষ্ঠ দিবসে কিছু কিছু জাতকর্ম করা হয়—মূলত এই কারণেই শিশুদের রক্ষয়িত্রীরূপে ষষ্ঠীঠাকুরাণীর পরিকল্পনা

দেবী-পরিচয়

করা হইয়াছে। ষষ্ঠীঠাকুরাণীর মূর্তিরও বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়না। অধিকন্তু এখনও পর্যন্ত ষষ্ঠীপূজা নারীমহলেই আবদ্ধ। শাস্ত্রকারগণ বারোমাসে বারো প্রকার ষষ্ঠীপূজার নির্দেশ করিলেও প্রধানত কন্যাজামাতার হিত-কামনায় অরণ্যষষ্ঠী বা জামাইষষ্ঠীই সর্ববঙ্গে সাড়ম্বরে প্রতিপালিত হয়। অধিকাংশ ষষ্ঠীমঙ্গলকাব্যে এই অরণ্যষষ্ঠীর মাহাত্ম্যই বর্ণনা করা হইয়াছে।

'কালিকামঙ্গলের' কবি কৃষ্ণরাম দাস ১৬৭৯ খ্রীঃ তাঁহার ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। কৃষ্ণরামের পিতার নাম ভগবতীদাস, নিবাস নিমতা গ্রাম। তাঁহার যে দুইখানা পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, দুইখানাই আদ্যন্তখণ্ডিত। তাহাতে নারীসমাজে প্রচলিত ষষ্ঠী-পূজার গল্পটিই রূপায়িত হইয়াছে। ইহাতে সপ্তগ্রামের সমসাময়িক সমৃদ্ধ রূপেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

কৃষ্ণরাম

রুদ্ররাম চক্রবর্তী-রচিত 'ষষ্ঠীমঙ্গল' কাব্য এতজ্জাতীয় গ্রন্থগুলির মধ্যে বৃহত্তম। কবির পিতার নাম গঙ্গারাম চক্রবর্তী—কবির উপাধি ছিল বিদ্যা-ভূষণ। কবির কাল-সম্বন্ধে কিছু জানিবার উপায় নাই, তবে অনুমান তিনি অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে বর্তমান ছিলেন। গ্রন্থোৎপত্তির কারণ-সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন—

রুদ্ররায়

'ব্যাধিসঙ্কটেতে মোর তনয়া পীড়িত।
তার রক্ষাহেতু মোরে করাইলে গীত॥'

ত্রয়োদশ পালায় কবির গ্রন্থটি রচিত। ইহাতে অরণ্যষষ্ঠীর কোন পরিচয় নাই—কবি মোটামুটি ভাবে বিভিন্নপুরাণ হইতে তিনটি কাহিনী গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথম কাহিনীটি প্রধানত কার্তিকেয়কে অবলম্বনে রচিত; দ্বিতীয় কাহিনীটি রাজা ক্ষেত্রমিশ্রের ষষ্ঠীর বরে পুত্রপ্রাপ্তি এবং পুত্র-কর্তৃক রাজ্যোদ্ধার এবং তৃতীয়টি কলাবতীর কাহিনী। কবির ভাষা খুব পরিচ্ছন্ন এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ, তবে কাব্যে সহজ কবিত্বের প্রকাশ বিশেষ নাই।

সম্প্রতি শঙ্কর চক্রবর্তী নামক এক কবির 'ষষ্ঠীমঙ্গল' আবিষ্কৃত হইয়াছে। কবি সম্ভবত মেদিনীপুর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থটি ১৭৫৯ খ্রীঃ রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কবির পিতার নাম সীতারাম, অতএব এই কবি যে কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী হইতে পৃথক্ ব্যক্তি তাহা স্বীকার করিতে হয়। ইনি কাব্যে যে ষষ্ঠীর উল্লেখ

শঙ্কর

করিয়াছেন, তিনি জলষষ্ঠী। অরণ্যষষ্ঠীর কাহিনীর সহিতও ইহার কাহিনীর মিল নাই। শঙ্করের কাব্যে মুকুন্দরামের প্রভাব অতিশয় স্পষ্ট।

রায় মঙ্গল : দক্ষিণ রায় বাঘের দেবতা। সাধারণত দক্ষিণ বঙ্গে অর্থাৎ সুন্দরবনের সন্নিহিত যে অঞ্চলে বাঘের উপদ্রব বেশি, সেই সমস্ত অঞ্চলেই ব্যাঘ্র-দেবতা দক্ষিণরাযের পূজা হয়। দক্ষিণরায়ের মাহাত্ম্য-সূচক কাব্যই 'রায়মঙ্গল' নামে প্রসিদ্ধ। বাঘের পূজা ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র প্রচলিত। মোহেনজোদরোর সীল মোহরে ব্যাঘ্রমূর্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতের কোন কোন জাতিও হয়তো ব্যাঘ্রপূজক অথবা নিজেদের ব্যাঘ্র-বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। বাঙলাদেশে ব্যাঘ্র-দেবতারূপে যে দক্ষিণরায়ের পূজা হইয়া থাকে, তাহার সঙ্গে ভারতের অন্য অংশের সম্পর্ক না থাকাই সম্ভব। বাঙলার দক্ষিণে সুন্দর বন,—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যাঘ্রকুলের বাসভূমি। সেই দক্ষিণদিকের অধিপতি দেবতা বলিয়া 'দক্ষিণরাজ' বা 'দক্ষিণরায়' নামকরণ হইয়া থাকিতে পারে। আবার কেহ কেহ বলেন যে, তিনি ভাটি অঞ্চলের রাজা মুকুট-রায়ের সেনাপতি ছিলেন। এমনও হইতে পারে যে, মূলত দক্ষিণরায় ছিলেন একজন উৎকৃষ্ট ব্যাঘ্র-শিকারী। যাহা হউক,—দক্ষিণরায়ও ক্রমে দেবতায় পরিণত হইলেন। এই দেবতা একেবারেই লৌকিক দেবতা,—পুরাণাদির সহিত ইহার কোনই সম্পর্ক নাই।

ব্যাঘ্রদেবতা

'রায়মঙ্গলে' যে কাহিনী পাওয়া যায়, তাহাতে পুষ্পদত্ত নামে এক বণিকের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। অবশ্য এই কাহিনীটি প্রধানত চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতি সদাগরের কাহিনীর অনুসরণে গঠিত। কিন্তু ইহার মধ্যে যে দক্ষিণ রায় ও বড় গাজীখাঁর যুদ্ধবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই এই কাব্যের মৌলিক অংশ।

কাহিনী

'কালিকামঙ্গল' ও 'ষষ্ঠীমঙ্গল' কাহিনী-রচয়িতা কৃষ্ণরাম-রচিত 'রায়-মঙ্গল' প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণরাম তাঁহার কাব্যে 'মাধব আচার্য' নামক একজন পূর্ববর্তী 'রায়মঙ্গল' কাব্যকারের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মাধব আচার্যের রায়মঙ্গলের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।—কবি তাঁহার গ্রন্থোৎপত্তির কারণ-বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে দক্ষিণরায় স্বপ্নে দেখা দিয়া তাঁহাকে উক্ত কাব্যরচনার জন্য আদেশ দান করিয়াছিলেন। অধিকন্তু দক্ষিণরায় শাপ দিয়াছেন :

কৃষ্ণরাম

'তোমার কবিতা যার মনে নাহি লাগে।
সবংশে তাহারে তবে সংহারিবে বাঘে॥'

'রায়মঙ্গল' নাতিবৃহৎ কাব্য। ইহার রচনাকাল ১৬৮৬ খ্রীঃ। কবি পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও রচনারীতি যথেষ্ট সরল।

'রায়মঙ্গলকাব্যে' কুম্ভীরদেবতা কালুরায় এবং বড় গাজীরও মাহাত্ম্য কীর্তন করা হইয়াছে। বড় গাজী খাঁর সঙ্গে দক্ষিণ রায়ের যুদ্ধের মধ্যে ঐতিহাসিক কোন কাহিনীর ইঙ্গিত থাকিতে পারে,—কেহ কেহ এইরূপ মনে করেন। 'রায়মঙ্গলে'র একটি মুসলমানী সংস্করণ পাওয়া যায়,—এইরূপ একটি গ্রন্থ 'বনবিবি জহুরানামা',—ইহার লেখক মুন্সী বয়নদ্দিন। ইহাতে দক্ষিণরায়ের উপর বনবিবির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বনবিবি জহুরানামা

অপরাপর মঙ্গলকাব্য : পূর্বেই বলা হইয়াছে যে কালক্রমে মঙ্গলকাব্যের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারে স্থানীয় দেবতাদের অবলম্বনেও ঐরূপ মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছিল। কখনও বা পাঁচালীকেই 'মঙ্গলকাব্য' আখ্যায় ভূষিত করা হইয়াছে।—

'মনসামঙ্গল'-কাব্যের রচয়িতা রামজীবন ১৭০৯ খ্রীঃ 'সূর্যমঙ্গল' বা 'আদিত্যচরিত' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। সূর্যের পাঁচালীকেই তিনি 'সূর্যমঙ্গল' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

সূর্য মঙ্গল

'কপিলামঙ্গল' নামে একখানি মঙ্গলকাব্য অপেক্ষাকৃত বেশি বিস্তার লাভ করিয়াছিল। 'কপিলাধেনু'-হরণই ইহার বর্ণিতব্য বিষয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অন্তর্গত বরদাখাত পরগণার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া পরিচিত বরদাকে অবলম্বন করিয়া দ্বিজ নন্দকিশোর ১৮১৯ খ্রীঃ 'বরদামঙ্গল' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। কুচবিহার জিলায় গোসানীমারী নামক গ্রামে গোসানীদেবীর মন্দির আছে। এই দেবীর কাহিনী অবলম্বন করিয়া রাধাকৃষ্ণদাস বৈরাগী 'গোসানীমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন্। ইহার কাহিনীতে ক্ষীণ ঐতিহাসিক-সূত্র থাকিতেও পারে। গঙ্গানারায়ণ নামে এক কবি 'ভবানী-মঙ্গল' নামে যে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, সম্ভবত তাহা চণ্ডীকাহিনীরই অনুরূপ। সরস্বতীর মাহাত্ম্য-কীর্তন করিয়া দয়ারাম নামক একজন কবি 'সারদামঙ্গল' কাব্য-রচনা করেন। সরস্বতী বৈদিক দেবী হইলেও কাহিনীতে বৈদিক

কপিলামঙ্গল

বরদামঙ্গল

গোসানীমঙ্গল

ভবানীমঙ্গল

কিংবা পৌরাণিক কোন প্রভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায় না—কাহিনী অনেকটা রূপকথার মত। সুসঙ্গের রাজা রাজসিংহ বাহাদুরও সরস্বতীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া 'ভারতীমঙ্গল' নামক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে কালিদাসের কবিত্বলাভ-কাহিনীই বর্ণিত হইয়াছে। শিবানন্দ-রচিত 'লক্ষ্মীমঙ্গল' কাব্যটি প্রকৃতপক্ষে দেবীভাগবত-পুরাণের একটি অধ্যায়ের অনুবাদ মাত্র।

সারদামঙ্গল

লক্ষ্মীমঙ্গল

এই সমস্ত দেব-দেবীর কাহিনী ছাড়াও বিভিন্ন তীর্থমাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া 'তীর্থমঙ্গল' কাব্য রচনা করা হইয়াছে। ২৪ পরগণার ভাজনঘাট-নিবাসী বিজয়রাম সেন এক জমিদারের সহযাত্রী হইয়া উত্তর-ভারতের বিভিন্ন তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। কবির রচনায় কাব্যগুণ না থাকিলেও বর্ণনা স্পষ্ট ও বাস্তব।

তীর্থমঙ্গল

অধ্যায় ঃ
তেরো

লোকসাহিত্য শাখা

সভ্য শিক্ষিত মানুষ সচেতনভাবে সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া আপন মনের ভাবনা-কামনাকে রূপদান করেন। এই ধরণের সাহিত্যে বিশিষ্ট ব্যক্তি-মনের স্বরূপটি উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু শিক্ষিত আর সভ্য মানুষকে লইয়াই সমাজের গঠন কখনও সম্পূর্ণ হয় না। সমাজের অধিকাংশ লোকই (অন্তত বর্তমানকালেও আমাদের দেশে এবং প্রাচীনতর কালে সর্বদেশেই)

লোকজীবন ও লোকসাহিত্য

শিক্ষা ও সভ্যতার আলোক হইতে বঞ্চিত হইয়া যে জীবন যাপন করে, তাহার পরিচয় অনেক সময় বহির্জগতে থাকে অজ্ঞাত। সেই অজ্ঞাত অন্ধকার জীবনেও যে কদাচিৎ সাহিত্য-কল্পনার বুদ্বুদ সৃষ্টি হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে তাহা আবার এক সময় অপরের অগোচরেই বিলয়প্রাপ্ত হইয়া যায়, তাহার সত্যতা অস্বীকার করা চলে না। বস্তুত লোকজীবনকে অবলম্বন করিয়া প্রাচীনকালেও যে এক ধরণের সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছিল, সাধারণত তাহাকেই আমরা 'লোকসাহিত্য' বলিয়া অভিহিত করিতে পারি।

'লোকসাহিত্য' কথাটি অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিককালের সৃষ্টি। পাশ্চাত্ত্যের Folk Literature কথাটি আক্ষরিক অনুবাদ করিয়াই আমরা শব্দটি ব্যবহার করিয়া থাকি; পাশ্চাত্ত্যে Folk Literature বলিতে যে সাহিত্যকর্মকে

সংজ্ঞা

বুঝাইয়া থাকে, তাহার নানাবিধ লক্ষণের মধ্যে একটা প্রধান লক্ষণ এই—'which form the popular entertainments of primitive peoples or of the uncultured elements of more civilised peoples.' এই প্রসঙ্গে আরও অন্য বহুবিধ লক্ষণের কথা বলা হইয়াছে; কিন্তু জটিলতা-বৃদ্ধির ভয়ে আমরা শুধু মোটামুটিভাবে এই সূত্রটিকে অবলম্বন করিয়াই আলোচনায় অগ্রসর হইব।

প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে আদিম অথবা অশিক্ষিত লোক জীবনের সঙ্গে যুক্ত সাহিত্যকর্ম-রূপে যাহাদের সন্ধান লাভ করিয়া থাকি, তাহাদিগকে মোটামুটি তিনটি ধারায় বিভক্ত করা যায়। তবে বিশেষভাবে

ত্রিধারা

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সমগ্র প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে দেববাদ এবং ধর্মীয় চেতনাই প্রাধান্য লাভ করিলেও লোকসাহিত্যে ইহাদের প্রভাব লক্ষণীয়ভাবেই অনুপস্থিত।

বস্তুত, ধর্ম-প্রভাবমুক্ত সাহিত্য-কীর্তিকেই আমরা তাৎকালিক লোকসাহিত্য বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। ইহাদের সবগুলি যে লোকজীবন হইতেই উদ্ভূত, তেমন দাবি সম্ভবত অবাস্তব এবং অসমীচীন। প্রাচীন সাহিত্যের যে একটি ধারাকে সাধারণভাবে 'মুসলমানী সাহিত্য' বলিয়া অভিহিত করা হয়, তাহা এই লোকসাহিত্যেরই অন্তর্ভুক্ত। এই মুসলমানী সাহিত্যের অপর অথচ সঙ্গততর নামকরণ হওয়া উচিত 'কিস্সা সাহিত্য'। প্রকারান্তরে বলা চলে যে, রূপকথা-জাতীয় কাহিনীই ইহার উপজীব্য। এই কাহিনীগুলিতে কখনো কখনো ঐতিহাসিক ঘটনার স্পর্শ থাকিলেও ইহারা যে মূলত আদিম কল্পনা হইতেই জাত, তাহা সতর্ক পাঠকের দৃষ্টি এড়াইতে পারে না। 'কিস্সা সাহিত্য'গুলির অপর বৈশিষ্ট্য—প্রায় সর্বক্ষেত্রেই এইগুলি অনুবাদ অথবা অনুকরণ মাত্র। বাঙলা ভাষায় স্বাধীন মৌলিক কিস্সা সাহিত্য রচনা-প্রচেষ্টা প্রায় দেখা যায় না বলিয়াই মনে হয়। লোকসাহিত্যের অপর শাখা 'পল্লীগীতিকা'।

কিস্সা সাহিত্য

এই সব সাহিত্যকৃতির স্রষ্টা যেমন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অশিক্ষিত অথবা অর্ধশিক্ষিত পল্লী কবি, তেমনি কাহিনীও লোকজীবন হইতেই উদ্ভূত। দুর্ভাগ্যক্রমে সমগ্র বাঙলাদেশে ও প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে যে অসংখ্য পল্লীগীতিকার সৃষ্টি হইয়াছিল, যথাকালে সংগ্রহের অভাবে ইহাদের অধিকাংশই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। লোকসাহিত্যের তৃতীয় শাখার উৎপত্তি অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে—ইহাদিগকে 'লোকসঙ্গীত' নামে আখ্যায়িত করা চলে। যদি বা প্রাচীনতর কালে ইহাদের সৃষ্টি হইয়া থাকে, আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তেমন নিদর্শনগুলি হয়তো সংগ্রহের অভাবেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আমরা এই তিনটি শাখাকেই আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করিলেও ইহাদের বাহিরে লোকসাহিত্যের বিস্তার অনেকখানি। প্রসঙ্গক্রমে রূপকথা, ছেলে-ভুলানো ছড়া, পাঁচালী, ব্রতকথা-আদির কথা উল্লেখ করা চলে। এইগুলি নিঃসন্দেহে লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যেও বলা হইয়াছে, 'under this rather loose heading are to be included those traditional legends. tales, ballads, songs, proverbs, riddles and plays......' কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকালেই রূপকথা, ছড়া-আদি বিভিন্ন জাতীয় লোকসাহিত্যের সৃষ্টি হইলেও ইহাদের কোন প্রাচীন লিখিত রূপ পাওয়া না

পল্লীগীতিকা

লোকসঙ্গীত

লুপ্ত সাহিত্য

যাওয়ায় ইহাদিগকে আমাদের আলোচনার বাহিরে রাখিতে হইল। কোন কোন ছড়ায় অবশ্য প্রাচীনতর রূপটি অনেকটা অবিকৃত আছে; কিন্তু ইহাদের সংখ্যা এত স্বল্প যে ইহাদের লইয়া আলোচনা অপূর্ণই থাকিয়া যাইবে।

১০ ॥ মুসলমানী সাহিত্য

মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা গৌড় দরবারের কথা উল্লেখ করিয়াছি। বাঙালী কবি ও বাঙলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় গৌড় দরবারের সহায়তার কথা আমরা যেমন কৃতজ্ঞতা-সহকারে স্বীকার করিয়াছি, অনুরূপ কৃতজ্ঞতা-সহকারেই আমাদিগকে রোসাঙ্ তথা আরাকান রাজসভার কথা উল্লেখ করিতে হইবে। বস্তুত 'মুসলমানী সাহিত্য' তথা 'কিস্‌সা সাহিত্যে'র আলোচনা-প্রসঙ্গে রোসাঙ্-রাজ-দরবারের উল্লেখ অপরিহার্য। আরাকান অঞ্চল বর্তমানে ব্রহ্মদেশের অন্তর্ভুক্ত হইলেও এক সময় তাহা বাঙলাদেশেরই অন্তর্বর্তী ছিল। সমসময়ে যে তথায় বাঙালী শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং সভ্যতা বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আরাকান ব্রহ্মদেশের অন্তর্ভুক্ত হইলেও এখনও পর্যন্ত নানাদিক দিয়া তাহাদের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। অঞ্চলটি চট্টগ্রামের সন্নিহিত-বিধায় উভয় অঞ্চলের শিক্ষাদীক্ষা এবং ভাষায় এখনও পারস্পরিক প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। আরাকানের অধিবাসীদের সাধারণত 'মগ' বলিয়া উল্লেখ করা হয়। বাঙলাদেশে অবশ্য 'মগ' শব্দটির নানাপ্রকার তাৎপর্য দাঁড়াইয়া যাওয়ায় ইহাদের সম্বন্ধে আমাদের মনোভাব খুব শ্রদ্ধেয় নহে। যাহা হউক, এখানকার আদিম অধিবাসীরা নিষাদ ও কিরাত জাতির সংমিশ্রণে জাত হইলেও এককালে এখানে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। এই স্থানের অধিবাসীরাও এক সময় অধিক পরিমাণেই বৌদ্ধধর্মও গ্রহণ করিয়াছিল। লক্ষ্য করিবার বিষয়, বাঙলাদেশে মুসলমানদের আগমনের পূর্বেই এই অঞ্চল মুসলমানদের দ্বারা অধ্যুষিত হইয়াছিল। ফলত, স্থানীয় শিক্ষা-সভ্যতার উপর মুসলমানী প্রভাবও নগণ্য ছিল না। আরাকানের বৌদ্ধ নৃপতিদের অনেকেই মুসলমানী উপাধিও ব্যবহার করিতেন। এই আরাকানের অধিবাসীরা নিজেদের 'রখইঙ' নামে অভিহিত করে এবং তাহা হইতেই

রোসাঙ রাজসভা

'রোসাঙ' কথাটির উৎপত্তি হইয়াছে। বাঙলাদেশে মুঘল-পাঠানের সংঘর্ষের ফলে বহু সম্ভ্রান্ত মুসলমানও রোসাঙের রাজ-দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইভাবেই দেখা যায়, কালক্রমে রোসাঙে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম ধর্মের এবং বর্মী ও বাঙালী জাতির সংমিশ্রণে এক বিশিষ্ট সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই রোসাঙ রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙলাদেশে মধ্যযুগে এক বিশিষ্ট সাহিত্যসম্পদ সৃষ্ট হইয়াছিল,—এই সাহিত্য লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত মানবিক ভাবযুক্ত রোমান্স সাহিত্য।

রোসাঙ রাজদরবারে যে সকল কবি বিভিন্ন কাব্য সৃষ্টি করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, লক্ষ্য করিবার বিষয়, তাহারা সকলেই মুসলমান। এই কারণেই লোকসাহিত্যের এই বিশেষ ধারাটিকে 'মুসলমানী সাহিত্য' বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই প্রসঙ্গে আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, রোসাঙ দরবারে মৌলিক সাহিত্য বলিতে প্রায় কিছুই সৃষ্ট হয় নাই; যাহা কিছু সৃষ্ট হইয়াছে, সবই অনুবাদ—কোথাও মূলানুগ, কোথাও বা ভাবানুগ। গ্রন্থকারদের অনেকেই ফার্সী সাহিত্যের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ হিন্দী সাহিত্য হইতেও তাহাদের কাব্যের উপজীব্য আহরণ করিয়াছেন। অতএব লোকসাহিত্যের অন্যতম শাখা 'মুসলমানী সাহিত্য' বা 'কিস্‌সা সাহিত্য' যে একান্তভাবেই অভারতীয় প্রেরণায় জাত, তাহা বলিবার উপায় নাই। ড° সুকুমার সেন এই বিষয়ে যথার্থই মন্তব্য করিয়াছেন যে এই ধারার সাহিত্যস্রষ্টা মুসলমান কবিরা ছিলেন 'ফারসী সাহিত্যের মধুকর এবং ভারতীয় সাহিত্যের রসসন্ধানী।' বস্তুত মুসলমান কবিদের অনেকেই ছিলেন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে সবিশেষ ব্যুৎপন্ন এবং ভারতীয় পুরাণসমূহের সহিতও ইঁহাদের অনেকের পরিচয় ছিল ঘনিষ্ঠ। তাই এই সকল মুসলমানী সাহিত্যে সংস্কৃত সাহিত্যের এবং হিন্দু পুরাণের প্রভাব বড় কম পড়ে নাই। এমন কি চৈতন্যোত্তর যুগে রচিত সাহিত্যে চৈতন্য-প্রভাবের পরিচয়ও দুর্নিরীক্ষ্য নহে। ফলত, এই ধারার সাহিত্যকে 'মুসলমানী সাহিত্য' নামে অভিহিত করিলেও ইহাদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মীয় ভাবের সমন্বয়-সাধনে তৎপর একটা মিশ্র সংস্কৃতিবোধের পরিচয়ই প্রকট হইয়া উঠে।

মিশ্র সাহিত্য

দৌলত কাজী: রোসাঙ-রাজ থিরি-থু-ধম্মা বা 'বুদ্ধাচারী' রাজা শ্রীসুধর্মার 'লস্কর উজীর' আশরফ খানের আদেশে দৌলত কাজী তাঁহার 'সতী ময়নামতী' বা 'লোরচন্দ্রানী' নামক কাব্য রচনা করেন। শ্রীসুধর্মার

রাজত্বকাল ১৬২২ খ্রীঃ—১৬৩৮ খ্রীঃ, অতএব কবি দৌলৎ কাজী এই কালেই বর্তমান ছিলেন অনুমান করা যায়। কবি গ্রন্থোৎপত্তির কারণ বর্ণনা-প্রসঙ্গে জানাইয়াছেন যে পণ্ডিতপ্রধান শ্রীযুক্ত আশরফ খানের সভায় নানা কাব্য পঠিত হইত। তথায় ঠেট হিন্দীতে সদন-রচিত সতী-কাহিনী শুনিয়া আশরফ খান কবিকে দেশী ভাষায় তাহা আবার রচনা করিতে অনুরোধ করিলেন :

> 'ঠেঠা ছোপাইয়া দোহা কহিলা সদনে।
> না বুঝে গোহারী ভাষা কোন কোন জনে॥
> দেশী ভাষে কহ তাকে পাঞ্চালীর ছন্দে।
> সকলে শুনিয়া যেন বুঝয়ে সানন্দে॥
> তবে কাজী দৌলতে সে বুঝিয়া আরতি।
> পাঞ্চালীর ছন্দে কহে ময়নার ভারতী॥

সেনাপতির আদেশে দৌলত কাজী সদন কবি-রচিত হিন্দী 'মৈনা সত' কাব্যের বাঙলা অনুবাদ রচনা করেন।

'সতীময়নামতী' বা 'লোরচন্দ্রানী' কাব্য তিনখণ্ডে বিভক্ত। কিন্তু কবির আকস্মিক মৃত্যুতে গ্রন্থখানি খণ্ডিত অবস্থায় ছিল। তিনি দ্বিতীয় খণ্ডে সতীময়নামতীর বারমাস্যার এগার মাসের কাহিনী বর্ণনার পরই দেহত্যাগ করেন। অতঃপর দ্বিতীয় খণ্ডের অবশিষ্ট অংশ এবং তৃতীয় খণ্ড রচনা করেন কবি আলাওল।

লোররাজার ময়নামতী নামক এক সুন্দরী রাণী ছিলেন। রাণীর প্রতি রাজার আকর্ষণ কিছুটা কমিয়া গেলে রাজা এক যোগীর নিকট গোহারী-রাজকন্যা অপূর্বসুন্দরী চন্দ্রানীর সন্ধান পাইলেন। চন্দ্রানী ছিলেন বামনবীরের পত্নী। এই সংবাদ শুনিয়া লোররাজা গোহারী গমন করিলেন এবং তথায় সুযোগ সৃষ্টি করিয়া চন্দ্রানীর সহিত মিলিত হইলেন। অতঃপর পলায়ন করিতে চেষ্টা করিলে বামন তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন; কিন্তু লোররাজার হস্তে তিনি পরাজিত ও নিহত হইলেন। এদিকে চন্দ্রানী অকস্মাৎ সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিলে এক ঋষি আসিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া দিলেন। গোহারীর রাজাও সংবাদ পাইয়া আসিয়া পরম সমাদর লোর ও চন্দ্রানীকে আপন রাজ্যে লইয়া গিয়া তাহাদের বিবাহ দিলেন। এইস্থানে প্রথমখণ্ড সমাপ্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে ময়নামতীর বিরহ বর্ণিত হইয়াছে। তাহার অবস্থা দেখিয়া প্রতিবেশী

কাহিনী

রাজার পুত্র ছাতন এক দূতীর সহায়তায় ময়নামতীকে হস্তগত করিতে সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু ময়নামতী আপন সতীধর্মে দৃঢ় থাকিয়া ছাতনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। তৃতীয় খণ্ডে সতী ময়নামতী এক ব্রাহ্মণের হাত দিয়া লোররাজার নিকট এক শুকপক্ষী পাঠাইলেন। ব্রাহ্মণই কৌশলে লোররাজার মনে পূর্বস্মৃতি জাগাইয়া তুলিলে লোর চন্দ্রানীসহ আপন রাজ্যে ময়নামতীর নিকট প্রত্যাবর্তন করিলেন।

দৌলতকাজী লৌকিক সাহিত্যের প্রথম কবি বলিয়াই নহে, প্রাচীনতম এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুসলমান কবি বলিয়াই অভিহিত হইবার যোগ্যতা রাখেন। ইস্‌লামধর্ম ও সুফীসাধনা-বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান ছিল যথেষ্ট; কালিদাস, জয়দেব এবং বিদ্যাপতির রচনার সহিতও তাঁহার পরিচয় ছিল প্রচুর; এমন কি হিন্দুর বেদ-পুরাণেও যে তিনি কৃতবিদ্য ছিলেন, তাঁহার কাব্যেই ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এই পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি প্রশংসার্হ হইলেও মুসলমান কবিদের মধ্যেও তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর পণ্ডিতজনের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। দৌলত কাজীর কৃতিত্ব পাণ্ডিত্যের সঙ্গে কবিত্বশক্তির সংমিশ্রণে। ডঃ সুকুমার সেন বলেন: 'দৌলত কাজীর কবিত্ব বিশেষ উপভোগ্য। মুসলমান কবিদের মধ্যে তিনি যে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দাবী করিতে পারেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কি বাঙ্গলা কি ব্রজবুলি উভয়বিধ রচনাতেই তিনি সমান দক্ষতা দেখাইয়াছেন।' অপর একজন সমালোচক দৌলতকাজীর কাব্য বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে কবির কৃতিত্বের কথা নিম্নোক্ত ক্রমে প্রকাশ করিয়াছেন: 'দৌলতকাজির রচনার এই স্বতো-বিকশিত সারল্য ও অনায়াস-সরসতা তাঁর কাব্যকে লোকজীবনের সার্থক রোম্যান্টিক প্রণয়গাথার শিল্পমূল্য দান করেছে। লক্ষ্য করা উচিত, কাব্য-কাহিনীর মধ্যে লোকজীবন-সম্ভব অসামাজিক প্রণয়-সৌন্দর্য শ্রেষ্ঠ আসন-লাভে সমর্থ হয়নি। 'লোর চন্দ্রানী'র যৌথ প্রণয় মাধুর্যের চেয়েও সতী ময়নামতী একা উজ্জ্বলতর বর্ণে চিত্রিত হয়েছেন দৌলতের কাব্যে। দৌলতকাজির বিশ্বাসী কবি-কল্পনা রোমান্টিক প্রণয়সৌন্দর্যকে ত্যাগ-তিতিক্ষাপূর্ণ বেদনার রঙে অনুরঞ্জিত করেছে; যৌবন-প্রেম সাধনার মহিমা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।' আলাওল 'লোরচন্দ্রানী'র যে অংশ রচনা করিয়াছিলেন কাব্যধর্মে তাহা দৌলতকাজী-রচিত অংশ অপেক্ষা হীন। দৌলতকাজী যদিও অনুবাদ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তৎসত্ত্বেও তাঁহার মৌলিক প্রতিভাকে অস্বীকার করা যায়না।

কাব্য বিচার

কারণ, কাজী বহুস্থলেই সদন-রচিত কাব্যের বহির্ভূত অনেক অংশ স্বয়ং রচনা করিয়াছেন।

আলাওল ঃ রোসাঙ রাজসভায় যে সকল কবি বর্তমান ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অন্তত জনপ্রিয়তায় আলাওল ছিলেন শ্রেষ্ঠ। আলাওল তাঁহার কাব্যে বিস্তৃতভাবে আত্মপরিচয় দান করিয়া গিয়াছেন। মুল্লুক ফতেহাবাদের অন্তর্ভুক্ত জামালপুর গ্রামে কবি জন্মগ্রহণ করেন। আলাওলের পিতা ছিলেন মজলিস কুতুবের অমাত্য। পিতাপুত্র স্থানান্তর যাইবার কালে জলদস্যুর হস্তে পড়েন এবং আলাওলের পিতা মৃত্যুবরণ করেন। আলাওল কোনক্রমে রোসাঙে উপস্থিত হইলেও সভার সদস্য হইবার সুযোগ পাইলেন না, তিনি অশ্বারোহী সৈন্যদলে ভর্তি হইলেন। কিন্তু অত্যল্পকাল মধ্যেই আলাওলের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি রটিয়া গেলে তিনি রোসাঙরাজ 'সাদ উমদার' বা থদো মিন্তার মুখ্য অমাত্য মহাজন মাগনঠাকুরের সৌহার্দ্যলাভ করিলেন। কবির পৃষ্ঠপোষক মাগনঠাকুরেব অনুরোধে কবি 'পদ্মাবতী' কাব্য রচনা করেন। থদো মিন্তার রাজত্বকাল ১৬৪৫খ্রীঃ—১৬৫২খ্রীঃ। অতএব ইহারই মধ্যবর্তী কোন সময়ে কবি আলাওল রোসাঙ-রাজদরবারে আশ্রয়লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। অতঃপর আলাওল তাঁহার দ্বিতীয় কাব্য 'সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জমাল' রচনা আরম্ভ করেন। ইতোমধ্যে কবির আশ্রয়দাতা মাগনঠাকুর পরলোক গমন করেন। তখন রোসাঙের রাজা ছিলেন 'থিরি সান্দ থুধম্মা' বা শ্রীচন্দ্র সুধর্মা। বাদশাহ শাজাহানের পুত্র শাহ্ সুজা এই সময় ঔরংজীবের ভয়ে রোসাঙ-রাজসভায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। কবির সহিত শাহ্ সুজার সৌহার্দ্য স্থাপিত হয়। শাহ্ সুজা রাজকোপে পড়িয়া বিড়ম্বিত হইলে অপরের প্ররোচনায় কবি আলাওলও কিছুদিনের জন্য বন্দীজীবন যাপন করেন। যাহা হউক, মুক্তিলাভ করিবার পরও তিনি কিছুদিন নানাপ্রকার দুর্ভোগ ভোগ করিয়া অবশেষে রোসাঙের কাজি সৈয়দ মসুদশাহের অনুগ্রহ লাভ করিয়া কাদেরী মতে দীক্ষিত হইলেন। সৈয়দ মসুদের নির্দেশেই তিনি অসমাপ্ত 'সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জমাল' কাব্য সম্পূর্ণ করেন। আলাওলের পাণ্ডিত্যের কথা শুনিয়া রোসাঙ-রাজ শ্রীচন্দ্র সুধর্মা তাঁহাকে 'সেকেন্দারনামা' অনুবাদ করিতে আদেশ করিলেন।

পরিচয়

'আরবী ফারসী পোস্ত নছরানী ইহুদী।
পহলবি সঙ্গে পঞ্চ ভাষ রত্নাবধি॥'

নেজামী-রচিত 'দারা সেকেন্দার নামা' গ্রন্থে এই পঞ্চভাষার ব্যবহার আছে—আলাওল পিতৃতুল্য 'অন্নদাতা ভয়ত্রাতা' রাজার আদেশে উক্ত গ্রন্থের ফারসী 'বয়েত' ভাঙ্গিয়া পয়ার ছন্দে গ্রন্থ রচনা করিলেন। আলাওলের অপর কাব্য 'সপ্ত পয়কর' বা 'হপ্ত পয়কর' শ্রীচন্দ্র সুধর্মার সেনাপতি সৈয়দ মুহম্মদের আদেশে রচিত। মূল গ্রন্থটি নেজামী-কর্তৃক ফারসী ভাষায় রচিত হইয়াছিল। আলাওলের আর একটি গ্রন্থ 'তয়ফা' বা 'তোহ্‌ফা'। য়ুসুফ গদা-কর্তৃক ফারসী ভাষায় রচিত গ্রন্থ-অবলম্বনে আলাওলের এই গ্রন্থ রচিত হয়। ১০৭৩ হিজরী বা ১৬৬৩-১৬৬৪ খ্রীঃ গ্রন্থসমাপ্তিকাল বলিয়া কবি স্বয়ং উল্লেখ করিয়াছেন। রোসাঙ-রাজের মহাপাত্র সুলেমান এই গ্রন্থটি রচনার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। ইহাছাড়া আলাওল যে দৌলতকাজীর রচনা 'লোর চন্দ্রানী' গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। আলাওল বলিয়াছেন যে তিনি বহু গ্রন্থই রচনা করিয়াছেন। পূর্বে যে সকল গ্রন্থের কথা বলা হইয়াছে, তাহা ছাড়াও তাঁহার পক্ষে আরও বহু গ্রন্থই রচনা করা সম্ভব—অনেকেই এইরূপ অনুমান করিয়া থাকেন। মুন্সী আব্দুল গফুর সিদ্দিকী আলাওল-রচিত 'য়ুসুফ জোলায়খা, লায়লা মজনু, শিরিঁখোসরো-নামা এবং আজিজকুমার-রসবতী' কাব্যের সন্ধান পাইয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুত সমগ্র প্রাচীন ও মধ্যযুগে কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী-ব্যতীত অপর কোন কবিই বোধহয় এত অধিক গ্রন্থ রচনা করেন নাই। এই সকল ব্যতীতও আলাওল অনেকগুলি বৈষ্ণবপদ রচনা করিয়াছিলেন।

বিভিন্ন গ্রন্থ

আলাওলের জন্মকাল এবং গ্রন্থ রচনাকাল-সম্বন্ধে সমালোচকগণ একমত হইতে পারেন নাই। ডঃ শহীদুল্লাহ্‌ সাহেবের মতে কবির জন্মকাল ১৫৯২ খ্রীঃ এবং তিনি যথাক্রমে পদ্মাবতী, সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জমাল, সতী ময়নামতীর উত্তরাংশ, হপ্তপয়কর, তোহ্‌ফা ও সেকেন্দার-নামা রচনা করেন। কিন্তু ডঃ সুকুমার সেন এবং অন্যান্য সুধী ঐতিহাসিকদের অনেকেই এই কালক্রম-বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন।

কবির শ্রেষ্ঠ রচনা 'পদ্মাবতী'। মালেক মুহম্মদ জায়সীর হিন্দী ভাষায় রচিত 'পদুমাবতী' নামক কাব্যের অনুবাদ-রূপে গ্রন্থটি রচিত হইয়াছে বলিয়া সাধারণত উক্ত হইলেও ইহাকে অনুবাদ কাব্য বলা সঙ্গত নহে। আসলে এতদুভয়ের মধ্যে কাহিনীগত কিছুটা সাদৃশ্য থাকিলেও কাব্যাদর্শে, রূপ-কল্পনায় এবং কোন কোন কাহিনীতেও বৈসাদৃশ্যের পরিমাণ বড় কম নহে।

জ্ঞানী সাধক মালেক মুহম্মদ জায়সী তাত্ত্বিক আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই 'পদ্মাবতী' রূপক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে তাঁহার কাব্যোক্ত চিতোর রাজ্য মানবমন, রাজা রত্নসেন জীবাত্মা, রাণী পদ্মাবতী বিবেক এবং শুকপক্ষী ধর্মগুরু। পক্ষান্তরে আলাওলের কাব্যে এই আধ্যাত্মিক ভাবনার একান্ত অভাব। তিনি প্রেম কাব্যরূপেই গ্রন্থটি রচনা করিয়াছেন। কাহিনীর দিক হইতেও উভয়ের পার্থক্য লক্ষ্য করিবার মত। মূল গ্রন্থটি বিয়োগান্তক এবং তাহাতে সম্রাট আলাউদ্দিনকে বিজয়ী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আলাওলের গ্রন্থ অনেকটা মিলনান্তক এবং ইহাতে আলাউদ্দিন পরাজয় বরণ করিয়াছেন। রসের দিক হইতে বিচার করিলেও দেখা যাইবে যে আলাওল কাব্যটিকে অনেকটা বৈষ্ণব কাব্যের রসে সিক্ত করিয়াছেন। এইগুলি ছাড়াও কাব্যের খুঁটিনাটি অনেক বিষয়েই উভয় কাব্যের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। জায়সীর কাব্যে নাই, তেমন বহুতর বিষয়ও আলাওল আপন কাব্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।—এই সমস্ত কারণেই আলাওলের কাব্যকে অনুবাদ গ্রন্থ না বলিয়া স্বাধীন মৌলিক গ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করাই সঙ্গত হইবে।

কাহিনী

'পদ্মাবতী' গ্রন্থের কাহিনীটি দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে চিতোররাজ রত্নসেনের সিংহল-রাজকন্যা পদ্মাবতীকে বিবাহ ও চিতোর-প্রত্যাবর্তন-কাহিনী, দ্বিতীয় অংশে সম্রাট আলাউদ্দিন-কর্তৃক পদ্মাবতী-লাভ প্রত্যাশায় চিতোর-আক্রমণ, যুদ্ধ, আলাউদ্দিনের পরাজয় এবং রত্নসেনের মৃত্যু ও পদ্মাবতীর সহমরণ-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম অংশ অপেক্ষা দ্বিতীয় অংশে কাহিনীর জটিলতা অনেক বেশি। কিন্তু তাহা হইলেও প্রথমোক্ত প্রেম-কাহিনীটিই আলাওলের প্রতিভা-বিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। কারণ এই অংশে আলাওলের কবিত্বশক্তি যেমন স্বচ্ছন্দে ও সহজ গতিতে প্রবাহিত হইয়াছে, পরবর্তী অংশের ঐতিহাসিক কাহিনী-বর্ণনায় তাহা হয় নাই। আলাওল যেমন ধর্মীয় কাব্য রচনা করেন নাই, তেমনি ইতিহাসও রচনা করেন নাই,—তিনি রচনা করিয়াছেন কাব্য, যাহার প্রধান উপজীব্য প্রেম। কবি আলাওল খাঁটি কবি ছিলেন বলিয়াই তাঁহার হৃদয়ানুভূতির ক্ষেত্র ছিল যেমন প্রসারিত, তেমনি গভীর। একটি প্রসঙ্গের আলোচনাতেই ইহার স্বরূপ উপলব্ধি করা যাইবে। মূল 'পদ্মাবতী' কাব্যে মুসলমান-সম্রাট আলাউদ্দিনের জয় প্রদর্শন করা হইয়াছে, কিন্তু আলাওলের কাব্যে আলাউদ্দিনের ঘটিয়াছে পরাজয়। কবি সত্যকার কবি

বলিয়াই সাম্প্রদায়িকতার নিকট নতি স্বীকার করেন নাই। তিনি বৃহত্তর ও মহত্তর মানবধর্মের অনুশাসনে চালিত হইয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীভট্টাচার্যের মতে, 'আলাওল ছিলেন সৌন্দর্যগত-প্রাণ সত্যকার কবি ; তাঁহার ধারণা ছিল—বিশ্বজগতে, অন্ততপক্ষে কাব্যজগতে ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয়ই চিরন্তন সত্য। কোনো রূপ সঙ্কীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা, স্বজাতিপ্রীতি তাঁহার এ বিশ্বাস টলাইতে পারে নাই। যে সুলতান অধার্মিক, পরপত্নীলুব্ধ, খামখেয়ালী ইতিহাস তাহাকে বিজয়ী বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে, কিন্তু সঙ্গতিপূর্ণ কবি-কল্পনার জগতে তিনি পরাজিত হইতে বাধ্য।' আলাওল ছিলেন সুফী-সাধক, এই দিক হইতে বাঙালী বৈষ্ণব কবিদিগের সহিত তাঁহার ভাবগত মিল থাকিবার কথা। বস্তুত তাঁহার 'পদ্মাবতী' কাব্যে কবির বৈষ্ণব-সমপ্রাণতারই পরিচয় পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৌন্দর্যের চিত্র-রচনায় আলাওলের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। জনৈক ঐতিহাসিক আলাওলের পদ্মাবতীকে বাঙলা সাহিত্যের প্রথম ঐতিহাসিক রোম্যান্সের মর্যাদা দান করিয়া বলিয়াছেন, 'বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে সম্ভবতঃ ইহাই প্রথম সত্যকার ব্যক্তি-সাহিত্য।...এই কাব্যের সূচনায় যেমন কবির ব্যক্তি-জীবনকে, তেমনি কাব্যের মধ্যে কবি-মানসকে সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়।...ইহাতে ইতিহাসাংশ থাকিলেও ইহা যথার্থ কাব্য এবং রঘুবংশ, কাদম্বরী প্রভৃতি ক্লাসিক্যাল কাব্যের সমশ্রেণীতে স্থান পাইবার যোগ্য। সপ্তদশ শতকে রচিত হইলেও ইহা উদার ও সর্বজনীন, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের চিহ্নমাত্র ইহাতে নাই।'

কাব্য-বিচার

আলাওল-রচিত অন্যান্য গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাদের সবগুলিই ফারসী ভাষা হইতে অনূদিত এবং 'তোহ্‌ফা' ছাড়া অন্য গ্রন্থগুলি অনেকটা রোম্যান্টিক-ধর্মী কাব্য। 'তোহ্‌ফা' ধর্মতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। পদ্মাবতীর তুলনায় আলাওলের অপরাপর গ্রন্থ সর্বপ্রকারেই অনেকটা হীন। হইতে পারে, কবির বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কল্পনাশক্তি এবং প্রতিভারও ন্যূনতা ঘটিয়াছিল।

অন্যান্য কবি ঃ রোসাঙ রাজদরবারে মুসলমান কবিদের যে কাব্য-সাধনা সুরু হইয়াছিল, তাহা এই দরবারেই সীমাবদ্ধ ছিল না। পরবর্তীকালে নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহেও মুসলমান কবিরা কাব্য সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে পূর্ববঙ্গ তথা চট্টগ্রাম এবং ত্রিপুরা-অঞ্চলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই মুসলমান কবিদের প্রায় সকলেই অনুবাদ সাহিত্য

রচনা করিয়াছেন ; একই গ্রন্থও আবার অনেকেই অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু বিষয়বস্তুর দিক হইতে তাহারা সন্তর্পণে দেবতা ও ধর্মকে এড়াইয়া গিয়াছেন। প্রধানত তাঁহাদের কাব্যে মানুষের কাহিনীই বর্ণিত হইয়াছে, অবশ্য কখনো কখনো সেই কাহিনী রূপকথার ধার ঘেঁষিয়াই গিয়াছে।

কোরেশী মাগন ঠাকুর-রচিত 'চন্দ্রাবতী' নামক একখানি কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়—আরব্য উপন্যাস হইতে ইহার কাহিনী গৃহীত হইয়াছে। অনেকেই অনুমান করেন রোসাঙের অমাত্য এবং আলাওলের আশ্রয়দাতা মাগন ঠাকুরই কোরেশী মাগন ঠাকুর। ইহার অতিরিক্ত কবির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। মাগন ঠাকুর জাতিতে মুসলমান ছিলেন কি বৌদ্ধ ছিলেন, তাহারও নিষ্পত্তি হয় নাই।

মাগন ঠাকুর

চট্টগ্রাম পরাগলপুরের অধিবাসী সৈয়দ সুলতান নামক একজন কবি 'শবে মেরাজ', 'জ্ঞানপ্রদীপ' এবং 'নবীবংশ' নামে তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেন। কবি-প্রদত্ত তারিখ হইতে অনুমান করা চলে যে তিনি সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি-কালে বর্তমান ছিলেন। কবি তাঁহার কাব্যসমূহে ইসলামধর্মীয় তত্ত্বোপদেশ ও কাহিনী পরিবেষণ করিযাছেন। শবেমেরাজ এবং নবীবংশে মুসলমানী পৌরাণিক কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। উদার-হৃদয় কবি নবীদের তালিকা করিতে গিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এবং কৃষ্ণকেও স্থান দান করিয়াছেন। সৈযদ সুলতানের রচনায় আধ্যাত্মিকতার পরিচয় বর্তমান। তাঁহার কোন কোন রচনা চর্যাপদের মত সাঙ্কেতিক ভাষায় রচিত। তিনি কয়েকটি বৈষ্ণবপদও রচনা করিয়াছিলেন।

সৈয়দ সুলতান

চট্টগ্রামের মহম্মদ খান 'মুক্তাল হোসেন' নামক যে কাব্যটি রচনা করেন, তাহা আরবী ভাষায় রচিত একটি কারবালা-কাহিনীর অনুবাদ। কবি ইহাতে কারবালা কাহিনী ছাড়াও আপন অঞ্চলের কিছু কিছু পরিচয় দান করিয়াছেন। কবি মহম্মদ খান এই গ্রন্থটি ছাড়াও 'কাসিমের লডাই', 'হানিফার পত্রপাঠ', 'কেয়ামত-নামা' নামে কযখানা কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কবি তাঁহার কাব্যে পিতৃবংশ ও মাতৃবংশের যে বিস্তৃত পরিচয় দান করিয়াছেন, এইরূপ পরিচয় অপর কোনও কবির কাব্যে পাওযা যায় না। বাঙলা ভাষায় এবং হিন্দু-পুরাণেও যে কবির বেশ অধিকার ছিল, রচনায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

মহম্মদ খান

আব্দুল নবী সপ্তদশ শতাব্দীতে ফারসী 'আমীর হামজা'র বাঙলা অনুবাদ রচনা করেন। ফারসী ভাষায় রচিত মূল কাব্যটি অনেক বাঙালীই বুঝিতে পারে না, এই জন্যই তিনি তাহা দেশী ভাষায় রচনা করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু কবির মনে ভয় রহিয়াছে—

আব্দুল নবী

মুছলমানি কথা দেখী মনেহ ডরাই।
রচিলে বাঙ্গালা ভাসে কোপে কি গোঁসাই ॥
লোক উপকারহেতু তেজি সেই ভএ।
দরবারে রচিবারে ইচ্ছিলুম হৃদএ ॥

'আমীর হামজা' আশি পর্বে বিভক্ত এক বিরাট কাব্য। কবি যে মূলের শুধু অনুবাদ রচনা করিয়াছেন, তাহা নহে, বহুস্থলে তিনি স্বাধীনতাও গ্রহণ করিয়াছেন।

আকবর

সৈয়দ মুহম্মদ আকবর 'জেবলমুলুক-শামারোখ' নামক একটি অনুবাদ কাব্য রচনা করেন। ইহাতে জেবলমুলুক ও শামারোখের প্রণয়-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। অসাম্প্রদায়িক কবি গ্রন্থারম্ভে ফিরিস্তাকে নারদ, হজরত রসুলকে চৈতন্য ইত্যাদি-রূপে বন্দনা করিয়াছেন। কবির কাব্যে আলাওলের প্রভাব বর্তমান।

শগীর

শাহ্ মহম্মদ শগীর 'য়ুসুফ জোলেখা' নামক একখানি প্রণয়মূলক কাব্য রচনা করেন। কবির অপর কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। মোহাম্মদ রাজা, সেরবাজ, আব্দুল হালীম, আব্দুল হাকীম প্রভৃতি আরও অনেক কবিই বিভিন্ন মুসলমানী সাহিত্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কবিদের অক্ষমতার পরিচয় সুপরিস্ফুট।

পরবর্তী শতাব্দীতেও মুসলমানী সাহিত্যের ধারা অব্যাহত ছিল। লক্ষ্য করিবার বিষয়, এইবার কিছু কিছু হিন্দুও এইরূপ প্রণয়মূলক মুসলমানী সাহিত্য-রচনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। আবার সাধনাক্ষেত্রও পূর্ববঙ্গ হইতে সর্ববঙ্গে বিস্তার লাভ করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের গরীবুল্লা 'আমীর হামজা' কাব্য রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে গ্রন্থটি অসমাপ্তই ছিল। পরে সৈয়দ হামজা নামক এক কবি গ্রন্থটি সমাপ্ত করেন। 'য়ুসুফ জোলেখা' গরীবুল্লার দ্বিতীয় কাব্য। গরীবুল্লার কাব্যে অসাম্প্রদায়িক মনোভাব সুস্পষ্ট। 'আমীর হামজা'র সমাপ্তিকারক সৈয়দ হামজা 'হাতেম-তাই, মনোহর মধুমালতী, জৈগুনের পুঁথি' এবং আরও কিছু কিছু কাব্য

রচনা করেন। কারবালার কাহিনী-অবলম্বনে বিভিন্ন নামে অনেকেই অনেক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। চট্টগ্রামের কবি নসরুল্লাখান হইতে বীরভূমের রাধাচরণ গোপ পর্যন্ত অনেকেই এই বিষয়ে 'জঙ্গনামা' রচনা করেন।

অন্যান্য কবি

এই বিষয়টি-সম্বন্ধে ডঃ দীনেশ সেন বলিয়াছেন, 'কারবালার যুদ্ধ, এজিদের কথা প্রভৃতি যে সকল বিষয় দূর দেশাগত, তাহা মুসলমান কবিরা বিদেশাগত অতিথির ন্যায় গৃহের বাহিরের একখানা একচালায় স্থান দিয়া তৃপ্ত হন নাই, তাঁহারা এমনভাবে সেই সকল অতিথিকে গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের রূপ বদলাইয়া তাঁহারা বাঙালী হইয়া গিয়াছেন।' লায়লা-মজনুর অনুপম প্রেমকাহিনীও বাঙালী মুসলমান কবিদের সাগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। চট্টগ্রামের দৌলত উজীর-রচিত 'লায়লি-মজনু' একটি সার্থক কাব্য।

অপরাপর যে সকল বিষয়-অবলম্বনে বিভিন্ন কবি লোকসাহিত্য রচনা করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ হইতেই বিষয়-বিস্তৃতির পরিচয় পাওয়া যাইবে। 'আমীর সওদাগর, কাফেন চোরা, নছরমালুম, সুরতজামাল ও আধুয়াসুন্দরী, চৌধুরীর লড়াই, নূরন্নেহা ও কবরের কথা, দেওয়ান ভাবনা' প্রভৃতি বিষয় লইয়া বহু গ্রন্থই রচিত হইয়াছে। অবশ্য ইহাদের অনেকগুলিই অনুবাদ নহে, স্বাধীন রচনা। স্থানীয় প্রেমকাহিনীকে অবলম্বন করিয়া যে সকল সাহিত্য রচিত হইয়াছে, পরবর্তী অধ্যায়ে 'পল্লীগীতিকা'-প্রসঙ্গে তাহাদের পরিচয় দান করা হইবে।

২ ঃ পল্লীগীতিকা

গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-আদি নদ-নদীর পলিমাটিতে গড়া বাঙলাদেশ; মৌশুমীবায়ু ইহার প্রাণ—অতএব অতিশয় সঙ্গত এবং স্বাভাবিক কারণেই এখানে সহজ হৃদয়ধর্মের বিকাশই লক্ষ্য করা যায়। জীবনে যাহাদের কোন জটিল সমস্যা ছিলনা, স্বল্পশ্রমে কিংবা বিনাশ্রমে প্রাপ্ত স্বচ্ছন্দ-বনজাত শাকসব্জীতে যাহাদের উদরপূর্তি হইত, দেশ-অধিকারের জন্য যাহাদিগকে কখনও কঠিন সংগ্রাম করিতে হয় নাই, তাহারা যে স্বভাবতই কবিধর্মে দীক্ষা পাইবে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। অতএব খুবই স্বাভাবিক হইত, যদি সহস্রাধিক বৎসর কাল পূর্বেই আমরা মানবিক আবেদন পূর্ণ গীতিকা-সাহিত্যের সাক্ষাৎ পাইতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, তাই জীবনযাত্রা

একেবারে নির্বাধ ছিলনা। ঘন ঘন রাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তনে অগণিত জনগণের মনে বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি না করিলেও বিদগ্ধ নাগরিকদের বিচলিত হইবার কারণ ছিল। তাহারা আত্মপ্রকাশ অপেক্ষা আত্মরক্ষার কঠিন সংগ্রামে ব্রতী হইয়া বিভিন্ন দেবতার উদ্বোধনে সচেষ্ট হইলেন। হৃদয়ধর্মী গীতিকাসাহিত্যের স্থলে রচিত হইল অসংখ্য মঙ্গলকাব্য এবং তজ্জাতীয় অন্যান্য বস্তুনিষ্ঠ সাহিত্য। কিন্তু একসময় দ্বন্দ্বমুখর জীবনের অবসান ঘটিয়াছিল; ইহা ছাড়া রাষ্ট্রকেন্দ্র হইতে দূরে অবস্থিত বিস্তৃত গ্রামাঞ্চলে প্রায় কখনও রাজনৈতিক আবর্তের সৃষ্টি হয় নাই। বিদগ্ধ নাগরিকদের অগোচরে সুদূর পল্লী অঞ্চলে হয়তো অতি প্রাচীনকালেই সমসাময়িক অথবা ঐতিহ্যাশ্রিত কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া পল্লীর অর্ধশিক্ষিত স্বভাবকবি গাথাকাব্য-রচনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। সম্ভবত কালক্রমে কিছুটা মহাকালের বিক্রমে, কিছুটা মার্জিতরুচি নাগরিকদের উপেক্ষায় ইহাদের অধিকাংশই বিনষ্ট হইয়াছে। কিছুটা হয়তো সময়ের সঙ্গে তাল রাখিয়া পরিবর্তিত আকারে আত্মরক্ষার সুযোগ পাইয়াছে। অনুমান করি, সারা বাঙলাদেশেই বিভিন্ন কালে এইরূপ প্রচুর গাথাকাব্য বা পল্লীগীতিকার উদ্ভব ঘটিয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, তাই দেশের হৃদয় হইতে উদ্ভূত এই সাহিত্য সম্পদগুলিকে রক্ষা করিবার বিশেষ কোন প্রচেষ্টাই কোন কালে দেখা দেয় নাই বলিয়াই দরিদ্র-মনোরথের মতই ইহাদের বিলয় ঘটিয়াছে। ভাগ্যক্রমেই ড০ দীনেশচন্দ্র সেন এই পল্লীগীতিকা-গুলির সংগ্রহে উদ্যোগী হইয়াছিলেন বলিয়া ইহাদের এক ভগ্নাংশমাত্র রক্ষা পাইয়াছে।

পল্লীগীতিকার উদ্ভব

প্রধানত চন্দ্রকুমার দে নামক একজন সংগ্রাহকের সহায়তায় ড০ দীনেশ চন্দ্র সেন পূর্বময়মনসিংহ এবং পূর্ববঙ্গের অন্যান্য স্থান হইতে অনেকগুলি গাথাকাব্য (Ballad) বা পল্লীগীতিকা সংগ্রহ করেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে চারিখণ্ডে প্রকাশ করেন। গীতিকাগুলি প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল হইতেই এই বিষয়ে অভিমত প্রচারিত হইতে থাকে। অভিমতগুলির মধ্যে প্রশংসার ভাগই বেশি, কিছু কিছু দেশীয় সমালোচকই কিছু প্রতিকূল মন্তব্য করিয়াছেন। লর্ড রোনাল্ডসে, স্টেলা ক্রেমরিস, রবীন্দ্রনাথ, আশুতোষ প্রভৃতি পল্লীগীতিকাগুলির অকৃত্রিমতায় মুগ্ধ হইয়াছেন। আবার কাহারও ধারণা—এই পল্লীগীতিকাগুলি আসলে আধুনিক কালেরই সৃষ্টি, অধিকন্তু সংগ্রাহকের কারসাজিতেই এইগুলি এমন

রোম্যান্টিক কাব্যরূপে পরিণতি লাভ করিয়াছে। এই বিষয়ে প্রধান প্রবক্তা ডঃ সুকুমার সেনের অভিমত উদ্ধার করিতেছি: '...পালাগুলিতে স্থানীয় উপভাষার রূপ বজায় রাখিবার চেষ্টাসত্ত্বেও সাধুভাষার এবং কলিকাতা অঞ্চলের কথ্যভাষার প্রভাব বিশেষ লক্ষণীয়। মধ্যে মধ্যে আবার পশ্চিমবঙ্গের উপভাষার (এবং সাধুভাষার) শব্দগুলিকে পূর্ববঙ্গীয় রূপ দিবার চেষ্টা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে এই সন্দেহ হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে পালাগুলি সর্বাংশে অকৃত্রিম নয়।...আসলে পয়ারটি হইতেছে সংগ্রহীতার প্রক্ষেপ। ...মধ্যে মধ্যে স্পষ্টতঃ অন্যান্য রচনা হইতে অথবা মৌলিক দুই চারি ছত্র জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ...এই দুই ছত্রও প্রক্ষিপ্ত, এই নিতান্ত আধুনিক ধরণের রোম্যান্টিক ভারও পূর্বাপর সঙ্গতিবিহীন। ...শুধু এই ছত্র কেন, 'বনে পর্যটন ও বিপদ' এই অংশের বাঁশী বাজানো motifও প্রক্ষিপ্ত। অনেকগুলি পালাতে অন্য গল্পের অংশ যোগ করিয়া অথবা অন্যরূপে কাহিনীকে পরিবর্ধিত ও পবিবর্তিত করিয়া রোম্যান্টিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছে। ...মহুযার আত্মহত্যা কখনোই মূলকাহিনীতে ছিলনা। সন্ন্যাসীর ব্যাপারটি স্বকপোলকল্পিত না হইলে অন্য কাহিনী হইতে গৃহীত হইয়াছে।' এতদরিক্ত ডঃ সেন যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাও ইহার কৃত্রিমতা এবং প্রক্ষেপের কথা। ইহাতে যে দুই একটি ছত্র ভাবে ও ভাষায় উৎকৃষ্ট, তাহাদের সম্বন্ধেও 'বিস্ময়ের হেতু' কিছু নাই বলিয়াই তিনি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে, তিনি সর্বত্রই অন্তর্যামীর মত ইহাদের আভ্যন্তরীন রহস্যভেদ করিযা সিদ্ধান্তটিমাত্র উপস্থাপন করিতেছেন, ক্বচিৎই দৃষ্টান্ত কিংবা যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। যে কথাটি তিনি স্পষ্টত বলেন নাই, অনুমানে বুঝিয়া লইতেছি,—এই গীতিকাগুলির কৃতিত্ব-অকৃতিত্বের দায় যেন সংগ্রাহকের। অথচ সংগ্রাহকেব কাব্যরচনা-ক্ষমতাসম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় কালিদাস রায় মন্তব্য করিয়াছেন, 'চন্দ্রকুমাবকে ঘনিষ্ঠভাবেই জানিতাম—ছন্দোবন্ধে তাঁহার জ্ঞান ছিল। তাঁহার সুরজ্ঞান ছিল, কিন্তু তিনি এতবড় কবি ছিলেন না যে ঐ অপূর্ব গীতিগুলি রচনা করিতে পারিতেন। ·· চন্দ্রকুমারকে মহাকবিত্বের গৌরব ও অসামান্য আত্মোৎসর্গের গৌরব দুইয়ের একটিও দিতে আমরা রাজী নই। যাহা খণ্ডিত, ছন্ন, ছিন্ন, ব্যুৎক্রান্ত ও অঙ্গহীন, তাহাকে পূর্ণাঙ্গ করিয়াছেন চন্দ্রকুমার—এ বিষয়ে সংশয় নাই।' প্রাচীন রচনায় সম্পাদকের হাত কোথায় বা না পড়ে? ডঃ সেন কৃত্তিবাসের রামায়ণ-

কৃত্রিমতা-বিচাব

সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'কৃত্তিবাসের রামায়ণের মধ্যে তাঁহার নাম ছাড়া আর কিছু অংশ অপরিবর্তিত রহিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়না।' অথচ তৎসত্ত্বেও সমস্ত ঐতিহাসিকই তাঁহাকে চৈতন্য-পূর্ব যুগে স্থাপন করিয়া তাঁহার গ্রন্থ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। প্রক্ষেপবাহুল্যের জন্য কৃত্তিবাস বাঙলাসাহিত্য-প্রাঙ্গণ হইতে বহিষ্কৃত হন নাই। পল্লীগীতিকার অপর সংগ্রাহক এবং স্বয়ং পল্লীকবি জসিমুদ্দিন সাহেবও পল্লীগীতিকাগুলির অকৃত্রিমতায় সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি সাত আট বৎসর ময়মনসিংহ জেলায় ঘুরিয়াও 'মাজাঘষা সংস্করণের গীতিকা' পান নাই বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ইহার উত্তর দিয়াছেন বাঙলাভাষাবিদ্ চেক্‌পণ্ডিত দুসান জুবাতিয়েল। তিনিও ময়মনসিংহ জেলার গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া গীতিকা পান নাই, কিন্তু মন্তব্য করিয়াছেন, 'কিন্তু তাতেই কি এই গীতিকাগুলির অনস্তিত্ব প্রমাণিত হয়?' ইনি ড° সুকুমার সেনের অভিমতেরও জবাব দিয়া বলিয়াছেন, '...কিন্তু এজন্য গীতিকাগুলির প্রামাণিকতায় সন্দেহ করায় উচিত কি?' বস্তুত পল্লীগীতিকায় সংগ্রাহক কিংবা সম্পাদকের হস্তক্ষেপের সম্ভাবনাকে স্বীকার করিয়া লইয়াই তাহার সম্বন্ধে সহৃদয় আলোচনা করাই সঙ্গত। গোড়া হইতেই কোন পূর্বসংস্কার বশত বিমুখ মনোভাব লইয়া আলোচনায় ব্রতী হওয়া ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক নহে।

পল্লীগীতিকার রচয়িতাগণ অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষিত ছিলেন বলিয়াই হউক অথবা গীতাকারে বহুল প্রচলিত ছিল বলিয়াই হউক, মনে হয়, এইগুলিকে লিখিয়া রাখিবার গরজ কেহ বোধ করেন নাই। ফলত, কোন গীতিকারই লেখ্যরূপের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। সংগ্রাহকগণ গায়কদের মুখ হইতে এইগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন। পুরুষ-পরম্পরায় যে এই ভাবে মূলগীতিকা কিছুটা পরিবর্তন লাভ করিবে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। অতএব প্রথমেই স্বীকার করিয়া লওয়া উচিত যে পল্লীগীতিকাগুলির কোনটিরই মূলরূপ অক্ষুণ্ণ নাই। অধিকন্তু গীতিকারদের প্রায় সকলেই অখ্যাত ছিলেন বলিয়াই তাহাদের কালনিরূপণ দুঃসাধ্য ব্যাপার। ইহাদের মধ্যে একমাত্র মহিলাকবি চন্দ্রাবতীর সম্বন্ধেই কিছু জানিবার সুযোগ পাওয়া যায়। ইনি ছিলেন মনসামঙ্গল-কাব্যকার দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা। আনুমানিক সপ্তদশ শতকে ইনি বর্তমান ছিলেন, ধরিয়া লওয়া যায়। অপরাপর কবিদের পক্ষে ইহার সমকালীন হওয়াও বিচিত্র নহে। যাহা হউক, ভাষা এবং দৃষ্টিভঙ্গী-আদি আভ্যন্তরীণ লক্ষণ-বিচারে পল্লীগীতিকা-

রচনাকাল

গুলিকে সাধারণ ভাবে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা বলিয়া গ্রহণ করিলেও ইহাদের উপর অবিচার করা হইবে না বলিয়া আশা করি।

ডঃ দীনেশ সেন সংগৃহীত পল্লীগীতিকাগুলিকে 'পূর্ববঙ্গগীতিকা' নামে চারিটি খণ্ডে বিভক্ত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে 'ময়মনসিংহ-গীতিকা' নামক খণ্ডটিই শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিনিধি-স্থানীয়। পল্লীগীতিকার আলোচনা-প্রসঙ্গে সাধারণত 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র কথাই উল্লেখ করা হইয়া থাকে। এই খণ্ডে মোট দশটি গাথা সঙ্কলিত হইয়াছে।—মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, দেওয়ান ভাবনা, কঙ্ক ও লীলা, কেনারাম, রূপবতী, কাজলরেখা, দেওয়ানা মদিনা।

ময়মনসিংহ গীতিকা

'মহুয়া' গাথাটি দ্বিজকানাই নামক একজন নমঃশূদ্রের ব্রাহ্মণ দ্বারা রচিত। সমগ্র 'ময়মনসিংহ গীতিকার' মধ্যে এই কাহিনীটিই যেমন সর্বাধিক প্রচার লাভ করিয়াছে, তেমনি বহির্বিশ্বেও বহু সুধীজনের প্রশংসা অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে। ব্রাহ্মণ জমিদার-পুত্র নদের চাঁদের সহিত বেদের পালিতা কন্যা মহুয়া সুন্দরীর রোমান্টিক প্রণয়-কাহিনী গাথাটির উপজীব্য। কাহিনীটির অসাধারণ নাটকীয়তার জন্যই ইহার সফল মঞ্চাভিনয় এবং চলচ্চিত্রাভিনয় সম্ভবপর হইয়াছে। স্থানীয় লোকদের ধারণা কাহিনীটি বাস্তব। গ্রন্থোক্ত স্থানগুলি এখনও বর্তমান। রচনাটির নাটকীয়তা, ট্রাজিক পরিসমাপ্তি এবং সংলাপের মাধুর্য ইহাকে অপরূপ রমনীয়তা দান করিয়াছে। ইহার উপকাহিনী-বর্জিত ঘনসন্নিবিষ্ট কাহিনী, চমকপ্রদ গতি, চরিত্রের স্বাভাবিকতা এবং বাস্তবতা ইহাকে বিশিষ্ট মর্যাদায় ভূষিত করিয়াছে। বিশিষ্ট মনীষী ষ্টেলা ক্রেমরিস 'মহুয়া' পড়িয়া ডঃ দীনেশ সেনকে লিখিয়াছিলেন, '...আমি ভারতীয় সাহিত্য যতটা পড়িয়াছি, তাহার মধ্যে এমন মর্মস্পর্শী এমন সহজ সুন্দর কোন আখ্যান পড়ি নাই।'

মহুয়া

'মলুয়া' কাব্যটির রচয়িতা কে ছিলেন জানিবার উপায় নাই। কেহ কেহ ইহাকে মহিলাকবি চন্দ্রাবতীর রচনা বলিয়া অনুমান করিলেও ইহা সত্য নহে বলিয়াই মনে হয়। এই গ্রন্থেও যে সকল গ্রামের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের অস্তিত্ব বর্তমান। কুড়া-শিকারী চাঁদ বিনোদ এবং মলুয়ার প্রণয়কাহিনী গাথাটির উপজীব্য। কাজির অত্যাচারে মলুয়া নির্যাতিতা হইলে যখন তাহার আত্মীয় বন্ধুজন তাহাকে ঘরে লইতে অস্বীকার করিল, তখন মলুয়া নৌকা ডুবাইয়া আত্মহত্যা করিল। কাহিনীর এই অতিশয় করুণ বিয়োগান্তক পরিণতি অনেকটা অস্বাভাবিক

মলুয়া

বলিয়া মনে হয়। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "'মলুয়া' গল্পটির মধ্যে রূপকথার লক্ষণ সর্বাপেক্ষা অধিক প্রকট; যে মন-পবনের-নাও-এ চড়িয়া নায়িকা নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়াছে, তাহা রূপকথার অতল সমুদ্রে পাড়ি দিতেই অভ্যস্ত।' স্থানীয় অঞ্চলে গাথাটি 'কুড়া শিকারীর পালা' নামে প্রচলিত।

'চন্দ্রাবতী' গাথাটি নয়ানঘোষ নামক কবির রচিত। কাহিনীটি যে শুধুই বাস্তব তাহা নহে, কাহিনীর নায়িকা বাঙলার প্রথম মহিলাকবি চন্দ্রাবতী। চন্দ্রাবতী দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা। চন্দ্রাবতীর বাল্যপ্রণয়ী জয়চন্দ্র কোন মুসলমান রমণীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে বিবাহ করিলে চন্দ্রা আজীবন কুমারীব্রত গ্রহণ করেন। সম্ভবত এই অবসরেই তিনি 'রামায়ণ' রচনা করিয়াছিলেন। ইহার পর অবশ্য জয়চন্দ্র আবার চন্দ্রাবতীর নিকট ফিরিয়া আসিয়াছিলেন; কিন্তু চন্দ্রাবতী তখন অপর এক ভাবজগতের অধিবাসিনী। জয়চন্দ্রকে উপেক্ষিত হইয়াই ফিরিয়া যাইতে হইযাছিল। 'ময়মনসিংহ গীতিকার' অনেকগুলি গাথাই বিয়োগান্তক,—মৃত্যুতেই ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। কিন্তু চন্দ্রাবতী বাঁচিয়া থাকিয়াও যেভাবে তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন, তাহার ট্যাজেডী তুলনাবিহীন। অধ্যাপক শ্রীভট্টাচার্য বলেন, '…নিরপেক্ষ রস-বিচারে সর্বশ্রেষ্ঠ গীতিকা চন্দ্রাবতী। ইহা কেবল বাংলায় নহে, বিশ্ব-সাহিত্যেরও একটী উৎকৃষ্ট ছোটগল্প—গাঢ় সংবদ্ধ, সূক্ষ্ম ইঙ্গিতপূর্ণ, আদ্যন্ত রিয়্যালিষ্টিক এবং যথার্থভাবে ট্রাজিক। ইহাতে ভাবোচ্ছ্বাসের সর্ববিধ চপলতা নিঃশেষে পরিত্যক্ত হইয়াছে, কবি আর্টের কঠোর শাসনে মর্মভেদী হাহাকারকে স্তব্ধ করিয়া দিয়াছেন, ফলে নায়িকা দেখা দিয়াছে অন্তর্গূঢ় মর্মান্তিক বেদনার মূর্তিমতী প্রতিমারূপে।'

চন্দ্রাবতী

'ময়মনসিংহ গীতিকার' অধিকাংশ গাথাই বাস্তব ঘটনা-অবলম্বনে রচিত হইলেও কোন কোনটী রূপকথার লক্ষণাক্রান্ত। ইহাদের মধ্যে গদ্য ও পদ্যাত্মক 'কাজলরেখা' পুরাপুরি রূপকথা। ইহা শিশুমনের উপযোগী করিয়াই যেন রচিত হইয়াছে। 'রূপবতী' এবং 'কমলা' বাহ্যত বাস্তব কাহিনীরূপে রচিত হইলেও আসলে দুইটিই রূপকথার লক্ষণাক্রান্ত। মহিলাকবি চন্দ্রাবতী-রচিত 'কেনারাম' অনেকটা পৌরাণিক কাহিনীর সাদৃশ্যযুক্ত হইলেও ইহা বাস্তব ঘটনা। চন্দ্রাবতীর পিতা প্রসিদ্ধ মনসামঙ্গল-কাব্য-কার দ্বিজ বংশীদাসের সহিত দস্যু কেনারামের জীবনের ঘনিষ্ঠ যোগ বর্তমান। কেনারাম দস্যুতার সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ করিত।

অন্যান্য গাথা

তারপর বংশীদাসের সংস্পর্শে আসিবার পর কিভাবে তাহার মনোভাব এবং জীবনধারার পরিবর্তন ঘটিল, তাহাই কাহিনীটিতে বর্ণিত হইয়াছে। চারিজন কবির রচিত 'কঙ্ক ও লীলা' কাহিনীটিতে চণ্ডাল-পালিত ব্রাহ্মণ-সন্তান কঙ্ক এবং কঙ্কের আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণ গর্গের কন্যা লীলার প্রণয়কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা চলে যে সম্ভবত এই কঙ্কই বাঙলাভাষার আদি 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের রচয়িতা। 'দেওয়ান-ভাবনা' এবং 'দেওয়ান-মদিনা' উভয় গাথাই বিয়োগান্তক।

গাথাকবিতা বা Ballad-এর যে সকল সাধারণ লক্ষণের কথা বলা হইয়া থাকে, সেই সমস্ত লক্ষণ মিলাইলে হয়তো 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র অন্তর্ভুক্ত গাথাগুলিকে Ballad আখ্যায় ভূষিত করা সঙ্গত হইবে কিনা তাহা বিতর্কের বিষয়। '**Ballad**. A widespread category of traditional poetry, mainly narrative in form, direct, simple and often dramatic in style, and generally composed to be recited or sung. The ballad is popular in the broadest sense; it deals with themes of universal concern and provided entertainment for the whole community.' গাথা-কবিতা কখনও কোন রীতির অনুসরণে কিংবা আলঙ্কারিকের নির্দেশে রচিত হয় না বলিয়াই মনে হয় যে ইহাদিগকে কোন বিধিবদ্ধ সংজ্ঞায় বিশেষিত করা সহজ নহে। যাহা হউক সাধারণ বিবেচনায় ময়মনসিংহ-গীতিকার কাহিনীগুলিই বাঙলাভাষার Ballad বা গাথা কবিতা।

Ballad

পল্লীগীতিকাগুলিকে বিশ্লেষণ করিলে আমরা কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ আবিষ্কার করিতে পারি। বিষয়বস্তুর দিক হইতে ইহাদের অধিকাংশের মধ্যে প্রেমই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই প্রেমও আবার অধিকাংশক্ষেত্রে অসামাজিক। অল্পবিস্তর নাটকীয়তা প্রায় সবগুলি কাহিনীতে বর্তমান। কোনটায় কম, কোনটায় বেশী। এই গাথাগুলি যে প্রধানত গানের জন্যই রচিত হইয়াছিল, তাহার পরিচয় ইহাদের ভিতরেই বর্তমান। প্রায় সব গাথাতেই নারীর প্রাধান্য : প্রাচীন ও মধ্যযুগের অধিকাংশ কাব্যেই এই বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। কবিরা নির্লিপ্তভাবে কাহিনী রচনা করিলেও প্রকৃতির প্রভাবকে তাহারা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। অধিকাংশ গাথায়ই প্রকৃতি যেন সজীব হইয়া উঠিয়াছে। গাথাকাব্যের গীতিপ্রবণতাও আলোচ্য প্রত্যেকটি গাথায় বর্তমান। গাথাগুলিতে সমসাময়িক যুগের যে চিত্র অঙ্কিত

সাধারণ লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য

হইয়াছে তাহাদের যাথার্থ্যে সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই। কবিরা ঔপন্যাসিকের সত্যনিষ্ঠা এবং বাস্তব ধর্মকে পরিপূর্ণ-ভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াই গাথাগুলি রচনা করিয়াছেন। মানবীয় রসের আশ্চর্য উৎসার এই কাব্যগুলির সাহিত্যধর্মও উল্লেখের অপেক্ষা রাখেনা। স্থানে স্থানে ইহাদের ভাষার ও কবিত্বের সৌন্দর্যে অনেক সংশয়ীও তুষ্টি প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুত এই সমস্ত লক্ষণ-বিচারে সমগ্র প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলাসাহিত্যের ইতিহাসে মানবিক ভাবধারা ও জীবনরসে পূর্ণ এই পল্লীগীতিকাগুলির স্থান একক ও অনতিক্রমণীয়। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়: '...এই সমস্ত দিক দিয়াই ময়মনসিংহ গীতিকা উপন্যাস সাহিত্যের উৎপত্তির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কান্বিত। বাঙ্গালাদেশের সাহিত্যের আর কোথাও অবিমিশ্র বাস্তবতার এমন তীক্ষ্ণ, তীব্র আত্মপ্রকাশ দেখা যায় না। আখ্যায়িকাগুলির কোথাও অতিপ্রাকৃতের স্পর্শ বা দেবকীর্তি-প্রচারের প্রয়াস আছে। কিন্তু মোটের উপর যে মনোবৃত্তির প্রাচুর্ভাব, তাহা অকৃত্রিম বাস্তবপ্রীতি; তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ-শক্তি, পরিবেশের ও সমাজ আবেষ্টনের নিখুঁত চিত্রাঙ্কন, ভাব-প্রকাশে কথ্য ভাষার প্রয়োগ ইহাদিগকে উপন্যাসের আরও নিকটবর্তী করিযাছে। পল্লী-সাহিত্যের ধারা যদি আমাদের সাহিত্যে অক্ষুণ্ণ থাকিত, গ্রামের অখ্যাত আবেষ্টন ও অশিক্ষিত গায়কের সংস্পর্শের পরিবর্তে ইহা যদি কেন্দ্রস্থ সাহিত্যের পদমর্যাদা লাভ করিত, ভাবতচন্দ্রেব বিকৃত, কুরুচিপূর্ণ প্রভাব যদি আমাদের সাহিত্যিক প্রচেষ্টাকে কৃত্রিম প্রণালীতে প্রবাহিত না করিত, তবে সম্ভবতঃ বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের জন্মদিনও আরও অগ্রবর্তী হইত। উপন্যাস-সাহিত্যের পূর্ব-সূচনার দিক দিয়াও ময়মনসিংহ গীতিকার প্রয়োজনীয়তা সর্বথা স্বীকার্য।'

৩. ঃ লোক-সঙ্গীত

সম্ভবত সঙ্গীতের মধ্য দিয়াই বাঙালাসাহিত্যের প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটিয়াছিল। চর্যাপদগুলিতে আমরা প্রাচীন বাঙালীর এই সঙ্গীত-চেতনাই লক্ষ্য করিয়া থাকি। অতঃপর এই সঙ্গীত-পরাযণতা দুইটি ধারায় প্রবাহিত হইতে থাকে: একটি পদাবলীশাখা অপরটি লোকসঙ্গীতেব ধারায়। লোক-

উদ্ভব

সঙ্গীতের ধারায় কালে কালে যে সকল গীত রচিত হইয়াছিল, সম্ভবত তাহা মুখে মুখে চলিত বলিয়াই ক্রমে কাল-কবলিত হইয়াছে। বাঙলা সাহিত্যের বিভিন্ন ধারার মধ্যে নাথপন্থীরাই

এই ধরণের সঙ্গীত-গুলিকে পৃথক মর্যাদা দিতেন বলিয়া মনে হয়। তাই দেখি শৈব সিদ্ধাদের কাহিনীতে এবং নাথসাহিত্যে এই জাতীয় কিছু কিছু গান বর্ত্তমান আছে।

যে ধরণের গানগুলিকে লোকসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে বাউল, মুর্শিদী এবং মারফতী গানই প্রধান। বাঙালাদেশে তথা সমগ্র উত্তর ভারতেই এক মরমীয়া সাধক সম্প্রদায় এই ধরণের সঙ্গীতের রচয়িতা। তাহারা কোন প্রচলিত ধর্ম্মে বিশ্বাসী নহে, বিশেষত যে কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানই তাহাদের দুই চোখের বিষ। তাহারা নিজেদের 'সহজিয়া' বা 'সহজপন্থী' বলিয়াই পরিচয় দিয়া থাকেন। এই সাধক সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের লোকই আছেন, কিন্তু কোনপ্রকার সাম্প্রদায়িকতার বন্ধনই তাহারা মানিতে চাহেন না। এই জন্যই তাহারা আপনাদিগকে মুক্ত পুরুষ বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। এই সহজপন্থী অথবা সাধু সম্প্রদায় দেহাত্মবাদী। যোগ-সাধনা-প্রক্রিয়াদি সব কিছুই দেহকে কেন্দ্র করিয়া। তাই দেহের ঊর্ধ্বে অপর শক্তিতে তাহাদের আস্থা নাই। ইহারা গুরুবাদী—তাই ইহাদের বিভিন্ন সম্প্রদায় সাঁই, কর্তাভজা, দরবেশ প্রভৃতি নামে পরিচিত। মনের মানুষই তাহাদের মতে একমাত্র সাধন-যোগ্য। এই মনের মানুষের ধারণা-সম্বন্ধে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলিয়াছেন : 'In the conception of the'Man of the heart'of the Bāuls, we find a happy mixture of the Conception of the Parmātman of the Upaniṣads, the Sahaja of the Sahajiyas, and Sufi-istic conception of the Beloved.' তাঁহার মতে উপনিষদের পরমাত্মা, সহজিয়াদের সহজ এবং সুফীবাদের প্রিয়ানুভূতির মিলনেই বাউল ধর্মের উৎপত্তি।

বাউলদের বৈশিষ্ট্য

বাউলগণ আপনাদিগকে অতি হীনরূপে চিত্রিত করিয়া স্বেচ্ছায় নানা অপনাম গ্রহণ করিয়াছেন। 'বাউল' শব্দটিও সম্ভবত 'বাতুল' (পাগল) শব্দের অপভ্রংশ। বাউল সঙ্গীত তাহাদের সাধনার এক অপরিহার্য অঙ্গ। সাধারণত একতারা যন্ত্র-সহযোগে নৃত্যের মধ্য দিয়া তাহারা বাউলসঙ্গীত গাহিয়া থাকেন। এই জন্যই যেন সঙ্গীতের মধ্যেও একটা নৃত্যচ্ছন্দ অনুভব করা যায়। অধ্যাপক শ্রীভট্টাচার্য বাউলদের ধর্মসাধন-পদ্ধতি-সম্বন্ধে অতিশয় নিষ্ঠুর মন্তব্য করিলেও বাউল-সঙ্গীত-সম্বন্ধে বলিয়াছেন : 'বঙ্গীয় সঙ্গীত সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান

বাউল সঙ্গীত

অধিকার করিয়া আছে বাউল-সঙ্গীত। ভাবাভঙ্গী ও সুরের এতখানি সরলতা, সাবলীলতা ও বাঙ্গালীভাব বাংলার অন্য কোন সঙ্গীতে দেখা যায় না। বাউলসুর মৌলিক ও বঙ্গজ। ইহা লঘু, তরল ও দ্রুতলয়-বিশিষ্ট, স্বভাব-ধর্মে গ্রাম্য।......বাউলসঙ্গীত সর্ববিধ ভার হইতে মুক্ত, ইহার সুর সহজ প্রাণের সুর,অমার্জিত পল্লীভাষার নিত্য-সহচর, তা ছাড়া নৃত্যসহচরও বটে।'

প্রাচীন বাউলগানগুলি অনেকটা mystic বা রহস্যমণ্ডিত। বাহিরের দিক হইতে দেহতত্ত্ববিষয়ক গানগুলির একটা অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া গেলেও ইহাদের গুহ্য তত্ত্ব একমাত্র মরমীয়া-পন্থীরাই বুঝিতে পারেন। 'চন্দ্র, রস, ফুল, ত্রিবেণী, অম্বুবাচী' প্রভৃতি শব্দগুলি বিশেষ অর্থেই কবিতায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চর্যাপদের মতই এইগুলিও 'সন্ধাভাষায়' রচিত বলা চলে। শিক্ষিত ভদ্রসমাজে ইহাদের বিশেষ কোন মর্যাদা না থাকিলেও অশিক্ষিত গ্রাম্যসমাজে বাউলগানগুলি অতি সুপরিচিত এবং জনপ্রিয় সঙ্গীত। এই গানগুলির আধ্যাত্মিকতাও ধর্মপ্রাণ গ্রাম-বাসীদের সহজেই আকর্ষণ করিয়া থাকে। অষ্টাদশ, উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতেও প্রাচীন বাউলগানের অনুসরণে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি একপ্রকার ভক্তিমূলক সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন।

রহস্যময়তা

সারি,জারি, ভাটিয়ালী, মালসী আদি-বহুতর লোকসঙ্গীতের মতই বাউল গানগুলিও হয়তো শিক্ষিত সমাজের অবজ্ঞাবশত লোপ পাইয়া যাইত, যদি না রবীন্দ্রনাথের মতো বিশিষ্ট মনীষীর দৃষ্টি ঐ দিকে আকৃষ্ট হইত। তিনি গগন হরকরা নামক এক বাউলের মুখে সঙ্গীত শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং স্বয়ং বাউল-সঙ্গীতসংগ্রহে উদ্যোগী হইলেন। তিনিই বিবিধ প্রবন্ধে এবং বক্তৃতায় ইহাদের প্রতি সুধীসমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন। অতঃপর রবীন্দ্রনাথেরই প্রবর্তনায় শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী প্রভৃত বাউলসঙ্গীত সংগ্রহ করেন এবং এই বিষয়ে বিবিধ তাত্ত্বিক আলোচনা ও গবেষণায় ব্রতী হইলেন। ফলত, আমাদের দেশের এই সম্পদগুলি নিশ্চিত বিলুপ্তির হাত হইতে রক্ষা পাইল।

সংগ্রাহক

বাউলসঙ্গীত-রচয়িতাদের মধ্যে লালন ফকির সম্ভবত শ্রেষ্ঠ। ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কুষ্টিয়া অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নাকি জন্মসূত্রে ছিলেন হিন্দু কায়স্থ, পরে সিরাজ সাঁই নামক ফকীরের নিকট বাউলধর্মে দীক্ষা লাভ করেন। লালন-রচিত পদের সংখ্যা অগুণিত। ইহার অনেক বিনষ্ট হইলেও শিষ্য-প্রশিষ্য-

লালন ফকীর

ধারায় যাহা বাঁচিয়া আছে, তাহার সংখ্যাও কম নহে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ লালনের অনেকগুলি বাউলসঙ্গীত সংগ্রহ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লালনের শিষ্য গগন হরকরার গান শুনিয়াই মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং তাহার রচিত সঙ্গীতও সংগ্রহ করিয়া বিভিন্ন বক্তৃতায় ব্যবহার করিয়াছেন। 'আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যেরে'—এই জনপ্রিয় সঙ্গীতটি গগন হরকরারই রচিত। আর একজন বিশিষ্ট বাউলকবি পাঞ্জশাহ্। তিনি শতাধিক বৎসর পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইনি 'নেড়ার ফকীর' নামেই অধিকতর বিখ্যাত। রবীন্দ্রনাথের আর একজন প্রিয় বাউল কবি ছিলেন শ্রীহট্টের হাসন রজা চৌধুরী। 'রূপ দেখিলাম রে নয়নে, আপনার রূপ দেখিলাম রে' সঙ্গীতটি তাঁহার রচিত। মতিলাল সান্যাল ছিলেন উচ্চশিক্ষিত ব্রাহ্মণ সন্তান। তিনি 'হাউড়ে গোঁসাই' ভণিতায় কয়েকটি অতি উচ্চাঙ্গ পদ রচনা করিয়াছেন। নবদ্বীপের চণ্ডীদাস-রজকিনী আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা চণ্ডীদাস গোঁসাইও কয়েকটি উৎকৃষ্ট বাউলসঙ্গীত রচনা করেন। বাঙলাদেশে বাউলকবির সংখ্যা অসংখ্য। সাম্প্রতিক কালপর্যন্ত বহু বাউল সঙ্গীত রচিত হইতেছে। এমন অনেকগুলি উচ্চাঙ্গের বাউল সঙ্গীতের নিদর্শন পাওয়া যায়, যাহার রচয়িতার নাম অজ্ঞাত। এমন অনেক 'বাউলগানের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত কবিত্বের প্রকাশ আধুনিক-পূর্ব বাঙ্গালা সাহিত্যের গতানুগতিকতার বহু উর্ধ্বে উঠিয়াছে।' বাউল সঙ্গীতের প্রভাব-সম্বন্ধে শেষ কথা এই—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও ইহার প্রভাবে অনেক সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন,—ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—'তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে।'

গগন হরকরা

পাঞ্জশাহ্

হাউড়ে গোঁসাই

অধ্যায় ঃ
চৌদ্দ

শাক্ত পদাবলী

'মঙ্গলকাব্য'-প্রসঙ্গে এবং বিশেষভাবে 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে বাঙলাসাহিত্যে শক্তিদেবতার উদ্ভব-সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবেই আলোচনা করা হইয়াছে। উক্ত শক্তি-সাধনার ফলশ্রুতি-রূপে মধ্যযুগে আমরা বিরাট চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি। মনে হয়, তখনও পর্যন্ত দেবীর সঙ্গে ভক্তের সম্পর্কটি ছিল প্রধানত ভয়ের—দেবী যেন ভয় দেখাইয়া অথবা লোভ দেখাইয়া ভক্তের নিকট হইতে পূজা আদায় করিবার জন্য সচেষ্ট। দেবী তখনও পর্যন্ত আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই, ব্যক্তিজীবনে ঘনিষ্ঠতা তো দূরের কথা। কিন্তু তারপর গঙ্গার অনেক জল সাগরে পড়িয়াছে। পরিবেশের পরিবর্তনে দেবীর সঙ্গে ভক্তের পারস্পরিক সম্পর্কেরও অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। অনার্যকুল হইতে উদ্ভূতা চণ্ডী জগজ্জননী কালীমাতায় রূপান্তরিতা হইয়াছেন। এখন আর ভয় কিংবা লোভের প্রয়োজন হয়না, ভক্ত নিজেই প্রাপ্তি-কামনা লইয়া মায়ের নিকট নালিশ জানায়। বলা বাহুল্য, ভক্ত-মানসের এই পরিবর্তনের জন্য প্রচুর সময়ের প্রয়োজন হইয়াছিল। বস্তুত অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই মাত্র সাধককবি রামপ্রসাদ এই অভিনব মনোভাবের প্রবর্তন করিলেন। এই প্রসঙ্গে, যে পটভূমিতে এই পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল, তাহার বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

শক্তিদেবতার রূপান্তর

চৈতন্যদেব বাঙলা দেশে যে ভাবের প্রবাহ বহাইয়া দিয়াছিলেন, তাহারই জের চলিয়াছিল দীর্ঘকাল পর্যন্ত। বস্তুত চৈতন্যোত্তর কাল তথা মুঘলশাসনকাল ছিল বাঙলাদেশে শান্তি ও সমৃদ্ধির যুগ। বাঙালী জনসাধারণও শান্তসমাহিত চিত্তে প্রেমভাবের সাধনায় ব্রতী হইবার সুযোগ পাইয়াছিল এবং এই অবসরেই প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ 'বৈষ্ণব-পদাবলী'গুলি রচিত হইয়াছিল। তারপর সুদূর রাজধানী দিল্লীর বুকে যে রাষ্ট্রনৈতিক আবর্তের সৃষ্টি হইয়াছিল, অনতিকাল পরেই তাহা আঘাত করিল বাঙলাদেশকেও। ফলে দেশে যে শুধু শান্তি ও শৃঙ্খলার অভাবই দেখা দিয়াছিল, তাহা নহে, সর্বপ্রকারেই বাঙলাদেশ একটা অবক্ষয়ের মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। চৈতন্যদেবের যে সমুন্নত ব্যক্তিত্ব একটা বিরাট

কাব্যের আকার ধারণ করিয়াছে। ভক্তহৃদয়ের আন্তরিকতায় এইগুলি বৈষ্ণবকবিতাগুলিকে অতিক্রম করিয়া যায়। তবে এই প্রসঙ্গে বৈষ্ণবগীতি-কবিতার প্রভাবের কথাও অস্বীকার করা যায়না। বস্তুত বৈষ্ণব কবিতাকে আদর্শ করিয়াই যে শাক্তপদকর্তাগণ পদ-রচনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা বাস্তক সত্য। বৈষ্ণব কবিতা যেমন ভাব ও রসানুযায়ী বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত—শাক্তপদাবলীও এইরূপ বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত। বৈষ্ণবগণ ক্ষুদ্রাকৃতি পদে যেমন সহজে ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, শাক্ত কবিগণও সেই রীতিরই অনুসরণ করিয়াছেন, বৃহৎ কোন কাব্য রচনায় ব্রতী হন নাই। রামপ্রসাদের কাব্য-আলোচনা-প্রসঙ্গে ড° সুশীল কুমার দে এই কথাটিই বলিয়াছেন : 'Not only does he imitate in places characteristic diction and imagery of Vaiṣṇaba Padābalis but he deliberately describes the Goṣtha, Rāsa, Milana of Bhagabati in imitation of the Bṛndābana Līlā of Śrikṛṣṇa.'

বৈষ্ণবপদাবলীর প্রভাব

শাক্তপদাবলীগুলির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাধারণভাবে বলিতে গেলে শাক্তপদাবলীগুলিকে গীতি-কবিতা বলিয়াই অভিহিত করিতে হয়। কিন্তু আধুনিক যুগের গীতিকবিতাগুলি যেমন সুরবর্জিত হওয়া সত্ত্বেও সুখপাঠ্য কিংবা বৈষ্ণবকবিতাগুলি হইতে সুর-বর্জন করিলেও যেমন রসানুভূতিতে পাঠকের মন মুগ্ধ হয়, শাক্তপদাবলীর এতখানি ক্ষমতা নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহাদের মধ্যে তত্ত্বের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় ; তাহা ছাড়া একটা বিশেষ সুরের সঙ্গে এই পদাবলীগুলি এমন ভাবে জড়াইয়া গিয়াছে যে সাধারণ আবৃত্তিতে পাঠকের মন পূর্ণ হয়না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এইগুলিতে কবিহৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস ঘটিয়াছে বলিয়াই ইহাদিগকে গীতিকবিতা বলিয়াই আখ্যায়িত করিতে হয়। নিঃসন্দেহে ধর্মীয় বিষয়কে অবলম্বন করিয়াই শাক্তপদাবলীর সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু ব্যক্তি-জীবনের সঙ্গে ইহাদের সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে ধর্মসম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পাঠ করিলেও ইহাদের আবেদন বিঘ্নিত হয় না। অধ্যাপক চৌধুরী বৈষ্ণব পদাবলী ও শাক্ত পদাবলীর তুলনামূলক আলোচনা-প্রসঙ্গে স্বীকার করিয়াছেন, 'বৈষ্ণবপদাবলী গোষ্টিগত প্রেমবিশ্বাসের ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত। তাই, এই পদ-সাহিত্যে ধর্ম ও মর্মানুরাগ সমসূত্রে বিধৃত ; একে অন্য থেকে অবিচ্ছিন্ন। কিন্তু শাক্তসঙ্গীতের মর্মোৎসারিতা ধর্ম-নিরপেক্ষ ; ব্যক্তি-চিত্ত-প্রবাহে

শক্তিপদাবলীর বৈশিষ্ট্য

সমাকুল। এই খানেই এই দুই শ্রেণীর ধর্মনির্ভর গীতিসাহিত্যের ঐতিহাসিক পার্থক্য-মূল।' শাক্তপদাবলীগুলি একান্তভাবে জীবনাশ্রয়ী। সমাজ-সংসারকে কেন্দ্র করিয়াই ইহা আবর্তিত হইতেছে, ব্যক্তিজীবন এবং সমাজ-জীবনের রূপ এইগুলিতে বারবার প্রতিফলিত হইয়াছে। মানবিক আবেদনে পুষ্ট এবং জীবনরসে অভিষিক্ত এই পদগুলিতে বাঙালী গৃহস্থ-জীবনের যে অকৃত্রিম চিত্র উদ্ভাসিত হইয়াছে, প্রাগাধুনিক যুগের কোন সাহিত্যেই তাহার তুলনা মিলিবে না। এই দিক হইতে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে শাক্ত পদাবলীগুলির স্থান একক ও অনন্য।

শাক্ত পদাবলীর দুই ধারা

বিষয়-বস্তুর দিক হইতে শাক্তপদাবলীকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে: ১. মাতৃ সাধনা, শ্যামা সঙ্গীত বা কালী কীর্তন ২. কন্যা সাধনা, উমা সঙ্গীত বা আগমনী-বিজয়ার গান। মূলত শক্তি-সাধনাই কবিদের লক্ষ্য হইলেও সম্পূর্ণ পৃথক্ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই পদগুলি রচিত হইয়াছে। শ্যামা-সঙ্গীতগুলিতে তত্ত্বের প্রাধান্য কিছুটা বেশি বলিযাই এইগুলিতে মনোধর্মের প্রভাব রহিয়াছে; কিন্তু উমা-সঙ্গীতগুলি একান্তভাবেই হৃদয়ধর্মী।

মাতৃ-সাধনায় কবি জগজ্জননীকে জননীরূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। এই শ্রেণীর পদগুলিতে একদিকে যেমন শক্তিতত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, অন্যদিকে তেমনি সাধনতত্ত্বেরও পরিচয় বর্তমান। শক্তিতত্ত্বের পদগুলিতে মায়ের বিভিন্ন রূপের পরিচয় দেওয়া হইযাছে। এই রূপ-চিত্রাঙ্কনে কবিরা কৃতিত্ব প্রদর্শন করিলেও যেভাবে বিভিন্ন রূপকের সাহায্য লওয়া হইয়াছে, তাহার ফলে ভক্ত-সাধক ব্যতীত অপরের পক্ষে ইহাদের পরিপূর্ণ স্বাদ গ্রহণ করা সম্ভবপর নহে। এই পদগুলিতে তন্ত্রোক্ত দেবীর ধ্যানের মূর্তিও সাবধানতা-সহকারে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। আবার দেবীকে ব্রহ্মময়ী বলিয়াও অনেক পদে বর্ণনা করা হইয়াছে। বস্তুত তন্ত্র-সাধনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকিলে শক্তিতত্ত্বের স্বরূপ উপলব্ধি করা কষ্টকর। সাধনতত্ত্ব-সম্বন্ধেও অনুরূপ উক্তিই প্রযোজ্য। এই পদগুলিতে শক্তি-সাধনার যে সকল গূঢ় তত্ত্বের ইঙ্গিত রহিয়াছে, ভাবের ভাবুক না হইলে তাহাদের মর্মোদ্ধার করা সহজ নহে। অবশ্য এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কতকগুলি পদে ভক্তের আকুতি যে ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ইহাদের সর্বজনীনতাকে স্বীকার করিয়া লইতে হয়। এখানে মায়ের কাছে সন্তানের অভিযোগ, আব্দার এমন মানবিক

মাতৃসাধনা তথা শ্যামা-সঙ্গীত

আবেদন লইয়া উপস্থিত হইয়াছে যে সাধ্য আর সাধকের অন্তরঙ্গ যোগটি সহজেই উপলব্ধি করা যায়। শাক্ত পদাবলীর এই অংশেই সমাজ-সংসারের জটিলতা ও তাহা হইতে মুক্তির জন্য দেবীর নিকট আত্মনিবেদন করা হইয়াছে।

উমা-সঙ্গীতগুলিতে দেবীকে কন্যারূপে ভজন করা হইয়াছে। এই উমা আর পূর্বোক্ত শ্যামা মূলত পৃথক ছিলেন, পরে ইহাদিগকে অভিন্ন বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে। শ্যামা মূলত ভীষণা,—তিনি অনার্যকুল হইতে উদ্ভূতা। পক্ষান্তরে উমা পৌরাণিক দেবী। দক্ষকন্যা সতী পর্বতরাজ হিমালয়-দুহিতা-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহারই নাম উমা। কিন্তু ইহার যে কাহিনী পদাবলীগুলিতে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা পৌরাণিক নহে, তাহা একান্তভাবেই বাঙালীর ঘরের কথা। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "বাঙ্গালার জলবায়ুতে মধুর রস বিরাজ করে, তাই বাঙ্গলাদেশে অত্যুগ্র চণ্ডী ক্রমশঃ মাতা অন্নপূর্ণারূপে, ভিখারীর গৃহলক্ষ্মীরূপে, বিচ্ছেদ-বিধুর কন্যারূপে, —মাতা পত্নী ও কন্যা, রমণীর এই ত্রিবিধ মঙ্গলসুন্দররূপে দরিদ্র বাঙ্গালীর ঘরে মধুর রস সঞ্চার করিয়াছেন।' উমাসঙ্গীতগুলি প্রধানত বৈষ্ণবকবিতার আদর্শে রচিত হইলেও মানবিক আবেদনের দিক্ হইতে এইগুলি নিঃসন্দেহে শ্রেয়ঃতর। উমাসঙ্গীত প্রধানত তিনভাগে বিভক্ত—বাল্যলীলা, আগমনী ও বিজয়া। এই তিন খণ্ডেই বাৎসল্যরসের অনুপম প্রকাশ ঘটিয়াছে। দুর্গাপূজা বাঙলাদেশে আর ধর্মীয় আচরণ বলিয়া গণ্য হয়না,—ইহা এক বিরাট্ সামাজিক মহোৎসব। কন্যারূপী ভগবতী দুর্গা যেন স্বামিগৃহ হইতে তিনদিনের অবকাশে পিতৃগৃহে আগমন করেন,—এই দিনগুলির প্রত্যাশায় সারাটি বছর কাটিয়া যায়। তারপর সপ্তমী, অষ্টমী পার হইলেই কন্যাবিদায়ের কথা মনে জাগে। নবমী নিশি পার হইলেই বিদায়লগ্ন—বিজয়া দশমী। কন্যাকে ঘিরিয়া মাতৃমনের আনন্দ ও ব্যাকুলতা এই আগমনী ও বিজয়াগানগুলিতে অপূর্বসুন্দররূপে প্রকাশ পাইয়াছে। এই বেদনা দুর্গাপ্রতিমা-বিসর্জনের বেদনা নহে, কন্যা-বিদায়ের বেদনা। শাক্তপদাবলীর এই কবিতাগুলি পাঠ করিলেই বোঝা যায়, কোন্ উপলব্ধি হইতে ইংরেজ কবি লিখিয়াছিলেন, 'Our sweetest songs are those that tell of saddest thought.' পারিবারিক জীবনের বিভিন্ন অনুভূতির এমন সুষ্ঠু ও সর্বাঙ্গীন প্রকাশ বিশ্ব-সাহিত্যের কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া ভার।

কন্যাসাধনা তথা উমাসঙ্গীত

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শাক্ত-পদাবলীর যে সঙ্কলন প্রকাশিত হইয়াছে,

তাহাতে সম্পাদক সত্যই বলিয়াছেন, 'শক্তি-বিষয়ক সঙ্গীত আমাদের ভাষা-ভাণ্ডারে যে কত আছে, তাহা ঠিক করিয়া বলা অসাধ্য ব্যাপার।' বস্তুত, বৈষ্ণব-কাব্যের ধারা বহুকাল গত হইলেও শাক্তপদাবলীর ধারা এখনও পর্যন্ত অব্যাহত বলিয়াই মনে করি। বাঙলার আধুনিক কবিদেরও অনেকেই যে শাক্তপদ রচনা করিয়াছেন, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মধুসূদন 'ব্রজাঙ্গনাকাব্য' রচনা করিলেও তাহা বৈষ্ণব-পদাবলী বলিয়া গণ্য হয় না, অথচ তাঁহার একটি কবিতাকে নিঃসন্দিগ্ধ ভাবেই শাক্তপদাবলীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। গভীর আনন্দের বিষয় এই,—রবীন্দ্রনাথকেও শাক্তপদকর্তাদের তালিকায় স্থান দান করা হয়। শাক্তপদাবলীর উদ্ভাবক কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন। এই ধারায় ইঁহাকে শ্রেষ্ঠ কবির স্বীকৃতিও দান করা হয়। অপরাপর প্রাচীন কবিদের মধ্যে সাধক কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, প্রেমিক মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, মহাবাজ মহাতাব চাঁদ, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, মহারাজ নন্দকুমার প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা চলে। যে সকল কবি কবিগান, টপ্পা, তর্জা, পাঁচালী-আদি লোক-সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের অনেক রচনাই শাক্তপদাবলীর অন্তর্ভুক্ত। দাশুরায়, রামবসু, ঈশ্বরগুপ্ত-আদি কবির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়,—মৃজা হুসেন নামক একজন মুসলমান কবি এবং এণ্টনি নামক একজন ফিরিঙ্গি কবিও শক্তি-বিষয়ক পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। পরবর্তী কবিকুলের মধ্যে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশ ঘোষ, নবীন সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতির রচনায় শাক্তপদের সন্ধান পাওয়া যায়।

শাক্তপদ ও কবিব প্রাচুয

রামপ্রসাদ সেন ঃ—[বিস্তারিত জীবন-কাহিনীর জন্য 'কালিকামঙ্গল' দ্রষ্টব্য।]

সাধক কবি রামপ্রসাদ বাঙলাসাহিত্যে 'শ্যামাসঙ্গীত' এবং 'উমাসঙ্গীত' উভয় ধারারই প্রবর্তন করেন। যে সকল কবি এই জাতীয় সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, সংখ্যায় এবং উৎকর্ষে রামপ্রসাদ তাঁহাদের শীর্ষস্থানীয়। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীর বিভিন্ন কবিদের পরিচয়-সম্বন্ধে আমরা বার বার যে সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছি রামপ্রসাদের ব্যাপারেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। কুমারহট্টের কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনই শাক্ত-পদাবলীর প্রবর্তক—এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু বিভিন্ন পদে ভণিতার বৈচিত্র্যই সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছে। 'দীন রামপ্রসাদ, দ্বিজ রামপ্রসাদ, শ্রীরামপ্রসাদ, দাস রাম-

প্রসাদ, প্রসাদ'-আদি নানারকম ভণিতাই শাক্তপদে সুলভ বলিয়া কেহ কেহ একাধিক রামপ্রসাদের অস্তিত্বে আস্থা স্থাপন করিয়া থাকেন। 'দ্বিজ রাম-প্রসাদ' ভণিতাটি যে কোন ব্রাহ্মণ রামপ্রসাদের, সাধারণভাবে তাহাই বিশ্বাস করিতে হয়। ঢাকা জেলার মহেশ্বরদি পরগণার অন্তর্গত চিনিশপুরে রামপ্রসাদ নামে একজন ব্রাহ্মণ কালীসাধক ছিলেন। তিনি বৈদ্য রামপ্রসাদের সমসাময়িক বলিয়া বিশ্বাস করা হয়। তাঁহার সম্বন্ধে গবেষকগণ বলেন যে ইঁহার কন্যার নাম জগদীশ্বরী এবং দেবী কালী এই কন্যার ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া রাম-প্রসাদের বেড়া বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। এই পক্ষের অনুমান—দ্বিজ রামপ্রসাদের সম্বন্ধে যে সকল কাহিনী প্রচলিত আছে, তাহাই বৈদ্য রামপ্রসাদের নামে প্রচলিত হইয়াছে। যে সকল পদের ভণিতায় 'দ্বিজ' পাওয়া যায়, সেই সকল পদ চিনিশপুরের ব্রাহ্মণ রামপ্রসাদের রচনা।—ইহা অভিমত মাত্র, কোন সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নহে। বস্তুত, কবিদের স্বহস্তলিখিত পদ পাওয়া না গেলে এই সমস্যার সমাধান হইবে কি না সন্দেহ।

পরিচয়-সমস্যা

পূর্বেই বলা হইয়াছে, রামপ্রসাদ শ্যামাসঙ্গীত এবং উমাসঙ্গীত,—উভয়-প্রকার সঙ্গীত-রচনায়ই পারদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি সঙ্গীত-রচনায়ই আপন প্রতিভাকে নিঃশেষ করেন নাই, উক্ত সঙ্গীতে একপ্রকার বিশেষ সুর আরোপ করিয়া তিনি সঙ্গীতগুলিকে আরও তাৎপর্যময় করিয়া তুলিয়াছেন। উক্ত বিশেষ সুরকে 'প্রসাদী সুর' বলিয়া অভিহিত করা হয়। মনে হয়, এই বিশেষ সুরটি ছাড়া যেন শ্যামাসঙ্গীতের পূর্ণ আমেজ আসেনা। অপর সকল কবির রচনাও সাধারণত প্রসাদীসুরেই গাওয়া হয়। কালক্রমে প্রসাদী সঙ্গীতগুলি এত জনপ্রিয়তা লাভ করে যে শিক্ষিত-অশিক্ষিত নাগরিক-গ্রাম্য-নির্বিশেষে প্রায় যে কোন বাঙালীই কখনও না কখনও প্রসাদী সঙ্গীতে গুণগুণ করিয়া থাকেন। যিনি তান্ত্রিক সাধনার কিছুই বোঝেন না, তিনিও অন্তত উমাসঙ্গীতের মাতা ও সন্তানের সহজ সম্বন্ধটির জন্যই প্রসাদী সঙ্গীতের স্বাদ গ্রহণ করিয়া থাকেন। 'রামপ্রসাদ আবার তাঁহার কালীস্তুতির সহিত দুর্গার বাল্য ও বিবাহিত জীবনের কাহিনী সংযুক্ত করিয়া এবং আগমনী ও বিজয়া-বিষয়ক গান প্রবর্তন করিয়া বাঙালীর মাতৃকল্পনাকে সম্পূর্ণতা দান করিলেন। কালীর দুর্বোধ্য, ভয়-দেখানো আচরণের সহিত উমার বাৎসল্য-রসে অভিষিক্ত, স্নেহের দুলালী কন্যামূর্তি এক হইয়া গিয়া বাঙালীর মনে মায়ের কঠোর ও কোমলরূপ যেন

কাব্যোৎকর্ষ

অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশিয়া গেল—শ্মশানের নিঃসঙ্গ ভয়াবহতা ও গৃহাঙ্গনের পরিচিত স্নেহ আবেষ্টনের মধ্যে আর কোন ব্যবধান রহিল না। বিশ্ববিধানের দুর্জ্ঞেয়তা মমতা-পারাবারে ডুবিয়া গেল।' রামপ্রসাদের রচিত নিম্নোক্ত পদগুলি জনপ্রিয়তা ও উৎকর্ষে শীর্ষস্থানীয়:

'আমায় দেও মা তবিলদারি।'
'আর কাজ কি আমার কাশী।'
'এবার কালী তোমার খাব।'
'এমন দিন কি হবে তারা।'
'কেবল আশার আশা।'
'গিরিবর, আর আমি পারিনা উমারে।—ইত্যাদি।

কমলাকান্ত: সাধক কবি কমলাকান্তের পৈতৃক নিবাস ছিল কালনার অম্বিকানগর গ্রামে। পরে তিনি তাঁহার বাসস্থান পরিবর্তন করেন। কবি ছিলেন বর্ধমান রাজের গুরু ও সভাপণ্ডিত। তান্ত্রিক সাধক কমলাকান্ত 'সাধকরঞ্জন' নামে তান্ত্রিক যোগপদ্ধতির এক গ্রন্থে তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন, আর কালীকীর্তনগুলিতে সাধনা ও আধ্যাত্মিকতার পরিচয় দান করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কবিপ্রতিভার সর্বাধিক স্ফুরণ ঘটিয়াছে 'উমাসঙ্গীতে।' অনেকেই মনে করেন, এই বিষয়ে তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ শিল্পী। জনপ্রিয় উমাসঙ্গীত-গুলির অধিকাংশই কমলাকান্তের রচনা।

অধ্যায় ঃ
পনেরো

নাথ-সাহিত্য

বাঙলাসাহিত্যের প্রাচীন যুগের আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি, ড° দীনেশ চন্দ্র সেন যদিও 'ময়নামতীর গান' এবং 'গোর্খবিজয়' নামীয় নাথ-সাহিত্যকে প্রাচীন যুগের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, তৎসত্ত্বেও ইহাদের স্থান তৎকালে নয়। প্রকৃতপ্রস্তাবে এই জাতীয় সাহিত্য বহু পরবর্তীকালেই রচিত হইয়াছে। পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলিতে প্রধানত মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা, কাহ্নপা-আদি সিদ্ধাচার্যদের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। সম্ভবত ইঁহারা সকলেই ঐতিহাসিক পুরুষ ছিলেন ; এই নামীয় কোন কোন সিদ্ধাচার্যের রচনারও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। [দ্রঃ 'বৌদ্ধগান ও দোহা']। ভাষা-সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে ইঁহারা সম্ভবত খ্রী° দশম-একাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের জীবিতকালেই যে তাঁহাদের অবলম্বন করিয়া সাহিত্য রচিত হইয়াছিল, তাহা অনুমান করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। বিশেষত যে কোন প্রাচীন সাহিত্যেরই যখন কিছু কিছু প্রাচীন পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তখন নাথ-সাহিত্যের কোন প্রাচীন পুঁথির সার্বিক অপ্রাপ্তি বিস্ময়জনক বৈকি। তাহা ছাড়া প্রাপ্ত পুঁথিগুলির ভাষায়ও অপেক্ষাকৃত আধুনিকতার লক্ষণ সুপরিস্ফুট। যে পাণ্ডুলিপিগুলি পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের প্রাচীনতমটিও অষ্টাদশ শতকের শেষপাদে লিখিত। এই সমস্ত কারণে অনুমান করা হয়, নাথ-সাহিত্যের বিষয়বস্তু যদিও প্রাচীন এবং ইহার মূল কাঠামোটিও যদিও প্রাচীনকালেই রচিত হইয়া থাকে, তবুও যে আকারে ইহাদিগকে পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ইহাদের রচনাকালকে অষ্টাদশ শতকের পূর্ববর্তী বলিয়া অভিহিত করা সম্ভব নহে।

নাথসাহিত্যের অর্বাচীনতা

নাথসাহিত্যের উদ্ভব-সম্বন্ধে সম্প্রতি জনৈক গবেষক অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে শৈবধর্ম হইতেই নাথধর্মের উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু 'নাথ-সম্প্রদায়ের গ্রন্থাদি আলোচনা করিয়া ও বিভিন্ন মোহন্তদের সহিত আলোচনা করিয়া আমি তাঁহাদের মূলতঃ শৈব বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছি।' (কল্যাণী মল্লিক)। কিন্তু নাথ-সাহিত্য বিশ্লেষণ করিলে উক্তিটির সমর্থন পাওয়া যায় না। নাথ-সাহিত্যে শিবও একজন জ্যেষ্ঠগুরু এবং দেবতা বলিয়া স্বীকৃত হইলেও অন্যান্য নাথগুরুদের কেহ কেহ তাঁহাকে তেমন সম্মান

দান করেন নাই। এমন কি নাথপন্থী কবিরাও তাহাদের কাব্যে শিবকে খুব শ্রদ্ধার আসনে স্থাপন করেন নাই। স্থানে স্থানে বরং শিবকে উপ-হাস্যাস্পদ করিয়াই তোলা হইয়াছে। অতএব, অনুমান হয়, অপর সকল মঙ্গলকাব্যে যেমন অনার্যকুলোদ্ভব দেব-দেবীরা শেষ পর্যন্ত শিবের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়া 'জাতে উঠিবার' প্রয়াস পাইয়াছেন, নাথপন্থীরাও এইভাবে শিবের সঙ্গে যোগযুক্ত হইয়া আর্যসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইতে চাহিতেছেন। আসলে নাথধর্মের উদ্ভব ঘটিয়াছিল বৌদ্ধধর্মের বিকারে—এই অনুমানই সঙ্গত। যে আদিম অনার্য সমাজ বহুকাল পূর্বেই বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়া হিন্দু-বিরোধী মনোভাবের অধিকারী হইয়াছিল, কালক্রমে তাহাদের মধ্যেই নাথধর্মের উদ্ভব হয়। পূর্বসংস্কার তাহারা তখনও ত্যাগ করিতে পারে নাই বলিয়াই একদিকে পৌরাণিক দেব-দেবীরা যেমন তাহাদের দৃষ্টিতে শ্রদ্ধার আসন লাভ করিতে পারে নাই, তেমনি হিন্দু-আচার-আচরণও তাহাদের নিকট হাস্যকর বলিয়া মনে হইয়াছে। তাহাছাড়া নাথ-সাহিত্যে যাহাদিগকে গুরুর আসন দান করা হইয়াছে, প্রাচীন বাঙলা-সাহিত্যের ইতিহাসে তাহা-দিগকে আমরা 'সিদ্ধাচার্য' নামেই অভিহিত করিয়াছি। এই সিদ্ধাচার্যগণ ছিলেন বৌদ্ধ সহজিয়াপন্থী সাধক। অতএব, নাথধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধদের যোগাযোগই ছিল ঘনিষ্ঠ—এই অভিমত অনুমানমাত্র নহে। এই বিষয়ে ডঃ শশিভূষণ দাসগুপ্তের সাক্ষ্য অতিশয় মূল্যবান্ বলিয়া বিবেচিত হইবে। 'The Nath cult seems to represent a particular phase of the Siddha cult of India. This Siddha cult is a very old religious cult of India with its main emphasis on a psychochemical process of Yoga, known as the Kāya Sādhanā or the culture of body with a view to making it perfect and immutable and thereby attaining an immortal spiritual life'. এই প্রসঙ্গে আর একটি সূত্রের উল্লেখ প্রয়োজন। এযাবৎ কোন মুসলমান কবি-রচিত কোন মঙ্গলকাব্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। অথচ নাথ-সাহিত্য-রচয়িতারূপে একাধিক মুসলমান কবির পরিচয় পাওয়া যায়। এই নাথ-সাহিত্যে কিংবা নাথ-ধর্মে যে কোন মুসলমানী প্রভাব বর্তমান তাহা নহে। তাই অনুমান, যে অনার্য সমাজ হইতে নাথধর্মের উদ্ভব হইয়াছে, তাহাদের অনেকেই পরবর্তী-কালে মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্বসংস্কার ও ঐতিহ্যের

নাথ সাহিত্যের উদ্ভব

তাহারা নাথধর্মের প্রতি কিছুটা পক্ষপাতিত্ব দেখাইতে পারেন। অতএব, নাথ-ধর্মের উৎপত্তি-সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিতে হয় যে, ইহা মূলত ছিল অনার্য ধর্ম। পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবেই ইহার কাঠামো গঠিত হইয়াছিল। আরও পরে শিবকে এই ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করিয়া ইহার আর্যীকরণের চেষ্টা করা হয়।

'প্রাগার্য আদিম জনতা-ধর্ম'ই নাথ-সাহিত্যে পরিস্ফুট হইলেও উক্ত সাহিত্য-বিশ্লেষণে সূত্রাকারে কতকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণের কথা উল্লেখ করিতে পারি। অবশ্য এই লক্ষণগুলিকে আর এখন পরিপূর্ণ অনার্যোচিত বলিয়া অভিহিত করিবার উপায় নাই, কারণ বৌদ্ধ এবং হিন্দুধর্মের কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যেও ইহাদের অস্তিত্ব বর্তমান। সন্ন্যাসজীবনের প্রতি আকর্ষণ অন্য অনেক ধর্মেই বর্তমান, কিন্তু নাথধর্মে ইহার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। নাথ-পন্থীদের ধারণা, যোগসাধনার দ্বারা'মহাজ্ঞান'লাভ করিয়া মানুষ দৈহিক অমরতা লাভ করিতে পারে—এই অমরতালাভের আকাঙ্ক্ষাই নাথপন্থীদের চরম ও পরম আকাঙ্ক্ষা। এই উদ্দেশ্যেই তাহারা ব্রহ্মচর্য আচরণ ও সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহার ফলে এই পথের পথিকদের নিকট নারী-বিদ্বেষও একান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই বিশেষ সাধনাটিকে 'কায়সাধনা' নামে অভিহিত করা হয়। ইহার উদ্দেশ্য যে কোন আত্মিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ, তেমন মনে হয় না। কারণ সন্ন্যাস-জীবনে যে ক্রোধ, মান-আদি দমিত হয়, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। এই সন্ন্যাস-আদি অনুষ্ঠানে এক দিকে বৌদ্ধ ভিক্ষুজীবনের প্রভাব পড়িয়াছে, অন্যদিকে হিন্দু বর্ণাশ্রমধর্মের বিরোধিতাও প্রকাশ পাইয়াছে।

নাথ-ধর্মের বৈশিষ্ট্য

নাথসাহিত্যকে দুইটি প্রধান ধারায় বিভক্ত করা চলে, একটি গোর্খবিজয় বা মীনচেতন, অপরটি ময়নাবতী বা গোপীচন্দ্রের গান। প্রথমোক্ত ধারায় আদি গুরু মীননাথের গোরক্ষনাথ-কর্তৃক উদ্ধার-কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। এই ধারার কাব্যসমূহে ধর্মীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। শেষোক্তধারার কাব্যে রাণী ময়নাবতী-কর্তৃক পুত্র গোপীচন্দ্রকে সন্ন্যাসধর্মে প্রবর্তিত করিবার কাহিনী বর্ণনা করা হইয়াছে। এই 'গোপীচন্দ্রের গানে' ধর্মীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা অপেক্ষা কাব্যগুণই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

নাথ-সাহিত্যের দুই ধারা

মৎস্যেন্দ্রনাথ বা মীননাথ আদি নাথগুরু। তিনি পার্বতীর শাপে কদলীর

দেশে গমন করিলেন এবং তথায় আত্মজ্ঞান বিস্মৃত হইয়া সংসারধর্মে আসক্ত হইয়া পড়িলেন। এদিকে শিষ্য গোরক্ষনাথ শুনিলেন যে গুরু মীননাথ কদলীরাজ্যে নারীর মোহে পড়িয়া মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতেছেন। এই সংবাদ পাইয়া গোরক্ষনাথ গুরুকে উদ্ধার করিবার আকাঙ্ক্ষায় কদলীরাজ্যে গিয়া উপনীত হইলেন। প্রথম তিনি ব্রাহ্মণের বেশে গেলেন, তাহাতে কোন ফল হইল না। পরে তিনি যোগীর বেশ ধারণ করিলেন, কিন্তু তাহাতেও মীননাথের দেখা পাইলেন না; সর্বশেষ তিনি নর্তকীর বেশ ধারণ করিয়া মীননাথের সাম্‌নে উপস্থিত হইলেন। তিনি বিহিত বিধানে মীননাথকে পূর্বকথা স্মরণ করাইয়া দিতে চেষ্টা করিলেও যখন মীননাথ কেবল আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন, তখন গোরক্ষনাথ মীননাথের পুত্রকে আছড়াইয়া হত্যা করিলেন এবং আবার এক তুড়ি দিয়া বাঁচাইয়াও দিলেন। এতক্ষণে মীননাথের চেতনা হইল। কিন্তু কদলীর অধিবাসীরা গোরক্ষনাথকে রাক্ষস ভাবিয়া হত্যা করিতে সচেষ্ট হইলে গোরক্ষনাথ শাপ দিলেন এবং সব কদলী বাদুড় হইয়া উড়িয়া গেল। এইবার গোরক্ষনাথ গুরু মীননাথকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

গোর্খ বিজয়ের কাহিনী

নাথপন্থীদের আদিগুরু মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ সম্ভবত ঐতিহাসিক ব্যক্তি। কেহ কেহ ইঁহাকে সিদ্ধাচার্য 'লুই-পা' (<রোহিত পাদ) বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। লুই-পার রচিত প্রাচীন বাঙলা পদ চর্যাপদের অন্তর্ভুক্ত। গোরক্ষনাথও সম্ভবত ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তাঁহার রচিত সংস্কৃত 'গোরক্ষ-সংহিতা' বিদ্যমান। গোরক্ষনাথ যদি বাঙলাদেশের অধিবাসীও হইয়া থাকেন, তবু একসময় সারা ভারতবর্ষেই তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল এবং সর্বত্র তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীও বর্তমান ছিল। কিন্তু তাঁহাদের অবলম্বন করিয়া যে কাহিনী রচিত হইয়াছে, তাহা উপকথারই তুল্য। ইহাতে ধর্মীয়মতবাদ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চলিয়াছিল বলিয়াই কাহিনীতে অলৌকিকত্বের এবং অস্বাভাবিকতার অভাব নাই। এমন কি গোরক্ষনাথের কেরামতি দেখাইবার জন্য দাম্ভিকতা, কুটিলতা এবং হিংস্রতারও যথেষ্ট প্রশ্রয় দান করা হইয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, আশঙ্কা হইতেছে, গ্রন্থটি-সম্বন্ধে নিরাসক্ত আলোচনা বিশেষ হয় নাই। একপক্ষ যেমন উচ্ছ্বসিতভাবে কাহিনীটির প্রশংসা করিয়াছেন, অপরপক্ষ তেমনি তীব্র ভাষায় ইহার নিন্দা করিয়াছেন। ড০ দীনেশ সেন গোরক্ষনাথের চরিত্রকে শরৎ-শেফালী বা যূথিকার ন্যায় শুভ্র বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ড০ সুকুমার সেন গোরক্ষ নাথ-

ঐতিহাসিকতা

কর্তৃক গুরু মীননাথের চৈতন্যসম্পাদনকে সমগ্র বাঙলাসাহিত্যের একটি মহনীয় কাহিনী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে অধ্যাপক শ্রীভট্টাচার্যের মতে গোরক্ষচরিত্রে 'নাথসংস্কারের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা' ছাড়া অপর কোন গুণ নাই—যাহা আছে তাহা 'আকাশস্পর্শী দম্ভ, অহংকার, ক্রুরতা, হৃদয়হীনতা, ক্রোধ ও প্রতিহিংসা।' তিনি মীননাথের চৈতন্য-সম্পাদন-কাহিনী-সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে এইরূপ বীভৎসকাহিনী অদ্বিতীয়।' অধ্যাপক শ্রীভট্টাচার্য গোরক্ষ-বিজয় সম্বন্ধে অতিশয় নিষ্ঠুর মন্তব্য করিয়াছেন: 'সাহিত্য-বিচারে গোর্খবিজয় হইতেছে অন্ধ তমসাবৃত প্রেতরাজ্য। অতিমানবীয় জড়শক্তিই ইহার অধিপতি। এখানে স্নেহ নাই, প্রেম নাই, ভক্তি নাই, হৃদয়স্পন্দনের কোন চিহ্ন নাই, এই জগতে বহিঃপ্রকৃতির রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, ঈশ্বরের বিধান অস্বীকার করিয়া দৈহিক অমরতার লোভে নাথধর্ম এখানে স্থাণু হইয়া বসিয়া আছে...এই জগতের জীবন দানবীয়,ভাষা হেঁয়ালী, উচ্চার্য ডাকিনীমন্ত্র। একটা অস্পষ্টতা ও রহস্যের ধূমল ছায়া ইহাকে হিম-শীতল মৃত্যুপুরীতে পরিণত করিয়াছে।' 'গোরক্ষবিজয়' কাব্য যে জীবন-বিমুখ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রথমত স্মরণ রাখা দরকার যে ধর্ম-প্রতিষ্ঠার জন্যই নাথপন্থীদের এই কাহিনী গঠন করিতে হইয়াছে। ইহাতে গোরক্ষনাথের চরিত্রে হিংস্রতা আদি সব কিছুই বর্তমান। কিন্তু যে প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগকে প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্য সচেষ্ট হইতে হইয়াছে, তাহার কথা বিবেচনা করিলে ইহাকে কাব্যের একটা অদ্বিতীয় অপরাধ বলিয়া মনে করা চলে না। মঙ্গলকাব্যসমূহে দেবতাদের যে হিংস্রতা, নীচতা ও কুটিলতার পরিচয় পাইয়াছি,তাহার তুলনায় গোরক্ষ-নাথ এমন বেশি কিছু অপরাধ করেন নাই। গোরক্ষবিজয়ে দেবতার স্থান নাই, গোরক্ষনাথ নিজেই এখানে দেবতার আসন গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব দেবতার কাজ তাঁহাকে দিয়াই সারিয়া লইতে হইয়াছে। তবে ইহাকে যদি ঐতিহাসিক কাব্য বলিয়া বিচার করিতে হয়, তবে অবশ্যই গোড়াতেই গণ্ডগোল থাকিয়া যাইবে,—কারণ ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের লইয়া কাব্যে উপকথাই রচিত হইয়াছে।

কাব্য-বিচার

পূর্বেই বলা হইয়াছে মীননাথ এবং গোরক্ষনাথ ঐতিহাসিক পুরুষ হইলেও গোরক্ষবিজয় কাব্যটি একান্তই অর্বাচীন কালে রচিত হইয়াছে। তবে গোরক্ষনাথের অলৌকিক লীলাকাহিনী এবং মীনচেতন-কাহিনী যে বহু

পূর্বেই সর্বভারতে বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র গোর্খ-পন্থী যোগী বা যুগী সম্প্রদায় বর্তমান। পশ্চিম ভারতেও মীনচেতন-সম্বন্ধীয় ছড়া প্রচলিত আছে। বাঙলাভাষায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে সহদেব চক্রবর্তী-রচিত 'অনিলপুরাণে'ই (তাহা দ্রষ্টব্য) সর্বপ্রথম 'মীনচেতন' কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। মৌলবী আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদই সর্বপ্রথম 'গোর্খবিজয়' নামক পৃথক্ গ্রন্থ উদ্ধার করিয়া তাহা প্রকাশ করেন। তিনি যে সমস্ত পাণ্ডুলিপি হইতে গ্রন্থটি সম্পাদনা করিয়াছিলেন, তাহাদিগের প্রাচীনতমটি ১৭৭৮ খ্রী০ রচিত। গ্রন্থের ভণিতায় ভীমদাস, ভীমসেন রায়, শ্যামাদাস সেন, কবীন্দ্র দাস এবং ফৈজুল্লার নাম পাওয়া যায়। অধিকাংশ পাণ্ডুলিপিতেই ফয়জুল্লার নাম পাওয়া যায়, অপরদের নাম কোন কোনটিতে বর্তমান। ইহাদের কে বা কাহারা গ্রন্থটি রচনা করিয়াছিলেন, তাহা অনুমান করাও সম্ভব নয়। শ্যামাদাস, ভীমদাস বা কবীন্দ্র-সম্বন্ধে কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। চট্টগ্রাম অঞ্চলের ফযজুল্লা নামক একজন কবি বৈষ্ণবপদ রচনা করিয়াছিলেন। হয়তো ইনিই এই গ্রন্থটিরও রচয়িতা হইতে পারেন।

কবি-পরিচয়

গোরক্ষবিজয়ের তুলনায় 'ময়নামতী বা গোপীচন্দ্রের গানে' মানবিক আবেদন অপেক্ষাকৃত বেশি। জালন্ধরিপাদ বা হাড়িপা শিবের শাপে হাড়ি হইয়া গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্রের রাজ্যে হীনকর্মে নিযুক্ত ছিলেন। রাজমাতা ময়নামতী ছিলেন সিদ্ধা, তিনি ইহা জানিতে পারিয়া গোবিন্দচন্দ্রকে হাড়ির নিকট হইতে দীক্ষা লইতে আদেশ করিলেন। কিন্তু হাড়ির নিকট হইতে দীক্ষা লইতে গোবিন্দচন্দ্র অসম্মত হইলে রাণী ময়নামতী আপন সিদ্ধাই দেখাইলেন। তখন গোপীচন্দ্র হাড়িপার নিকট দীক্ষা চাহিলেন। হাড়িপা গোপীচন্দ্রকে পরীক্ষা করিতে চাহিয়া তাহাকে ভিক্ষায় পাঠাইলেন। গোপীচন্দ্র গুরুর সঙ্গে দেশ-দেশান্তর ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। শেষে গোপীচন্দ্রকে হীরা নামক এক বারাঙ্গনার কাছে বাঁধা রাখিয়া চলিয়া আসিলেন। বারো বৎসর পর হাড়িপার মনে পড়িলে তিনি গোপীচন্দ্রকে উদ্ধার করিয়া আনিলেন। এইবার গোপীচন্দ্র রাণী অদুনা ও পদুনার পরামর্শে হাড়িপাকে মাটির নীচে পুঁতিয়া রাখিলেন। হাড়িপারে শিষ্য কানুপা বহুকাল গুরু সন্ধান না পাইয়া গোরক্ষনাথের নিকট শুনিলেন যে গুরুকে মাটির নীচে পুঁতিয়া রাখা

গোপীচন্দ্রের গানের কাহিনী

হইয়াছে। কানুপা শিশুর মূর্তি ধারণ করিয়া গোপীচন্দ্রের রাজ্যে উপনীত হইয়া আপন সিদ্ধাই দেখাইলেন। গোপীচন্দ্র তাহার শরণ লইয়া হাড়িপাকে মুক্ত করিলেন। ইহার পর রাজা গোপীচন্দ্র সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া অমর হইলেন। রাণী ময়নামতীও পরম সুখ অনুভব করিলেন।

এই কাহিনীটির মধ্যেও 'গোরক্ষবিজয়ের' মত অলৌকিকত্ব এবং আজগুবি কাহিনীর ছড়াছড়ি; জনৈক সমালোচকের মতে 'শিশুচিত্ত লইয়াই ইহার কাহিনী অনুধাবন করিতে হইবে। দেবতা ভূত পশু কীট উদ্ভিদ সকলেই এখানে মানুষের সহচর ও সমধর্মী, কোন অলৌকিকতাই এখানে অবিশ্বাস্য নহে। .. কেবল অলৌকিকতা নহে, রূপকথার আঙ্গিক ও বর্ণনাও গোপীচন্দ্রের গানে দেখা যায়।' কিন্তু তৎসত্ত্বেও গোপীচন্দ্রের গান অপেক্ষাকৃত মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ। ময়নামতী প্রথমাবধি পুত্র গোপীচন্দ্রকে সন্ন্যাসী সাজাইবার চেষ্টা করিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে আপন অন্তর তাহার প্রতিক্রিয়াটুকুও স্বরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণ-কালে অদুনা-পদুনার অন্তর্ভেদী বিলাপের মধ্য দিয়া অদ্ভুত অলৌকিক ক্ষমতার মাহাত্ম্যও মুহূর্তের জন্য ভুলিয়া থাকা যায়। তদুপরি রচনার ফাঁকে ফাঁকে কবিরা যেন বাস্তবে নামিয়া আসিয়াছেন আর সেই অবসরে বাস্তবজীবনানুভূতিরই পরিচয় দান করিয়াছেন। গ্রন্থটির ভালোমন্দ বিচার করিয়া ড০ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থ মন্তব্য করিয়াছেন: 'যে সমাজের পটভূমিকায় কাহিনীটি বিন্যস্ত হইয়াছে তাহা হিংস্র, ক্রূর, বর্বরোচিত প্রবৃত্তির অমার্জিত উচ্ছ্বাসে অসংবৃত ভোগ-লালসায়, শৈশবসুলভ উদ্ভট কল্পনার আতিশয্যে এবং সমাজ ও পরিবার-জীবনের রূঢ়, সুষমাহীন ছন্দে এক অর্ধ-সভ্য, অপরিণত সংস্কৃতি ও জীবন-বোধেরই পরিচয় বহন করে। এই অশিক্ষিত, আদিম সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ হইতেও যে এরূপ উন্নত, যথাযথ ভাব-প্রকাশক্ষম, সূক্ষ্ম তত্ত্ব পরিস্ফুট করিতে নিপুণ, কাব্যগুণসমৃদ্ধ রচনার প্রেরণা আসিয়াছে ইহাই বাঙালী-জীবনের এক চিরন্তন বিস্ময়।' 'গোপীচন্দ্রের গানে'র মূল কাহিনীটিকে অনেকেই বাস্তবতার কাঠামোয় গঠিত বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু বর্তমানে তাহা হইতে ইতিহাস উদ্ধার করিতে গেলে বিড়ম্বনাই সার হইবে। তবে এই কথা সত্য যে গোপীচন্দ্রের কাহিনীর উদ্ভব বাঙলা দেশে। উড়িষ্যায় রাজেন্দ্রচোলের (১০৬৩ খ্রী০-১১১২ খ্রী০) এক শিলালিপিতে বঙ্গরাজ গোবিন্দচন্দ্রের উল্লেখ

কাব্য-বিচার